RH5085

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
আবাহন			রূপের পূজারী কবি		
চিত্ররূপা	ডঃ বমা চৌধুরী ...	১	দেবেন্দ্রনাথ ...	কালিদাস রায় ...	৫৯
মধুবেন সমাপয়েৎ	সুবোধ ঘোষ ...	৩	দুর্গম ...	মানবেন্দ্র পাল ...	৫৭
কাশ্মীর প্রসঙ্গে	অন্নদা শঙ্কর রায় ...	৭	মকাম্বা সক্রেটিস ...	বেজাউল করীম ...	৬৯
চিত্রোর গড়	অতুলা ঘোষ ...	১১	হোমার গীত		
ভাগবতী তনু	শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১২	জাগলো স্মৃতি ...	বণজিৎ কুমার সেন ...	৬৫
ও কিছু নয়	বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	১৭	কানের ভিতর দিয়া	পার্থ চট্টোপাধ্যায় ...	৬৯
বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ			চারন কবি মুকুন্দ দাস	নরেন্দ্র কুমার গুহরায় ...	৭৩
সঙ্গীত সামগ্রীর			বকযন্ত্র ...	ইন্দ্রনীল ...	৭৭
সংক্ষিপ্ত পরিচয়	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ...	২১	প্রস্তরের পাথার ও		
নিবেদন	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৭	ত্রয়োদশী 'বনফুল' ...	ভবপ্রসাদ মিত্র ...	৮৫
ত্রৈধরী	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	২৯	ক্লান্তি ...	প্রভা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ...	৯০
সংস্কৃতে নারী শব্দ	সুকুমার সেন ...	৩৩	মাষিক উল্লাস্তর		
বাঘ	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ...	৩৭	পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ ও		
বিচিত্র সংলাপ	প্রমথনাথ বিশী ...	৪১	গান্ধী ...	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ...	৯৯
ইরা, মুরলা ও			ঝিনুকে লুকনো		
অন্যান্যরা	বিমল কর ...	৪৩	মুক্তা ...	শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ...	১০৩

সূচী পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভগবান না ভাকুন	— মনিলী বিশ্বাস চন্দ	১১১
অবলে অসে ভাবা	— সুবল নাথ ঘোষ	১১৪
সেই লজ্জা যাও।		
ভারিয়াস ছবি	— রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬
বিদেশে রচিবে লজ্জা	— শচিলরঞ্জন বসু	১২৭
ভাবনলজ্জার ভূমিকা	— অন্ন মজুমদার	১৩১
ভারত ধর্ম	— হরদীন ভট্টাচার্য	১৩৭
অন্নেন্দুনারায়ণের		
বাঘ শিকার	— অন্নেন্দু দত্ত	১৩৯

কবিতা

আমার জীবন	— সুমুদরঞ্জন মল্লিক	১১৪
পথে হেরার দিন	— সজল ভট্টাচার্য	১১৬
কলমা আঁধি	— সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১১৬
ভাঙ্গা লজ্জা	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১৬
ঠিক আছি	— বকুল	১১৭
প্রবুদ্ধ আজের বন্ধ	— বিশ্বনাথ দেবগুপ্ত	১১৭
দর্পণে মনের ছবি	— বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
সেই অচেনা	— গোবিন্দ চক্রবর্তী	১১৮
ছন্দ পতন	— গোপাল ভৌমিক	১১৮
উৎস মুখে কিবে		
যাব	— মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১১৮
মুখে যাব	— সুশীল রায়	১২১
ভালবাসা ছাড়া	— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১২১

বিষয়		পৃষ্ঠা
নীল বেদনের		
মতো	— ইলা দেবী	১২১
কবিতার বদলে	— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১২২
বিশ্বিত প্রহর	— বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৩
জীবনের বয়	— শান্তশীল দাস	১২৬
ছাউনি	— আলোক সরকার	১২৭
চোখের পলকে	— অরবিন্দ গুহ	১২৭
কালানী কবিতা	— দিলীপ দত্ত	১২৯
আকাশ ইচ্ছা	— অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত	১২৯
ছয়াং নিমন্ত্রণ	— শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	১৩০
শুধু কথা	— অনিরুদ্ধ ঘর	১৩২
কলুর পদ্য	— তারাপদ রায়	১৩৪
ফেরার লগন	— সুধেন্দু বৈরিক	১৩৫
শুভদের	— সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	১৩৫
ইচ্ছে করে	— শাক্ত চট্টোপাধ্যায়	১৩৬
অজ্ঞাত হাওয়ায়	— আনন্দ বাগচী	১৩৮
সর্বনাশ	— প্রবব কুমার মুখোপাধ্যায়	১৩৮
শিবরাত্রের আজ	— সাধনেন্দু দত্ত	১৩৯
ঘর বেঁধা	— মোহিত চট্টোপাধ্যায়	১৩৯
অবলোকে বেতে		
চাই	— সন্তোষ কুমার অধিকারী	১৪০
বাইরে দাঁড়িয়ে	— শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৪১
শব সাধনা	— শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	১৪১

পূজার অভিনন্দন জানাই

সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্যসংস্থা মণ্ডলীর
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক

মেসার্স মান্না মণ্ডল এণ্ড মল্লিক কোং

রামকৃষ্ণপুর—ভড়াঘাট, হাওড়া

ফোন—৬৭-২৩২০

হেড অফিস : ১৬১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩-৩৭৫৩
৩৩-৩৮২০

সূচী পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
পরিপূরক	... আশাপূর্ণা দেবী	... ১৫৫
শেষ সংযুক্তি	... শিবরাম চক্রবর্তী	... ১৫৯
ইন্দ্রলুপ্ত	... নবেন্দুঘোষ মিত্র	... ১৬১
আহত	... প্রফুল্লকুমার মিত্র	... ১৬৯

সম্ভাষিকা

নাটক জোড়	... শ্যামলকান্তি দাশগুপ্ত	... ১৭৩
এবার পুজো এলো	... সলিল মিত্র	... ১৭৫
বাসনা	... মনোজ চট্টোপাধ্যায়	... ১৭৫
কী না হতে পারে		
মামার	... শুভানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ১৭৬
কেবল একটা	... মনোজিৎ বসু	... ১৭৬
চুল গজাতে পারে	... লক্ষ্মীকান্ত রায়	... ১৭৬
খেলা যখের ডঙা	... শঙ্কর গুপ্ত	... ১৭৬
এক রাতের ঘটনা	... তুষারকান্তি ঘোষ	... ১৭৭
সরষে	... অমিতাভ বসু	... ১৭৭
মগজের ফাঁকত	... বীরেশ্বরলাল ঘর	... ১৭৮
বিজ্ঞাপন	... আশা দেবী	... ১৮১
ছেড়া-ছিলের		
মিছিল	... বিশু মুখোপাধ্যায়	... ১৮১
দাদুর লাঠি	... উমা ঘোষ	... ১৮৭
বড় ভাই	... যোগেশচন্দ্র গুপ্ত	... ১৮৭
আমনা টুইন লোনা	... রাজেন বিশ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায়	... ১৮৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
কম্পিউটার	... অলোক দা	... ১৯৩
বাঘ	... প্রেমেন্দ্র মিত্র	... ১৯৪
চুল ছুটবে	... গৌরিক গোস্বামী	... ১৯৪
পুকুর পুকুর	... বিশ্ব মুখোপাধ্যায়	... ১৯৪
স্টেন রিমুভ	... পাঁচুগোপাল কুমার চক্র	... ১৯৫
খাবার ওষুধ খেলা	... অমল বুড়ো	... ১৯৬
ঘুটে ভেজা গাছ		
জাদুর	... বিমল ঘোষ	... ১৯৭
লিখে ডাক	... যামিনীকান্ত ঘোষ	... ১৯৯
টিকা-টিকে টিকা	... বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	... ১৯৯
আবোরের কাহিনী	... বৈষ্ণবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	... ১৯৯

আকন মালা দেবী	... নমিতা সেন	... ২১৮
আর এক ঘর	... শ্রীধর সেনগুপ্তি	... ২২০
রূপ মালক	... শ্রীদর্শন	... ২২১
খেলা ধূলা	... বিপাশীকুমার ঘোষ	... ২৩৮

প্রচ্ছদপট : ... সুনীল পাল

স্কেচ : ... কবিপদ দাস, ইন্দ্র কুমার, বরুণ মণ্ডল, গোপাল সরকার।

অলঙ্করণ : ... সুব্রত চিপাঠী, বরুণ মণ্ডল, গোপাল সরকার, বীরেন রায়, নৈবেদ্যী দেবী, অরুণেন্দু দত্ত।

উৎসবের
দিনগুলি
আনন্দমুখর
করে

লিলি বিস্কুট

দুইটি জনপ্রিয় বিস্কুট
কার্নিভ্যাল
ও
থিন এরারুট

লিলি বিস্কুট কোং, প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

শারদীয় জনসেবক ১৩৭১

আবাহন

সংবৎসরের প্রতীক্ষা অন্তে বাঙালীর মহাপূজা আজ সমাগত। বাঙলার জীবনে, জাতীয় জীবনে দুঃখ, দৈন্য, গ্লানির অন্ত নাই। তবু মহামায়ার এই মহাপূজার বাঁশি সে চিন্তা, সে বিচার আচ্ছন্নতের।

শারদীয়া মহাপূজায় মুহূর্তের অনুভব: প্রাত্যহিক জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে মানসিকতায় উত্তরণ। বাঙালী প্রার্থনা করে নিশ্চয়ই—

ঈশানীত্রাণি কল্যাণি
দুঃখহন্ত্রি নমোঽস্তুতে।
ত্রাহি মাং সর্বদুঃখেভ্যো
নমস্তুভ্যং ভবত্যম্বি॥

বাঙালী ভক্তিপ্লুত অন্তরেই প্রার্থনা করে, সকল দুঃখ গ্লানি হইতে আমায় মুক্ত করো। কিন্তু, এ প্রার্থনা জীবনের যাচ্ঞা নয়, হতাশ মনের আর্তি নয়। মুক্তির আশা এবং প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠায় এই প্রার্থনা, এই কামনা এক অনন্তসাধারণ সুরে, ধ্বনিতে, ব্যঞ্জনায় প্রতিধ্বনিত।

হে প্রভাত উষোদয় নব—

তব বিশ্বজাতে বিশ্ব তমোহরণাচরণ।

নিত্য প্রত্যূষ বন্দনা তুমার তবাঁত মুকুরে।

সেই মহামন্ত্র এই মহাপ্রভাতোৎসবে কবি বন্দিল। [illegible] করলে মানুষকে মুক্তিমন্ত্রের [illegible] প্রদান করেন।

প্রভাতোৎসব প্রকাশ হে দেবি! বিশ্বাধিকারিণী!

দেবী! বিশ্বের দুঃখহারিণী! তুমি প্রভা হও। তুমি বরদান কর।

মাতৃ-আরাধনায় এই প্রার্থনার উচ্চারণ করিব। জননী প্রভা হইলে প্রভাব লাভ করিব। প্রকাশ লাভে আত্মা ধন্য হইব। তদপেক্ষাও আর কি কাম্য? মাতৃ অন্তর আলোময়ী। জননীর কৃপাই আমাদের পাথেয়, আমাদের সম্পদ। তাই সন্তানগণ এই পূজায়োজন।

পূজায়োজন আমাদের ঘরে, আমাদের দ্বারে, আমাদের সমাজে; বাড়ী ও বসতীর মাঝে। সারা প্রকৃতিরও পূজায়োজনের সমারোহ। জননী আমাদের আনন্দময়ী। দুঃখনাশিনী। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে তাই এই মধুর আয়োজন। প্রভাত সূর্য হইতে সোনার আলোকে করিয়া পাঠিয়েছে—মাটির পৃথিবীর যেখানে যে বাঁধন আছে, সেখানেই বর্ণে তরল প্রাণে সে টান উঠিয়াছে। কাশের গুচ্ছে, নবীন ধানের সবুজীতে, কলাই কাশের পূর্ণ ফলে ফলে মাতামাতি, শিউলি শাখায় ফুলের মেলা—রাশি রাশি করিয়া পাঠিয়েছে। প্রকৃতির এই অপরূপের অজস্র সৌন্দর্য প্রাচুর্যের মধ্যে যে আনন্দের সন্ধান, তা মনকে পাইবার আনন্দ। দূরে হইতে, দূরে হইতে মাকে পাইবার আনন্দ। তাই এই দিনকে আমরা ফুলপাতার ঘরে সাজাই, দীপমালার দ্বারে উজ্জ্বল করি, সঙ্গীতের ধ্বনি মধুর করিয়া তুলি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, দুঃখশীতল আত্মবিস্মৃতির মধ্যে কোনও দিন হারাকে মোহমন্ত্রে মাতাল করিতে পারে না। বিসর্জনের ধ্বনি, প্রীতি উচ্ছ্বাসে ভরে এই চারটি দিনকে আমরা বৎসরের অন্যান্য সাধারণ দিনের মুকুটমণি স্বরূপ করিয়া তুলি।

জগজ্জননী মা আমাদের অন্নের প্রবাহে চিরচিরন্তন পূর্ণ করিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, আর আমাদের দুঃখ নাই, ভয় নাই, ক্লান্তি নাই। যে চরম সুন্দর কল্যাণ মুখে আমাদের চিত্ত অনন্তকাল ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—আমরা দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া আমার সেই মুখ সন্তোষ করিব। ক্ষুদ্র স্বার্থ চুলিয়া, ক্ষুদ্র অভিমান দূর করিয়া নিজেদের অন্তঃকরণকে আনন্দে ভরিয়া তুলিতে পারিলে আনন্দময়ীর উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের মা জগজ্জননী, নিখিল চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন—তবু বিশ্ব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত তাহাকেই আমাদের সব সাধনা প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের [illegible] সার্থক হইবে।

মায়ের কল্যাণী কল্যাণী মূর্তি ভাবভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মত ভাবিতে হইবে—সকলে আমাদের সকল উপকরণ, সকল উপচার নিবেদন হইবে। আমাদের যেখানে আঘাত হইয়া উঠে, আমাদের মনে সমারোহ আঁকিয়া পড়ে, যেখানে ঘাতি প্রতিঘাতের জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে সকল কর্ম লোকে পরিচালনা করে, যেখানে পুরাতন অভ্যাস আচারমাত্রে পর্যবসিত, সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত জড়, সমস্ত স্বার্থ; বিশ্বজননীর আহ্বানে উপস্থিত হইয়া দিবিয়া আসে। তাই বলি, উৎসব প্রাঙ্গণের দূরত্ব হৃদয়কে লুটাইয়া দিতে হইবে; তবেই মা আমার উৎসবের অধিকারী হইব। আমাদের প্রার্থনা সফল হইবে। আমরা ধন্য হইব, চরিতার্থ হইব।

যথার্থসাধনার জন্য সময়ও দিতে হয়। পরীক্ষাই উত্তীর্ণ করে। বাঙ্গালীর নিকট এই কথা নূতন নয়। তাই দুর্বি পরের আকাশে আলোকরশ্মির অন্তরালে দুর্যোগের আসন্নতার একটি [illegible] সম্মুখে পরীক্ষা। ক্ষুধা, দুঃখ, অন্ধকারের প্রচণ্ড কশাঘাতে জর্জরিত বাঙ্গালা। এই কশাঘাত কি বাঙ্গালীকে পঙ্গুত্বে করিবে, না জাগ্রত করিবে, উদ্বোধন করিবে? [illegible] বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার অমৃত হস্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, এই মানুষী [illegible] আকাশে স্থির শ্রামিনীর ন্যায় কোটী সূর্যের ছটাতেও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে কোন পরীক্ষাই অনতিক্রম্য হইবে না; কোন নৈরাশ্যই অবলম্বনীয় হইবে না। অভয়াকে পাইয়া আমাদের সকল ভয় ভাঙিবে। তিনি দুঃখহরণকারিণী দুর্গা। কেন আমরা নিজেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে দিনযাপন করিব? 'আমাশ্রিতানাং ন বিনশ্যতি'—তাঁহাকে যাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদের বিপদ স্থায়ী হয় না।

কর্মসাধনেই জীবন। সেখানে যা কর্মপ্রধান সেখানে ফোন-দেখাশোনার কথা নাই। কর্ম আছে, কর্মের ফলশ্রুতি আছে। কর্ম করো, ফল পাইবেই। দেবীর সাধনার দুই দিক—ভাবের ও কর্মের। ভাবরহিত কর্মসাধন উচ্চাঙ্গ হবে না; তেমনি কর্মকে বাদ দিয়া ভাবসাধনও পর্যাপ্ত নয়। একদিন ছিল, যখন এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙ্গালীর সমাজ জীবন, তাহার জীবন এই ভাবের, এই কর্মের মুকুলে সমস্বরে আন্দোলিত, আলোকিত, উচ্ছ্বসিত হইত। আজ পুনরায় সেদিনের শক্তিসঞ্চারিণী কল্পনায় শক্তি আহরণ করিব। কর্মরত হইব।

প্রার্থনা করিব, হে উষসী, তুমি শুভ্রমহিমার স্নিগ্ধ সঞ্জীবনীর সকলকে সুকোমল স্নেহাঞ্চলে আবৃত করিয়া অমরাবতী হইতে; তোমার আলোকে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, আমাদের শক্তিতে ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক। আমরা যেন দুঃখকে অবজ্ঞা না করিয়া, তাহাকে যেন তোমার মঙ্গলস্পর্শের দানে বরণীয় করিতে পারি।

সত্যমঙ্গলে সংসারে সত্যশিব সমীরণে।

ঘরেঘরেতে নো দেবি দুর্গে

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবী ! বিশ্বার্তিহারিণি !
ত্রৈলোক্যবাসীনামীড্যে :
লোকানাং বরদা ভব ॥

চিতিরূপা

ডঃ রমা চৌধুরী

চিতিরূপিণী যা কৃতজ্ঞতের ব্যাপ
স্থিতা জগৎ।
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মা
(শ্রীশ্রী চণ্ডী ৪।৮০)
আদ্যাশক্তি যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী
তাঁহাই প্রণাম, তাঁহাকেই জানাই,
তাঁহাকেই প্রণাম একাকিনী।"

আজ মহাজননী-পূজাকালে এই গৃহে মহাসাত্ত্বিক, শুদ্ধসত্ত্ব, সর্ববান্দিত, পূত মন্ত্রমেধী মহিত ভবে ঈশ্বর হয়ে পরম গৌরবে মহাকাল—বাধা। কত ভাবেই না আমরা তাঁকে বন্দনা করছি; করছি নানা বিশেষণে বিভূষিত; কিন্তু অনন্তা, অপারা তাঁর পার তো আমরা কিছুতেই পাচ্ছিনা; কিছুতেই তাঁকে ধরতে না আমাদের মন —এমনই আচ্ছন্ন তাঁর মহিমা।

এই সব বর্ণনার মধ্যে, একটী কেন্দ্রীভূত, সাধারণীন ধারণা হল এই যে তিনি জ্ঞান-স্বরূপিণী। বস্তুতঃ, আমাদের দর্শন-শাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্বে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের একটী প্রধানতম লক্ষণরূপে গণ্য করা হয়েছে এই জ্ঞানস্বরূপত্বকে। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপা—সৎ, চিৎ, ও আনন্দ তাঁর স্বরূপের তিনটী দিক।

"চিৎ" বলতে আমরা কি বুঝি? একেত্রে, লক্ষ্যার্থক দিক্ দিয়েই আমাদের আলোচনা করতে হয়। এই দিক্ থেকে, ব্রহ্ম "জড়ত্ব-বিহীন; অজ্ঞানহীন। জ্ঞানকে সকল দর্শন-শাস্ত্রেই চেতনত্বের বিশেষ লক্ষণ বলেই গ্রহণ করা হয়। চেতন অচেতন যত জড় বস্তুই যাক। এই পৃথিবীতে একটী বস্তু ব্যতীত সব কিছুই জড় বস্তু—ঘট-পটাদি জড় বস্তু, দেহেন্দ্রিয়ও জড় বস্তু, মনও জড় বস্তু। অজড় একমাত্র আত্মা; এবং জ্ঞান এই আত্মারই, একমাত্র এই আত্মারই স্বরূপ। চেতন, লক্ষ্যার্থক দিক্ থেকে, ব্রহ্ম ঘটপটাদি নন; দেহেন্দ্রিয়াদিও নন; মনও নন; তিনি আত্মা, একমাত্র আত্মা। কিন্তু এই সম্বন্ধে উপলব্ধি আসে পরে। প্রথমেই আমরা লাভ করি সেই লক্ষ্যার্থক জ্ঞান যে, ব্রহ্ম এই পৃথিবীর কিছুই নন।

কিন্তু সংসারের ও আমরা অজড়-জড় চেতন-অচেতন জ্ঞান-অজ্ঞানের মধ্যে প্রত্যহই প্রভেদ করে থাকি। এই প্রভেদের সার্থকতা কি? তা হল এই:—

সাংসারিক দিক থেকে আমরা মন, বা চিত্ত, বা অন্তঃকরণকে বলি "চেতন" বা "আত্মা" বা "অজড়"; বাহ্যবস্তু এবং দেহকে বলি "অচেতন" বা "জড়"। অর্থাৎ আমরা বলি যে, ভাবনা (Thinking), ভাব (Feeling), এবং কামনা (Willing)—এই তিনটীই হল মানব-মনের প্রধান বৃত্তি (States and Processes)। এবং, পাশ্চাত্য জ্ঞানেও, এই হল প্রভেদের। যথা, আমরা পড়ছে জানছি—এই হল "ভাবনা"; আমরা পড়ছে দেখে সুখোপভোগ করছি—এটি হল "ভাব" আমরা পড়লাভের জন্য যত্ন করছি—এটী হল "কামনা"।

পাশ্চাত্য দিক থেকে, অবশ্য আমরা

এই ভাবে অজ্ঞ-জড়, চেতন-অচেতন, জ্ঞান-অজ্ঞানের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রভেদ রহিয়াছে। এবং এই দিক থেকে, সে প্রভেদের আবশ্যকতাও আছে। যথা, আমরা যদি বলি ঘট জড়, অচেতন, জ্ঞানহীন; চিত্ত অজ্ঞ-চেতন, জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ না করলে পার্থিব জীবন অচল হয়ে যায়।

কিন্তু পারমার্থিক দিকের কথা অন্য। পারমার্থিক ও লৌকিক জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ মূলীভূত। পারমার্থিক দিক্ থেকে লৌকিক জ্ঞান জ্ঞানই নয়—অথচ লৌকিক জ্ঞানই আছে। তার কারণ হল এই যে, পার্থিব জ্ঞানের ধারণা যে, চিত্ত নিজেই যে জড়, বা অচেতন—তাহলে আর তা জ্ঞানের দ্রষ্টা হবে কিরূপে, জ্ঞানস্বরূপই বা হবে কিরূপে?

বস্তুতঃ, লৌকিকাবস্থায় আত্মার জ্ঞান যেন মনে প্রতিফলিত হয়, এবং তাতেই যেন মনকেও জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা বলে বোধ হয়।

সে যাই হোক্, পারমার্থিক জ্ঞানের প্রণালী সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। প্রথমতঃ, ঐক্ষেত্রে "প্রণালী" কথাটাই ভুল, যেহেতু পারমার্থিক জ্ঞানের কোনো "প্রণালীই" নেই—আমরা "প্রণালী" বললে মনে হয় যে, জ্ঞান যেন পৃথক থাকে না; পরে বিশেষ এক "প্রণালীর" সাহায্যে সেই জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান শাশ্বত জ্ঞান, কোনো "প্রণালীর" প্রয়োজন তার একেবারেই নেই।

সুতরাং, জ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি, তত্ত্ব-জ্ঞান তার সবেরই বিপরীত। আমরা সাধারণতঃ জ্ঞান বলতে বুঝি—

একটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে একটি বিশেষ চিত্তবৃত্তির সংযোগ হলে, অন্তরে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যিক প্রণালীর সাহায্যে (যথা, বাস্তবের একটি বিশেষ রূপ, অথবা, ভোগের উত্তেজনা, পারিপার্শ্বে অস্তিত্বরূপ, এর বা চিত্তে সেই বিষয়ের একটি ছাপের উদয় হয়, এবং এই ভাবের সেই বস্তুবিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়।

এটি অবশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রণালী। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের জ্ঞানের প্রণালী অন্যরূপ। কিন্তু জ্ঞান এইভাবে পার্থিব বস্তু এবং পার্থিব সর্বের বিষয় নির্ভরশীল প্রত্যেক ক্ষেত্রেই।

পুনরায়, এরূপ জ্ঞানের ফলে সেই জ্ঞানাধার জীব "জ্ঞাতা" হয়; অর্থাৎ, একটি বস্তুকে জ্ঞানে প্রত্যক্ষ ভাবে ভোক্তা, জীবরূপ অপ্রত্যক্ষ ভাবের ভোক্তা।

কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এ'সব কিছুই সম্ভবপর নয়। তাঁর পার্থিব দেহ-মন নেই, তাঁর বাহিরে কোনো পার্থিব জগৎও নেই। পুনরায়, তিনি "জ্ঞাতাও" নন, কেবলই "জ্ঞান"।

এরূপে, লক্ষণের দিক্ থেকে, ব্রহ্ম জড় হবারও নয়; তথাকথিত অজড় জ্ঞাতাও নয়।

পুনরায়, লক্ষণের দিক্ থেকে, "জ্ঞানের" অর্থ হল: পরম, পরিপূর্ণ, শাশ্বত ঔজ্জ্বল্যতা আলোকময়তা, প্রকাশ স্বরূপতা। "ঔজ্জ্বল্যের" বৈশিষ্ট্য কি? "ঔজ্জ্বল্যের" বৈশিষ্ট্য হল স্বীয়বিকাশশীলতা, স্বপ্রকাশপূর্ণতা, স্বপ্রকাশকতা। কারণ, এরূপে "জ্ঞানের" অর্থ স্বপ্রজ্ঞানতা—অপরকে নিয়ে জানা নয়; কিন্তু কেবল নিজেকে "প্রকাশ"—কারো কাছে প্রকাশ নয়, কিন্তু কেবলই প্রকাশ: সক্রিয়ভাবে প্রকাশ নয়; কিন্তু কেবলই নিষ্ক্রিয় ভাবে স্থিতি। এরূপে যে স্থিতিই প্রকাশ, সেই স্থিতিই "জ্ঞানালোক" স্বরূপ।"

এরূপই আলোচনা করেন পরমা জননী—চিরন্তনময়ী, চিত্ত প্রকাশিকা। অতঃ, কি অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য, অনন্তরীয় ব্যাপার—আমরা নিজে দেখতে পাচ্ছি অন্যান্যের নয়, বাস্তবের ও নয়। কেন? অন্ধ সেইজন্যে ছিজ্ঞাসা করেন কেন সে দেখতে পাচ্ছে না? মানুষের তাহার জ্ঞান। একই ভাবে, আমরা হয়ে রয়েছে আমাদের চক্ষুর ধারা, নিষ্পন্ন হয়ে রয়েছে। আমাদের চিত্তবৃত্তিরা, আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞানের সুচতুরতা অন্তরালে। আমাদের নিজেদেরই সচেতনতার অন্তরালে: আমাদের নিজেদেরই সার্থপরতার সুরক্ষার আবরণে।

আজ এই শুভ মাতৃপূজা কালে যাঁর সেই অন্তরাল, সেই প্রকৃত, সেই আবরণ মনের অন্তরঃ সার্থিক ভাবের দূর করতে না পারে তো, তখন আমাদের এই আয়োজন, আড়ম্বর। আমরা আজ সগৌরবে ঘোষণা করছি যে, পরমা জননী আসছেন। আমাদের দীন হীন কুটীরে তিনি আসছেন। কিন্তু সত্যই কি তিনি "আসছেন"? কারণ, তিনি তো রয়েছেন, পরম কালই রয়েছেন, তাঁর তো যমনাগমন নেই। কেবল উপলব্ধি হয় যে তিনি রয়েছেন। আকাশে, বাতাসে, অণুতে পরমাণুতে, বেদুতে বেদুতে তিনি রয়েছেন তাঁর অনন্ত, অসীম, অবিনশ্বর সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, ঐশ্বর্যে।

শ্রীশ্রীমাতৃপূজার এইটিই তো একমাত্র কথা—তাঁরই আলোকে জীবন সত্যসত্যটীকে বিকশিত করে তোলা; তাঁরই আনন্দে চিত্তবীণাটীকে মধুর করে তোলা। তাঁরই অমৃতে জীবন পাত্রটি পূর্ণ করে তোলা। এর অপেক্ষা মহত্তর, সুন্দরতর, মঙ্গলতর উদ্দেশ্য আর কি হতে পারে?

—(•)—

জায়গাটার নাম যোগিবন। এখানে কোন যোগী পুরুষ অবশ্য নেই, কিন্তু বন আছে অনেক। কোনকালে হয়তো কোন যোগী পুরুষ এখানে ছিলেন। কিন্তু কেমন করে এর উদ্ভব হয়েছিল, সেটা কল্পনা করতে চেষ্টা না করাই ভাল। আজও এখানে কোন মানুষ কাঁটাকালে কোন গাছের-তলায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করবে না। জঙ্গলের ভাল্লুক সন্ধ্যা হলেই রেল-লাইনের দিনগ্রাসের পুঁটির কাছে চুপ করে বসে থাকে। ডাকবাংলোর হাতার সর্বদৃষ্টির ঘোলের কাছ থেকেই একজোড়া জলন্ত নরুন চোখ চট্টার একটা লাফ দিয়েই ছুটে পালিয়ে যায়। এই যোগিবনে এমন বহু অযোগী মানুষের দুঃখ ও দুরন্তপনা আছে। জঙ্গলের গা ঘেঁষে একটা বস্তিও আছে। সে বস্তিতে সন্ধ্যাবেলা মাদলও বাজে; আর এখানে-ওখানে ছোট ছোট মাড়িতে আদিম জীবনের প্রদীপও জ্বলে। মাটির দেয়াল আর খাপরার চালা, ছোট-ছোট বাড়ি। কিন্তু সেজন্য এই যোগিবনের চারদিকের ভয়ানক স্তব্ধতা একটুও বিচলিত হয় না। রাতের বেলাতে এখানে ঘরের দুয়ারের কাছে এসে বসে থাকে। আদিম ছেলের কাছে যেখানে দুরন্ত জন্তু একটা গর্জনের মতো দু'চারটে ঘোলা ঘাড় দিয়ে ঘুপসুপ করে। একটু বাতাস হলেই সেখানে কাছাকাছি ছোটার ভিজে চক্‌চক্ শব্দ করে জল থাকে।

ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে যোগী বলেই মনে হয়। যেমন জুড়ে তেমনই বিকালে ও সন্ধ্যায়, আর চাঁদের আলো থাকলে রাতের বেলাতেও এইসব ছোট-ছোট পাহাড়ের দিকে চোখ পড়লে মনে হবে, ধ্যানমগ্ন কয়েক ও অন্তিকল এক-একজন যোগী এসে বসেছেন।

এই নিঃশব্দের বক্তব্যের বুঝেছে ঝিল্লিরাও কিন্তু মানুষের কাছে চলতে থাকে। সকাল থেকে বিকেল, বাস, ডাকের আর নয়। জঙ্গলের ভিতরে পাথরের খাদের কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটায় পাথর-কাটা বংশী মুন্ডার দল। পালা করে জাগে, আর পালা করে ঘুমোয়। জঙ্গলের বাঁশ কাটবার জন্যে যে ঠিকেদার আর মোটর ট্রাক আর লোকজন নিয়ে সকাল বেলাতে জঙ্গলে ঢোকে, সেও সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। রেলের সাইডিং-এর কাছে বাঁশের টাল নামিয়ে দিয়ে ঠিকেদারের মোটর ট্রাক তিরপাল মুড়ি দিয়ে সারা রাত পড়ে থাকে। সে তিরপালের গায়ে রাতের নেকড়ের মুখের আঁচড়ের শব্দ শুনে আশ-পাশের জন্তুরা মানুষ হয়ে করে নেবার তাড়ায়।

এমন যোগিবনে খুব দুরন্তপনা ও দুরন্তপনা নিয়ে একজন নিতান্ত ঘরোয়া ভদ্রলোকও থাকেন, যার নাম বিজয় বসু। এই পাথর খাদানের যোগাযোগের চালানবাবু হলেন এই বিজয় বসু। যোগাযোগের ফেড অফিস কলকাতায়। ৪' মাসে ৪' বার ফেড অফিস থেকে কোন একজন সুপারভাইজর আসেন। চালানবাবুর কাজের ধরন-ধারণ দেখে আর পাথরকাটার কাজের সুবিধা অসুবিধের কথা জেনে নিয়ে আবার কলকাতাতে ফিরে যান।

মধুরেন সমাপয়েৎ

*

সুবোধ ঘোষ

স্টেশনে গিয়ে ওয়াগনের বন্দোবস্ত করল, আর লাইটম্যান-এর ঘুরে ঘুরে ওয়াগনের পাখর বোঝাইয়ের কাজ সব একবার চোখে দেখে নেওয়া। আর ঠিকাদারের খাতাতে হিসেবের অংকগুলিকে একবার পরীক্ষা করে দিয়ে সই দেওয়া। এ ছাড়া চালানবাবুর চাকরিতে আর কোন লাভের সম্ভাবনা নেই। তাই চালানবাবু বিজয় বসু অনায়াসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন নতুন আগন্তুকের সঙ্গে পুরো একটি ঘন্টা গল্প করতে পারেন। ডাকবাংলাতে গিয়ে নতুন অভ্যাগতের পরিচয় জানতে পারেন। সুবিধা বুঝলে দু' এক ঘন্টা গল্পও করে যেতে পারেন। দিনে একবার ট্রেন আসে আর চলে যায়, এহেন স্টেশনে নতুন আগন্তুকেরও ভিড় নেই। যারা আসে, তাদের বেশির ভাগই কাছাকাছি দশ বারোটা গ্রামের মানুষ। তাদের হাতে ছাতা-বন্দুক, কাঁধে একটা পুঁটলি, তার ভিতরে হয়তো এক-আধসের নুন আছে; আর কিছু শুকনো ফলমূল আছে। ট্রেন এলেই বিজয় বসুর চোখেও পড়ত একটু বেশী উৎসুক হয়ে ছটফট করে দেখতে কোন বাঙালী ভদ্রলোক এলেন কিনা।

কচিৎ কখনও বাঙালী ভদ্রলোক আগন্তুকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর বিজয় বসুও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেন। তারপর বিজয় বসু তাঁর আসল ইচ্ছার কথাটাই যেন ভোর করে বলে ফেলেন।—তা কী ব্যাপার, আপনি ডাকবাংলোতে থাকবেন কেন? এখানে আমার বাড়ি থাকতে কোন বাঙালী ভদ্রলোক ডাকবাংলোয় আস্তানা করেন, এটা কী ভাল দেখায়?

আগন্তুক ভদ্রলোক অনেক আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত বিজয় বসুর অনুরোধের কাছে নতি স্বীকার না করে পারেন না। আগন্তুক ভদ্রলোক যে দুটো-তিনটে দিন বিজয় বসুর বাড়িতে আস্তানা করে থাকেন, সেই দুটো-তিনটে দিন যেন বিজয় বসুর বাড়ির জীবনের একটা উৎসব। বাড়ির সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিজয় বসুর স্ত্রী সোহনা বসু তাঁর সেরা রান্নার তালিকা বাঁধেন। বিজয় বসু খোঁজ করেন, ভদ্রলোক বাসার জল খেয়ে অসুখ কিনা, কুকুর কামড়ে দিলে ইনজেকশন নিতে হবে কিনা। বিজয় বসুর বড় মেয়ে টুসি, যার বয়স দশ বছর সেও আগন্তুক ভদ্রলোকের কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসে আর জিজ্ঞেস করে—ছবি আঁকেন?

আজ ট্রেন থেকে যিনি নামলেন যাঁর নাম বি দত্ত, তিনি কিন্তু কিছুতেই বিজয়বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করলেন না। তাঁর বিজয়বাবুর কাছে আজ অবশ্য একজন অপ্রত্যাশিত হাইং-আধিকার নন। তাঁর ওই পাথর কোম্পানীর কলকাতা অফিস থেকে আসছেন। তাঁর হলেন, সুপারভাইজর বি দত্ত।

উপরওয়ালা মানুষ যেভাবে খুশি হয়ে কথা বলেন, দত্তবাবুও ঠিক সেই ভাবে খুশি হয়ে বিজয়বাবুকে জানিয়ে দিলেন—ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ডাকবাংলোতেই থাকবো।

বিজয়বাবু—আমার এখানে থাকলে আপনার খুব বেশি অসুবিধে হবে না স্যার।

দত্তবাবু—হবে। আপনি বোধহয় সেটা বুঝতে পারছেন না।

বিজয়বাবু—কিন্তু ডাকবাংলোর খাওয়া-দাওয়া, অসুখ বিসুখ, আর খানসামাটার কাছ; এসব কি আপনার পছন্দ হবে।

—হবে।

—খানসামাটা কিন্তু কালে শুনতে পায় না, স্যার।

ছেলে কেলেন দত্তবাবু—আমি তো এখানে গান গাইতে আসিনি যে, কালা খানসামা হলেও হবে। হুইসেল বুঝবার ভাব হলে হবে, ব্যস, তাহলেই তো হয়ে গেল।

—এটা আমাদের ডিউটি বলেছেন স্যার; আমার এখানে থুবরী-ভাতের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন।

—তবে আর এত পীড়াপীড়ি করছেন কেন?

—আমাদেরই খুব ভাল লাগতো, সেই জন্যেই আপনাকে অনুরোধ করে বিরক্ত করছি।

—থাক এসব কথা। আপনি খাতাপত্র নিয়ে ডাকবাংলোতে কখন আসছেন?

—যখনই বলবেন।

—আজ রাত্রিতে আসুন।

—রাত্রিতে হবে না স্যার। এখানে সন্ধ্যা হলেই মেকড়ে ঘুরে বেড়ায়, আর একটু রাত হলেই জানোয়ার বড় হিংস্র হয়ে ওঠে।

হেসে ফেলে দত্তবাবু।—তাহলে আজ বিকালেই আসুন।

বিজয়বাবু—যে আজ্ঞে।

সুপারভাইজার বি দত্ত দেরি না করে ডাকবাংলোর রাস্তায় এগিয়ে গেলেন; আর বিজয় বসু চলে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ির দিকে, স্টেশন থেকে সামান্য একটু দূরে; গেলে গাছের একটা ঝিরঝিরে কাঁকে যে বাড়ির খাপরার চালার উপর এখন একটা পাহাড়ী ময়না বসে আছে।

[দুই]

থুবরী-ভাত খেয়ে নিয়ে, ডাকবাংলোর ঘরের একটা জানলার ধারে বসে যোগিবনের চারদিকের জঙ্গলের বিস্তার দত্তবাবু দেখতে থাকেন। বন্দুকটা নিয়ে এলেই ভাল হতো। এই যে

WITH BEST COMPLIMENTS
From
PAL & COMPANY
'Spec : T. M. B. Perkins, P. 6
Ambassador, Jeep Etc.
3, BARETTO LANE, CALCUTTA-1.

ব্যাপারটা এটাও যেন একটা অদ্ভুত রকমের। এই ট্রেনেও একেবারে অকারণ।

চমকে ওঠে প্রভাবতীর দুই চোখ। একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে আর কাঁধে আরো ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের দিকে চলে আসছেন যে মহিলা, সে যে একজন খাঁটি বাঙালী মহিলা। বাঙালী মহিলা না হলে কি কোন মহিলা ঠিক ওভাবে শাড়ি পরে? মহিলার হাতে কয়েকটা চিঠি। বুঝতে অসুবিধে নেই ট্রেনদের ডাক-ব্যাগে চিঠি ফেলবার জন্যেই মহিলা তাঁর মেয়ের হাত ধরে, আর যেন এই ট্রেনের দুপুরের রোদে একটু বেড়িয়ে নেবার আনন্দ নিতে ওই মহিলা এখন বের হয়েছেন। এখানে তো সন্ধ্যা হলেই বেরুতে যেতে। তাই যেকোন দুপুরে বিকেলে বেড়াতে বেরুবার এখানকার নিয়ম।

মহিলা কী যেন বলেছেন। এইবার মহিলার মুখটাকে একেবারে স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুপাশ-ঝাইবার প্রভাবতীর দুই চোখ এইবার যেন হঠাৎ একটা বিস্ময়ের ঝড়ের মধ্যে পড়ে ছটফট করতে থাকে, ঠিকই তো! এই পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে সোভাগ্য শেষে এই ভয়ানক বন্যার মধ্যেখানে এসে ঠাঁই পেয়েছে?

প্রভাবতীর দুই চোখ যেন পনর বছর আগের দুটো চোখ হয়ে এক পাঁয়াচিন্তায় মুখ দেখছে। হ্যাঁ, সেই সোভনা, যার পনর বছর আগের সেই প্রশ্নটা এই বিলাস প্রভাবতীর জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। বাঁচিতে বিলাস প্রভাবতীর বাড়ি যে-পাড়াতে, সেই পাড়াতেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন যে প্রফুল্ল ঘোষ, তাঁরই মেয়ে সোভনা। মাড়োয়াড়ীর কাপড়ের দোকানের বেতনী প্রফুল্ল ঘোষের মেয়ে সোভনা সেদিন বিলাস প্রভাবতীর কাছ থেকে যেন একটা সান্ত্বনার কথা শোনবার জন্যে মরিয়া হয়ে কত কাণ্ডই না করেছিল। বিলাসের বাঁচিতে নিজেই গিয়ে বিলাসের বোনের হাতে উপহার দিয়ে এসেছে সোভনা, নিজের হাতে কতটুকু সুতোর কাজ করা একটা ছোট্ট টেবিলক্লথ। বিলাসের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কাকে লক্ষ্য করে এই উপহার দিয়ে গেল সোভনা। যখন-তখন এসেছে সোভনা। বিলাসের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, যেমন আজকে? নিজের হাতের তৈরী খাবার কতবার নিয়ে এসেছে; তখনও চাকরি পেয়েছে, কখনও নার্ভাসনেস-পুলি। বিলাসের জন্মদিনে মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়াও পাঠিয়েছিল সোভনা। আজও মনে পড়ে বিলাস প্রভাবতীর, সোভনার সেই ব্যবহার দেখে বিলাসের মা-বাবা-আত্মীয়-স্বজনেরা একটু চিন্তিত হয়েছিল। সোভনা নিশ্চয় জানে না যে, বিলাসের বিয়ে এরকম ঠিক হয়েই আছে। আর বিলাসও এরকম ধরেই নিয়েছে যে, পাইলার মাস্টার জনার্দনবাবুর মেয়ে বেবার সঙ্গেই বিলাসের বিয়ে হবে। শুধু একটা বছর বিলাসের জন্য মনে-প্রাণে একটা আশা জাগিয়ে রেখে, তারপর নিজের কর্তব্যটুকু সোভনা। কে জানে কেন হঠাৎ মনে হয়েছিল সোভনা। বিলাসদের বাড়িতে দু'জনের মধ্যেই যখন সোভনাকে আসতে না দেখে খোঁজ নিয়েছিল বিলাসের বোন সুজাতা, তখন জানতে পেরে একটু আশ্চর্য হয়েছিল, যেমন সুজাতা তেমনি বিলাস, মাত্র এক সপ্তাহ হলো সোভনারা চলে গিয়েছে।

যাত্রাপথে আর সেই ছবি নেই। সোভনা আর মেয়ের হাত ধরে ট্রেন থেকে আবার কোন্ পথে চলে গেল কে জানে? কিন্তু ও কী সান্ত্বনা সোভনা?

খাবারের প্লেট নিয়ে ডাইনিংরুমের বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন বিজয় বসু। —আমি এসেছি ভাই।

—আসুন। আচ্ছা একটা কথা। আপনি বিয়ে করেছেন তো?

বিজয় বসু—চমকে নয়ন।

চমকে উঠল প্রভাবতী, শুধু চমকে—শুধু চমকেনয়ন বললেই তো সব বলা হলো না।

বিজয়বাবু—আমার শ্বশুর মশাইয়ের নাম প্রফুল্ল ঘোষ। উনি চিরকাল বাইরে বাইরে, বাঁচি, চাটানগরে কাজ করে শেষে চন্দননগরে এসেই সেটেল করেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন প্রভাবতী। একটা খালা হাতে তুলে নিয়ে আনমনার মত জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিজয়বাবু—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে তো আর?

প্রভাবতী হাসেন—হ্যাঁ, হয়েছে, কিন্তু খুব শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

—মানে?

—মানে এ দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনা নয়। যেন শুকুন। যেমন চিমসে, তেমনই শক্ত, দাঁতে কাটে ছাড়ে না।

—এঃ, যা বলে তো খুব ভালোর জন্যই বলো।

—ঈশ্বরে ওসব জাল। ওজনো গরুরা গুলে দিয়েছে।

—সর্বনাশ!

—তা ছাড়া, আপনাদের বাড়ি-বাংলার এই মেহোগনির খাট তো খাট নয়, ডাইনোসোরাস বলেছি। জিরোবার জন্য একটু শুতে গিয়েছিলাম মশাই: কিন্তু এক মিনিটু পরেই লাফিয়ে উঠতে হলো। মৌমাছি তো নয়; একেবারে ভীমরুলের পরিবার।

বিজয়বাবু আবার আক্ষেপ করেন।—এঃ, আপনার তো এখানে এসে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কী করে পুরো দুটো দিন কাটাবেন?

প্রভাবতী—তাই তো ভাবছি। তবে ওসব আপনি আমার যে-ভয় দেখিয়ে রেখেছেন!

—আজ্ঞে? কিসের ভয় দেখালাম?

—ওই যে বললেন, সন্ধ্যা হতেই মশা মেরেড়ে-টেরেড়ে আর খাক হতেই আরও বড় ছিলো.....।

বিজয়বাবু হাসেন—কিন্তু ডাক বাংলার ঘর-দরজা তো সবই পাকা আর যতদূর: জানি কবরার কিছু নেই।

প্রভাবতী—তার ওপর একটা কথা বাবার খানসামা। চৌকিদে ডাকলেও কোন সাড়া দেয় না। চেয়েছিলাম একটু গরম জল: দিয়ে গেল একটা ঠেলা আর কুচনো পেঁয়াজ।

বিজয়বাবু হাসেন—আপনি তাহলে একটা বিপদেই পড়েছেন, দেখছি।

প্রভাবতী—আরও দেখুন, এই ডাক বাংলোয় এখন একটিও চেয়ার নেই। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যে আধটা ঘণ্টা মনের সুখে গল্প করবো, তারও উপায় নেই। নাঃ, তাহলে আপনার এখানেই চলে যাই, বিজয়বাবু।

বিজয়বাবু—আমাকে বড় লজ্জায় ফেললেন; আমার বাড়ির বাইরের ঘরে তো এখন আপনার জন্যে একটু স্নান করে নেবার উপায়ই নেই। আজ স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের ভিস গ্রামিলা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচটি ছেলে-মেয়েও আছে। বাড়ীর [illegible]

দাঁড়িয়ে বলতে গেলে শুধু একটা ঘর : কাজের মাইনে মশাইয়ের কুটুম্বিতাদের আজ আমাদের বাড়ির বারান্দার ঘরে থাকতে হবে।

সত্যবাবু এবার বেশ একটু চিন্তিত-ভাবে কথা বলেন—এখানে আমার খাওয়া-দাওয়াও তো খুব অসুবিধে হচ্ছে। সকালে সেই মশাই তুলসী-চায়ে আপনি আমাকে একটু চা-টা খাওয়ান ; এখানে দারোগার বাড়ির এক্টু চায়ের কথা বলতে গেলে বন্ধ হয়ে যায়।

বিজয়বাবু—নিশ্চয় নিশ্চয়। কাল দুপুরবেলাটা তাহলে আমার ওখানেই চা-টা খাবেন আর।

সত্যবাবু—খাওয়াদাওয়া আজ থাকুক। এখন আর কিসের বন্ধন চাইছে না। আপনি বরং বাড়ি যান। আর, আমি এখানেই...কী আর করবো, চুপ করে যোগীর মত বসে থাকি।

চলে যাচ্ছিলেন বিজয়বাবু, কিন্তু সত্যবাবু ডাকলেন—শুনছেন।

বিজয়বাবু—কী?

সত্যবাবু—আপনি বোধহয় শুধু জানেন যে, আমি একাম বিলাস। আমার পুরো নামটা জানেন কি?

বিজয়বাবু—না।

সত্যবাবু—আমার নাম বিলাস দত্ত।

বিজয়বাবু হাসেন।—আমার কাছে কি দত্ত তা, বিলাস দত্তও তা। আমি তো বুঝতে পারি না যে, আপনি আমাদের কুলপরিচয়ের। আপনাকে তো আমি নাম ধরে ডাকতে পারি না আর।

সত্যবাবু হাসেন—ঠিক কথা। আমি বলছি এই জন্যে যে, কেউ হয়তো হঠাৎ আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, বি দত্তের পুরো নামটা কী?

বিজয়বাবু—আচ্ছা আমি এখন চলি। কাল দুপুরে আমিই এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

[তিন]

বিজয় দত্তর বাড়ির বাইরের ঘর। স্টেশন মাস্টারের কুটুম্বিনীরা, যাঁরা কালী ঘাটে এ-ঘরে ছিলেন, তাঁরা চলে গিয়েছেন। আর এখন এই ঘরটি ছোট একটা টেবিল, তার উপরে রঙীন সুতোর কাজ করা একটা ঘাটির কাপড়ের ঢাকা। টেবিলের উপর চীনে মাটির একটা ফুলদানি ; তার মধ্যে টাটকা ফুলের একটা গুচ্ছ।

ঘরে ঢুকেই বেশ প্রসন্নভাবে চারদিকে তাকালেন সত্যবাবু বিলাস দত্ত।—বাঃ, চমৎকার ফুল।

বিলাস দত্তের চোখে যেন মনের বহু আশের এক অভ্যর্থনার বিস্ময় টিক টিক করে জ্বালতে থাকে। সে অভ্যর্থনা এখনও যে সাঙ্গই হচ্ছে তা নয়। ফুলের গুচ্ছ হয়ে বিলাস দত্তের চোখের সামনেই এসেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন, আর ভাবতে গিয়ে ফুলদানির পাশেই চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিতে ভুলে যান বিলাস দত্ত। শোভনা যে সত্যিই আজও তার মনের মধ্যে আগের আশার মানুষটাকে ভুলে যেতে পারে নি।

ঘরের দরজার দিকে তাকাল বিলাস দত্ত। আজ কী কথা বলবে শোভনা, যখন এই দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে আর বিলাস দত্তকে দেখতে পাবে? সেই শোভনা, যে তাঁর বাসে অন্তত তিন বার বিলাস দত্তের বাড়িতে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছেন? আজও শোভনার এই জিজ্ঞাসার জবাবে বলে দিতে পারবেন বিলাস দত্ত, আমি ভাল আছি ; কিন্তু তুমি কেমন আছ, শোভনা?

কিন্তু অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। বাড়ির ভিতরে শুধু বিজয়বাবুর হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। শোভনা কি এখনও জানতেই পারেনি যে, বিলাস দত্ত এখন এই ঘরে এসেই বসে রয়েছে। শোভনাও কি ঘরেও ভাবছে সেরেছিল যে, তার মনের মধ্যে আগের একজন ভালবাসার মানুষ আজ এতদিন পরে এই ঘরটিতে বেলা যোগিবনে এসে তারই সমাদরের অভ্যর্থনা হবে?

ঘরে ঢুকলেন বিজয়বাবু—আর দেরি নেই, ভাই। হঠাৎ, দুটো বেজে গিয়েছে, তাই বললাম, জানা করে খাও। জানা হয়েও গিয়েছে।

বিলাস দত্ত—জানা-টানা না হলেও চলবে। আমি ও জানার অপেক্ষায় আর থাকছি না আর, ওটা জানা

বিজয়বাবু—আজ্ঞে?

বিলাস দত্ত—আপনার তুলসী মিস্ত্রি লোকের বয়সের মানুষ নন।

বিজয় বাবু—ঠিক উল্টো। বড় বোঁ একেলে। কোন লজ্জা-টজ্জার বা ধারে না। মাঝে মাঝে আমার সাই কেলটা নিয়ে নিজেই চালিয়ে স্টেশনে চলে যায় ; আর তাদের চিঠি ফেলে দিয়ে আসে।

বিলাস দত্তের চোখের তারা স্থির হয়ে ওঠে। আর ঘটনাটি ঘটে।—বলেন কি? আই কোন্ : তুলসীকে এখন বলুন, আমি দুটো ডাল-ভাত খেয়ে নিয়ে সরে পড়তে চাই। তাতা না হলে চলবে।

বিজয়বাবু হাসেন—যেমন ভাবছে আমার মেয়ে টুলি : তুলসী এখন স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে একদিনের চেনা বান্ধবীদের সঙ্গেই গল্প করতে যায় রয়েছেন।

—তাঁ? উনি এখন বাড়িতে নেই?

—না তাই।

উনি কি জানেন না যে, আজ একজন অতিথি তাঁরই বাড়িতে আসবেন।

—জানেন বইকি। কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের কুটুম্বিনীরা আজই চলে যাবেন। তাই তাদের সঙ্গে দেখা করে নিতে চলে গেলেন।

বিলাস দত্ত আবার ওঁর আনমনার বন্ধ চৌখলের ফুলদানির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা কথা যেন তাঁর মনের হঠাৎ আবছায়ার আবার মত মুখ থেকে বের হয়েই পড়ে।—উনি ঘরে না থাকলেও সব ব্যবস্থা বেশ ভালভাবে করে রেখে গিয়েছেন, দেখছি।

বিজয়বাবু—আজ্ঞে?

বিলাস দত্ত—টাটকা ফুলের ছোড়া টাকে সাজিয়েছেন ভাল। ফুল আর পাতা এভাবে কাছাকাছি করে মিশিয়ে দিয়ে.....।

বিজয়বাবু—ফুলের ছোড়া আমি বেঁধেছি। এটা আমার পুরনো অভ্যেস।

বিলাস দত্তের চোখ দুটো হঠাৎ ঝুঁকে যায়।—তাই নাকি? কিন্তু এই টেবিল ঢাকার রঙীন সুতোর কাজ তো আপনার হাতের কাজ নয়। এটা নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর কারুর একটা চমৎকার কাজ।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে

অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীশান্তিকুমার দিন
শ্রদ্ধাস্পদেষু
প্রীতিভাজনেষু,

ভ্রাতের তৈরি বিরিয়ানির স্বাদের মোহ ত্যাগ করা আমার পক্ষে সহজ নয়। বন্ধুদের অনুরোধে লোদিন গার্ডেনের ও জামদেদপুরের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি উপলক্ষে যে বিরিয়ানিটিতে স্বাদের মোহ ত্যাগ করি তার উপাদানগুলি সকলেই সুপরিচিত। তার থেকে এ রকম একটা ধারণা জন্মাতে পারে যে আমিও তাঁদের একজন। তাহলে এমন কিছু এসে যেত না, কিন্তু পরে দেখা গেল কাশ্মীর নিয়ে গবেষণাকর্মীদের অনেকজন বিশেষ একপ্রকার সমাধানের ইঙ্গিত করছেন ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন যে আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত তা হলে আমার উপর অবিচার করবেন।

গণতন্ত্রে কেউ কারো ছাত পা বেঁধে রাখতে পারে না। অযৌক্তিকভাবে কাজ করার অধিকার যে কোনো নাগরিক রাখে। জয়প্রকাশ যা ভালো মনে করেন তা করতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। দরকার সব বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকা এবং বিক্ষোভপ্রদর্শনের দাবী করবার দাবী রাখা। যেমন তাঁরা স্বীকৃত সরকারের বিরোধ ও সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত। দাবের পক্ষে অধিকাংশ লোক বলে শাস্ত তার যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ দেবে এমন নয়। এটাও একরকম আন্দোলন।

জয়প্রকাশের অনুরোধে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মিটমাট। মিটমাটের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় তাঁর মতে কাশ্মীর। পাকিস্তানীরাও এই কথা বলেন। অর্থাৎ আগে কাশ্মীর, তার পরে অন্য কথা।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোনটা আগে, কোনটা পরে, এ নিয়ে তর্ক করতে করতে দশ বিশ বছর কেটে যায়। তবু কেউ কারো সোজাসুজি যায় না। রাশিয়া বলছে, আগে নিরস্ত্রীকরণ। আমেরিকা বলছে, না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। মিটমাট হচ্ছে না। যে কোনো দিন মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারত। এখনো বাধেনি। তেমনি লাল চীন বলছে, আগে কমনোয়েলথ, আমেরিকা বলছে, না। বছরের পর বছর যাচ্ছে। মিটমাটের লক্ষণও নেই। যে কোনো দিন মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোনটা আগে, কোনটা পরে, এ নিয়ে তর্কের কোনো নিষ্পত্তি আছে। রাশিয়া বা লাল চীন বা আমেরিকা কেউ অনর্থক তর্ক করছে না। অকারণে যুদ্ধের ভয়ে প্রস্তুত থাকছে না। তবে এটাও ঠিক যে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজী নয়। লাল চীনও না। এটা বৈর্যের খেলা।

ভারত ও পাকিস্তান যদি দুটো আলাদা আলাদা সমস্যা হয়ে থাকে তখন কাশ্মীর নিয়ে কলহটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যাপার হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির যা কোনো ক্ষতি বাড়বে। কোনটা আগে, কোনটা পরে এ নিয়ে তর্ক অনন্তকাল চলবে। যুদ্ধের ভয়ে প্রস্তুত থাকারও অন্ত নেই। তা বলে যুদ্ধের ভয়ে আমরা চলতে চলবে না। পাকিস্তান যদি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায় নিতে পারে। কিন্তু ভারত ধৈর্য ধরবে। এটাও ধৈর্যের খেলা।

তা হলে কাশ্মীর সমস্যার মিটমাটের জন্যে এই ব্যাকুলতা কেন? এটা কি জয়প্রকাশের মতো আদর্শবাদীদের চলচ্চেষ্টা? না, এর পিছনে রাজনীতি চলে আছে? এটা কি ভারতের স্বার্থ নয়, বিদেশীদের স্বার্থ?

ব্যাপারটা অত সরল নয়। কারণ ব্যাপারটা বিশুদ্ধ আন্তর্জাতিক নয়। পাকিস্তানীরা আইনের দৃষ্টিতে 'আলিয়েন' হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে আমাদেরই ভাই। আমরাও তাদের। তাই যদি না হতো তবে গান্ধীজী কেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত একজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করলেন ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন? দ্বিজাতি তত্ত্ব একটা মিথ্যা। ইতিহাসের বিবর্তন একে তবে অসত্য করেছে। বিশ পঁচিশটি বছরান্তে এর পুনর্মূল্যায়ন একটা পরিহাস। একটা করুণ পরিহাস। একদিন না একদিন পাকিস্তানীদের মনেরও পরিবর্তন হবে। তখন মানবে যে ওরা আর আমরা দুই জাতি নই এক জাতি। রাষ্ট্র আলাদা হতে পারে, সংবিধান আলাদা হতে পারে, কিন্তু কিছু মুসলমান হিন্দুস্থান নিয়ে নিলেই সব ভারতীয় মুসলমান একজাতি, কিছু মুসলমান মিলে পাকিস্তান গড়ে নিলেই সব পাকিস্তানী তেমনি একজাতি, কিছু মুসলমান নিয়ে হিন্দুস্থান গড়ে নিলেই সব ভারতীয় ও সব পাকিস্তানী একজাতি।

এই [illegible]

চেষ্টা করতে হবে। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে ব্যক্তিগত দায়িত্বে পাকিস্তানে যেতেন ও মিটমাটের জন্যে আলাপ করতেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ যদি আর কেউ দায়িত্ব তুলে নেন তবে তাঁকে সাধুবাদ জানাই। বড়জোর এইটুকু বলতে পারা যায় যে, সম্মানজনক মিটমাট আমরাও চাই, কিন্তু কাশ্মীরই প্রধান বা প্রথম অন্তরায় নয়। কাশ্মীর আগে নয়। দুই পক্ষের নেতারা বৈঠকে বসুন, তৃতীয় পক্ষকে বাদ দিন, কাশ্মীর প্রভৃতি আবশ্যিক বিরোধের ফয়সালা একই সঙ্গে করুন, সার্বিক একটাই হোক। ধরা-বরের মতো। কুটুমের দ্যাড় একটু একটু করে কাটার মতো আজ কাশ্মীর, পাঁচ বছর পরে আসাম, দশ বছর পরে ত্রিপুরা, পনেরো বছর পরে অন্য নির্বাচন, এ রকম যেন না হয়। নয়তো কাশ্মীর নিয়ে এখন যা হচ্ছে আসাম নিয়ে পরে তা হবে, সেখানেও হাঁড়ি চানা যাবে না।

সবকটা বিরোধের এককালীন নিষ্পত্তি যদি কোন দিন হয় তবে ১৯৪৭ আগস্টের মতো সেও হবে চিরকাল মনে রাখবার মতো দুর্দিন। সেদিন আমরা সবাই মিলে কোলাকুলি করব। অতীতের প্রাতৃহত্যা ভুলে যাব ও ক্ষমা করব। দুটো রাষ্ট্র যেমন আজ তেমনি থাকবে, কিন্তু দুটো হাত যেমন মিলে মিশে কাজ করে তেমনি পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে। সেদিনকার সেই পরিবর্তিত পটভূমিকায় কাশ্মীর হবে না বিদেশীদের চক্রান্তের কেন্দ্র যা আজ। সেখানকার সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ যা সেকুলার। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের অধিকার কোনো অংশে খর্ব হবে না। সেখানে যাতায়াত করা ও ব্যাপার করা ভারতীয় মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক হবে। সেখানকার প্রতিরক্ষার উপর ভারতেরও কর্তৃত্ব থাকবে। বলা বাহুল্য কাশ্মীর বলতে গিলগিট প্রভৃতি পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলও বোঝাবে।

মোটকথা, অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানীরা যেসব অধিকার পাবে ভারতীয়রাও সেইসব অধিকার পাবে। ভারতীয়রা যেসব অধিকার পাবে পাকিস্তানীরাও সেইসব অধিকার পাবে। সম্প্রদায় অনুসারে কাউকেই কোনো বিশেষ অধিকার দেওয়া হবে না।' অবশ্য নির্বাচনের বা নিরপেক্ষ চাকরির কোনো সম্প্রদায়কে জোর করতে দেওয়া হবে না। তবে কাশ্মীরের মূল অধিবাসী তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তাদের জন্যে যদি কিছু সংরক্ষণ করতে হয় তো সেটা নিয়ে কেউ কোন আপত্তি করবে না।

কাশ্মীর অধিকৃত পশ্চিমবঙ্গের বা মহারাষ্ট্রের মতো একটি 'রাজ্য' হবে এটা বাড়াবাড়ি। পাকিস্তানটি পাওয়ার আগে ত্যাগ করার সময় এই স্থির হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছামতো ভারতে বা পাকিস্তানে যোগ দেবে। যোগ দেবার অর্থ দেশরক্ষা বিদেশ তিন চারটি বড়ো বড়ো বিষয় কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাকী সব নিজের হাতে রাখা। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতভুক্ত দেশীয় রাজ্য হবে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বা মহারাষ্ট্রের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের সঙ্গে সমান করে দিয়ে সবাইকে 'স্টেট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে কাশ্মীরকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'স্টেট' বলে বর্ণিত একটি বর্ণচোরা প্রদেশে পরিণত করা উচিত নয়। শেখ আবদুল্লার তুলপ্রান্তি যাই ঘটে থাকুক তাঁর ব্যথা এইখানে যে কাশ্মীরকে তার প্রাপ্য ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যেমন করা হয়েছে বৈত্তবকে। বৈত্তবের তাতে আপত্তি না থাকতে পারে, কাশ্মীরের আপত্তি আছে। অন্তত তাঁর মতো অনেকের আপত্তি আছে। এটা হিন্দু বনাম মুসলিম নয়। এটা কেন্দ্র বনাম দেশীয় রাজ্য। বৈত্তবে যদি কংগ্রেস না হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রবল হতো সেখানেও এ প্রকার আপত্তি উঠত।

কোন্‌টা সত্যি সত্যি সাম্প্রদায়িক, কোন্‌টা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক এ বিষয়ে পণ্ডিতদের চিন্তার অভাব নেই। শেখ আবদুল্লা মুসলমান ও তাঁর অনুগামীরা প্রায় সবাই মুসলমান বলে তাঁর কেসটা কেঁচে যায় না। তিনি পাকিস্তানকে চটাতে চান না বলে তাঁর কেসটা পাকিস্তানের কেস হয়ে যায় না। কাশ্মীর পাকিস্তানের সামিল হওয়া তাঁর পক্ষে বিভীষিকা। তাই কাশ্মীরকে এখন পর্যন্ত প্রদেশে পরিণত করেনি। করলেও তার ক্ষমতা পূর্ব-পাকিস্তানের চেয়ে বেশী থাকবে। কিন্তু

পাকিস্তান যদি একবার কাশ্মীর চাইতে পারে তবে তাকে উত্তরপাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশের মতো একটি কাঁসলবার পাশিত স্বীকারে পর্যবসিত করবে। এখনো চাকে পাকিস্তান বলে মিঠি মিঠি মূল সোনাচ্ছে তাতে আর যেই কুলুক শেখ আবদুল্লা ভুলবেন না। পাকিস্তান যা চায় আর শেখ সাহেব যা চান তা একই জিনিস নো নয়ই, তা দুই স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী বস্তু।

শেখ আবদুল্লাকে সন্তুষ্ট করবে তাঁর আদি ক্ষমতা। যে ক্ষমতা তাঁর ছিল ভারতচুক্তির অব্যবহিত পরে কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ক্ষমতা। যে ক্ষমতা তাঁর ছিল পদচ্যুতির কিছুকাল পূর্বে। আবুব খানকে কাশ্মীর পাইয়ে দিয়ে তাঁর সে ক্ষমতা তিনি ফিরে পাবেন না। পরন্তু তাঁর দশা হবে খান আবদুল গফুর খানের মতো। আবুব খানকে কাশ্মীর পাইয়ে দেওয়া মানে আপনাকে বঞ্চিত করা। কাশ্মীরী মুসলমানেরই বা তাতে লাভ এমন কী হলো। খবরদের অনেকখানি তারা তোষ করছে। সেটা তো তাঁরা করবেই। আবুব কি তাদের খবরদের দাবী মেটাবেন? আবুব অন্যান্য মুসলমান-দের যে সংখ্যান দিয়েছেন কাশ্মীরী মুসলমানদেরও সেই সংখ্যাম দেবেন। তাতে পূর্বপাকিস্তানীরাই সন্তুষ্ট নয়। কাশ্মীরীরা হবে কী করে! কিন্তু জাতিসংঘে পাঞ্জাবী মুসলমান গিয়ে বলবে। তাতে যদি লাভ মেটে তো আশ্চর্য হতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের মূলনীতি নয়। মূলনীতি লঙ্ঘন করে যে মিটমাট সে মিটমাট বেশি টিকবে না। মিটমাটের চেষ্টা চলছে, চলুক। বার বার ব্যর্থ হবে, বার বার আরম্ভ হবে। আমি পরাজয়বাদী নই। আমি স্বীকার করব না যে হিন্দু মুসলমানের মিটমাট বা ভারতপাকিস্তানের মিটমাট কখনকালে সম্ভব নয়। সবাই হাল ছেড়ে দিলেও আমি হাল ধরে থাকব। সাম্প্রদায়িকতা অতীতে দেখেও ছিল, এখনো আছে। মিটে গেছে বা মিটে যাচ্ছে। আধুনিক যুগের সঙ্গে যা খাপ খায় না তার পরমায়ু বড়জোর ত্রিশ চল্লিশ বছর। এই তো সেদিন বিলেতের মুসলমানরা লাইবেরালের প্রতি গ্ল্যাডস্টোনের পক্ষে, অধর্মী তুর্কদের বিপক্ষে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা মালয়েশিয়ার মুসলমানদের বিপক্ষে, জিন্নাবাদী চীনদের পক্ষে। যদিকে রাজনীতির মূলধন করে পাকিস্তানীরা কাশ্মীর চালাবে!

আমি চেষ্টাও করব, অপেক্ষাও করব। ইতি। বিনীত

স্কেচ : হৈম চন্দার

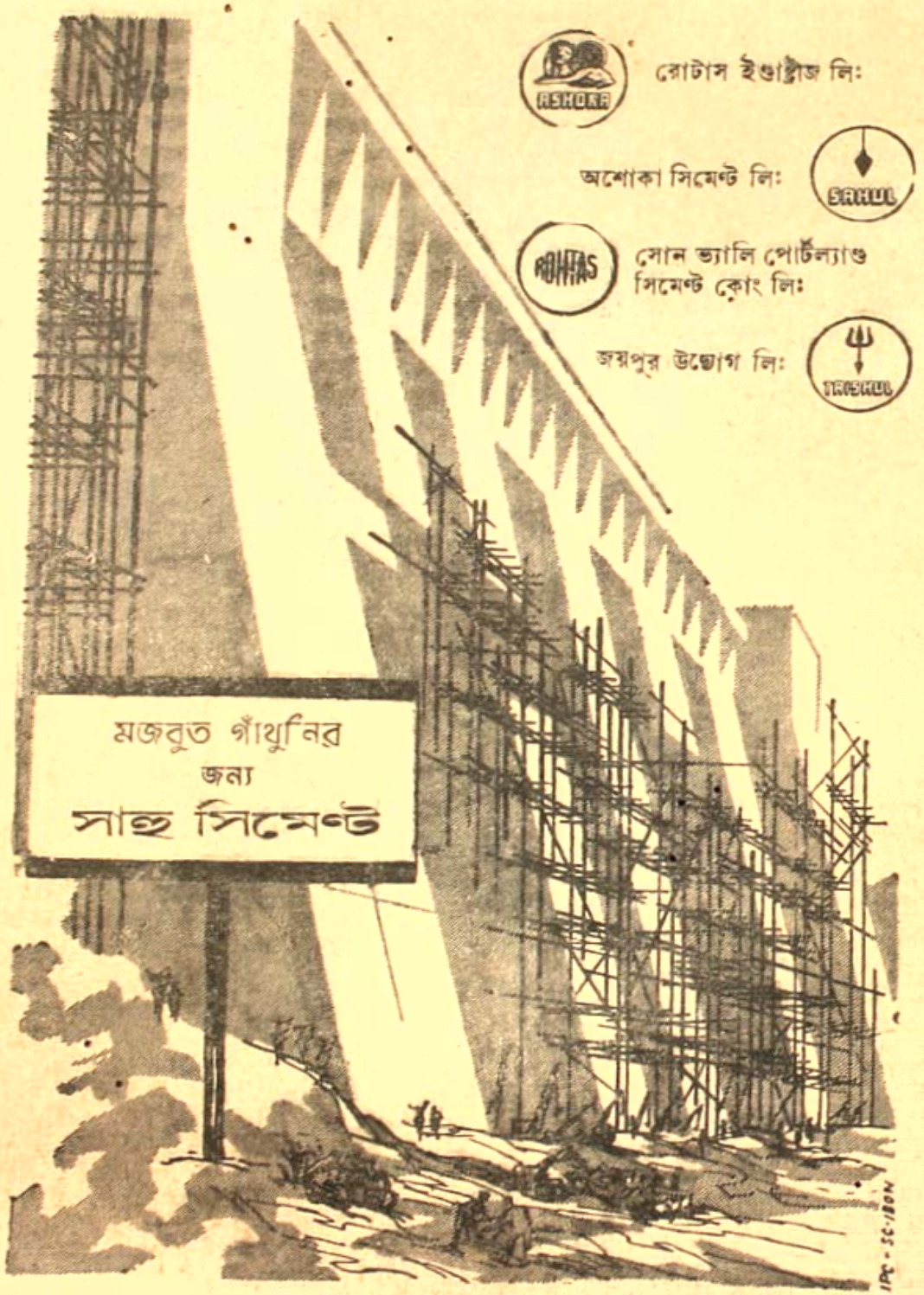

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

অশোকা সিমেণ্ট লিঃ

সোন ভ্যালি পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট কোং লিঃ

জয়পুর উদ্যোগ লিঃ

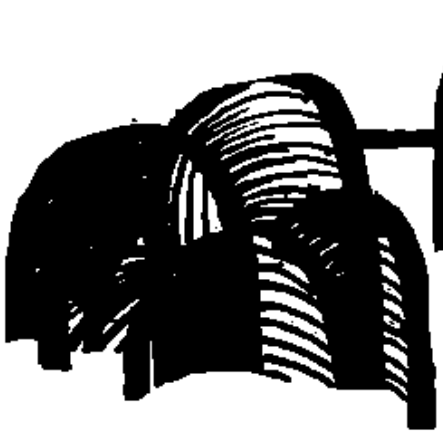

চিতোরগড়

অতুল্যঘোষ

অগ্রহায়ণ সংখ্যার শেষ আমরা ভীমকায় চিতোর দুর্গের ফটকের উপর এসে পড়েছি। আর খানিক ক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে চিতোর দুর্গ একেবারে ঢেকে যাবে। ইতিমধ্যে আমার চিতোর দুর্গের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়।

আমরা যে যুগে জন্মেছি, সে সময় মেবারের ইতিহাস, রাণাপ্রতাপ, চিতোরের রোমাঞ্চকর কাহিনী আমাদের মনে বাল্যোচিত ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জোগাতো। প্রবন্ধ, পত্রাদি, গল্প, কবিতা, নাটক এই সকলের মারফৎ আমরা মেবারের সঙ্গে পরিচিত হোয়েছিলুম। একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়ে উঠেছিল। সেইজন্য সকাল ৭টায় বিরিয়ে ৩ ঘণ্টার পথ যখন ১২ ঘণ্টায় অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭টায় চিতোরে পৌঁছলুম তখন ক্লান্ত হলেও মনে কোনও অবসাদ ছিল না। পরিষ্কার ডাক্তার রায়, এক প্রফুল্লচন্দ্র দুর্গম পথ ক্লেশ সত্ত্বেও কেউ কাতর হয়ে পড়েন নি। তখনও চিতোর দুর্গের কাছে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ১৪ শতাব্দীর ললিত ভাস্কর্যে ভাস্কর্যে মুগ্ধ অবসাদিত মনেও দর্শনীয় দিয়ে চিতোরের জন্য শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছে। পদ্মিনীর জহর ব্রতের কাহিনীর মানসিক ছোঁয়া এড়ান কঠিন। একে একে ১৩০ নারী মাতৃভূমি—রাজস্থানী স্বাধীনতা অবহেলার অগ্নিমুখে নিজেদের সমর্পণ করে মৃত্যুকে জয় করেছে। কঠোর মানসিক বল ও দৃঢ়তা মর্যাদা জ্ঞানের জন্যই বার বার চিতোরের নারীরা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে পেরেছিলেন। পদ্মিনী ও মর্যাদা জ্ঞানের অপরূপ সংমিশ্রণে চিতোর দুর্গ ইতিহাসকে অতিক্রম করে মহত্তর মহীয়ান রূপ নিয়ে সগৌরবে বিরাজ করছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহু যুদ্ধের মত জহর পদ্মিনের ঘটনা নয়নের কাহিনী আছে কিন্তু একটা দৃষ্টিকে অবলম্বন করে বার বার এমন আত্মাহুতি ও গৌরবের পরিচয়ের দৃষ্টান্ত এমন বিরল। আমরা এই আকাশে এখনও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মীরার ভজন। সমস্ত বিস্ময়ে যার যার মনে হয় কি করে সম্ভব হলো।

যেমন মিষ্টি মেবারের গোধূলির রঙ্গীন, তেমন মিষ্টি মাতৃভাষের মর্যাদা রক্ষায়, আবার চিতোর, আমাদের দেশবাসীর আত্মদানেরও সেই মিষ্টি।

চিতোর গড়ের কাহিনী ভারত ইতিহাসের এক অসামান্য গৌরবোজ্জ্বল চিত্রমালা। দুঃখ তা নয় যে ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ আজ চিতোরের গৌরবের সঙ্গে পরিচিত নয়—দুঃখ এই যে যাদের জানার দাবিছ—তাঁদের অধিকাংশের কাছেও আজ চিতোরের ইতিহাস অজ্ঞাত।

শক্তিমান, কর্মবীর ডাঃ রায়কেও দেখলুম চিতোর দুর্গের প্রাকারে বিস্মিত মনে দেখেছিলুম। অনেকক্ষণ চোখ মেলে থাকবার পর, রাণাপ্রতাপের কথা, বাপ্পারাওয়ের কথা, জহর ব্রতের কথা বার বার করে স্মরণ করেছিলেন।

ডাঃ রায় ও প্রফুল্লদার সঙ্গে আমরা কয়েকজন আজমীঢ় থেকে চিতোর গড়ের জন্য বেরিয়েছিলুম। কোনও জায়গায় কারো জন্য একটু ভুল হয়েছিল—সেইজন্য চিতোরে পৌঁছতে আমাদের ১২ ঘণ্টা লাগে। রাত্রের ট্রেণে পরদিন সকালে আজমীঢ় ফিরে আসতে হয়। কারো সঙ্গে বিছানা বা অন্য কোনও বিছানা ছিল না। এই পথ কষ্ট ও অত্যন্ত অসুবিধার কোনও কষ্টই সেদিন আমরা অনুভব করতে পারিনি। চিতোর দুর্গ, চিতোরের ইতিহাস, চিতোরের স্মৃতি সমস্ত মনকে ভরিয়ে রেখে সব ক্লান্তি দূর করেছিল।

মন্দিরের চূড়াটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো হাওয়ায় উঁচু হয়ে উঠলো। আবছায়ায় ছেয়ে গেল। পুরাকালের চৌকো-চৌকো পাথরগুলো সমুদ্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগলো। মন্দিরের উচ্চ চূড়া গেল, দেওয়াল গেল, থামগুলো গেল, কিন্তু বিগ্রহ যেখানে থাকবেন, সেখানকার অন্ধকার গেল না। বিগ্রহের মূর্তি নেই কিন্তু নেই, নিষ্ফল জমাট অন্ধকার সেখানে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। আকাশে আলো ঐ ঐ ফেলতে পাচ্ছি রৌদ্র-ঝলোমল নীল আকাশ, বাস-বাস ফুলোর মতো মেঘ। মন্দিরের একেবারে নেই, শুধু সেখানে ঐ আকাশ থেকে আলোর কণা এসে পৌঁছচ্ছে না!

আমি দুঃখের দেখেছি। উষালোকে, সবার আগে ঘুম থেকে উঠে বসেছি, শুধু সেই নিদারুণ দুঃখের ঘোর আমার চোখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে না। 'বাঙ্গালী' বা 'ম-ভাষী'দের মতো, যাদের আজন্ম দারিদ্র্যেও চোখের কোণ থেকে মোছে না, এমনকি স্নানের পরও লেগে থাকে। আমার আশেপাশে থাকে অসবাবু বেলা, সেই পুরানো কাজলের ওপরই নতুন কাজল দেখা এঁকে মন প্রসাধনে ভুলিয়ে হয় তারা।

আমার এই দুঃখটা যেন ঐ অন্ধকার কাজলরেখার মতো, মন থেকে বারবার মুছে ফেলার প্রয়াস করছি, শুধু যাচ্ছে না। আমার পালক-পিতা এখানকার সর্বজন-মান্য 'নট্টু বান' (সেই বাঙালী মেয়েরা যে-ভাবে উচ্চারণ করে, ঠিক সেইভাবে শব্দটাকে প্রকাশ করলাম, নইলে আমাদের জিহ্বার কথাটা উচ্চারিত হয় বিকৃত ভাবে।) তাঁকে গিয়ে বলবো? তিনি সবখানে উঠবেন, পাঁচ জন দেখবেন, প্রাচীনকের বাবস্থা করবেন। মন্দির ভেঙে পড়ছে, বিগ্রহ নেই,—এর থেকে ভয়ানক দুঃখের আর কী হতে পারে?

সারা গ্রাম ঘুরেই একটি সোরগোল প'ড়ে যাবে। 'গ্রাম' বলতে বাঙালীরা যা বোঝায়, আমাদের গ্রাম ঠিক সেরকম নয়। আমাদের গ্রাম শহরেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ছোট-ছোট বাড়ী পাশাপাশি। ইটের দেয়ালে খড়ের চালও আছে, আবার পাকা একতলাও আছে, এমন কি পাথরের গাঁথনীর বাড়ীও আছে। সোজা-সোজা রাস্তা, শহরের মতো অতো চওড়া নয়, তবে একখানা 'বাস' বা গরুর গাড়ি যেতে পারে। যেটা আমাদের প্রধান রাস্তা, একেবারে সোজা

মন্দিরের সামনে দিয়ে নিয়েছে, সে রাস্তার পাশাপাশি একখানা কেন, দুখানা কেন, তিন খানা কি চারখানা পর্যন্ত গরুর গাড়ী যেতে পারে।

এ-হেন গ্রামবাসীরা কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক শহরবাসীদের মতো নয়। এরা অর্থাৎ বিস্তর সবাই মন্দিরটির অন্ত নিয়ে বাঁধা। এদের জীবিকা ঐ মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে, এদের দৈনন্দিন জীবন, আচার-ব্যবহার সবই ঐ মন্দির-কেন্দ্রিক। আমরাও তাই। আমরা পুরুষানুক্রমে 'নৃত্যগীত'-এর চর্চা করি, কিন্তু সে-ও ঐ মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে। তাছাড়ের। বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির থেকে দশ-বারো মাইলের মধ্যেই তাদের এই গ্রাম,

ভাগবতী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবছর 'ভাগবত মেলা'র সময় মন্দিরের সামনে আমরা মঞ্চ-নির্মাণ করি, লম্বা সড়কটা তখন দর্শকদের বসবার মতো 'স্থানে' পরিণত হয়। শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-সবাই মহা উৎসাহে এসে বসে 'নাটক' দেখবার জন্য। আমাদের 'নাটক' ঠিক বাঙালীদের মতো নয়। আমাদের নাটক থাকে নাচে-গানে ভর্তি। নাচই মুখ্য, সঙ্গে গান থাকে, মাঝে মাঝে দু-চারটে কথাও থাকে। সে-কথা কুশীলবরা বলে না, বলে মঞ্চের পশ্চাৎভাগে বসে-থাকা গায়ক ও বাদককুলদের মধ্যেকার কেউ। সচরাচর 'নট্টুবান' নিজেই বলে থাকেন কথাগুলো। সেই বাঙালী মেয়েটার কথার বলাটাকে অনুসরণ করে পুনরায় 'নট্টুবান'ই বললাম।

আমাদের এই 'নৃত্যনাটকে' পর্দা থাকে, সামনে-পিছনে একটি-একটি করে দুটিই পর্দা। আর কোনো সজ্জা থাকে না। বাঙালী মেয়েটার কাছ থেকে শুনেছি, কলকাতার নাটকে ট্রেন চলে যায় মঞ্চ দিয়ে, জলের বন্যা বয়ে যায়। আর সে-সব দেখে লোকে খুব হাততালি দেয়।

আমরা সে-সব কথা শুনে মনে মনে হাসি। ওসব দেখবে-ই, লোকে সিনেমা দেখুক, যাত্রাভিনয় দেখুক। 'নাটক' বস্তুটা ত সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বস্তুর বাজা এবং বসের সাজানো।

এমন কি, আমাদের নাটকে যন্ত্রেরও 'নিজস্ব চরিত্র' আমরা পরিহার করে চলি। ঘটনার পরিপার্শ্বের ইঙ্গিত কেন্দ্রে রেখে উচ্চ গ্রামে মেল দৃশ্য পর্যন্ত 'নাটক' ঘুরে চলেছে,—এতে কুশীলবদের শক্তিমত্তার সমাক্ পরিচয় কোথায়? গল্প নিয়েই ত দর্শকদের আসনে বসিয়ে রাখবে।

না, আমরা সমাদরে বসন্তঋতুকে পৌঁছতে চাই। আমাদের গল্পও সবার জানা, চরিত্রও জানা। এমন কি, আগেই আমরা বলে দেই, কী ঘটতে চলেছে আর কী হবে। পরিণতি জানিয়ে দিয়ে দর্শকদের মন গল্পের চতুর্থ থেকে কুশীলবদের ভাব বিন্যাসের দিকে টেনে আনি।

দর্শক চিত্রাপিতের মতো শোনে। সাধারণ মানুষের মতো বসে থাকে। এবং বসজ্ঞ শ্রোতা যেমন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঠিক জায়গাটিতেই 'বাহবা' বলে ওঠে, তেমনি এরাও যথাযথ স্থানে 'আহা-আহা' বলে স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনিস্রোত তোলে।

এক কথায় এই যে দৃশ্যে আমাদের জগৎ। ঈশ্বর, ধর্ম, আচার-আচরণ, এবং সঙ্গে স্বতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছি আমাদের শিল্পকে। 'শিল্প-বস্তু' যে এদের থেকে আলাদা কিছু,—এ আমরা ভাবতেই পারি না।

বাঙালী মেয়েটা কিন্তু ঠিক জায়গাটাতেই আমাদের আঘাত হেনেছে। যেদিন সে এখানে এসে প্রথম দাঁড়ালো, সেদিন সবাই একযোগে বারণ করেছিল। ওকে গুরু করতে দেওয়া কেন?

মেয়েটা নাচতে পারে।

তাতে কী? নাচই কি আমাদের সব?

মেয়েটা সুন্দরী।

তাতেই বা কী? সৌন্দর্যই কি সব কিছু?

মেয়েটা আমাদের আইন-কানুন, রীতিনীতি, সমস্তই মেনে চলতে রাজী।

এ-কথা শুনে সবাই তখন নীরব হয়ে গিয়েছিল। মাথা নীচু করে সবাই ভাববার চেষ্টা করছিল ব্যাপারটা।

কে একজন চটাং মুখ করে বললে,—ওরা যায় যাক।

'ম-দালৈ',—যে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সে বললে,—এখন যায় না। মেয়ে দিয়েছে।

কর্তাব্যক্তিদের তখনো 'মন-খুঁ-খুঁ-ভাব' কাটেনি।

মেয়েটি হস্তকঙ্কণে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। পারিজাত-রঙের লীলায়িত সন্ধ্যাভাষার মতো। 'আধিকার প্রমত্তরা'র ভাব ওর অঙ্গাভাসে ফুটে উঠেছে ওর মধ্যে একটু একটু করে।

দেখতে দেখতে আমিই দর্শকের মতো আমার বলতে ইচ্ছা করলো,—বাঃ!

বলে উঠলাম,—ওকে নিয়ে নিন।

সবাই আমার দিকে তাকালো। বললাম,—আমি ওর 'নট্টুবান' হবো।

কলরব। পক্ষে-বিপক্ষে নানান্ প্রশ্ন-উত্তর। শেষপর্যন্ত অবশ্য আমার কথাই টিকে গিয়েছিল। তাকিয়ে দেখি, সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন 'সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

কিন্তু তখন কী জানি, এই মেয়েই আমার বিরুদ্ধে যাবে?

না, আমার কাছে কোনো অভিযোগ নয়। ওর যা কিছু অভিযোগ, যা কিছু সমালোচনা, সব আমার কাছে। একান্ত আমারই কাছে।

কিন্তু সে-সমালোচনা কি কম তীক্ষ্ণ? সে-সমালোচনার দাহ যে আমার সমস্ত সত্তাটিকেই পুড়িয়ে ছাই করতে চলে। আমার সত্তা শুধু কেন্দ্র সম্প্রসারণে এই

আমাদের সঙ্গে। এই পরিবেশের সঙ্গে, এই বিশ্বাসের সঙ্গে, সমস্তভাবে এই দেশেরই সঙ্গে।

তাই বলছিলাম, আমার দুঃখদের জন্য যদি আমি কষ্ট পাই, যদি আমি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবার আয়োজন করি, তাহলে ঐ মেয়েরা অন্তর দিয়ে লাঞ্ছিতদের দেশের তালায় টাঁক বিজন হীনে ফেলে; মীরবেই সেই চেয়েছিটি বলবে, 'আপনি আমার 'মা-বাবা', আপনি আমার শিক্ষক, —আপনার কাছ থেকে আমরা কি এত শিখতে চাই, আমাদের নিজ আমাদের জীবন, সবই আপনার নিকট।

ঠিক। মেয়েটা এই ধরনের কথাই বলে। বলে,—উচ্চল মাটিকেই দুঃখ দেখে। এর পাশে আমাদের কোনো অস্তিত্বই নেই।"

আমরা একবার এক ধরনের দুঃখ দেখেছিলাম আমি। দেখেছিলাম, নদীর প্রবাহ হঠাৎ এক আকস্মিকতায় পরিবর্তন হয়েছে। আমিলতা উভয় দুখী হয়, কিন্তু এ-প্রবাহের জলস্তর লোকগুলো সব জল-চরদের মতো। একসঙ্গে মাছ চলেছে। মাথা আছে, ফুলের মালা বলায়, ফুলের মালা মাথায়, ফুলের মালা পরে,—এ বাঙালী মেয়েটা অনেক দূরের মতো ভেসে চলেছে। ভাসে চলেছে, কিন্তু পুরুষেরা নির্মীলিত চাখদুটি বুজের আবেগ কী অদ্ভুত সুন্দর।

মেয়েটা কিন্তু পরে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে উঠেছিল। বলেছিল—উচ্চল শিক্ষকের কথা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সুখ অনুভবের আলো পেয়ে। আপনি হাসাতে পারেন না, এটুকু বুঝলাম।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে। বলেছিলাম,—না—না, তুমি ভুল বোঝ না। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এমন কথা কিছু নয়।

—তাদের প্রায়শ্চিত্ত?

—এ-ও একরকমের পাপ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো না?

—কার কাছে করবেন?

—ঈশ্বরের কাছে।

মেয়েটা হঠাৎ হেসে উঠেছিল। বলেছিল,—আপনারা না বলেন, আমরা শিল্পী?

—হাঁ।

মেয়েটা দুঃখারিসারের মতো বলে উঠেছিল, আমাদের ঈশ্বর নেই মানুষ নেই, পূজা-আর্চা নেই, আচার অনুষ্ঠান কিছুই নেই। একমাত্র শিল্পই সত্য।

—কিন্তু শিল্প কি ঈশ্বর আরাধনা?

—কেন নয়?

—বলবো কী?

মেয়েটা বলেছিল,—সব কিছু থেকে আলাদা। আমরা আলাদা করে একে দেখতে চাই। নইলে আপনি যথার্থ শিল্পী হলেন কী করে?

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম কিছুক্ষণ ধরে, কোনো কথা বলতে পারি নি।

ও তখন বলে চলেছে—এইসব কৃত্রিম লাইনের কথা, সমাজের, তাই-তাদের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুখ ফুটে তার তাঁর মনের কোনো ঈশ্বরের আলোচনা করেছিলেন, এইবার।

—মুখ ফুটে?

—হাঁ। জনকয়েক মানুষের জীবন আর সমাজের কথা পড়ুন। জনকয়েক মানুষের প্রতিভার প্রতিফলন দেখেছেন।

ঠিক যেই মুহূর্তে আমার চেতনা ফেরে। মনে পড়েছিল, এ আমাদের গল্প, আমাদের মধ্য-মিলনের ছেলে ছাত্রিদের কবে লিখে এসেছে।

মাস্টারমশাই কী, আমি মেয়েদের পালিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে।

কিন্তু, পালিয়ে যাবো কোথায়? ঘর নামের ভিতে একবার অন্তত মেয়েই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করে 'মা-বাবা' বা 'শিক্ষক' হয়েছি, তার 'শিক্ষা' বলতে না হওয়া পর্যন্ত এর উপাধি থেকে আমার আর নিস্তার নেই।

আমাদের অনেকের ঘর ভাঙে, আমাদের এ-অঞ্চলে অনেক অভাব এবং নয়ন পুরাতন 'আমরা' কবিতার বুলিতরা গান করেন, তখন সেটা ১৯৫০ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। তাঁদের বাড়ি-ঘরদোরে তখন আকাশ থেকে আলোকণিকের কাল। রাজিকাতা জনকে আধুনিক রাজিকাতের তখনো আকাশ-ছোঁয়ার ঘরান শুরু পাঁচতে পারেন।

তখনকার কালে 'নায়ক-কবিতা' এক বুলিতে ছিলেন, তাঁর নাম 'আহারাজা নায়ক।' জনকাতে আছে, একবার ছোট্ট জনের মুখে পাশের খিল মুখে দিয়ে-ছিলেন বা-হাতে। তখন কালের নিজস্ব নিয়মে এটা আচার অনুষ্ঠান হিসেবে। যারা এই আহারাজের প্রায়শ্চিত্ত করেন তারা তাঁর বাড়ির সামনে একটা খোঁড়া খাল কাটা করে ছিলেন, যেখানে রাজনেতা নিরপরাধে নিজ ও বিজাতীয় করতে পারবে। এই প্রবাদটির নাম – মেলাই'।

মেলাইয়ের জলে ভরে 'আমরা মেলা' ঐতিহ্য ধরে উঠেছে, যা আজও পর্যন্ত বেঁচে আছে আমাদের সাধারণের মধ্যে।

আমাদের রাজত্ব ঐ প্রাচীন মেলাইয়ের জন্ম। অবশ্য, পরবর্তীকালে 'মেলাই'-এরই আদলে নিজ নিজ পাঠশালাতে গড়ে উঠেছিল।

'মেলাই' আমার থেকে মাত্র দুই মাইল অন্তরে। 'মেলাই'-এর অর্থ, নাম, অভিধানসম্মত নয়। রাজা অজাত শত্রুদের-এর রাজত্ব পরিবারের দিয়েছিলেন এই নাম। প্রতিটি পরিবারে মেয়েরা একটি করে কুল-মাসের বাড়ি এ অনুসৃত ছিল।" প্রবাদটির ছিল আটটি মতন এবং এই আটটির একটি সমাজের

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
ও
চোখের শ্রীবৃদ্ধি করে
জবাকুসুম তৈল
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস ৪ কলিকাতা—১২

দেখে মনে হয় যেন বাঙালিরা সেকেলে এবং বাঁদর। এই বাঁদরের মনোরঞ্জন—ভাঁড়ামো, ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, ইংরেজের মতন ঘোড়ায় চেপে খেলা ইত্যাদি করে আমাদের বাঁদরের মুখ দিয়ে যেন বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

'সেলাম' থেকে আমাদের জন্ম তিন বাঈজির মতো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে আমার ভাল লাগে, যখন আমাদের গ্রামে 'তাপস মেলা'র অনুকরণে ছোট-খাটো মেলা হয় বসে এবং আমাদের বৃদ্ধ পাঁচুর বাবা যা এই নাম—'সেলাই'-এর কোনো অর্থ হয় না।

আমরা বাঙালি জাতি বড়ো, কিন্তু আমাদের 'আই'গুলো বাঁকা হয়ে' ছেলেও আমার।

বাঙালী মেয়েদের ফ্যাশনের প্রসঙ্গেও ঘটেছে। বলে, বিয়ের আগে মেয়ে পরের জন্য কেন?

অবাক হয়ে যাই। এসব কী আজকের কথা! আর সেসব বহু দূরে চলেছে এসব বাঁধি দেখা হয়েছে। আমাদের বিয়ের আগে ও আগের 'আপেরাজা'র মনোমোহিনী মেয়েটিদের আগে একজন ছেলেকে বাজে বাস করতেন মেয়াদিতে। তিনি আর তাঁর সিস্টারহুড এসব নাকি নিয়ে মেতেন তাঁদের ও পুরুষদী দীর্ঘ নাকের তোষীর অনুসরণে। 'মেয়েটিকে'-এর নিজস্বতার মোপালরক্ষক আগে ফ্যাশন বিষয়ে আটের ছড়াছড়ি। যেমন, নীতা ফলাবন্ধ, জলবিহঙ্গ, মোমবাতি-বন্ধ-ফলক এবং কাঁচপোকা-ফলাফল। এসব আইডিয়াগুলো অবশ্য আমাদের 'ভাঁড়ামো'-এর জন্য তৈরী হয়েছিল, তিন বৃদ্ধাদেরও জন্য নয়। তাছাড়া তখন অনেকটা বাঙালীদের 'অথচ' আর 'কীর্তন'-এর মতো। কুলবালারা বলা হয়েছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে মেয়েটিদের আগে 'প্রজাপতি', 'ইয়ং-লিডার্স' 'অনেকের 'ঈশ্বরচন্দ্র,'—এইসব হচ্ছে এর নেশা। তখন, আমাদের এই ভাঁড়ামোদের ছেলেরা ছিল 'বাঙালদের' তারা যা মুরুব্বিয়ানা।' মেয়েরা এ-সব আইডিয়া ঠিক মতোই ছেলেবেলে। লোকে তখন ছিলেন স্বিধাবোধ। সেই থেকে এই প্রজাপতি চলে আসছে। আমাদের এই প্রাক্তিক মোপালরক্ষক তারা ছেলেরা। এই মেয়েটিদের আগে থেকে 'তাপস মেলা' চলে আসছে মেয়াদিতে। এর মেয়েরা আঁকতে ভিতি ছিলেন, তিনি ছিল বাঁকা হাত, এবং তাঁর 'আপেরাজা'—তাদের চুলে যে ধারণ করে ছিলে তখনও এই ধারণা। তিনি আগের পাঁচমিশে এই ধারণা পুনরুজ্জীবিত করে তখন, এই বিষয়ে চুল দেন। তিনি ছিলে ছিলেন একজন ছবি-আঁকিয়ে এবং 'অথচ'। ছিলে তাঁর ছবিগুলোর তাঁর নামের 'আঁচলের' ছিল মেয়েদের মতো। 'অথচ'-এর আঁচল এবং মাঝখানের আলপনাটি তিনি মেয়ে করে দিতে যান ১৯৩০ সালে। তাঁর ছবি-বিষয়ে ছিলেন খুব কর্তিকার মুকুর। 'মেয়েদের আঁচলে ও অথচ' নামে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এঁরা দুজনেই যান মেয়ে। মেয়েদের আগে ছিল 'আঁচলে' আছেন, তাঁর নাম ভরাক্রান্তীয় আইডিয়ার। তাকে দুটি দেখেছো, বা ঈশ্বর?

তাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি। আমি আমাদের থেকে প্রথমে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, নিশ্চিত ছাত্র-ছাত্রী মেয়েরা ভরে যেতে, আর মেয়ে না। দুটি বই,—

তিনি এই যে আমে আজ এসেছি, এই প্রশ্নেরই আগ করেছিলেন। আমার আগ ছিল মৈত্রেয়ী। অবশ্য, এঁরা আগের, ঈশ্বরী বলে। প্রথম যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমার নাম, আমি বলেছিলাম,— ঈশ্বরী মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়।

তখন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার 'ঈশ্বরী'র আগের অংশ। তাঁদের ছিলের এ-নাম ঈশ্বরিক ভাবে বড়ো বিশ্রী লেগেছিল, তাই আর প্রতিবাদ করিনি। আমি বাঙালী, কিন্তু বাঙালাদেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল কম।

এখানে যে 'অথচের মেয়ে বাড়ির' অবতারণা হয়, তার স্রষ্টা-রচয়িতা প্রবন্ধ-এর লেখিকা প্রথমের নিজের পরিচয় দেন, বলে,—আমি লেখিকা। আমি এই অথচে, এই অবনো।

তখন আটের প্রবন্ধ-বীথিকা এই। —কী করেছি আর কী করবো,' —এসব আগের এল আঁ' আল মেয়ে লোকে দেখুক শুধু আমে, সেই আগের তখ কথা হয়।

আমার ঠিক মেয়ে আগে প্রথমেই আমাদের ছিল বাঁধি। প্রথম ঠাঁদে আমরা ছিলাম মাঝের পরিবে। বাবা, মানুষ সেবার জন্য, আমরা ভেবেছিল পাঁচমিশে। বাবা ছিলেন বড়ো ব্যবসায়ী। কিন্তু তাঁর একটি দোষ ছিল। তিনি খুব, তখন তাঁর মনে বাঁধনের এ ব্যবসাকে অন্য কী পাঁচমিশে আর মানুষকে চলে আসেন তাঁরা অবশেষ করতে। বলা বাহুল্য তাঁর এই 'পিতৃসীয় বিবাহ' ঠিক আনন্দদায়ক ছিল না। আমি তাঁর এই 'পিতৃসীয় বিবাহ'-এর একবার সন্তান। আমি যখন চূড়ান্ত হলাম, তখন থেকেই 'ব্যবসায়ী' তাঁর মনকে সবসময় করে তুলেছিলেন। অবশেষে, মায়ানী হয়েছি আমার নামক রেখে ছিলেন, 'তুমি লক্ষ্মী লক্ষ্মী। বলেই নাকি আমাকে আদরের ছোট বোনার। কিন্তু, পরে যখন আমার বয়স যখন আমার মনে হয়ে এই চুক্তিবার কথা মনে। আমাকে চুক্তিনি। কথা ঠিকই। আমার ওজনও ছিল। এবং প্রথমে আমরা ঠিক বাঙালের ফাঁদে পড়ি। তবু বাবাকে আমাদের ছিলে তখনো আমরা একটা সন্দেহ জন্মায়। দুটো 'বাঙালি' এসেছিল, তবু ছিলে আমরা 'দুই' বলে ডাকতে ভরসা পাচ্ছিলাম। তাকবার 'দুই' বলে ডাকা হলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে। আমরা ডেকেছিলাম। আমি আর মা। 'অথচ-ঈশ্বরী' মনে করে বসে ছিল। আমার মনে হলো। আমার সেই সন্দেহ আমাদের তখন 'ঈশ্বরী' এই। মেয়েদের ঠিক মেয়ে। সেই আর আমাদের আমার এক লাভ ছিলেন। আমার থেকে বয়সে অনেক বড়ো, তাঁর নাম বলেছি, তাঁকে ডাকতে দেখেছি। তিনিও দেখেছি, বয়সকের দেখেছি। ছেলেটিলাম, এবার মেয়ে হবে। কিন্তু তখনো না, তাঁরা সেই এলেন না। তিনিও ছিলেন না।

মা বাড়ী বিক্রী করে ছিলেন, যাদের টাকা পয়সা তাঁদের নিয়ে এ-দেশ ছেড়ে আমার জন্য প্রস্তুত হলেন। লোকে তখনি ব্যবসায় তখন ও করেছিলো। অনেকে,—মাকে ছেড়ে মেয়ে করেছে। মাকেই ছেলে ও তখনো মাকেই-কলেজে এই কাজ করে থাকবে।

তখন এ-সব অনুমান, না ঠিকের ছেড়ে পড়াশুনা করলেন। ঠিকমতো এ-সব ব্যাপারে মতে মতের ঠিক-ভাবে হয়ে ওঠে। তাঁর ছিল ছিলেন, আর

বয়সের মানুষ। সৎ পরামর্শই দিলেন মাকে। বললেন,—কোনো প্রশ্নই নেই। মামলা করতে গেলে মিছিমিছি অনেক টাকা নষ্ট হবে। তার থেকে এই মেয়েটিকে ভালো করে লেখাপড়া শেখান, মানুষ করে তুলুন।

মা বলেছিল,—লেখাপড়ায় ওর মন নেই। স্কুলে যায় ঠিক, কিন্তু আসলে ওর নাচে। বাড়ীতেও নাচ শিখছে। ওকে যে শেখাচ্ছে, সে ওর খুব তারিফ করে।

উকিল ছিলেন মাঝারিগোছের লোক, বয়সে প্রৌঢ়। বললেন,—সে-ও ভালো। ওতেও আজকাল চাঁড়ানো যায়।

মা আমাকে নিয়ে সোজা চলে এলেন বেনারসে। খুব সরু একটা গলি—কেদার ঘাটের কাছে—তার এক প্রান্তে একটা পাথরের গাঁথুনীর বাড়ী, তার ওপর সমস্তটা জুড়ে থাকতেন আমার বড়ো মা। পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকতেন,

Telegram : WELCHAIN

Telephone : Office—22-3226 Factory—66-4022

WEST BENGAL CHAIN INDUSTRIES CO.

Office : 12, Raja Woodmunt St., Calcutta 1.

Factory : Hara Chandra Mukherjee Lane, Howrah

We manufacture M.S. Link Chains by latest automatic machine. Our chains are butt-welded to withstand maximum load. Our chains are tested in our imported chain testing machine as per B.S. and I.S. Specifications. Manufacturing of calibrated pulley chains is our speciality.

আমি যখন দেখলুম, তখন বিধবার বেশ। তবুও সৌম্য আর শান্ত মূর্তি। মাকে বলে হলুদ-বাটুয়ার,—ওর দেহের রঙ তা-ই। আমার মার থেকে ঢের বেশী সুন্দরী। মাথায় এক ঢাল চুলও ছিল দেখবার মতো!

আমার মা গিয়ে প্রণাম করে আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন, বললেন—তোমারই মেয়ে। মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন। বোধ হয় নিজেকে একটু সামলে নিলেন। তারপরে আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বাড়ীটা ছোট, তেতলা। তেতলায় তিনখানি ঘর। এরই একখানিতে আমরা থাকে-কিংবে থাকতাম।

বড়ো-মার নিজের বাড়ী এটি। তাঁরও পিতার দিক থেকে তিনি একমাত্র মেয়ে। কলকাতার বাড়ীখানা ছেলের নামে লিখে দিয়ে তিনি কাশীর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন। দোতলা আর নিচের অংশটুকু ভাড়া দিয়ে যা পান, তাতেই তাঁর দিন গুজরান চলে। আমাকে মাকে বিশেষ কিছুই বললে না, একখানি ঘর খুলে দিয়ে বললেন,—থাকো।

তিনি নিজে ফ-পাকে রান্না করে খেতেন। একটি ঠিকে-ঝি ছাড়া তাঁর কাজ করবার আর কেউ ছিল না, বা, সঙ্গিনীও ছিল না। সকাল-সন্ধ্যে যখনই সময় পেতেন, বসে বসে বই পড়তেন। বড়ো হয়ে দেখেছি, বইগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে উপনিষদ, সংস্কৃত ও তার অনুবাদ। এ ছাড়া, শ্রীমদ্ভাগবতও ছিল। রামায়ণ-মহাভারত-গীতাও ছিল। গীতা পাঠ করতেন খুব ভোরে উঠে। রাত থাকতে উঠে গঙ্গায় স্নান করে এসে পূজোয় বসতেন। পূজোর শেষ পর্যায় ছিল গীতাপাঠ। উনি যখন 'গীতা' পড়তেন, তখন উষাকাল শেষ হয়ে সূর্য উঠছে, কাশীর আকাশে চক্রাকারে চলেছে পায়রাগুলো উড়ছে। আর কখনো বা বাঁদরের পাল এসে পড়েছে ছাদের ওপর। চতুষ্কোণ উঠোনের মাথায় মোটা মোটা লোহার রড পোতা তার নীচে তাদের ছাদ বিছানো, বাঁদরগুলো সেই লোহার রডের ওপর পড়ে শুধু বাঁকাতো। আর তখন নাচে থেকে 'হৈ-হৈ' উঠতো বুড়ীদের,—এই যা হট। বাড়ীর দোতলা বা নীচে যারা ভাড়া থাকেন, তারা সবাই বাঙালী মধ্যবয়সী—আর বুড়ী। দেশ থেকে ছেলেরা যে সামান্য খরচের টাকা পাঠায় তাতেই তাদের সমস্ত সঙ্কুলান করে নিতে হয়।

আমরা পরে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, ভাড়ার টাকা প্রায় সবারই বাকী পড়ে থাকতো, আর অল্প অল্প ভাড়াটেই তাড়ার টাকা দিয়ে যেতো। উনি অবশ্য তাগাদা করতেন একবেলা, রাতে খেতেন সাবু, তিনবেলা। হয়ত ওঁর প্রয়োজনও কম, তবু মাঝে মাঝে নিদারুণ অর্থ সঙ্কটে পড়তেন। অথচ, কলকাতার ছেলেদের কখনো লিখতেন না কোনো সাহায্য চেয়ে।

আমরা মা প্রথম দিকে বাড়ীঘর-দোর ঝাড়পোঁছ করে কাটালো। পরে একদিন বড়মার ঘরে গিয়ে হাজির। বড়োমার ঘরখানা বড়ো। এককোণে পূজোর টাট। অন্যদিকে মেঝের ওপরে কম্বলের বিছানা।

মা বলতো, গরম-কালে কী করেন-দিদি? ওনেছি কাশীতে ভয়াবহ গরম পড়ে।

বড়-মা হেসে বলতো,—দেখোনি?

—কী?

বড়-মা বলতো,—নীচে ছোট একটা কুয়ুরী আছে, ভাড়াবন্ধ। তখন ওটাই আমাদের দিনের বেলার আশ্রয়। রাত্রে ছাদ; নীচের অনেকেই তখন ছাদে শুতে আসে।

মা বলতো,—দিদি, ঠাই ও দিলে। পরের ভাবনা ভেবেছ কী?

কী?

—মেয়ে?

বড়ো-মা হেসে সেই প্রথম নির্বিকারভাবে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—লক্ষ্মী মাকি নাম!

—ভাগ্যলক্ষ্মী বলে উনি ওকে ডাকতেন।

মুহূর্তের জন্য কেমন যেন উদাসী হয়ে গেলেন বড়মা, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর আবার বললেন—মা। মেয়ে "ভাগ্যবতী ভবঃ" নিয়ে জন্মেছে, লক্ষণ দেখে বুঝছো না? পৌঁছেছুখে

(১১৯ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

হাজিরিমল্ল এণ্ড কোম্পানী চা প্রাঃ লিঃ

ও কিছু নয়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জমিদারি প্রথা উঠে গেছে, তার সঙ্গে সাতনালার জমিদারি সেরেস্তাও। তবে সেরেস্তা আরও অনেক রকম আছে, মানুষও উঠেছে কিছু বললাম না, সুতরাং সাতনালার কথা বর্তমান পাঁচালীতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি।

মানুষ ছাড়া সব সেরেস্তার গঠনও মোটামুটি একই রকমের। বড়, মেজো, ছোট, তারপর খুচরো পাচরা আর সবাই। সাতনালার যেমন ব্যবস্থা ছিল, একেবারে ওপরে কর্তা স্বয়ং, তাঁর নীচে নায়েব মশাই, তাঁর নীচে তহশিলদার, তাঁর নীচে পাটোয়ারি, ক্রমে ধাপে ধাপে নেমে পাইক-সেপাই বরকন্দাজ পর্যন্ত। আর সব সেরেস্তায় কোথাও আছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টার, কোথাও প্রেসিডেন্ট, কোথাও তাঁর অন্য কোন অভিধা, একেবারে মাথার ওপর। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে একেবারে নীচে এসে আর্দালি দারোয়ান পর্যন্ত নেমে গেছে এই কথা। মিলিয়ে নিতে অসুবিধা হয়না।

মাস্থারি সাইজের জমিদারি সাতনালার; তহশিল সত্তর হাজার এই রকম। নায়েব একজনই হয়, এখানেও তাই। তহশিলদারও একজনই। পাটোয়ারি তিন জন। সঙ্গে একজন করে পাইক। এ-ছাড়া অমুক নবীস তমুক নবীস করে আরও কয়েকজন কর্মচারী আছে, লম্বা-লম্বা খেরোয় খাতায় খাগের কলম দিয়ে কি সব লেখে হুজুরে বসে, খালির পুঁটলিতে গুঁজে রেখে।

জমিদারির দিকে। কর্তার খাস খেরসতে আলাদা লোক আছে। তাঁদের অন্তরঙ্গলের ব্যবস্থা আলাদা। বড় মত এমন কিছু, তবে বেশ গোছালো। অন্তত বর্তমান মালিক ছজন নায়েবদের পিতা গঙ্গাধর রায় যেমন দিয়ে ছিলেন: কম নেই, আদায় পত্র ভালো, মামলা মকদ্দমা জমিদারির অঙ্গ হিসাবে যেটুকু না থাকলেই নয়। তাঁরই হাতিল করা জমিদারি, কর্মচারী এই-ই ছিল, তবে সবচেয়ে খাটি কর্মচারী ছিলেন তিনি নিজে। খেয়ে দেয়ে খানিকটা আরাম করে সেই যে অফিসে এসে বসতেন, উঠতেন একেবারে ঘাড় ধরে। যতক্ষণ থাকতেন সমস্ত অফিসটা গমগম করত।

অফিসে এসে বসেন হৃদয়নারায়ণও, তবে ক্রমে ক্রমে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। নিয়মিতভাবে রোজও আসেন না। তাঁর ক্লাব আছে, পার্টি আছে; আরও নানাধরণের ব্যসন গোড়ার কাজ থেকে সময় করে নিয়ে ঐসব খেয়াল মেটাচ্ছেন, ক্রমে ক্রমে এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, সাঁঝ খেরসতের চাবি মিটিয়ে পাওয়া গেল সময় তো ছিলেন একটু এদিকে। সপ্তাহে এক আধ দিন।

সেরেস্তা এখন বলতে গেলে সম্পূর্ণ নায়েব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। কর্তার আমলের লোক তহশিলদার থেকে নায়েব হয়েছিলেন। বয়স দুই-ই সমান বেশ বৃদ্ধ লোকও, তাঁর যেন সেই সময় থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা তোষের ছিল। পরামর্শের ছিলেন মুরুব্বিপুরুষ, সাহায্যে বড় গুরুত্ব থেকে জমিদারিটা নিজের হাতে গড়ে তোলেন। তাঁর সময় নায়েব পদবীটা ছিল, কিন্তু মাথে'মধ্যে কখনও সুযোগ হয়নি, কিন্তু সে দাবীটা মেটাবার একদিন সুবিধা যে আসবেই, এ আশাটা বরাবরই ছিল তাঁর। ছিল হৃদয়নারায়ণের ভরসাতেই। বাপের মতন আস্তিন গুটিয়ে খাটতে হয়নি; জমিদারের ছেলে হবেন জমিদার, ওর মতিগতি লক্ষ্য করে আসছিলেনই, বাপের মৃত্যুর পর

দিতে বললে নিজের হক অনুযায়ী দাম শুরু করে দিলেন সাহেব হরলাল।

বিশেষ কিছু নয়, শুধু বাইরের চাট-কু বজায় রাখা। তা সেটুকুর, বজায় রাখা রেখে আরও খানিকটা বাড়িয়েই ছিলেন। সেরকম ছিলেন কিছু বাড়িতে, বাজ সজ্জায়, আসবাব পত্রে খানিকটা ঐশ্বর্যের আমদানি ক'রে যেন দেউলিয়া-ত্ত করে দিলেন লন্ডনটাকে। তাদের কোথায় জন্যে খালির পুটলির সেই দেশাদী মুটটাকে লন্ডন ছাড়া করলেন।

অবশ্য সইয়ে সইয়ে নূতন মানিয়ের মন মেন, শুধু প্রভাবটা কিরকম হচ্ছে র সূক্ষ্ম হিসাব রেখে। বুদ্ধি ধরুন, টা ভালোরকমই বুঝেন যে, বাইরের আ—এদের মন যেভাবে জানি বললেই ে জেনে নেওয়ায়, এরকম নিশ্চিন্ত থাকা ভাবুক মত।

অপছন্দ নয় ছন্দর নারায়ণের। ভাবন আঁকল ঘরে সেঁদিয়ে নূতন পুরু রপেটের ওপর দাঁড়িয়ে উঁকে ঝেকে লেন— "আমার চেয়ার টেনে ার আওয়াজে আপনার কর্মচারীরা ঘুমিয়ে হয়ে যেত, সেটা বন্ধ করলেন?"

একটু হেসেই বলা। বিজনেরও হেসেই াব দিলেন —"কাজ ছেড়ে আপনার ভাবের আওয়াজের দিকে কান পেতে কে এমন কর্মচারী আমার সেরেস্তায় ই।"

সাবেক আলের দু'একজনকে সরিয়ে-ন, বেশ তাদের ওপর দিয়ে গেলও ছটা। নিজের নায়েবিয়ানা নিষ্কণ্টক রতে যাদের সরানো দরকার ছিল। ঃ রকম লোক আছে তো আমার।

টা হোল সদরের চিত্র। সেটা চোখের সামনে ধরে রেখেছেন বিজনেশ। এ-ছাড়া মফঃস্বল আছে। জমিদারির সেটা আসল জায়গা, সেখানে তার লক্ষ্মীর আসন পাতা। সেখানে রয়েছে তহশিলদার, তার অধীনে তিনজন পাটোয়ারী আর তাদের একজন করে পাইক। তিনটে এলাকা এদের তিনজনে ভাগ করে দেওয়া। আদায়পত্র করে নিয়ে এসে তহশিলদারের তহবিলে, জমা দেবে। সেখান থেকে হেড আফিস।

পাটোয়ারি নিকুঞ্জ মাইতির এলাকাটা ঘুরে পরশুদিন বাড়ি ফেরে। গলাবন্ধ ওভারকোট পরেও দিন কয়েক বেঁচে ছিলেন কিন্তু বলতে পারেননি, তারপর এদিকে তাঁবুর ভেতর বাতির কাছে জমিয়ে নিয়েছে। কী তাঁবুর ভেতর, কী বলতে হোল সেই জন্যে। একটু সুখ হয়েছে। বাড়িতেই থাকে, সেখান থেকেই আদায়পত্র। বাড়িটারও শ্রী ফিরে আসছে। মাঠের দিকে একটা ইটের পাঁজাও তোয়ের ক'রে নিয়েছে। নিকুঞ্জ পাটোয়ারির দালান উঠবে।

শত্রুও আছে। শত্রুতা করল লীলু হাজরা। ভালো বাবুর জমিদারের মেজর কী। এক পয়সা খাজনা বাকি থাকে না, সুতরাং পাটোয়ারির খবরদারি করতে হয় না, সুতরাং পাটোয়ারি বিরুদ্ধও।

একদিন তিনক্রোশ ঘুরে তহশিল আফিসে গিয়ে জানাল ইটের পাঁজার কথাটা। আরও অনেক কিছু।

তহশিলদার রামপ্রাণ সাহা বাড়ি চোষবাতে চোষবাতে একটু হেসেই উঠলেন ভাস্কিলভাবে। বললেন—"ও কিছু নয়। পাঁজা তুলেছে বলে তাকে সেই পাঁজার ওপর চাঁপরে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে? এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আপনি।"

লীলু হাজরা বুঝল, তবে আর এগুল না। পাটোয়ারি নিকুঞ্জ, তার সঙ্গে যদি তহশিলদারও যোগ দেয় তো তাকেই পাঁজায় তুলে দেওয়া কিছু শক্ত কথা নয়।

পাটোয়ারির পাঁজা উঠলে এদিক'কার আদায়পত্রের-ভার সেরেই যায়, তবে তার জন্যবাড়ির দেওয়ার মতো পাটোয়ারি-বুদ্ধি আছে নিকুঞ্জ মাইতির। গলাবন্ধের বুধ খেয়ে: বোঝবারও লোক হয়েছে এখন।

পাঁজা আর আদায়-পত্র নিয়ে নিকুঞ্জ মাইতির কথাটা চাপা পড়ে গেল। উলটে গুজব উঠল লীলু হাজরার নামে বাকি বাকি খাজনার দলিল-পত্র তোয়ের হচ্ছে। অন্য কেউ আর এগুতে সাহস করল না এ-নিয়ে।

এবং এর পর দেখা গেল আগের পাঁজার পাশে আর একটি বড় পাঁজা উঠছে।

এর মাস আষ্টেক পরে আর একটা অভিযোগ পৌঁছাল, এবার আরও উঁচুতে, স্বয়ং নায়েবের কাছে এবং তহশিলদারের নামে।

ছত্রমাতারমণের মা বিষবাসিনী এখনও জীবন্ত। বয়স ছেষট্টি-পঁয়ষট্টি বলে হয়েছে, পূজাআচা, ভীর্থব্রত এই সব নিয়েই থাকেন, এবং যাতে এই সব নিয়েই থাকতে পারেন তার জন্য ছেলের বিষয়েও খুব সতর্ক। তা সত্ত্বেও জমিদারের গৃহিণী, জমিদারের মা, ওঁদের যেন একটা তৃতীয় নয়নই যায় খুলে। ওঁর মনে হ'ল, কী যেন একটা বড় রকম গলদ ঢুকেছে জমিদারিতে, আমীর আমলের সে সাজসাজা আর নেই। অথচ সদরের আবহা যায় অন্তরমহল পর্যন্ত সব নিখুঁত, কিছু বলাও যায় না। যেন কিছুদিন অশান্তিতে কাটিয়ে উঠে মাইতি এস্টেটকে পেয়েছেন। পরেশ ডাক্তার, যিনি ছত্রমনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং রিটায়ার হওয়ায় এখন বাড়িতে বসেই একটা মাসোহারা পাচ্ছেন।

পরেশনাথের বাড়ি তহশিলদার রামপ্রাণের বাড়ির বিপরীত উল্টো-দাপটা কিছু কিছু জানে বাড়ির, তবে নির্বিরোধী মাইতিমাত্রই, এসব কথায় যোগ

হেন না। এখন কর্তার অনুরোধে সাবধানে তাদের করে সন্ধান নিতে দেখেন অবশ্য সবাই গুরুতর। বিপদে পড়ে বিপদ উনি সবসময় যে না বলে আগে মানের বিচলিত ই একটু তুলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে মন। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঐ ই এসে দাঁড়াবে, তখন মেয়েদের ঐ দুর্বল মাওয়ার মতো বড় প শুনতে হবে।

সব কথাও বললেন না। যা জমিদারি স্তার ছেত্রবকার কথা নয়, স্পষ্ট ছেই প্রত্যক্ষ, একটা লোক আগেলেই ব দেখা যাবে, একটু খোঁজ নিলে ার হয়ে যাবে, সদক্ষোচে সেইটুকুই মন করলেন। তাঁর এ ভূমিকা সব চরাচরদাঁচটাও ছিলেন; কর্তার ার, তবে তিনি তাঁকে না জানিয়ে সন্দেহই আগে জানাচ্ছেন।

তহশিলদার গাড়োয়ান সাহায্য বাইরে ই কোঠা-ঘর ছিল, ছেলের বাড়ির গাড়ি সবই মেটে। এদিকে ঐদের রেল স্বচ্ছল কোঠা তো ক'ঘে ই, এখন আবার চাষবাসির গুদামই ল্য উঠেছে। লোকদেখানে একটা া পুড়েছিল, কিন্তু তাতে তো ভরসা। া যাচ্ছে তিনজনের তিনজনই চাষারি এক একখানি বড় পাঁচার দখে াছিল, নিজের গ্রামে পুঁড়িয়ে মোগান খেয়ে।

শুনে বলেই প্রকাশ করলেন পরেশ-। বললেন—দ্বিজপদ যদি একটু ন যেন তো বোঝ হয় ভালো হয়।

প্রস্তাবে নয়। বাড়ি দিয়েই একটু ত করে বললেন।

দ্বিজপদও আজকাল পাড়ি মেরেছেন। ন সন্ন্যাসী খুব যাতায়াত করেন, তাঁর থেকে একটি কবচ নেওয়ার পর ন। লাঠি ঠোকঠাকে ঠোকঠাকে জোরেই হেসে উঠলেন, যেন এত ত তুচ্ছ কথাটা মোদন করার ভারটাকে দে দিয়েই। বললেন—ও কিছু ন, আপনিও যেমন! ছোঁয়া লাগলেই কোষ্ঠীচক্র টাটায়। আপনি ওসব ত যাবেন না।"

বিকেলে উনি ফিরে যাওয়ার আগে একবার ডেকে পাঠালেন। বললেন—"ও!! আপনি এসেছেন, ভালোই করেছে। কর্তা একদিন আমার কাছে ডেকে বললেন—মায়ের মধ্যাই. আর করে এসেছে, সেরকম আমার পর নেই, ছেটে থেকে দুটি মায়েরোরা কাছের দেওয়া হয় একবারে কতটা দেখেন তো। ছেলে মেয়েদুটি। কিন্তু কতদিন যে পরের ভাতে জানিনা। ভুলে দিলাম কাজে আপনার একটু। আপনারটাই তো সব চেয়ে বেশী; তোকে পড়বার মতন!"

বুঝলেন পরেশনাথ। বুড়ো মনেরের দর্শন দুর্বলতুকুর মাঝে কর মায়া নয়, তবে মাষ্টারি বিবেক, উনি ছেলে চিনে বলো মতি একটা পথ বের করলেন। কত্তাকে বললেন—কিছু কিছু কাজে আসে, তবে তার ওপর তো কিছু বলা যায় না। উনি যেন চন্দ্রনাথবাবুকে একটু নজর রাখতে বলেন এটুকুতেই। উনি নিজেই বলছেন, তবে জমিদারি নিয়ে তাদের সঙ্গে কখনও কোন আলোচনা করেন নি, বুড়ো বয়সে এসে যেন আরও বাধে।

বললেন বিজয়ালিনী মেয়েকে, তবে নজরও নয়। জমিদারের দৃষ্টিশক্তি, জমিদারের মা. ঐর বুঝতে দেরি হোল না, এ-সব ছত্র খুঁড়ে বের করা গোয়েন্দাগিরি মাষ্টার বলাইয়ের সাধ্য নয়। খুব সোজাসুজি ভালো করে লোক লাগালেন এবং একটি ঘটনার ওপর নজর ফেলে রেখে চুপ করে বসে রইলেন। দ্বিজপদর মেয়ের বিবাহ, মাস-তিনেক পরের আসছে। কাজেও যাচ্ছে অনেক কিছু এখন থেকেই।

উৎসব চুকে-বুকে গেলে একদিন বললেন—"শুনেছিস বোধহয় নায়েব মশাইয়ের মেয়ের বিয়ের কথা। ঐদের সৌখীনপুরে নাকি জমজমাট বলে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে যোগাড় বাড়ি, আসা থেকে সানাই। মানের ফিরিস্তিই যা শুনলাম—নাকে তহশিলদার থেকে পাটোয়ারি পাইক পর্যন্ত সবাইয়ের ওপর ফর্দ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এই এই দিতে হবে..."

যেন একটি ছোটো মেয়ের প্রলাপ প্রশ্রয়ের কান দিয়ে শুনতে শুনতে ছোটো-ঘরে হেসে উঠলেন চন্দ্রনাথবাবু। বললেন—"মেয়েটা তোমারও কাল তাড়াতে আরম্ভ করেছে। ও কিছু নয়। শান্তনাদের মায়ের, তার মেয়ের বিয়েতে একটু ঘটা বুঝবে না?"

"না বাবা, যেমন তুমি। তুই কিছু দেখিসও না—কর্তা যেখানে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে নজর দিচ্ছেন..."

"আমার যে তাতে চেয়েও বেশি নজর রাখতে হচ্ছে মা. এসব ছোট খুঁটিনাটি নিয়ে থাকলে চলবে?"

"সে আবার কি কথা?"

"ছাতুলীবরই যে ঘোড়ায় কোপ বসাতে চাইছে, সেখানে গিয়ে না দাঁড়াতে পারলে চলবে? কাস্টিলে দাঁড়িয়েছি. আমার এখন ইলেকশনের মাইকে কোন দিকে নজর দেওয়ার কুসময় আছে? আর মেয়ের বিয়েতে কোথা থেকে সানাই এল..."

"হ্যাঁ, ঐ আর এক পাপ ঢুকেছে বাবা। তোকে বলব বলব করছিলাম। ও-হু করে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, খাচ ছুতে লুট যাচ্ছে—সেই ভাবে এঁরাও শুষিয়ে নিচ্ছেন নিজের নিজের। জমিদারি থাকে তো আমাদেরই তো সবটা পাবা যায় শুষিয়ে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।" শুনলায় নাকি একটা পরশপাও বাঁধা পড়েছে..."

আরম্ভে হতাশায় জল উপচে এল চোখে। অবুঝ ছোট মেয়েকে তোলানর মতো করেই কাঁধে হাত দিয়ে একটু হাসলেন চন্দ্রনাথবাবু, বললেন—

"এই দ্যাখো! বলছি ও কিছু নয়। তুমি তোমার পুতুল বিয়ে যাও, যাও—"

বছর দুয়েক পরে যখন জমিদারি হস্তান্তর করা হয় তখন যে হিসেবটি লাগিয়ে হয় তার মূল কথার সঙ্গে এ কথা কটার বেশ, মিল ছিল খানিকটা—"It is almost a vacuum" অর্থাৎ—"আর কিছুই নেই।"

দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির
মধ্য দিয়েই সার্থক হয়

জাতীয় উৎসব

এই দিন
আমাদের সংকল্প হোক :

- জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব
- সকলপ্রকার অপচয় বন্ধ করব
- সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব
- জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আত্মোৎসর্গ করব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষ্ণু-ধর্মোত্তরপুরাণ সঙ্গীত সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ অন্যান্য পুরাণ গুলির মতো সংকলনগ্রন্থ হলেও বিচিত্র বিষয়বস্তুর সমাবেশ আছে সে সমাবেশের মধ্যে বেশ একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যা সঙ্গীতের বেলায় তার শৃঙ্খলাবদ্ধ পারিপাট্যে সঙ্গীতের অনুসরণ করে। কিন্তু পুরাণগুলি নব-সংকলিত কাহিনীর পরিবেশে থাকলেও ঐতিহাসিক উপাদান-গুলিকে মোটেই বর্জিত নয়। পুরাণ-গুলি বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাগুলিকেই উপকথা ও আখ্যানের নূতনভাবে মানুষকে ঐতিহাসিক পরিবেশন করে। পুরাণগুলির সংকলনকার্য খ্রীষ্টীয় শতকের থেকে খ্রীষ্টীয় ১৭শ-১৮শ শতক বিস্তৃত। কাজেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্রত, ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গীতের উপাদানও পুরাণগুলি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যাবে।

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ আদিপুরাণপর্যায়ের নয়। এটিকে বলা হয় শেষের উপপুরাণ। অথচ পুরাণের সকল লক্ষণ, সামর্থ্য ও সার্থকতাই রয়েছে এর। অনেকের মতে, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের একটি শাখা বা সংবিশেষ। যিনি পরিব্রাজক আলবেরুনী (আনু-মানিক ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) এই পুরাণ-গ্রন্থের সাথে পরিচিত ছিলেন। ডক্টর উইন্টারনিজ এবং উল্লেখ করে-ছেন: "It is also important that the Arabian traveller Alberuni (about 1030 A. D.) was already familiar with the Purāṇas, but has also studied one of the later Purāṇa texts, 'the Viṣṇudharmottara very minutely'" [১]। আলবেরুনী যাঁর ভ্রমণকাহিনীতেও এই পুরাণের কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক বুলারেরও (Prof. G. Buler) অভিমত যে, পরিব্রাজক আলবেরুনী বিষ্ণুধর্মোত্তরের ৩'খানি হস্ত লেখেছিলেন এবং ১'টিকেই একটি গ্রন্থ বলে সম্বোধন করেছিলেন। পণ্ডিত এবালন বিষ্ণুধর্মোত্তরের যে পাণ্ডুলিপি দেখে-ছিলেন তাতে মাত্র ৪'টি অধ্যায়ের সমাবেশ ছিল। অধ্যাপক উইন্টারনিজ এই পুরাণটিকে তিনটি অধ্যায়যুক্ত সম্প্রকোষ-প্রকৃতির কাশ্মীরীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। [২] এর প্রথম অধ্যায়ে বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুর ঔপাসনিক পরিচয়, প্রতিষ্ঠা, জলাধিবাস, স্নান, ব্রত ও শ্রাদ্ধতত্ত্বের নিরূপণাবলী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাসন ও রাজনীতি, দেবপ্রতিষ্ঠা, দুর্গনীতি, গ্রহবিজ্ঞান ও জ্যোতিশাস্ত্রের এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাকরণ, অলঙ্কার কাব্য ও ছন্দ-তত্ত্ব, নাট্যশাস্ত্র, চিত্র ভাস্কর্য: মূর্তিতত্ত্ব ও মণ্ডপবিন্যাসের বিবরণ আছে। অধ্যাপক উইন্টারনিজ মনে করেন যে, বিষ্ণুধর্মোত্তরে যে 'পৈতামহসিদ্ধান্ত' নামে একটি বিশেষ গণনাপ্রণালীর অন্তর্নিবেশ আছে সেটি সম্ভবতঃ ("as is probable") ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত ব্রহ্মগুপ্ত-লিখিত 'ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত'-গ্রন্থেরই সংবিশেষ। অধ্যাপক থিবো (Prof. Thebout) ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত-লিখিত গ্রন্থের 'খণ্ডখাদ্যক' বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ সংকলন করেন এবং প্রাচীন 'বিষ্ণুধর্ম' গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১০৪১ থেকে ১০১০ শতকের মধ্যবর্তী। আমাদের মতে, এ অনুমান অনুমানমাত্রেই পর্যবসিত। কারণ, সনাতন দিক থেকে বিচার করে দেখলে একথাই উপলব্ধ হয় যে, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ (উপপুরাণ) খ্রীষ্টীয় ৮২৮ থেকে ১০০০ শতকের মধ্যে সংকলিত। অধ্যাপক উইন্টারনিজের অভিমতও তাই।[৩]

বিষ্ণুধর্মোত্তরে সঙ্গীত-সামগ্রীর আলোচনা আছে সংক্ষেপে, কিন্তু তাহলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। বিষ্ণুধর্মোত্তরে সঙ্গীত-বিষয়ক ধারা বায়ুপুরাণের প্রায় অনুরূপ। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে, বায়ুপুরাণের রচনা বা সংকলন-কাল খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক এবং সে দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, বিষ্ণুধর্মোত্তর নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বায়ুপুরাণের ঋণী। কিন্তু অনেকের মতে বিষ্ণুধর্মোত্তর বায়ুপুরাণের চেয়ে প্রাচীন এবং এই মতই বেশীর ভাগ পণ্ডিত স্বীকার করেন। বায়ুপুরাণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে সাঙ্গীতিক উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতো বায়ুপুরাণের মূল বক্তব্যগুলির মিল আছে, আর মিলও পাওয়া যায় 'গ্রুবকর্মী' ও 'ধ্রুবকোত্তর' প্রায় সকল সঙ্গীত-স্তরের সঙ্গে। তাছাড়া অন্যান্য সঙ্গীত-উপাদানের মিলও আছে উভয় পুরাণের মধ্যে।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বক্তা মহামুনি মার্কণ্ডেয়। 'অথ চিত্রলক্ষণং কথ্যতাং' বলে প্রথমেই উর্বশী ও শিব এই তিনটি স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে বিষ্ণুধর্মোত্তরে। তিনটি গান মন্দ (খাদ) মধ্য ও তার (উচ্চ) তিন রকম বর্ণবিন্যাসকলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এদের সঙ্গীতশাস্ত্রে 'স্থান' বলা হয়েছে।

১। Cf. "A History of Indian literature, vol 1 'a, p526.

২। "It is a Kashmiri Vaisnava book of encyclopaedic character in three sections."

৩। Cf. A History of Indian literature vol. I. p. 580.

এর পরই ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম-বিস্তৃতির পরিচয় আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরের সময়ে গান্ধারগ্রামের প্রচলন লোপ পেলেও সংকলনকার তার পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নি।

ষড় সাতটি—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এরা লৌকিক। সংকলনকার ধর্মোত্তরে বৈদিক কোন স্বরের সাধোরেখ করেন নি, অথবা একেবারে অপ্রচলিত থাকার উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি ক'রে মূর্ছনা, সুতরাং তিনটি গ্রামের একুশটি মূর্ছনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে পুরাণে। গান্ধারগ্রাম-মূর্ছনার কথা ছেড়ে দিলেও ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম-মূর্ছনা-বর্ণনার সময়ও ধর্মোত্তরে সংকলনকার বায়ুপুরাণের রীতিকে অনুসরণ করেছেন। মধ্যম-গ্রামের মূর্ছনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যমা, মার্গী, সৌরবী ও ছন্দকা এই সাতটি মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা—"এতাঃ সপ্ত মধ্যমগ্রামীয়াঃ" অবশ্য মধ্যমগ্রামের মূর্ছনাগুলির নামের বিভক্ততা ধর্মোত্তরে আছে এবং সৌরব থেকে সঙ্গীত-রত্নাকরে উল্লিখিত মধ্যম-গ্রামিক মূর্ছনা-নামগুলির সঙ্গে প্রায় মিল আছে। এবং এদের থেকে শিক্ষাকার নারদ, ভরত, মতঙ্গমুনির নারদ ও বায়ুপুরাণকারের মূর্ছনার নামগুলিতে বহু অসঙ্গতি আছে।

ষড়জগ্রামের মূর্ছনাগুলির নামোল্লেখ আছে: প্রাকৃতী চ, উত্তরা, আয়তা, শুদ্ধষড়জা, মৎসরীকৃতা, অশ্বক্রান্তা, উদ্গতা। বায়ুপুরাণের সঙ্গে এগুলির নামের মিল নাই। সঙ্গীত রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব ষড়জগ্রামের মূর্ছনাদের নামোল্লেখ করেছেন:

মূর্ছনোক্তবর্ণনিরুক্তা ষড়জগ্রামেঽস্তি কল্পতরুতা।
অশ্বক্রান্তা চ সৌবীরী হরিণাশ্বা চোক্ত রাজতা॥
মত্সরীতি সমাখ্যাতা ধর্মজ্ঞাঃ সপ্ত মূর্ছনাঃ।"

ধর্মোত্তরের অল্প কয়েকটি বর্ণিত মূর্ছনা-নামের দু'একটির ছাড়া অন্যগুলির মিল নাই। তাছাড়া ধর্মোত্তরপুরাণে সম্ভবতঃ ষড়জগ্রামের একটি মূর্ছনার নামোল্লেখ করা হয় নি, কেননা উহারা ও আরও বেশকয় উত্তরাহতা এই একটি নামেই পরিচিত। সংকলনকার উল্লেখ করেছেন —উত্তরন্যাসাঃ প্রাকৃতী উত্তরাহতা শুদ্ধষড়জ-সংসরীকৃতা অশ্বক্রান্তা। উদ্গতা চ এতাঃ সপ্ত ষড়জগ্রামিকাঃ"।

মনে হয়, পুরাণকারদের বর্ণিত বিবর-বস্তুগুলি কালের দীর্ঘ প্রবাহের মধ্যে পড়ে নামে ও রূপে অনেক পরিবর্তিত ও স্থানে স্থানে বিকৃত হয়েছে। অবশ্য এই ধারা ও প্রকৃতির পরিবর্তন প্রায় সকল পুরাণ-গুলিতেই দেখা যায়। ধর্মোত্তরে বর্ণিত গান্ধারগ্রামের মূর্ছনাগুলির বর্ণনা অসম্পূর্ণ, কেননা আলাপী, কুশিমা, গুহ্যা, উত্তরা, ষড়জা, পঞ্চমাহতা এই ছ'টি বিকৃত নাম। রত্নাকরে গান্ধার গ্রামের মূর্ছনাগুলির নাম নন্দা, বিশালা, বহুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও আলাপ।

মূর্ছনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। ক্রমানুসারে সাতটি স্বরের আরোহণ অর্থাৎ পর পর ভাবে ষড়জ প্রভৃতি সাতটি স্বরের উচ্চারণ ও ব্যুৎক্রমে অবরোহণ বা পশ্চাদ্‌ভাবে নিষাদ প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণের নাম মূর্ছনা। মূর্ছনা সম্বন্ধে টীকাকার সিংহ-ভূপাল ভরতের অভিমত অনুসারে বলেছেন, রাগ মূর্ছিত অর্থাৎ ধ্বনিত হয় যোগে মূর্ছনা নামের সার্থকতা:

মূর্ছনানাম নির্দেশমাহ। যোগে সপ্তস্বরে। মূর্ছতে যেন রাগো হি মূর্ছনেত্যভিধীয়তে॥

তাকেই "আরোহণাবরোহক্রমেণ স্বর-সপ্তকস্য মূর্ছনা-সম্ভবাচ্চ"—আরোহণ ও অবরোহণযুক্ত সাত স্বরের নাম মূর্ছনা। সিংহভূপাল উদাহরণ দিয়েছেন,

(ক) উত্তরমন্দ্রা—সারিগমপধানি
(খ) রজনী—নিসারিগমপধ
(গ) উত্তরায়তা—ধনিসারিগমপ
(ঘ) শুদ্ধষড়জা—সারিগমপধনি ইত্যাদি
(ঙ) মৎসরীকৃতা—সারিগমপধনি ইত্যাদি
(চ) অশ্বক্রান্তা—নিসারিগমপধ ইত্যাদি
(ছ) সৌবীরী—মপধনিসারিগ
(জ) হরিণাশ্বা—ধনিসারিগমপ
(ঝ) কলোপনতা—নিসারিগমপ
(ঞ) শুদ্ধমধ্যা—সারিগমপধনি ইত্যাদি

কিন্তু ষড়জ ও নিষাদের (মন্দ্রষড়জ ও নিষাদের) প্রত্যেকটিতে সাতটির পরিবর্তে আটটি স্বরের মূর্ছনার কথা বলেছেন। সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন "ষড়জেন হি যাদৃশস্বরযুক্তা উক্তাঃ —ইত্যাদিঃ সংপ্রদায়াদি যাদৃশস্বর-যুক্তা: সীত। ০০ নাস্তিকেশ্বরেণাপ্যুক্তম্ —যাদৃশস্বরসংপন্না জাতির্বা মূর্ছনা পুনঃ। তাদৃশস্বরসংযোগাদিত্যাদিঃ তাব-দ্ব্যাপ্তি সিদ্ধয়ে"।।।। যাকটি স্বরযুক্ত মূর্ছনা যেমন,

(ক) উত্তরমন্দ্রা—সারিগমপধনিসা
(খ) রজনী—নিসারিগমপধনিসারিগম,
(গ) উত্তরায়তা—সারিগমপধনিসারিগমপ, প্রভৃতি। ভরত বলেছেন, গানের বা বাদ্যের সময় যে স্থানে স্বর স্থাপিত বা ন্যস্ত হয়ে কাম্পত হয় তখন তা মূর্ছনা নামে কথিত এবং ষড়জাদি স্বর থেকে অবতারিত স্বরের উদ্ভাবে যে স্থানে বিরত হয় (থামে), তাকে মূর্ছনা বলে।

সিংহভূপাল বলেছেন, সকল রকমের মূর্ছনাই দুই প্রকার—শুদ্ধা, সকাকলী, সান্তরা ও কাকলান্তরযুক্ত—"তাশ্চতুর্দশ মূর্ছনাঃ পৃথক্ প্রত্যেকং চতুর্বিধাঃ শুদ্ধাঃ কাকলীসহিতাঃ সান্তরাঃ কাকলান্তরো-পেতাশ্চেত্যেকৈক্যেন ষটপঞ্চাশদ্ভবন্তি"। মূর্ছনার যে যে স্বর বিকৃত বা অবিকৃত হয়, তা ঠিক সেভাবে থাকলে তাকে শুদ্ধা-মূর্ছনা বলে। নিষাদস্বর ষড়জস্বরের দুটি শ্রুতি নিয়ে যার শ্রুতিসংখ্যা হোলে তাকে কাকলীমূর্ছনা বলে। যে মূর্ছনায় চারটি শ্রুতি নিষাদ বা কাকলী থাকে, তাকে সকাকলী মূর্ছনা এবং গান্ধার মধ্যমের দু'শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চার শ্রুতিসংখ্যা হোলে তাকে অন্তর এবং যে মূর্ছনায় গান্ধার

১। স্বরের উপরে বিন্দু ˙ থাকলে মন্দ্র বা খাদ (নিম্ন) এবং স্বরের উপরে রেখা (ঊর্ধ্বরেখা) থাকলে তার বা উচ্চ বুঝতে হবে—"লিখেৎ বিন্দুশিরা মন্দ্রো জ্ঞাতব্যঃ ঊর্ধ্বরেখাশিরস্তু তারঃ"। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব ঠিক এই ভাবেই স্বরলিপি পদ্ধতির (Notation) প্রচলন করেছিলেন।

ও অবিমিশ্রিত চয় তাকে আকল্যাস্তর-ভূমি বলে। ৮। তাপার কুমে ভূমি প্রথমাদি ছয় থেকে আরম্ভ করে সাত বরুর শ্রেণীতে বিভক্ত, মোট ১×২=১৪, ১৪×৪=৫৬, ৫৬×৪=২২৪ বরুরের ভূর্জনাস্তরসাধিত।

ভূর্জনার পর ধর্মোত্তরের সংকলনকার "আর্য কোনস্কাসভাষায়" কথাগুলির সূচনায় বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করেছেন। প্রায় বায়ুপুরাণের বর্ণনাও তাই; তবে বায়ুপুরাণের পাঠকে সুস্পষ্টতা নাই। কেননা আয়ুষ্টৌমিকাদি ভূর্জনা—কিংবা স্থান, তাহা ষড়্জগ্রামিক, মধ্যমগ্রামিক, ক গান্ধারগ্রামিক সে সম্বন্ধেও পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বিশেষ ক'রে বায়ুপুরাণকারের এ বিষয়ে মৌনতা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মৌনতার জন্য অনেকে অনেক সময় আয়ুষ্টৌমিকাদিকে ভূর্জনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিচার ক'রে দেখলে মনে হয়, বায়ুপুরাণকার "গান্ধারগ্রামিকাংশ্চান্যান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত" শ্লোকাংশে গান্ধারগ্রামের ভূর্জনার কথা বলার ইচ্ছা করলেও বলেন নি। এই শ্লোকাংশের পর তিনি "আয়ুষ্টৌমিকমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং বাজপেয়িনম্" প্রভৃতির অবতারণা করেছেন। আমাদের পূর্ব-বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে অনুভূত হয় যে, এগুলি স্থান, ভূর্জনা নয়। কেননা ১০ শ্লোকে তিনি উল্লেখ করেছেন,

"বিংশতির্মধ্যগ্রামাঃ ষড়্জগ্রাম চতুর্দশ।
তথা পঞ্চদশেত্যেতে গান্ধারগ্রাম-
সংজ্ঞিতা।"

তাহাতে পাঁচটি স্থান মধ্যমগ্রামের, চোদ্দটি ষড়্জগ্রামের ও পনেরটি গান্ধারগ্রামের। বায়ুপুরাণের এই বিবরণ বিষ্ণুধর্মোত্তরের সঙ্গে ঠিক মেলে, কেননা ধর্মোত্তর-সংকলনকারও উল্লেখ করেছেন:

"আয়ুষ্টৌমিক: অন্তরায়ুষ্টৌমিক:
১ ০ এতে বিংশতির্মধ্যগ্রামিকাঃ।
প্রথাপনং পৈশাচ ০ ০ এতে চতুর্দশ-
ষড়্জগ্রামিকাঃ। ভূয়ঃ কৃতিপ্রয়ঃ মহালক্ষ :-
১ ০ ০এতে পঞ্চদশ গান্ধারগ্রামিকাঃ"।

তিনটি গ্রামের স্থান-সংখ্যায় মিল আছে, কিন্তু নামে বিষ্ণুধর্মোত্তরের সঙ্গে বায়ু-পুরাণের মিল নাই।

ষড়্জকেশরীতে ষড়্জ আয়ুষ্টৌম (আয়ুষ্টৌমিক) থেকে উত্তরমায়ূর পর্যন্ত নিবাসবিভাগ যাড়ব আটাশটি স্থানকে ষড়্জগ্রামিক বলেছেন।৭ ব্যাকরণে শাক-টায়নও তাই স্বীকার করেছেন।৮ দাত্তিলী থেকে গোপেশ্বর পর্যন্ত গান্ধারবিভাগ একুশটি যাড়ব স্থানকে মধ্যমগ্রামিক বলেছেন। ব্যাকরণেও তাই। গান্ধার-গ্রামের স্থানের উল্লেখ করেন নি, সে সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত কোন কারণও দেখান নি, অথবা ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এবং তিনটি গ্রামের বিবরণ দিয়েছেন, নাট্য শাস্ত্রকার ভরতের মতো গান্ধারগ্রামের উল্লেখকে তিনি বাদ দেন নি। কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তর গান্ধারগ্রামের স্থানগুলির স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "কুশ্রুপ্রিয়: মহালক্ষণ: ষড়-বাসুমতঃ অনঘূর্ণাপ্রিয়: নারদীপ্রিয়: ভীমসেনীপ্রিয়: বিতান মাতঙ্গ: তার্ক্ষ্যপ্রিয়: আভিরাম: সংজ্ঞাবা: কিন্নরীপ্রিয়: পূণ্যা: মনোহর: কল্যাণকরশ্চেতি এতে পঞ্চদশ গান্ধারগ্রামাশ্রিতাঃ"। ৯। অর্থাৎ গান্ধার-গ্রামের স্থানগুলির নাম কুশ্রুপ্রিয়, মহালক্ষণ, গন্ধর্বাসুমত, অনঘূর্ণাপ্রিয়, নারদীপ্রিয়, ১০। ভীমসেনীপ্রিয়, বিতান, মাতঙ্গ, তার্ক্ষ্যপ্রিয়, আভিরাম, সংজ্ঞাবা, কিন্নর প্রিয়, পূণ্যা, মনহর, ও কল্যাণকর।

বায়ুপুরাণকার প্রত্যেক গ্রামের বিভাগসমূহের স্থানগুলির নাম করেন নি, বটে, কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বায়ুপুরাণকার গান্ধারগ্রামিক স্থানগুলির নামোল্লেখ করেছেন, যদিও বিষ্ণুধর্মোত্তরের উল্লিখিত নামের সঙ্গে অনেক অমিল আছে। যেমন বায়ুপুরাণকার বলেছেন,

০ ০ ০ ০ কুশ্রুপ্রিয়মেব চ।
মনোহরমথাষাঢ়ং গন্ধর্বানুমতং তথা ৪
অনঘূর্ণেন্দ্র তথা নারদীপ্রিয় এব চ।
তার্ক্ষ্যজো ভীমসেনেন নামভাগং যথা প্রিয়: ৪

বিষ্ণুধর্মোত্তরে স্থানগুলির নাম:

তার্ক্ষ্যপ্রিয়: ।
আভিরামাখ্যকশ্চান্য পূণ্যঃ পূণ্যাত্মকঃ
মতঃ ।"

কি বায়ু ও কি বিষ্ণুধর্মোত্তর দুটি পুরাণে উল্লিখিত গান্ধারগ্রামের স্থান-গুলিতে অবশ্য সাদৃশ্যসূচক আভিচারিক প্রকৃতির কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। অবশ্য পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের কতকগুলি উত্তম ও মধ্যম স্থানের মধ্যে আদ্যা-ত্মিক ও আভিচারিক ভাবের উল্লেখ আছে, কিন্তু বায়ু ও বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ-দুটিতে গান্ধারগ্রামের স্থানগুলিতে অন্তত সে সবের কোন লক্ষণেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। তাছাড়া সকল সময়ে সকল স্থানের আভিচারিক ভাবনার সঙ্গে আর্থিক প্রকৃতির মিল পাওয়া যায় না। আবার অনেক সময় মিল পাওয়াও যায়। কাজেই নারদী শিক্ষার আলোচনার অবসরে অনেক সময় গান্ধারগ্রামের সঙ্গে যে আদ্যাত্মিক ও আভিচারিক প্রকৃতি ও ভাবের সংযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঠিক না হতেও পারে। গান্ধারগ্রাম লুপ্ত হওয়ার বিশেষ কোন কারণে। গন্ধর্বদের কাছে গান্ধারগ্রাম সর্বাধিক প্রিয় ছিল। তাঁরাই এর যথাযথ প্রয়োগ জানতেন। গন্ধর্বেরা সঙ্গীতপ্রিয় এক শ্রেষ্ঠীয় জাতি ছিল। মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, গন্ধর্বেরা ভারতের উত্তরপ্রদেশে (উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে) এক শ্রেষ্ঠীয় জাতি-বিশেষ।[৫] 'কাশীখণ্ড' পুস্তকে আছে, যারা গীতশাস্ত্রজ্ঞ, বৃত্তা-বাদ্য ও নৃত্যে নৃপতি-মনের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করে এবং বৃত্তা, গীত ও বাদ্যাদিতে যারা পারদর্শী তাদেরই গন্ধর্ব বলে। বিশ্বকোষে উল্লিখিত হয়েছে, গন্ধর্বেরা দু'ভাগে বিভক্ত—মৌলেয় ও গ্রামেয়।[৬] বিষ্ণুপুরাণে আছে, যারা গান সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা গন্ধর্বাস্তুক অবজ্ঞাত।

৬। "নিবাদঃ ষড়্জাস্য শ্রুতিস্থং সংশ্রয়েজ্জ্যেৎ ০ ০ প্রাক্'—সঙ্গীতরত্নাকর (আডেয়ার সং.), ১ম ভাগ, পৃ ১১১

৭। ভূয়ঃকৃতী (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ) পৃ: ২৬-২৭

৮। সঙ্গীত-রত্নাকর (আডেয়ার সংস্করণ), ১ম ভাগ, পৃ: ১৪২-১৪৩

৯। শিক্ষাকার নারদের অভিমতও তাই। যেমন শিক্ষায় তিনি উল্লেখ করেছেন।

"বিংশতির্মধ্যগ্রামে ষড়্জগ্রামে চতুর্দশ।
তানান্ পঞ্চদশেত্যেতি গান্ধার গ্রাম মাহিতান্ ৪২।"

১০। এর বানান গন্ধর্বের 'অনঘূর্ণ' হবে, বায়ুপুরাণে ও অন্যত্র এবে অনঘূর্ণাই (ন স্থানে ঘ) আছে।

শিবজো লক্ষ্মণে যাচং গন্ধর্বাণাং ছে-ছিত ।

ধাতা থেকে গন্ধর্বের সৃষ্টি হয়। গো (বাক্য বা গীত) ধৃতম ধারণে ঈশ্বরের বা গান করতে জন্মগ্রহণ করেছিল বলে 'গন্ধর্ব' নাম হয়। বহিপুরাণে আছে, গন্ধর্বেরা এগারোটি ভাগে বিভক্ত : অঙ্গার, অর্থাবি, বরাবি, সূর্যবর্চা, কৃষ্ণ, সহজ, সুপর্ণ, ভূর্যবান, বিশ্বাবসু ও কৃশানু। হরিবংশ আরও আটজন প্রধান গন্ধর্বের নামোল্লেখ করেছেন—চারু, চিত্র, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, শালিহ, হুহুরা ও নন্দি।

ওল্ডেন পুশালকার তাঁর Aryan settlements in India-নিবন্ধে গান্ধারী রাজ্যবংশ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বলেছেন, গন্ধারীরা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করত। ঋগ্বেদ .126.7) গান্ধারীদের পশম সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। অধ্যাপক জিমার (Prof. immer) মনে করেন, বৈদিক যুগে বা কুভানদীর দক্ষিণ তীরে উপনিবেশ পত্তন করে, এবং সিন্ধুনদী পর্যন্ত তাদের সৃষ্টি ছিল। ১১। তাছাড়া অথর্ববেদে ২২.১৪) ও কৌতুহলে গান্ধারী বা গান্ধারের (গান্ধার) উল্লেখ আছে : "They pper apperently as a despised ople in the Atharvaveda. In ler times however, the angle vision of the people of the adeyades's changed, and Gandhara became the famous resort the Vedas and Vidya."। ১২

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।৩।৪) নগ্নজিৎ নামে জনৈক গান্ধার রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদগ্ধ ব্রাহ্মণদের ভেতর নগ্নজিৎ লোপামুদ্রা (লোপামুদ্রার ভক্ত) প্রকাশ করেন। এ থেকে গান্ধারজাতি যে বৈদিক আর্যদেরই একটি শাখা তা প্রমাণ হয়। জয়া অনার্য ছিল না—"Which shows that Gandhara was not excluded from the Vedic Aryans" তাঁ পুশালকারের মতে, মহাভারতে গান্ধারদের বিভিন্ন রূপ থেকে একথাই মনে হয় যে, বিভিন্ন সময়ে গান্ধারদেশের সীমার পরিবর্তন হয় : "From various references to Gandhara in Indian literature it appears that the boundaris of the country varied at different periods in its history."

তান কাকে বলে—এর উত্তরে বলা যায়, কোনপ্রকার আরোহযুক্ত স্বরসমূহকে তান বলে। তান শুদ্ধ ও কূটভেদে দু'রকম। মূর্ছনা একস্বরবিহীন-ক্রমে ষাড়ব ও দু'স্বরবিহীন ক্রমে পাঁচস্বরযুক্ত হলে শুদ্ধতান বলে। ষাড় বা ছয় ষাড় যুক্ত শুদ্ধতানকে ষাড়ব ও পাঁচস্বর যুক্ত শুদ্ধতানকে ঔড়ব বলে।

ষাড়ব তান উনপঞ্চাশটি। ষড়জ-গ্রামের সাতটী মূর্ছনা ষড়জ, অমৃত, পঞ্চম বা নিষাদ এদের মধ্যে কোন একটি থেকে আটশটি ষাড়ব শুদ্ধতানের, এবং মধ্যমগ্রামের সাতটি মূর্ছনা ষড়জ, অমৃত, গান্ধার এদের মধ্যে কোন একটি না থেকে একুশটি ষাড়ব শুদ্ধতানের সৃষ্টি হয়।

ঔড়ব তান পঞ্চত্রিংশটি। ষড়জগ্রামের সাতটি মূর্ছনা থেকে ষড়জ ও পঞ্চমবিহীন সাতটি গান্ধার ও নিষাদবিহীন সাতটি এবং অমৃত ও পঞ্চম-বিহীন হয়ে সাতটি, মোট একুশটি তান। সেরকম মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা থেকে অমৃত ও বৈবত না থেকে সাতটি, মোট চোদ্দটী তান।

পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ মূর্ছনা ব্যতিক্রমে উচ্চারিত হলে তাকে 'কূটতান' বলে। পূর্ণমূর্ছনায় যে কূটতান হয় তাকে 'অসম্পূর্ণ কূটতান' বলে। পূর্ণমূর্ছনা ছাপ্পান্নটি, সুতরাং পূর্ণতানের মোট সংখ্যা ২৮।২২৪০। সিংহভূপাল টীকায় তাই উল্লেখ করেছেন : "এক মূর্ছনা অসংপূর্ণা যাস্ত সংপূর্ণবিজ্ঞা এব ব্যতিক্রমেণোচ্চারিতত্বাৎ সত্যঃ কূটতানাঃ ভবন্তি। ০ ০ এবৈকত্রাং মূর্ছনায়াং পূর্ণাঃ কূটতানাশ্চত্বারিংশত্তথাধিক পঞ্চসহস্রাণি (৫০৪০) ভবন্তি ০ ষড়জ ও ধৈবত ৫০৩৩টী কূটতানের কথা বলেছেন —"পূর্ণাঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ সংখ্যকাঃ।"

পূর্ণমূর্ছনার অন্য একটি না থাকলে ষট্‌স্বরের অসম্পূর্ণ কূটতান হয়। এরকম ছয়ের অন্যস্বরের অভাবে পঞ্চস্বর, তিনটির অভাবে চতুঃস্বর, চারটির অভাবে ত্রিস্বর, পাঁচটির অভাবে দু'স্বর এবং দুটির অভাবে একস্বর কূটতান সৃষ্টি হয়। উদাহরণ প্রত্যেক মূর্ছনায় ছয়টি ক্রমে অসম্পূর্ণ কূটতান থাকতে পারে। বিভিন্ন সংখ্যাবিহীন কূটতানগুলির নাম ষাড়ব, ঔড়ব, ষাড়ভ, সাম্বিক, গান্ধিক ও আর্চিক।

পূর্বে উল্লিখিত স্বরগুলির মধ্যে কোন কোন স্বর অপর স্বরে সাধারণ (common) হয়ে থাকে, এবং তাদের বলা হয় 'সাধারণ'। এই সাধারণ দু'রকম —স্বর-সাধারণ ও জাতি-সাধারণ। স্বর সাধারণ আবার চারটী—কাকলী, অন্তর ষড়জ ও মধ্যম সাধারণ। কাকলীস্বর ষড়জ ও নিষাদের এবং অন্তরস্বর গান্ধার ও মধ্যমের সাধারণ রূপে প্রকাশ পায়। গানে ষড়জের উচ্চারণের পর ক্রমানুসারে প্রথমে কাকলী ও পরে বৈবতের প্রয়োগ করা উচিত।

নিষাদ ও ঋষভ স্বর-দুটি যথাক্রমে ষড়জের আদি ও অন্ত্য (প্রথম ও শেষ) শ্রুতি গ্রহণ করলে তাদের ষড়জ সাধারণ বলে। গান্ধার ও পঞ্চম যথাক্রমে মধ্যমের প্রথম ও শেষ শ্রুতি অবলম্বন করলে মধ্যম-সাধারণ হয়। ষড়জ-সাধারণ ষড়জগ্রামে ও মধ্যম-সাধারণ মধ্যমগ্রামে ব্যবহৃত হয়। বৈশিষ্ট্যে উভয় সাধারণেরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। ভরত দুটির জাতিমতে এক গ্রামে সমান অংশ ও ঘনিষ্ঠ জাতিতে পরস্পর সমান গানকে 'জাতি-সাধারণ' বলে। ভরতের মতকে উল্লেখ করে তাই টীকাকার সিংহভূপাল লিখেছেন : "সমান গ্রামোদ্ভবত্বেঽপি-ঘনত্বেন জাতিমু বৎসনামং গানং ভবেৎ তদর্থ মাত্রা আচার্য্য ভরতাদয়ো জাতি-সাধারণমব্রবীৎ।। ০ ০ বৈচিত্র্যার্থং এবং শুদ্ধকৌশিক মধ্যমাদয়ো জাতি-সাধারণাধিকারাঃ।" শাঙ্গদেব মতাকারে ভরতের মতকেই অনুসরণ করেছেন—"সমানং গানমার্যাদ্বয়ান্তর্জাতি সাধারণঃ ভবেৎ (১৫।১০।)। রাগোপযোগের সঙ্গীতদর্পণে রাগোপযোগকেই জাতি-সাধারণ নাম দিয়েছেন।

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণকার ত্রিমূর্তির তানগুলিকে ষড়, পঞ্চ, দশ ও বিংশ অনুযায়ী তাদের বিভাগের কথা উল্লেখ

---

১১ C.F. History and Culture of the Indian People : The Vedic Age, vol. I (1951). p. 248.

১২ Ibid., P P. 259. Ct also Dr. Roychoudhury: Political History of Ancient India (1953). 5 -52

১৩। সঙ্গীত-মকরন্দ (আড়েয়ার সং) ১ম ভাগ, পৃঃ ১১১

হেন। তাছাড়া মূর্ছনার প্রথমে, মধ্যে শেষে বাদী, সংবাদী ও অনুবাদী তিন স্বরের ব্যবহারের কথা বলেছেন—"মূর্ছনাসাদি মধ্যান্তে বাদি সো স্বরঃ : বাদী, সংবাদী ও অনুবাদীর কোন পরিচয় তিনি দেন নি। মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে বাদী, সংবাদী অনুবাদী ও বিবাদী এই চারটিকে স্বরের পরিবর্তে স্বর বলেছেন, তবে সম্পর্কে ও প্রকৃতি অনুসারে স্বরগুলিই বাদী, সংবাদী হয়। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন : চতুর্ণাংস্বরাণাং বর্ণসাম্যে। যথা—স র গ ম প ধ নি স্বরাণাম্বৎ। বর্ণনাৎ সংবাদী অমাত্যবৎ। ১৪ বর্ণসাম্যমনুবাদী পরিজনবৎ। বিবাদি-বিবাদী শত্রুবৎ। 'বর্ণনাৎ বাদী'—এর অর্থ 'বর্ণ' বলতে প্রীতিপাদন বা রঞ্জন করা, অর্থাৎ রাগবর্ধ অথবা রাগের শ্রীবৃদ্ধি করিয়ে দেয়—"বর্ণনং হি রাগস্য প্রীতিপাদকত্বং বিবক্ষিতং ০ ০। তেন রাগস্য জনকত্বাৎ।" মতঙ্গ বাদীস্বরকে যে রাগবর্ধক সৃষ্টি করতে বলেছেন [রঞ্জনকৃত্']। প্রকৃতপক্ষে রাগে যে স্বর ব্যবহার অধিক থাকে তার জ্ঞান বিকাশ-মানুষেই রাগের প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রকাশ পায়। সংবাদী স্বর রাগস্বরূপের নির্ণায়ক - "স্বরং বাদিত্বেন রাগস্য জনিতং তদ্বিপক্ষত্বং নাম বাদিত্বং।" অনুবাদী সংবাদীর অনুগামী, অর্থাৎ সংবাদী স্বরের দ্বারা রাগের রূপ বা প্রকৃতি যতটুকু প্রকাশ পায়, তাকে আরো সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে—"স্বং সংবাদিনং রাগস্য রাগজ্ঞঃ পার্শ্বস্থং তৎপ্রতিপাদকং মন্যতেঽনুবাদি-নম্"। বিবাদীস্বর রাগের রূপ ও প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে, এজন্য সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগদ্বেষ শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে—"রাগাদীনাং: তদ্বৈরূপ্যাপাদকং বিদ্যাৎ সংবাদিস্বরভেদাদিহ প্রাজ্ঞঃ, জনকত্বং নাম বিবাদিত্বম্"। ১৫ [অনেক গুণীদের রুচিবিরুদ্ধ আঙ্গিকও রাগে বিবাদী-স্বরেরও ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে দেখা এজন্য উচিত যে, অসঙ্গত স্বর রাগচ্ছায়া ও সৌন্দর্যকে বিকৃত করবে। পরিচয় দেওয়া। যেমন, আধুনিক-

কালের বাদীস্বরস্থানীয় বা মূলস্বরোপরি ১৬ পঞ্চমস্বর বর্জিত অর্থাৎ বিবাদী পঞ্চম-স্বরের ব্যবহার হোলেই রাগস্বরূপ বিকৃত বা বিনষ্ট হয়। সেই কারণেই মতঙ্গ "রাগি-রাগহা" বলেছেন। কিন্তু কিভাবে বিবাদিত্ব জানে তা প্রথমে বা প্রকাশ করার জন্য অনেক প্রাচীন ও সুদক্ষ সঙ্গীত-শাস্ত্রী বাদীস্বরস্থানীয়কেও সাময়িকভাবে পঞ্চমের ব্যবহার কোরে থাকেন এবং দক্ষতা ও চাতুর্যের সঙ্গে করাও অসম্ভবপর নয়। এদিক থেকে দেখলে পার্শ্বদেব বিবাদীস্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'সঙ্গীতসময়সার' গ্রন্থে (পৃঃ ৬) বিবাদীর স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন,

বিজ্ঞাতব্যো বিবাদী স যস্য :
ভার্যোঽথবা পুনঃ।
প্রজ্ঞাদনীয়ো রোগো বা
যস্মাৎ স্যুঃ স্বরস্তু যঃ।

বিবাদী-বর্জিত স্বর ঠিকই কিন্তু স্বর ব্যবহারও অনেক সময় করা হয় বিবাদী-স্বরের।

বাদী, সংবাদী কি ভাবে নির্ণয় করতে হয় সে সম্বন্ধেও মতঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন : স্বরাঃ সপ্তৈব। স চ পঞ্চাংশবং রঞ্জবিবো বোদ্ধব্যঃ"; অর্থাৎ অংশস্বর বাদী এবং তা রঞ্জকত্বের হয়।

অংশ, এই ঐতিহ্যগত রাগের অঙ্গ। অবশ্য মতঙ্গও বাদী, সংবাদী, প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন—"চতুর্বিধস্বরভেদেষ্বং বিভেদেষ্বং প্রীতিযোগতঃ, বাদী চৈবার্থ সংবাদী অনুবাদী বিবাদীপি" (২৮।২০)" এদের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন এই বোলে "রঞ্জনাদ্বাদী সংবাদ সংবাদী বিবাদি-ত্বাদ্বিবাদী অনুবাদাদনুবাদী" (২৮।২২)। এই বাদী সংবাদ" স্বরগুলি প্রীতির অনু-সারে নির্ণয় হয়, অবশ্য ভরতও সে কথা বলেছেন—"বিজ্ঞেয়ঃ প্রীতিযোগতঃ", কিন্তু তা ছাড়া আরও তিনি উল্লেখ করেছেন —"এতেষাং স্বরাণাং মূর্ছনাবিকারাণাং মূ ত্রোপপাদন তত্ত্বোক্তং বৈণ্যাকুলজায়তে। উক্তোত্তং বর্ণবিধানং চতুর্বিধং (২৮।২২)। কিন্তু তা হোলেও অর্থাৎ বাদী, প্রকৃতির উল্লেখ থাকলেও তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও রাগের পরিচয় দেবার সময় অংশ কথা গ্রন্থ প্রস্থাতিরই ব্যবহার করেছেন, যেমন,

"গান্ধারোদীচ্যবাসাং তু তারাংশৌ
ষড়জমধ্যমৌ ৫"

ষড়জ গ্রামরাগীতে ষড়জাদীর্ণ ভাষি-রাগের পরিচয় দিয়েছেন,

গান্ধারী ষড়জগান্ধার্যোঃ ষড়্জমধ্যম-পঞ্চমাঃ।
সাংশবাদাঃ ষড়্জা অংশ
অনৌড়ুবিড়ৌড়বিনঃ।

অংশ কাকে বলে? ভরত নাট্যশাস্ত্রে পরিচয় দিয়েছেন :

"যস্মিন জাতি রাগস্য ব্যবস্থিতৌ প্রবর্ত্তন্তে" (২৮।১২)। যেখানে রাগ থাকে, ও যেখান থেকে রাগের আরম্ভ হয় তাকেই অংশ বলে। মোট কথা যে স্বর রাগের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে তাকেই অংশ বলে, সুতরাং অংশ শব্দটি বাদীরই সমান অর্থ ও সার্থকতার প্রকাশক। পরবর্তীকালে অর্থাৎ—১৪শ —১৬শ খৃষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রীরা অংশের পরিবর্তে বাদী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য পার্শ্বদেব তাঁর সঙ্গীতসময়সার-গ্রন্থে (পৃঃ ৫) অংশকে স্পষ্টভাবে বাদীই বলেছেন,।

সপ্তস্বরাণাং মধ্যেঽপি যস্মিন্ যস্মিন্
সুস্থাগতাঃ।
স জীবস্বর ইত্যুক্তো অংশো বাদীচ
কথ্যতে।

কিন্তু তাহোলেও রাগের পরিচয় দেবার সময় পার্শ্বদেব 'অংশ' শব্দই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে অংশ শব্দটির ব্যবহার একেবারে লোপ পেয়েছে এবং তা থেকে সুবিধা—কি অসুবিধা হয়েছে চিন্তাশীল সঙ্গীতজ্ঞানীরাই বিচার করে দেখবেন। আমাদের মতে, বোধহয় পূর্বোক্ত রীতিই নিরাপদ করা হয়, তাতে বাদীস্বর নির্ণয়ে অনেক সময় বিপর্যয়ও দেখা গেছে।

বাদী, সংবাদী প্রকৃতি নির্ণয় রীতি অনুসারে হয় ('প্রীতিযোগতঃ') এবং তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত ও মতঙ্গ প্রকৃতি বলেছেন :" যস্মাদ্ধ নবস্বরো-দাহৃতস্বরাস্তস্মাৎ তাবত্যোঽঃ সংবাদিনৌ। যথা ষড়্জস্বরস্য ষড় ঋষভস্বরস্তৃতৈ-

১৪ বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং) পৃঃ ১৩৯
১৫। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং) পৃঃ ১৪—১৫
১৬। প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে রাগের বৈশিষ্ট্যকে বোঝাতে সম্পূর্ণ গান্ধ স্বরের ও কোন রাগের বাদী বা রাগ্য স্বরের
ম বলা হয়েছে।

হয়েছে গান্ধারনিষাদে ইতি ষড়জগ্রামে। মধ্যমগ্রামের ক্ষেত্রে হয়েছে ষড়জ-পঞ্চমবর্জোদীচ্যে সংবাদে ইতি। বিবাদী নির্ণয় করতে গিয়ে পুনর্বার ভাবত বলেছেন: "বিবাদিনস্তু যে স্বোক্ত বিংশত্যন্তরস্থিতাঃ"—যাতে কুড়িটি শ্রুতির ব্যবধান থাকে, যেমন, "ঋষভস্য গান্ধারো বৈবতনিষাদৌ"। মতঙ্গ বলেছেন: "ত্যক্তবৌ তু যদৌ বিবাদিনৌ" অবশ্য একটি মধ্যমগ্রামের। তেমনি অনুবাদী সম্বন্ধে ভরত লিখেছেন, ষড়জগ্রামে ঋ-র অনুবাদী হবে ধৈবত, গান্ধার, ষড়জ, নিষাদ, ঋষভের—মধ্যম—পঞ্চম ও নিষাদ, গান্ধারের—মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ষড়জের ধৈবত, পঞ্চম, নিষাদ, পঞ্চমের ষড়জ ও নিষাদ ধৈবতের ঋষভ, পঞ্চমে, ধ্যম প্রভৃতি।

বাদী সংবাদী ও অনুবাদীর উল্লেখের ন বিষ্ণুধর্মোত্তরকার সবটা মতের বিস্তার দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি ত ঘরে অনুপস্থিত। যেমন তিনি বলেছেন, "ভরত ও অন্যে বিষ্ণুসিদ্ধির ভারতীয় সঙ্গীত-পুস্তক মালিকা (১ম:—৪র্থ:) পুস্তকে ঐকমত্যের বিষয়ও দেখা যায়। যেমন কোন ধ্বনি পঞ্চমকে বাদীত্বের হিসাবে নির্ণয় করা হয়েছে, সেখানে বাদীর (বহুল প্রয়োগত্ব) সার্থকতা নিয়ে দুজন পঞ্চমের ব্যবহার নাই বরং পঞ্চমবর্জীত মাত্রৈষবের প্রয়োগই আছে ইত্যাদি ছাড়া ও পুস্তার বল ষড়জ ও পঞ্চম ঘর-টির অনুগত, বীর ও রৌদ্র ষড়জ ও পঞ্চমের অনুগামী, করুণরস নিষা ও গান্ধারের সঙ্গে যুক্ত, আর বীভৎস ও ভয়ানক রস রৈবতে অনুগত এবং শান্তরসের সঞ্চার ঋষভে। রস ভাব-সঞ্চারী এবং সাঙ্গীতিক দাতের নবরসে অতিরিক্ত হয়ে ৯'রকম ভাব প্রকাশ করে।

এর পর বিষ্ণুধর্মোত্তরে রসলক্ষণে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অংশ, গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাস। প্রত্যেক স্বরলক্ষণের ইঙ্গিতও পুরাণে সংকলনকার করেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে আছে: "স্বরেষের গ্রামেষ্বেঃ ক্রমেণো ভবলক্ষণা।" জাতি বলতে ভাতিরাগ। পুরাণকারেরও অভিপ্রায় যে, রসলক্ষণযুক্ত হয়ে প্রতিটি রাগের প্রকাশ হয়।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে প্রবন্ধাদি অলংকারের কোন উল্লেখ নেই। তবে "গীতজাতি" বলে ধ্রুব, ধাথা, পাণিকা, শকাবিদ্যা বা শকবদ্যা, প্রবন্ধগীতিকা প্রভৃতি প্রবন্ধগীতির উল্লেখ বিষ্ণুধর্মোত্তরে আছে। সাধারণে বাদ্য ও নৃত্যের প্রসঙ্গও পুরাণকার করেছেন। যেমন,—

মুরজাঃ পুষ্করাদ্যাঃ তদলঙ্কারনিকা
ভবেৎ।
"আতত ভাততং বিদ্যাৎ ঘনং
পনবদ্ধুষা।

• • • •

ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তরে কৃতীষষ্ঠতে মার্কণ্ডেয় বহু সংবাদে অভ্যাস বিধিন-বাদ্যবিকোদ বিংশোঽধ্যায়:।"

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

র‍্যালে ভারতের সর্বাধুনিক
সাইকেল কারখানার
সেরা-র‍্যালের তৈরী

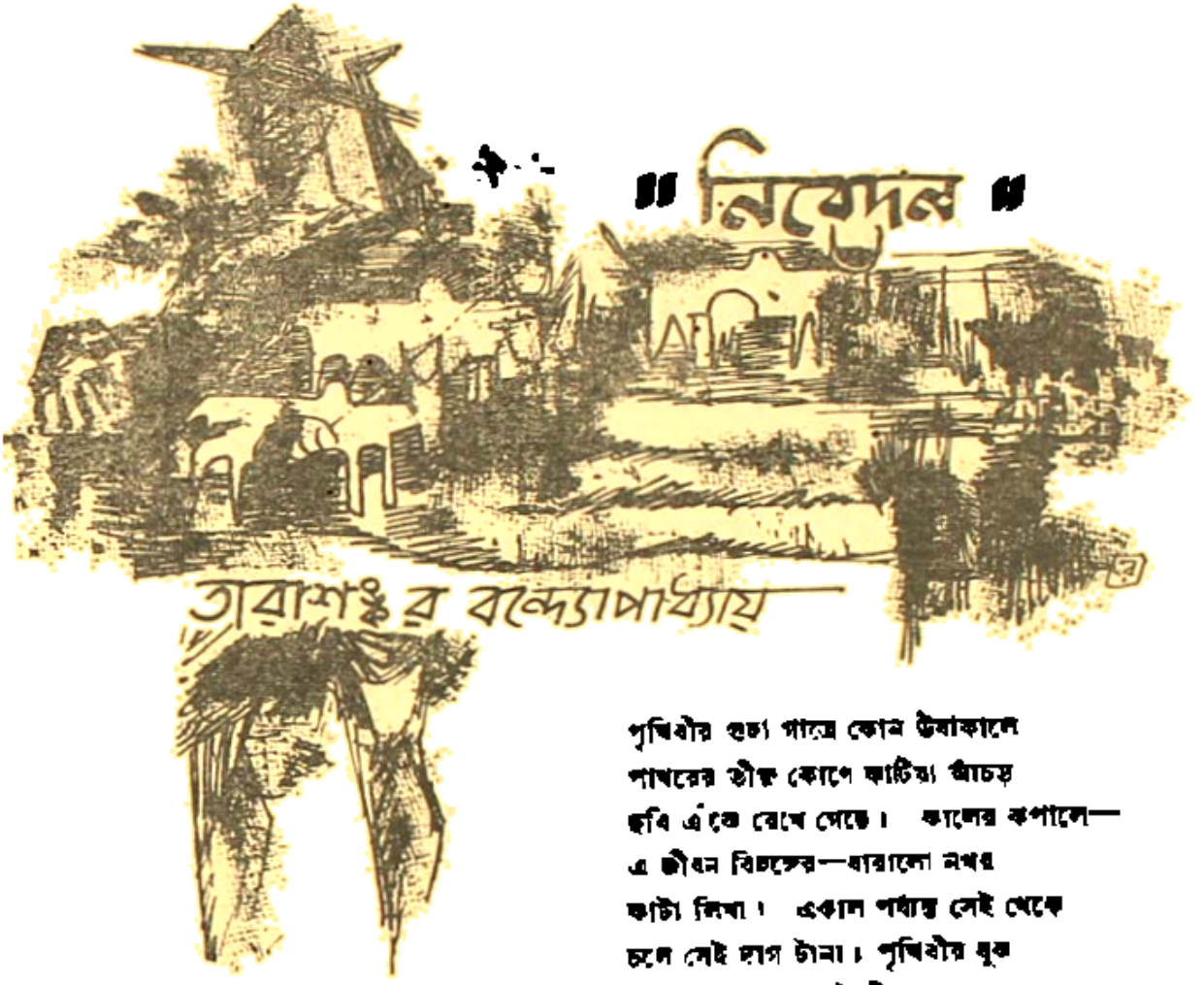

পৃথিবীর শুভ্র গাত্রে কোন উষাকালে
পাথরের তীক্ষ্ণ কোণে কাটিয়া আঁচড়
ছবি এঁকে রেখে গেছে। কালের কপালে—
এ জীবন বিচক্রের—ধারালো নখর
কাটা লিখা। একাল পর্য্যন্ত সেই থেকে
চলে সেই দাগ টানা। পৃথিবীর বুক
কালের আঁচড়ে কেটে বীজ দেয় ডেকে
কৃষকেরা চিরকাল, আর তৃপ্ত সুখ
আকাশের আনন্দ আনে নতুন ফসল
হিমাগমে বাতাসের সর্বাঙ্গে সুবাস
সবুজ সোনালী রঙে ধরণী উজ্জ্বল।
মানস আনন্দ-ক্ষেত্রে চলে সেই চাষ।
আজ যারা কলমে আঁচড় টেনে যায়
তারাই ফসল বোনে—তাদের পায়
নতি রেখে যাই আমি আমার সন্ধ্যায়—
তোমরা আঁচড় টানো, এ ধরণী আছে প্রতীক্ষায়।

স্বাস্থ্য গঠনে একান্ত প্রয়োজন

আপনি কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করেন···কাজে উৎসাহ পান না
অথবা সর্দি কাশিতে ভুগছেন···হয়ত খিদে হয়না,
যা খান তা হজমও হয়না

তা' হলে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার **চামচ**
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খেলে
আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে।

মৃতসঞ্জীবনী
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয় চাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস,
(লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা),
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

শুধু ভৈরবী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বকুলতলার ঘাটে হঠাৎ একদিন একটি নৌকো এসে লাগলো। সকাল বেলা। গদাধর তুলসী তুলছিল বাগানে। ঘাটের দিকে তার নজর পড়লো। দেখলে, নৌকো থেকে একটি মেয়ে নামছে। পরণে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল—এক সন্ন্যাসিনী। গদাধর বুঝতে পারলে না এখানে সে কি জন্যে এলো।

নিজের ঘরে ফিরে এসে গদাধর ডাকলে, 'হৃদয়!'

হৃদয় কাছে আসতেই বললে, বকুলতলার ঘাটে গিয়ে তাখ কেমন একটী মেয়ে নামলো নৌকো থেকে। ডাক্ না ওকে এইখানে।

হৃদয় তো অবাক্! বাবা ডাকতে বলছে একটী মেয়েকে! হাঁ করে তাকিয়ে রইলো হৃদয়।

হাঁ অমন করে তাকাচ্ছিস কেন হতভাগা? যা না, ডাক্ না মেয়েটাকে। বল্ আমি এইখানে রয়েছি। তা'লেই আসবে।

মায়ের আদেশ। যেতে হলো হৃদয়কে। গিয়ে দেখে—এক সন্ন্যাসিনী। পরণে গেরুয়া। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চুপটি করে বসে আছে ঘাটের সৈঁড়ায়।

হৃদয় বললে, বাবা তোমাকে ডাকছে গো! এসো আমার সঙ্গে।

বলবামাত্র উঠে পড়লো ভৈরবী। হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এলো গদাধরের কাছে।

গদাধরকে দেখেই সে তাকে, বড় বড় চোখদুটি দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। যেন অবাক হয়ে গেল সে।

—'বাবা তুমি এইখানে? গঙ্গাতীরে আছো তুমি জানি, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি অনেকদিন থেকে। আজ আমার খোঁজা শেষ হলো।'

গদাধর বললে, 'আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ? আমার কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

ভৈরবী বললে, 'মা মহামায়া আমাকে জানিয়ে দিলেন। তিনজনের কথা বলে দিলেন মা। তার একজন তুমি একজন।'

গদাধর জিজ্ঞাসা করলে, 'আর দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। হয়েছে পূর্ববঙ্গে। বাকি আছো শুধু তুমি।'

গদাধর বললে, 'আমিও যেন তোমারই মত কাউকে খুঁজছিলাম।'

'কেন বাবা, তুমি খুঁজছিলে কেন?'

'আমার মনের কথা বলবার জন্যে।'

এই বলে গদাধর ঠিক ছোট ছেলেটির মত বলতে আরম্ভ করলে, 'এই ছাখ মা, আমার সারা গা চব্বিশ ঘণ্টা যেন জ্বলছে। আগুনে পুড়ে গেলে যেমন হয়—তেমনি। সারা রাত চোখের পাতা এক করতে পারি না। ঘুম হয় না। কী যে হয় কিছু বুঝতে পারি না। কত কী দেখি চোখের সামনে। সবাই বলে—লোকটা পাগল হয়ে গেছে। হ্যাঁ গো মেয়ে, সত্যিই কি আমাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে?'

ভৈরবী বললে, 'না বাবা কে তোমাকে পাগল বলে? যারা বলে তারাই পাগল। তবে হ্যাঁ ভাবে মানুষ একরকম পাগল হয়। সেই কথার আছে না—লোকটা ভাবে পাগল। ভাবের ভুবনে যাদের ভাববার—যেমন কবি, শিল্পী। তাদের হয় এমনি পাগলা-পাগলা ভাব। তোমার ভাব একটু আলাদা। এ তোমার মহাভাব।'

আবদার ধরে বসলো গদাধর।—সে কেমন আমাকে বুঝিয়ে দে মা।'

'সময় হোক তখন বুঝিয়ে দেবো। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখো—তোমার মত ঠিক এইরকম ভাবে পাগল হয়েছিলেন চৈতন্যদেব। হয়েছিলেন রাধারাণী। ভক্তিশাস্ত্র পড়ে পড়ে আমি সব দেখিয়ে দেখিয়ে মিলিয়ে দেবো তোমাকে।'

গদাধরের হঠাৎ মনে হলো—অযাচিত ভাবে যিনি এলেন তাকে কিছু জলযোগ করানো উচিত। কিন্তু মায়ের প্রসাদ ছাড়া কীই-বা আছে এখানে? গদাধর খানিকটা মাখন আর কয়েকটা মিছরি টুকরো নামিয়ে দিলে ভৈরবীর হাতের কাছে। বললে, 'খা মা। আগে খেয়ে নে, তারপর কথা বলবো।'

ভৈরবী বললে, 'আগে তুমি খাও।'

এই বলে একটুখানি মাখন আর মিছরি ভৈরবী প্রথমেই তুলে দিলে গদাধরের মুখে। মা যেমন করে সন্তানের মুখে তুলে দেয়—ঠিক তেমনি করে।

তারপর নিজে খেলে।

সামান্য একটুখানি মাখন আর মিছরি। ভৈরবীকে দেখে মনে হলো সে যেন কতই-না খেলে।

গদাধর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনীর দিকে। দেখে তার বয়স বুঝবার জো নেই। মনে হয় যেন অপরূপ সুন্দরী যুবতী। যেমন গায়ের রং, তার তেমনি দুটী বড় বড় চোখ। সে চোখ যেন মানুষের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পায়।

'এইবার বল মা তুমি কে?'

'সময়ে সবই জানতে পারবে বাবা।

পাশাতে ফেলে রাখো—আমি বাসুদের যাবে। যশোর জেলায় বাড়ী।

'কি বলে ডাকবো মা তোমাকে?'

'আমাকে বোলো—যোগেশ্বরী।'

হ্যাঁ, যোগেশ্বরীই বটে! দেখলে তাই ন হয়।

ভৈরবী বললে, যোগে বসে জানতে বলাম দাদাকে সাহায্য করতে হবে নজনকে। দু জনকে করে এলাম। জন চন্দ্র আর একজন বিধবা। শালে তাদের বাড়ী। এবার এলাম আর কাজে।'

'ওরা কি শিখলে মা?'

ভৈরবী বললে, 'বলবো—বলবো—বলবো। তাদের নিয়ে আসবো ন তোমার কাছে।'

গদাধর বললে, 'এসো, এইবার তোমার ন ব্যবস্থা করি।'

ভৈরবী বললে, 'তার আগে দক্ষিণে। যাকে দর্শন করে আসি।'

গদাধর তাকে বসিয়ে নিয়ে গেল। 'এই তাখো আমার মা জগদম্বিকা।'

দেখা যেন আর শেষই হয় না!

ভৈরবীর গলায় দুলছে রঘুবীর শীলা। যাত্রা করে তার ভোগ দিতে হবে। পর সেই প্রসাদ পাবে ভৈরবী। বাড়ী থেকে নিয়ে এলো। সেই নিয়ে ভৈরবী চলে গেল পঞ্চবটীতে। তার সঙ্গে গেল। কোথায় কি হবে দেখিয়ে দেবে।

ভৈরবী উনোন তৈরি করে ভৈরবী করবে। গাছের ডালপালা ঠেলে রাখে। পাতায়। তারপর রঘুবীরকে স্নান করবার জন্য ধ্যানে বসে ভৈরবী। চোখ বুজে একদিন এখানে বসে আছে। সুমুখে জগদম্বা। ভৈরবী ধ্যানে দেখছে রঘুবীর পরম পবিত্রতার সঙ্গে থাকে তার নিবেদনের অন্ন।

কিন্তু চোখ মেলে চাইতেই ভৈরবী দেখলে—রঘুবীর তো নয়। তখন এসেছে গদাধর, কখন বসে গেছে তার সুমুখে, তখন থেকে আরম্ভ করেছে রঘুবীর সাথে নিবেদিত অন্নব্যঞ্জন কিছুই সে বুঝতে পারেনি।

ভৈরবীর সঙ্গে গদাধরের চোখোচোখি হতেই গদাধর হাত গুটিয়ে নিলে। হঠাৎ যেন তার জ্ঞান ফিরে এলো। অপ্রস্তুত ভাবে বিব্রত বললে, 'এ কে হে হে হে, এ কী কাণ্ড করে বসলাম বল তো! এমন দিন আজকাল কাণ্ড করে যাই থাকে থাকে। কে যেন টেনে এনে আমাকে বসিয়ে দিলে এইখানে।'

ভৈরবীর মুখে প্রসন্ন হাসি।

'জানি আমি—তুমি আসবে। বাইরের পুজো আজ আমার শেষ হয়ে গেল। তুমিই আমার রঘুবীর।'

এই বলে গদাধরের উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে বসে গেল ভৈরবী।

তারপর কলার পাতা আর জলের ঘটি গঙ্গায় ফেলে দেবার জন্য ভৈরবী গেল গঙ্গার ঘাটে। পাতা ফেলে দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো গঙ্গার জলের দিকে। সূর্যের আলো পড়েছিল ঢেউএর ওপর। সেই সূর্যালোকোজ্জ্বল জলপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলে। তারপর গলা থেকে রঘুবীর শীলাটিকে খুলে নিয়ে একবার মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। প্রণাম করে অবলীলায় সেই শিলাটিকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'তোমার শীলা মূর্তিতে আর আমার কোনও প্রয়োজন নেই রঘুবীর। আমি পেয়ে গেছি তোমাকে।'

গদাধর বললে, 'আমি আকাট মূর্খ মা, নিজের মাথাটা পর্যন্ত সাফ করতে পারি না। আমাকে মা যা বলায় তাই বলি। মা যা করায় তাই করি। সব সময়েই মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি।'

ভৈরবী বললে, 'তুমি মূর্খ নও বাবা। মা তোমার সঙ্গে রয়েছেন, তোমার ভাবনা কিসের?'

'তাই তো এক-একসময় ভাবি আমি। আবার এক একসময় সব ভুলে যাই।'

ভৈরবী বললেন, 'মা যে তোমার সব ভারগ্রহণেই বাঁধা। ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। বিবাদর্শন থাকে বলে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব। বুঝিয়ে দেবো কাকে বলে নিত্যোপাসনা। আর কেথায়ো উপাসনা।'

গদাধর বললে, 'কিন্তু মা, একটা কথা বলি তোমাকে। তুমি যে আমার কে সেকথা তো লোকে বুঝবে না। তোমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নানা লোকে নানা কুৎসা রটাবে। সেই জন্যে বলছি মা, তুমি এখান থেকে একটু দূরে কোথাও নিজের থাকবার ব্যবস্থা করে নাও।'

ভৈরবী বললে, 'কিছুই করতে হবে না বাবা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

সত্যি সত্যিই তাই হলো। গ্রামে গেছে ভৈরবী, এ বলে আমার কাছে নিয়ে নাও, ও বলে আমার কাছে নাও। এ বলে আমার বাড়ীতে থাকো, ও বলে আমার বাড়ীতে।

শেষ পর্যন্ত তার স্থান হলো দেব-মণ্ডলের ঘাটে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে মাইলখানেক দূরে। নিজের হাতে রান্না করে, ঘরখানা নিজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে, আর পঞ্চবটীতে বসে বসে চলে গদাধরের সঙ্গে যোগসাধন-ভজনের আলোচনা।

এরও জানে ভৈরবী!

গদাধর এক একসময় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ভৈরবীর মুখের দিকে।

'এত সব ছাই শিখলি কোত্থেকে?'

কখনও তুই, কখনও তুমি। কখনও ভৈরবী কখনও যাদুমণি, কখনও মা কখনও যোগেশ্বরী।

ঠাকুরের ধর্মজীবনের—ঠাকুরের যোগ

বিদায় প্রথম শুরু এই অসহায় চিত্রকরীপত্নী মাধবী।

•

•

মধুর দেখলে ভাল এ আপদ ছুটলো হেসে যাবার কালে।

ষোল সতেরো থেকে বাঁচি পর্যন্ত যাবার নামে বৈষ্ণবীর কিসের এমন কথা!

আর ওপর যেমনটাও তেমন ভাল নয়। যাবাকে ডাকবারো নাকি সেবা দেবে?

মধুর একদিন শঙ্কিতস্বরে এসে দেখে কলা মাঝিদের মুখুয়ে বৈষ্ণবী এসেই হেসে আছে চুপটি করে। মধুর ভাবে লাগে গেল এখানে।

বাঁশি ওগো বৈষ্ণবী, 'সাজগোছাকটা এ হয়নি তোমার, দেখলে বৈষ্ণবী বৈষ্ণবী মনে হয় বটে। কিন্তু যৌবনে যাগিনী সাজলে লোকে কেমন যেন সন্দেহ করে।'

'কি বললেন?'

উঠে দাঁড়ালো বৈষ্ণবী।

'যা বলছেন একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

মধুর বললে, 'বাঁশি তোমার মনোমত বৈষ্ণবীরা তো একাএকা ঘরে বেড়ায় না বাপু, বেড়ানো উচিতও নয়, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম তোমার বৈষ্ণবটি কোথায়?'

আঙুল বাড়িয়ে বৈষ্ণবী মাঝিদের ভৈরব দেখিয়ে দিলে। দেখিয়ে দিলে তরতাজিনীর পায়ের নীচে যে মহাদেব শুয়ে আছেন তাকে। বললে, 'ওই তো আমার বৈষ্ণব।'

মধুর বললে, 'ও বৈষ্ণব তো অচল নয়, ও অচল বৈষ্ণব।'

বৈষ্ণবীর চোখদুটো যেন জ্বলে উঠলো। বললে, 'ওই অচল বৈষ্ণবকে যদি সচল করতে না পারি তাহলে মিথ্যেই বৈষ্ণবী সেজেছি।'

মধুর আর ঘাঁটালে না বৈষ্ণবীকে।

ঘাঁটালে না কিন্তু নজর রাখলে।

গণাধরের সন্দেহে জ্বালায় তরু প্রায়ই মধুর ঘাটে গিয়ে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে। গণাধর মাটি মাখে গায়ে। ছিপে গামছা ঘাড়ে ফেলে সিমেন্টের ওপর গড়াগড়ি দেয়।

মধুর কবিরাজ ডেকে আনলে। ওষুধ খেলেও কিন্তু তাতেও সারলো না।

বৈষ্ণবী বললে, 'কিছু করতে হবে না। আমি সারিয়ে দিচ্ছি।'

এই যে বৈষ্ণব! তুমি ওর রোগের জ্বালা জুড়োবার ওষুধ জানো নাকি?

বৈষ্ণবী বললে, 'জানি। এমনি জ্বালা ধরেছিল শ্রীরাধিকার সর্বাঙ্গে। সে জ্বালা কৃষ্ণবিরহের জ্বালা। ডাক্তার কবিরাজে এ জ্বালা সারাতে পারে না।'

মধুর জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি জানলে কেমন করে গো। তুমি কি দেখেছ নাকি শ্রীরাধিকাকে?'

'বেশ তো, শ্রীরাধিকার কথা বিশ্বাস করতে হবে না। ইতিহাসে বিশ্বাস কর। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা একবার ভেবে নাও। তাঁরও ঠিক এমনি পারা" করেছিল। তাঁরও সেই কৃষ্ণবিরহ।'

মধুর জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন করে সেরেছিল।'

বৈষ্ণবী বললে, 'সেরেছিল আছে সহজে। চন্দন ঘষে নিয়ে এসো এক বাটি, আর নিয়ে এসো একটি তুলসী তুলসীর মালা।'

মধুরের হুকুমে চন্দনও এলো তুলসীর মালাও এলো।

বৈষ্ণবী নিজের হাতে গণাধরের সর্বাঙ্গে চন্দন মাখিয়ে দিয়ে তুলসীর মালাটি তুলিয়ে দিলে গলায়।

মুহূর্তেই যেন আগুনে জল পড়লো।

গণাধর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বৈষ্ণবীর দিকে।

সাধে কি তোমাকে আমি যোগেশ্বরী বলেছি!

বৈষ্ণবী বললে, 'তোমার ভেতরেও যে দেখেছি আমি সেই চৈতন্যদেবের লক্ষণ! ঈশ্বরের কথা বললেই ভাবে বিভোর হয়ে যাও। ধ্যানে বসলেই সমাধিস্থ হও। শরীরের বোধ নেই। চেতনার ঠিক নেই। এ কি সাধারণ ব্যাপার! তুমি নরদেহধারী নারায়ণ। তুমি অবতার।'

'এ কী কথা বলছো তুমি? ও-কথা বলতে নেই।'

বৈষ্ণবী বললে, 'আমি প্রমাণ করে দেবো।'

মধুর বললে, 'কথাটি মাত্র অবতার। সেই দশের ভেতর কতকী অবতারেরই মাত্র আসতে এখনও বাকি আছে। আর অবতার পাবে কোথায়?'

বৈষ্ণবী বললে, 'তিনি বলেছেন—সম্ভবামি যুগে যুগে। বলেছেন ধর্মের যখন গ্লানি হবে তখন আমি আসবো। লেকথাটা কি মিথ্যা বলতে চান?'

'সত্যি মিথ্যে জানি না বাপু। কিন্তু তোমার ওই যুগের কথাতেই তো মানুষ বিশ্বাস করবে না। মানুষকে বিশ্বাস করাতে হলে অনেক কাল ধরে পড়তে হবে।'

'তাই করুন তাহলে।'

•

মধুর তাই করেছিল।

'বিবাহ এক বর্ষসঙ্গ আজ্ঞান করলে চক্ষুলজ্জায়। যত দূর দূরান্তর থেকে পাণ্ডুতেরা এলেন, নায়ক এলেন, সন্ন্যাসী এলেন।

এলেন বিচার করতে। বিচার করতে এলেন একটি মানুষকে তাঁদের পাণ্ডিত্য দিয়ে। সে মানুষটি আমার এমনি—যার সবদের কালজের ঠিক নেই, নিজের নামটি পর্যন্ত যে সই করতে জানে না।

গণাধর বললে, 'আমাকে নিয়ে এমন টানা-হাঁচড়া করছিস কেন তোরা? আমাকে নিয়ে তোরা সিংহাসনে বসাতে চাস! আমি বসবো না সিংহাসনে। আমি মাটিতে গড়াগড়ি দেবো।'

গণাধর চললো নিয়ে মায়ের মাঝারে। তরতাজিনীকে বললে, 'তোর আছ থেকে আমাকে এরা কেড়ে নিতে চায় মা। তুই যেন আমাকে ছাড়িস না।'

কত বিচার হলো, কত বিবেচনা হলো কত তর্কের ঝড় উঠলো, কিন্তু যাকে নিয়ে এই এত কাণ্ড, যাকে নিয়ে এত তর্ক, সে তর্কাতীতকে কেউ ছুঁতেও পারলে না। সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক বালকের মত অচার গণাধরের কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সে ধোলাও করে চায় না উজীবও করে চায় না, তোমরা তাকে অবতারই বল আর যাই বল, সে নিজে জানে—সে তার মায়ের সন্তান।

এমন অকৃত্রিম বিশ্বাস, এমন অমলকুসুম-সুন্দর অন্তরের কেউ কখনও দেখেনি কোনও মানুষের মধ্যে।

শাস্ত্রের প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলে তারা। সব লক্ষণ মিলে গেল।

কিন্তু মিলুক আর নাই মিলুক, সেদিকে লক্ষ্য নেই গণাধরের। সে জানে তার নিজের দিক থেকে সব-কিছু মিলে গেছে। মিলে গেছে আর যাকে।

গণাধর তাকাচ্ছে তরতাজিনীকে। অন্তরের সে কী ব্যাকুলতা! কত মধুর কথা সে তাঁর সঙ্গে হৃদয়কে নিয়ে শুরু করে—প্রতিদানে তোলে না কিছুই।

সেই মাতৃমন্দিরের পাশে নায়ক গণাধরকে অস্বীকার করবে কে?

গদাধরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে সবাইকে।

তোমাদিগেরও পরাস্ত হলো সেই সাধনার কাছে। এই অন্তরের রস উৎসবের অবতরণ! সেই নিষ্কল পবিত্র অকলঙ্ক মানুষটিকে অন্তরীক্ষচিত্তে প্রণাম জানালে—তাঁরই উদ্দেশ্যে—তব পদ্মা নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ! মস্তিষ্কামৃত হলো প্রভুর অবতার!

বালকের মত নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো গদাধর।

'কই আমি তো কিছুই জানি না।'

ভৈরবী আমলে আত্মহারা! বললে, 'আমি জানি।'

'আর জানি বলেই এসেছি এখানে।'

গদাধর কিন্তু নির্বিকার!

অবতারই মানুক আর যে যাই বলুক, সাধন চায় নিজের অন্তর।

'ওই গো যোগেশ্বরী, এলো আমার রাধে। দেখি তোমার ঘুচলো কি না রে।'

ভৈরবী বললে, 'আছে কতিনতর পড়া। আপনার যোগচর্চা। আত্মিক জ্ঞান।'

সেই সাধনা শুরু হলো গদাধরের।

সন্তান নিয়তম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরে অবরোহণ! চিত্ত থেকে চৈতন্যে উত্তরণ!

ভৈরবী বললে, এ জগতে কিছুই তুচ্ছ নয়, কাউকে ঘৃণা অবজ্ঞা করতে পারো না, পরিত্যাগ করতে পারো না। এই দেহ যখন ধারণ করেছ তুমি, তখন যেচ্ছায় নিয়েছ তুমি সপ্তপ্রকার বিকারের ভার। সেই বিকার আর ব্যাধির ঘুঙুর—সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয় সমেত তোমার এই দেহটিকে নিয়ে যেতে হবে অতীন্দ্রিয় লোকে। রূপান্তর ঘটবে চিন্ময়ী সত্তায়!'

তবে তাই হোক্!

শুরু হলো অন্তরে সাধন। দর্শনের পর দর্শন। অনুভূতির পর অনুভূতি।

একদিন রাত্রে একটি স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে এলো ভৈরবী। পরিপূর্ণ যৌবনা এক সুন্দরী নারী।

'একে' মাতৃজ্ঞানে পূজো কর তুমি গদাধর।

সব নারীই তো তার মা। পূজো করতে দোষ কি?

পূজো করতে গিয়ে গদাধর চমকে উঠলো। বিবস্ত্র নারী। বস্ত্র বলে তার গায়ে কোনও বস্তু নেই তার সারা দেহে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ সে মেয়ে।

ভৈরবী বললে, এবার ওর কোলে বোসো।'

শিউরে উঠলো গদাধর।

এ আবার কি রকম আদেশ?

এই মাত্র শুরু সাধনা। নির্বিকার হয়ে থাকতে হবে তোমাকে। একটুকু পদস্খলন হবে না। কোনও চঞ্চলতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। তবে তো ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারবে তুমি। তবে হবে জিতেন্দ্রিয়।

গদাধর তার মাকে স্মরণ করলে। মাগো জগদম্বিকা! এ কী ভীষণ পরীক্ষায় ফেলালি তুই আমাকে? তোর জয় করা কি সহজ কথা?

মা যেন তাকে বলে দিলে—ভয় কি তোর! ও-ও তো আমি। তুই আমার কোলে বসবি। তোর মা মা উলঙ্গিনী!

জয় মা জগদম্বিকা।

নিঃশঙ্কাচিত্তে গদাধর উঠে বসলো সেই দিগম্বরী নারীর কোলের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে সমাধি!

ভৈরবী দেখলে—দেহজ্ঞানশূন্য মহা-উপলব্ধিকে।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় মা জগদম্বিকা।

Telegram : 'UNIROP-WORK' Telephone.: 66-3552

UNIVERSAL ROPE WORKS

70. C. T. ROAD, BELUR, HOWRAH

Manufacturers of

MANILA, COTTON, SISAL, JUTE COIR ROPES

of Best Quality

EXPORTER & IMPORTER

সংস্কৃতে নারী শব্দ

* সুকুমার সেন

কিছুকাল আগে এক ভালো বাঙালী লেখকের এক মন্তব্য আমাকে চকিত ও বিস্মিত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে একই বস্তুবাচক শব্দের অনেক প্রতিশব্দ থাকায় সংস্কৃত ভাষার নাকি খুব প্রকাশ ক্ষমতা (preciseness) হারিয়েছে এবং এর জন্যেও বাংলা ভাষার কাছে সংস্কৃত ভাষার কাছে অনেক ভালো। এ মন্তব্যের বিচার আমি করব না। শুধু নারী-বাচক শব্দগুলি নিয়ে আলোচনা করব। তার থেকে হয়ত বোঝা যাবে সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য শব্দের বাহুল্য কি ধরনের এবং তা কতটা ছিল।

প্রথমে সাধারণ নারী-বাচক শব্দগুলি নিয়ে আলোচনা করি। স্ত্রী, জনী, জানি, নারী, কুমারী, মহিলা, মানবী, যোষা (যোষিৎ), ইত্যাদি। 'স্ত্রী', 'জনী' ও 'জানি'—এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন শব্দ, বৈদিকে এবং তার পরেও সাধারণের চলিত ছিল না।

'স্ত্রী' ঋগ্বেদের পরে লুপ্ত হয়েছে। এটি ছিল ঈষৎ সম্ভ্রমসূচক। ইংরেজীতে যে শাখা বিদ্যার নাম gynaecology-র মধ্যে অংশটি এসেছে 'স্ত্রী'র সগোত্র গ্রীক্ শব্দ gune থেকে। 'স্ত্রী'র সঙ্গে সম্পর্কিত 'জনী' ও 'জানি' মূল ভাষার (প্রায় ৪০০০ বছর আগে) সাধারণ নারীবাচক (কখনও কখনও সম্ভ্রমসূচকও) শব্দ ছিল।

সংস্কৃতে 'জনী' শব্দটিতে জন ধাতু যুক্ত হয়ে উৎপন্ন 'জননী' শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয় আর তার ফলে শব্দটি নিজে লুপ্ত হয়। 'জানি' শব্দের সগোত্র ইংরেজীতে কুইন (queen) সংস্কৃতে শব্দটির ব্যবহার অতি অল্পই, এবং যা আছে তা 'মহারানি'র মতো ও একটি অনুপ্রদেশ শোধনের রূপে। সংস্কৃতে মানে হচ্ছে 'পত্নী' (সম্ভ্রমসূচক)।

'জনী'র সঙ্গে আর একটি শব্দ উল্লেখযোগ্য,—'জন্যা'। কালিদাস এই ব্যবহার করেছেন "দারিদ্র্যাহিতা, সতী" এমন এক অর্থে। 'জন্যা'র মূল অর্থ ছিল জনীমাত্র মতো, 'নারী', তবে শব্দটির প্রয়োগ সম্ভ্রমসূচক ছিল না। জনী : জন্যা—এই রূপবন্ধনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি অগ্নেয়ের অগ্নী (সংস্কৃতে অগ্নীনিকা ও 'কাপীন' শব্দে লক্ষ্য) : অগ্না।

'নারী'ও প্রাচীন শব্দ, তবে মূল ভাষায় শব্দটির প্রয়োগ ছিল কিনা বলা যায় না। শব্দটির প্রাচীনত্ব ৩০০০ বছরের কম হবে না কেননা এটি আবেস্তায়ও আছে। নারী শব্দ 'নৃ' ('নর') শব্দের সূত্রে সম্পর্কিত। এর পুংলিঙ্গ রূপ 'নর' নয়, সম্ভাব্য 'নার' ('নারায়ণ' এই শব্দের আদিম অনুমান করি)। 'নারী' শব্দের মূল অর্থ ছিল অনুভবকর্ত্রী, শক্তিশালী স্ত্রীলোক, বীরনারী। সংস্কৃতে সৌভাগ্যে আগেই শব্দটি সাধারণ নারী-বাচক, অর্থাৎ নর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত হয়।

'পুরুষী', পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গ। ঋগ্বেদের বাইরে শব্দটি ব্যবহৃত নয়। ইংরেজী female-এর যেন প্রতিশব্দ। 'মানবী' 'মানব'-এর স্ত্রীলিঙ্গ, ইংরেজী human female-এর ঠিক প্রতিশব্দ।

'মহিলা' সংস্কৃতে প্রচলিত শব্দ, খ্রীষ্টের সমকালীন, বিশেষ করে পঞ্চম-ষষ্ঠ সমকালী থেকে ব্যবহৃত। অর্থ সম্ভ্রমসূচক। অনুমান করি শব্দটির সম্ভাব্য পুংলিঙ্গ প্রতিরূপ ছিল মহিল, অর্থ পূজনীয় ব্যক্তি, মহালোক। তুলনীয় পরবর্তীকালের 'মহত্তক'।

'যোষা' (যোষন্), 'যোষিৎ' ঋগ্বেদ থেকে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ দুটি 'যু' ধাতু থেকে উৎপন্ন (অর্থযোগ করা বা যুক্ত হওয়া)। আসলে 'যোষা, যোষিৎ' মানে ছিল প্রজননে সমর্থ নারী। পুংলিঙ্গ প্রতিরূপ ছিল 'যুবন্' (যুবা)। সংস্কৃতে যুবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'যুবতী' আসলে ছিল 'যু' ধাতুর পর প্রত্যয়ান্ত শব্দ।

'স্ত্রী' শব্দটি প্রাচীন, যদিও মূলভাষার আর কোনো সাখায় ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা নেই। পাণিনি থেকে আমরা জানি সব সংস্কৃত বৈয়াকরণ শব্দটিকে নির্বিশেষে ইংরেজী female এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যেও শব্দটি সেইভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে কিন্তু প্রধানতঃ নারী (মানুষ ও ইতর প্রাণী) অর্থেই ব্যবহৃত। শব্দটির বুৎপত্তি করা হয় 'স্ত্যৈ'-ধাতু থেকে। অর্থ সন্তান প্রসব করা) থেকে। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানের অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো সূত্রেই সম্ভাব্য 'স্ত্যৈ' থেকে 'স্ত্রী' নিষ্পন্ন হতে পারে না। স্তৃ' ('তোষা', ইংরেজী (star) শব্দ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ 'স্ত্রী' অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেখানে বাধা ঠেকে অর্থে। (অকাল কোপার্নিক আদি অথবা সিনেমাতারকা ছাড়া কেউই নারীমাত্রকে female star বলবে না।) অনুমান করি স্ত্রী শব্দের বুৎপত্তি মূল ভাষার যে ধাতু অথবা প্রাতিপাদিক থেকে উৎপন্ন তা প্রায় 'স্তৃ'র (তারা)-ই সমধ্বনি শব্দ। তবে মানে একেবারে আলাদা। মূল ধাতু বা প্রাতিপাদিকটির দুটি রূপ ছিল—ster— (তারা), ster- (সন্তানাদিত্ব)। তারা রূপ হল ইংরেজী sterile (লাটিন sterilis থেকে) সংস্কৃত (বংশ ক্ষয়, বংশ ক্ষয়) তারা (আর ক্ষয়, (আর ক্ষয়) ৫—ক্ষয়, —ক্ষয়); আর সন্তানাদিত্ব রূপ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ 'স্ত্রী', শব্দটির মূল অর্থ ছিল প্রজননের দ্বারা বংশরক্ষণের অনুপযুক্ত। সংস্কৃত 'বংশক্ষয়, বংশক্ষয়' মানে বড়

বাহুর বা প্রজননের বা গর্ভধারণের বয়স পায় নি। 'অরভ' 'অরভী' এই মূল অর্থ থেকে বিশেষ অর্থ (mule) লাভ করেছে। (তুলনীয়, "অরভী গর্ভধরে আপনা নাশিতে"।)

এখন বিশেষ অবস্থার ও সম্পর্কের নারী-বাচক শব্দের আলোচনা করব। এ শব্দগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—বয়সবাচক, যৌন সম্পর্কবাচক ও সমাজ সম্পর্কবাচক।

বয়সবাচক হল—অজ্, জনা কিশোরী, কুমারী। 'অজ্' ধাতুরূপের পরে আর ব্যবহৃত হয়নি। আবেস্তায় পাওয়া যায়, অজএর শব্দটি পুরাণো। মানে ছিল যে গর্ভধারণ করেনি অর্থাৎ অবিবাহিত। শুরু শব্দের সঙ্গে এর অর্থগত কোনো যোগ নেই, আছে গুবিণী'র সঙ্গে। 'গুবিণী' মানে গর্ভবতী নারী। এখানে 'গুরু' মানে গর্ভ, অর্থাৎ গর্ভভার। আবেস্তায় বুঝেরা আইবুরু মেরে" অর্থে অজ্ শব্দটি পাওয়া গেছে। গ্রীসিক 'অজ্' (= অবিবাহিত নারী) থেকে ওরবেদে পুংলিঙ্গ 'অজ্' (= অবিবাহিত পুরুষ) শব্দটি সৃষ্টি হয়েছিল।

'জনা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মানে ছিল 'ছোট মেয়ে' (জনিষ্, জনীয়স্, কনীয়স্ —শব্দগুলি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন) তার পরে মানে হল "অবিবাহিত মেয়ে", তার পরে আরও মানে হল "বিবাহযোগ্যা" "বয়ঃপ্রাপ্তা" ইত্যাদি। "জনৈবৌ"—এখানে জায়া শব্দের প্রাচীনতম অর্থটুকু রয়ে গেছে। ঋগ্‌বেদে অবিবাহিত মেয়ে অর্থে 'জনী' শব্দের ব্যবহার আছে। 'জানীন' (= কন্যাপুত্র) শব্দটি এর থেকেই উৎপন্ন। "জনী : জায়া"র সঙ্গে "জনী : কন্যা" তুলনা আছে ঋগ্বেদে।

'কিশোরী'—মানে ছিল ঘোড়ার মাদী বাচ্চা। মূল পুংলিঙ্গ 'কিশোর' মানে ছিল ঘোড়ার নর বাচ্চা। অর্বাচীন সাহিত্যে 'কিশোর কিশোরী' অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর মারফৎ এই অর্থই প্রচলিত হয়েছে।

'কুমারী' অল্পবয়সী অবিবাহিত মেয়ে। তার থেকে মানে হয়েছে— অবিবাহিত নারী (বয়স যাই হোক না কেন)।

দাম্পত্যসম্পর্ক বাচক নারী শব্দ হল— জায়া, পত্নী, ভার্যা, দয়িতা, অবরোধ, কলত্র, পরিবার (বাংলায়) ও বিধবা।

'জায়া'র মৌলিক অর্থ "যে সন্তান প্রসবক্ষমা" (ইংরেজীতে prolific wife)। 'পত্নী' শব্দ বিবাহিত নারীর গুণে ও সমাজে উচ্চস্থান নির্দেশ করে। ধর্ম-অনুষ্ঠানে স্বামীর সঙ্গে পত্নীর সমান অধিকার। সন্তান মধ্যপ্রদেশের একাধিক পত্নী থাকলে তারা পরস্পর 'সপত্নী' (বাংলায় সতীন, সতা)। 'ভার্যা' মানে হল পত্নী অথবা পত্নী স্থানীয় যাকে স্বামী ভরণ পোষণ (অর্থাৎ to maintain) করতে পোষণ বর্ষণ করা। 'দায়' ও 'অবরোধ' (দুইটি পুংলিঙ্গ শব্দ) আসল মানে ছিল "অন্তঃপুরের মহল"। অন্তঃপুরের মহিলা (যারা কর্তার ভোগ্য ছিল [illegible] বা

With Best Compliments Of

Orient Supply Syndicate

MANUFACTURES OF

PULLEY BLOCKS, SHACKLES, CRAB
WINCHES, THIMBLES, CHAIN SLINGS Etc.

2 RAJA WOODMUNT STREET CALCUTTA 1

PHONE 22-1391
22 4170

Works—UTTARPARA 61
Gram—SHACKLES

...ছাড়া ছেলে আদের বর্তমানে সম্মান ...(— ছেলে থাকলে)। পুরুষের ...ব " স্ত্রীলিঙ্গ" থেকে উৎপন্ন ...' বোঝায়।২ বাংলায় এখন আর শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয় ও গেছেই হয়।

'বিধবা' মানে পতিহীনা। শব্দটি খুব নো, ইংরেজী widow শব্দের সঙ্গে আছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শূন্যের জাতা নারী।" 'বিধু' ত বাক্যকালে—রাবিবর্জিত চন্দ্র) ব লক্ষোত্ত। সঙ্গে সহিংসা" এই

ব্যুৎপত্তি কল্পনা করে অপাচীন ত পরিবর্তক শব্দ" শব্দের সৃষ্টি ক।

বিবাহ বন্ধনের বাইরে যৌন সম্বন্ধ ...র নারীদের জন—অসতী, ভাগিনী, চলী (পুংশ্চলী), গণিকা, বারনারী' রক্ষিতা, বারবধূ, বারবিলাসিনী, ী ইত্যাদি ও বেশ্যা (বোশকং ধূ, বেশবনিতা), বেশস্ত্রী ইত্যাদি ।

'অসতী' বৈদিক সাহিত্যে কিংবা ...দিক প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ...ছোন নারী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ...প্রাচীন সংস্কৃতে প্রচলিত এই ...ই পাওয়া যায়। মানে হল পুরুষ ...র্থাৎ, বিশ্বাচারিণী, অবিশ্বাসিনী) ...। 'ভাগিনী' ঋগ্বেদের পরে ...ছত্তীয় নি। মানে হল, যে নারীর ...ন" (অর্থাৎ ঔপপতি) আছে, অর্থাৎ ...ন প্রণয়াসক্ত নারী। 'পুংশ্চলী' ও ...চলু' (এই শব্দটি পুংলিঙ্গেও ব্যবহৃত) ...বেদের পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ...য়ায়, 'পুংশ্চলী' সংস্কৃত সাহিত্যের ...বিচিত্র নয়। মানে ধরা হয়েছে, ...ছন্দ-প্রণয়ী বিষয়ে যে স্ত্রীরা চলচিত্ত ...ং প্রণয়ে একনিষ্ঠ নয়।" এ অর্থ ...ব্যুৎপত্তিগত হলেই মনে হয়।

সম্ভবত মৌলিক অর্থ 'ছিল স্বৈরিণী নারী" ইংরেজীতে predatory female")।

'গণিকা' অবৈদিক শব্দ, প্রাচীন। প্রথমে অর্থ ছিল "সমাজ বেশ্যা", পরে কিছু অর্থাবনতি হয়ে হয়েছে "বেশ্যা"। সাহিত্যে ও পুরাণে সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন বৃদ্ধত্বটিকে। প্রাচীন অর্থেই (অর্থাৎ রাজসভার ও ধনী ব্যক্তিদের ভোগ্য নারী) শব্দটি ব্যবহৃত। আসলে মানে ছিল শুধু নারীর প্রণয় অনেক মূল্যে পাওয়া যায়।", শব্দটি শব্দ' (ধনসমূহ) থেকে আসেনি, ঐসেছে 'গণক' শব্দ থেকে। পাণিনির সূত্র (৫, ১, ২১) অনুসারে সিদ্ধ 'গণক' (পুংলিঙ্গ) শব্দের এক অর্থ ছিল "যে মূল্য কীট"। সেই অর্থের গণকের স্ত্রীলিঙ্গ 'গণিকা'।

'বারবনিতা' ইত্যাদি শব্দে" অংশের মানে হল—শ্রেষ্ঠ' কামনা, অংশোদ", পরে মানে হল—যাকে স্বামীপুত্র চায়। অর্থ অবনতির যেখানে নারীদের প্রতি প্রার্থনের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ একসময় ইংরেজীতে 'হর' শব্দের প্রায়শঃ হল brothel, অর্থাৎ বেশ্যালয়।

'বেশ্যা' ইত্যাদি শব্দগুলি এসেছে 'বেশ' থেকে 'বেশ' শব্দটির অর্থ পরিবর্তন অনুধাবন করলে প্রাচীনকালের সমাজের একটু টকরো ছবি দেখতে পাই। 'বিশ' ধাতুর অর্থ ছিল "বিশ্রাম করা, ঘর বাঁধানো, উপভোগ করা"। (ইংরেজীর enjoy করা অর্থেই ধাতুটি ব্যবহার হয়েছে।) এর থেকে বৈদিক 'বিশ' এবং অবৈদিক 'বেশ' (মানে বাসগৃহ, যেখানে লোকে স্থায়ীভাবে বাস করে, গ্রাম, পুর) এসেছে।

বেশ্যাদের বাসক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ধরণের ঘর বাড়ি কাটাবার অথবা অন্যকোন ভোগ আসতে seat house বড় সম্ভবে থাকত। সেগুলিকে বলত 'বেশ'। বিশেষীকৃতদের পরিচর্যা ও চিত্ত বিনোদনের জন্য সেখে নারী নিযুক্ত থাকত। (বেশের চাকর-বাকরী ছিল।) বেশের অধিবাসিনীকে 'বেশিকা' বা 'বেশ্যা' বা 'বেশবধূ' ইত্যাদি।

যৌন সম্বন্ধযুক্ত প্রাচীন দুটি নারীশব্দ ব্যাপার কালোচিত পরিবর্তন নিয়ে চলে এসেছে। একটি হল 'ঘোড়া' (পুংলিঙ্গ) পুরোপুরি। অন্যটি হল 'ঘরা' শব্দ " আংশিক, কেননা শব্দটি এখন পাই 'পিসেস', 'পিসী', 'মেসো', 'মেসো' এই শব্দগুলির সঙ্গে যুক্ত 'ভাগিনী' (পুরুষের বৈদিকে নেই। সংস্কৃতে এ শব্দ 'ঘসা (ঘস)' শব্দের প্রায় প্রতিরূপ হয়ে গিয়েছে। 'ভগিনী' শব্দটির মেয়ে মেয়ে সামাজিক ব্যবহারের একটা ছাপ ঘটে গেছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল —ভোগ্যবতী"। অর্থাৎ সামাজিক সম্বন্ধে ও খুব ব্যবহার ঘরের মেয়ের চেয়ে ঘরের ছেলের চেয়ে বেশী ছিল। কেননা ভোগের সঙ্গে সম্পর্কের উপযোগিতাটা হত। সুতরাং মনে হয় 'ভগিনী' শব্দের "ভগ" অর্থে প্রচলন প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক ভাষা সম্প্রদায়েই শুরু হয়েছিল। তারপর ধরন ছড়িয়ে পড়ে।

আরও কয়েকটি যৌন সম্বন্ধ বোধক নারীশব্দ সংস্কৃতে—বৈদিকে এবং অবৈদিকে ভিন্ন। যেমন, 'অঘা' (সম্বোধনে 'অঘে'), 'ভর্তৃ' বৈদিক 'ভ্রাতৃ' (অবৈদিকে 'ভগ্না' (বৈদিকে) এগুলি আসলে ছিল ভিন্ন-ভোলানো অনেক-কাছের শব্দ বাংলার মৌহয়া মানের এ শব্দগুলি লোপ পেয়েছিল।

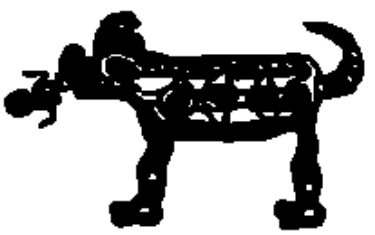

শারদীয় অভিনন্দন

কেয়ো-কার্পিন বিভাগ

Dey's দে'জ মেডিক্যাল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত

কথা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

এক এক সময় এমন হয়।

তখনকার চঞ্চল মনে পড়েন জলধরবাবু। ঈশ্বরে একটা অপরাধাত্মক আস্থাবতা নিয়ে তিনি পায়চারি করতে আরম্ভ করেন। যেমন এখন। অথচ এখন বিশ্রামের সময় ঘুমের সময়। বিশ্ব চরাচর নিস্তব্ধ। শুধু রাত্রির নৈঃশব্দ নিয়ে অনন্ত আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলজ্বল করছে।

জলধরের চোখে ঘুম নেই।

এখন তাঁর ক্লান্ত হবার কথা। নিষ্ফল অবসন্ন কেহ সন্ধ্যাগতী হবার কথা।

সারাদিন তো অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। চাউল তৈল দাল নিয়ে সংগ্রাম, অফিসে যাবার সময় ট্রাম বাস ধরতে সংগ্রাম, ওপরওয়ালার মন যোগাতে সহকর্মীদের মান বাঁচাতে অফিসের কাজ নিয়ে সংগ্রাম, তারপর ঘরে ফিরে স্ত্রী পুত্র কন্যার দুই বিছানের জন্য আর এক-দফা সংগ্রাম।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে একটা মানুষকে সূর্যোদয় থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অন্তত সংগ্রাম করতে হয়।

আশ্চর্য, তারপরও সংগ্রাম! তাই তো। তা না হলে জলধরবাবুর চোখে ঘুম আসে না কেন। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এখনো তিনি ছটফট করছেন কেন।

ঘরের ভিতর গুমট। কিছুক্ষণ সেখানে পায়চারি করে তিনি বাইরে আসেন। লোডশেডিং আজকাল, তাই হাতে পাখার সুবিধা আছে।

...মধ্যে ...ছাড়া ...

...

...

পৌঁছে গেল। জলধর বাবু ড্রাইভারের পাশের বসলেন।

ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল। না, তখন না। বাঘের গায়ের ডোরা ডোরা একটা আবার তিনি টের পেলেন মাঝরাতের ঘোরে এসে। ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ট্যাক্সি এক মিনিটের বেশী সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

জলধর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনলেন বাইরে থেকে শব্দটা আসছে। জল পড়ছে। মাস্তার পাশের কোন ডালপালা থেকে শব্দটা উঠে আসছে হয়তো। চামচা টামচা কিছু পড়ে থাকতে পারে। জল ছিটে উঠে ও রকম শব্দ হচ্ছে।

অর্থাৎ তখন পর্যন্ত জলধর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ওটা সত্যি বাঘের গায়ের শব্দ। দিনদুপুরে কলকাতার রাস্তায় বাঘ আসবে কোথা থেকে। তবে যদি চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এক আধটা বাঘ পালিয়ে আসে। কিন্তু তা হলে কি আর সহর এমন নীরব থাকত। হৈ-হৈ পড়ে যেত এতক্ষণে।

মিসেস চ্যাটার্জি পাশ্চিপুকুরে নেমে গেলেন।

পরদিন ঘুম থেকে বাড়ি ফিরে শিবানী বাবার হাতে চিঠি খানা দিল। মিসেস চ্যাটার্জি মেয়ের হাত দিয়ে জলধরবাবুকে কালকের উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। সেই সঙ্গে চা খাবার নিমন্ত্রণ। পরের রবিবার বিকেলে জলধরবাবু যেন অবশ্য যান। মিসেস চ্যাটার্জির সানির্বন্ধ অনুরোধ। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে জলযোগ সেরে জলধর অবসরের পাঁতাখানা সবে খুলে বসেছিলেন। এমন সময় মিসেস চ্যাটার্জির চিঠি হাতে এল। দুবার পড়লেন চিঠি—তিনবার পড়লেন। শিবানী তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। জলধর তিনবার পড়ে শেষ করে চতুর্থবার নূতন করে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। শেষ করতে পারেন নি। হঠাৎ চমকে উঠলেন। আতঙ্কে উঠলেন বলা চলে। যেন তাঁর কানের কাছে একটা বাঘ হুংকার ছাড়ল। আতঙ্কের ভাবটা কাটাতে প্রায় ৫ মিনিট সময় লেগেছিল। তখন জলধর চিন্তা করলেন, মিসেস মাস্তার কোন পার্টির কথা বলেছেন। আজকাল কতরকম নূতন ধরনের পার্টি সহরের মাস্তায় আত্মপ্রকাশ করছে। বাঘের গর্জন শোনালের চিন্তায় হাতেমার চাসির মতন এক একটার কথা মনে পড়ছে। কথাটা চিন্তা করার পর জলধরবাবুর ভয়টা কেটে গেল। পাঁচা আর পড়া হল না। শিবানীর ইংরেজী পড়াটা বুঝিয়ে দিলেন।

পরের রবিবার যথাসময়ে মিসেস চ্যাটার্জির চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি পাশ্চিপুকুর গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর সর্দির খারাপ করল। রাতে ভাত কটি কিছুই খেলেন না। শুয়ে পড়লেন। তাঁর সর্দিতে কি যন্ত্রণা হচ্ছে কেউ জানল না বুঝল না। অনেকেই এর বর্ণোছিল। জলধরবাবু বুঝে থাকলেন। কেননা ঘুম ভুটে কি তিনি বলতে পারছেন তাঁর বুকের ভিতর হিংস্র জানোয়ারটা আস্ফালন করছে। শিউরে আরও বাঘ যেমন করে। তার দুই চোখে প্রচণ্ড রাগ আক্রোশ অভিমান অবজ্ঞা। জলধর-বাবুর সর্দিটা বুকে কফের মতন জেঁকে বেঁধে উঠেছিল। সেদিন তিনি প্রথম টের পেলেন বাইরে বাঘ কোথাও নেই। তাঁর ভিতরে রক্তলোলুপ শ্বাপদটা পায়চারি করছে। গর্জন করছে। সেই রাতে তাঁর ঘুম হল না।

আজ রাতেও সেই অবস্থা।

গৃহিণীর পাশে শুয়ে জলধরবাবু ছটফট করছিলেন। তারপর কী মনে হতে তাঁর মনে পড়ল কাল ছুটির দিন—রবিবার। আফিস মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ভিতরটা শান্ত হয়ে গেল। তাঁর মনে হল, আর যেন বাঘের চোখে জ্বালা নেই, আগুন নেই। জলধর ঘুম নেমেছে সেখানে। স্নিগ্ধতা ঠাণ্ডা দেহ বাঘের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। জলধরও চুপ করে শরতাত ঘুমের মিঠে তালিয়ে গেলেন।

পরদিন সারা সকাল জলধরবাবু মহা উৎসাহের সঙ্গে শিবানীকে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত পড়ালেন, মেয়ে মেয়ে বীজগণিতের অনেকগুলি অঙ্ক করালেন। বেলা বাড়তে, ভাল করে মুখের দাড়ি গোঁফ সাফ করলেন। সাবান দিয়ে প্রচুর সময় লাগিয়ে স্নান করলেন। মীরেনদের দুপুরের আহারাদি শেষ করে শয়ন করলেন। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। আড়াইটে তিনটে পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলেন। ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে শিবানীকে বলে একটু চা করে খাওয়ালেন। আজকাল শিবানীকে বলে " রাত্রে ঘুম থেকে জেগে ঘুম পাঁড়াবার বাঘ করছিল। মুখে সে মাখনের হাতে বলায় একটু পাউডার ছড়ালেন। চোখে সুর্মা দেওয়া হয়ে গেলে আয়নায় তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

পাশ্চিপুকুর আসতে মিনিট কয়েক বাস থেকে নেমে জলধরবাবু হাঁটতে আরম্ভ করলেন। একটু রাত্রি হাঁটতে হয়। খোলা বিছানো দাঁড়ানো নির্জন পথঘাট। গাছের পাতা সবুজ হয়ে গেছে। চমৎকার মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। জলধরবাবুর মনে হল বাঘটা আসবে সে আসছে। বাঘের ডোরা মুখে এখন আর কোন রোষ-আক্রোশ নেই, হিংসা নেই। বরং প্রসন্নতা ছড়িয়ে আছে। মীরেনদের ওপর একটা পুলকের প্রলেপ লেগে আছে। কিন্তু মুশকিল কিনে আসবার বেলা একটা চমৎকার সর্দি বাধিয়ে বসা। জলধর মুচকি হাসলেন। অবশ্য এই বাঘ তাঁর মনে যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল তার জন্য তিনি মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন।

সেই সুন্দর রাতের কথা মনে পড়ে। সবকালে। প্রতুল পথ ঘুরে আসছে জলে। তখন উত্তরে জলে পড়ে মাটিতে ঝরিয়ে পড়ে ও গাছের পাতার ছায়া, আকাশে তুলোর মেঘের খণ্ড দেখে। সব মিলিয়ে একটা ছবি। আর নীরব শীতল পরিবেশের মধ্যে লাল কেউ নেই। সবাই ঘুমিয়ে। জলধর আনমনা হয়ে পড়েন। বাঁধানো মাতৃর ছায়ে। তিনি একা একা বসে আছেন। বাঘ তাঁকে নিয়ে যায় নি। বাঘ তাঁকে নিয়ে যাবে এখানে। বেড়াতে বেড়াতে পুকুরে এসেছেন। বাঘ সঙ্গে। কাজেই বড় থাকবে, বাড়ির লোকেরা ভাববে চলে গেছে। তাঁর জন্য কিছু ভিন্ন না। অভিমান তাঁর কারও ওপর নেই। কিন্তু যেতে হবে।

জলধরবাবুর চিন্তা যেতে হল না। উৎসাহের সঙ্গে প্রতুল ঘাটের আরও কয়েকজন। খুব সাবধানে তিনি উঠে দিকে অগ্রসর হলেন। তার পর হাঁটার সবুজ ঘাসে ঢাকা ঘাটের সঙ্গের কাছে পৌঁছে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। বড় নীরব নির্জন তা তো বুঝবে। একটা [illegible]

ছুটে গেলেন ভদ্রলোক। ডাক্তার আর সম্ভাবনাও নাই। যাদী লিপ্সা প্রবাসী। বাড়িতে মানুষ রোগায় ও জলধর ওজন শোনা যাবে। একটু ইতস্তত করলেন জলধর। তারপর কড়া নাড়লেন।

একটু ক্ষীণ দেহের কড়ার শব্দ হলো।

তারপর চুপ করে এক সময় দরজার খোলা দরজাটা খুলে গেল। পাল্লা দুটো ছিটকে পড়তে জলধরবাবু আহত হলেন। তার পরিচয় প্রসূন নীরব হাসি ছড়িয়ে দিয়ে ভিতরে সরে সরে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

কিন্তু মনে হল নিমেষ চাটার্জি ব্লেন একটু ভয় পেয়ে চৌকাঠ ছেড়ে দিয়ে ঘরে সরে দাঁড়ালেন।

"কাকে চাই আপনার—কাকে খুঁজছেন। মহিলার গলার স্বরের প্রশ্ন চোখের ধাক্কা অন্ধকারকে বিস্মিত মিশ্র করে দিল। তাঁর চোখ স্থির হয়ে গেল।

"আপনি কি এই ঠিকানা খুঁজছিলেন ছিলেন কি?"

প্রশ্নটা কঠিন হয়ে জলধরের কানে বাজল।

জলধর হাঁ—না কিছু বলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে মেঝেটা দেখতে লাগলেন।

পুরো একটা মিনিট এভাবে কাটল।

—নিশ্চয়ই সন্দে পড়ে—সেই মেয়েটিও ভিতরের লিকের একটা পর্দা সরিয়ে ঘরে পাশে এসে দাঁড়াল। জ্বাল-জ্বাল করে চেয়ে থেকে জলধরকে দেখল, তারপর সরে কাণে কাণে যেন কি বলল।

কিন্তু তখাপি নিমেস চাটার্জির মুখে পরিচয়ের হাসি ফুটল না। অপরিচয়ের অবজ্ঞা ঔদাসিন্য এবং একটু যেন কৌতূহল নিয়ে জলধরকে দেখছিলেন ও তাঁর মাথে মনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জলধর আর মাথা তুললেন না। ঐ অবস্থায় ঘাড় নামিয়ে রেখে মাটি দেখতে দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলেন।

তখন আবার হাতটাকে তাঁর মনে পড়ল।

এই বাঘের গুহা আক্রান্ত জর্জন গর্জন সার—আর কিছু করতে পারে না। দাঁত পড়ে গেছে নখ ভোঁতা হয়ে গেছে। বুড়িয়ে গেলে মানুষের যা হয় হিংস্র পশুরও তা হয়। কেবল ঘরের দোর ও তৃষ্ণা নিয়ে ছটাছুটি করে মরে। আর মুখ বাঘকে কে-ই-বা গ্রাহ্য করে।

দীর্ঘ শ্বাস ফেলে জলধর হাঁটেন।

এখন সুদীর্ঘ পথটায় দিকে তাকাতেও তাঁর আর উৎসাহ হইল না।

পূর্ব রেলওয়ে

প্রাচুর্যের কারুর থেকে
আশিসের আভাস এল,
দৈ-চৈ বর্ষার মধুর
পেরিয়েই তো
সবুজের ভালো-বাসার দীপ।
দূরত্ব থেকে দূরত্বে
নিরাশা থেকে আশায়
এবং দার্জিলিং থেকে সকলতায়
উত্তরণের খবর
সকলের জীবনে
সার্থক হোক।

বিচিত্র সংলাপ

প্রমথনাথ বিশী

দ্রৌপদী। ঐ শোনো কৌরবগণ, আর্যা-ভ্রাতৃবাহুর আস্ফালনে ভূমে শিখাস্থানি, আর ঐ শোনো কৌরব পুরীতে গর্জন, বাহন এবং সেচকধ্বনি অকালে, অন্তত, নিষ্প্রয়োজন। সভায় মুক্ত মৃত্যুদেবের আহ্বান, তীব্র ক্রোধ বিদ্বেষ ভ্রাতৃবাহুর আহ্বে জানতে চাই আমাকে যে এই সভায় টেনে আনা হয়েছে এ কি অন্তর্বাচন নয়? পিতামহ ভীষ্ম আপনি সকলের জ্যেষ্ঠ, সকলের শ্রেষ্ঠ গরিমা আপনি উত্তর দিন, বলুন, কেন আপনি এই পাপাচারের নিন্দা করছেন না?

ভীষ্ম। ভাগ্যবতী, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।

দ্রৌপদী। আর্য, আপনি আমাকে ভাগ্যবতী সম্বোধন করলেন, আপনার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। আমার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে। আমার পঞ্চস্বামী আর্যা বর্তমান, সেই অজেয় পঞ্চপাণ্ডব সম্মুখে উপবিষ্ট, তাঁরা মুখে প্রত্যক্ষ করেছেন, ইচ্ছা করলে আমার প্রত্যক্ষ করতে পারেন, আর আমি কি না তাদের ধর্মপত্নী সভা মধ্যে লাঞ্ছিতা, বিবস্ত্রা, বিবসনা। আমি যদি ভাগ্যবতী না হই তবে আর ভাগ্যবতী কে।

ভীষ্ম। কল্যাণি, তুমি যথার্থই বিচলিত হয়েছ, তাই ঘটনার স্বরূপ বুঝতে পারছ না। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম ঐবং দুর্বোধ্য—এই জন্যে আমি উত্তর দানে অসমর্থ।

দ্রৌপদী। আর্য, আপনি ধর্মের স্বরূপ মনে মনে পর্যালোচনা করুন। যে ধর্ম মানুষকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করতে না পারে সে ধর্মে আমার প্রয়োজন নাই।

ভীষ্ম। কিন্তু বৎসে, যে অবস্থায় তুমি উপনীত ধর্মরক্ষা আর কে তোমাকে রক্ষা করবে।

দ্রৌপদী। তবে ধর্ম এখনো নিষ্ক্রিয় কেন?

ভীষ্ম। ঐ যে বললাম ধর্মের গতি সূক্ষ্ম এবং দুর্বোধ্য।

দ্রৌপদী। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম কিম্বা স্থূল, ধর্ম দুর্বোধ্য কিম্বা দুর্বোধ্য সে চুলচেরা তর্কে আমার আগ্রহ নাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ধর্ম কুরুবৃদ্ধগণের মতোই অন্ধ এবং অসহায়।

ভীষ্ম। এ পাপচিন্তা পরিহার করো।

দ্রৌপদী। অসহায় এক নারীর আর্তরক্ষা চিন্তা পাপ আর কৌরবদের আহ্বান পাপ নয়? পঞ্চস্বামীর নীরবতা পাপ নয়? মুক্তকচ্ছদের নিষ্ক্রিয়তা পাপ নয়? হে কৌরব, আমি দুর্খ রমণী, উৎসবেও আমি যে ধর্মের গতি সরল এবং উদার, শিশুর পক্ষেও তা দুর্বোধ্য নয়।

ভীষ্ম। ধর্মের গতি যদি সরল ও উদার হতো তবে সংসারে এত পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতো না, সোজাসুজিই সব পরিষ্কার হয়ে যেতো।

দ্রৌপদী। চমৎকার আপনার ধর্ম আর্য। আগে বক্ষাল গিলতে দাও তবে তো তাহলবে তার প্রতিকার চিন্তা করবে। এদিকে যে আর্ত সংসার তার অন্তর্বাসকে হরণ করে। চারদিকে তো পাপের অবাধ লীলা। ধর্ম কোথায়?

ভীষ্ম। পাপের আধিক্যেই ধর্মের প্রমাণ।

দ্রৌপদী। অসম্ভব নয়, তবে বলবো ধর্ম এখন সুপ্ত।

ভীষ্ম। সুপ্ত নয়, যোগনিদ্রা মগ্ন।

দ্রৌপদী। স্বামী কি যোগনিদ্রা সে কথা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব যার অসহায় অবলা আমার মতো দ্বিতীয় কেউ হয় নি। দুঃশাসনের পরুষ বাক্যেও যোগনিদ্রাভঙ্গ হবে কাপুরুষগণের অট্টহাস্যেও তার কর্ণকুহর সচেতন হবে না? দুর্যোধনের উরুপ্রদর্শনে কি তার শরীর কণ্টকিত হবে না? ধন্য ভারতীয় বীরগণ, ধন্য ভারতীয় ধর্ম। আজ নিশ্চিত বুঝতে পারলাম ভারতের ধর্ম আর চরিত্র নষ্ট হয়েছে।

ভীষ্ম। ধিক, এমন কথা শ্রবণেও পাপ।

দ্রৌপদী। আর অসহায় নারীর

লাঞ্ছনা দর্শনে পাপ নয়। যে কৌরব সভা তথা বসে, আপনাদের আচরণের ফলে ধর্মের কোন সংস্রব নাই। আপনি, দ্রোণ, বিদুর সকলেই কৌরবের আহার্য। তাই আপনাদের অসহায়তার দায়িত্ব ধর্মের উপরে চাপিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করতে চেষ্টা করছেন।

। আমরা যে বাঁধা পড়ব হওয়া সত্ত্বেও এমন অসহায় ধর্মের সে-ও এক লীলা।

দী। আর আমি যে সভামধ্যে লাঞ্ছিতা ধর্মের সে-ও এক লীলা। কি বলেন পিতামহ।

। অসম্ভব নয়।

দী। অসম্ভব নয়! ধর্ম ও ধার্মিকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এখন বুঝতে পারছি সংসারে পাপীর সংখ্যা এত বেশী কেন?

। কেন বেশী?

দী। ঐ অজস্র ধর্মের বক্তৃতা শোনার চেয়ে পাপের বক্তৃতা শোনা ভালো—আর কিছু না হোক হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

। কল্যাণী, কৌরবপক্ষ সেই পাপের বক্তৃতাই শোনার করছে চলেছে—ফলটাও হাতে হাতে পাবে।

দী। তবে আমার এ লাঞ্ছনা কোন্ পাপের ফলে? আমি তো জ্ঞানতঃ পাপাচরণ করিনি।

তোমার প্রতি পাপাচরণ না করলে কৌরবদের পাপের ভরা পূর্ণ হ'তো না।

দ্রৌপদী। আর্য, আপনার ধর্মের গতি সত্যই সূক্ষ্ম এবং দুর্বোধ্য। ধর্ম আমাকে পরিত্যাগ করেছে যে-আমি আত্মমনোবাক্যে ধর্ম-লীলা আর পাপাচারী কৌরব-গণের সভাস্থের অধিকার আর্ও পাক্কা করে চলল। এ কেমন বিচার?

ভীষ্ম। ক্ষুদ্র কালের মতো দেখলে সত্যই এ বিষয় দুরূহ—কিন্তু মনে রেখো কাল তো ক্ষুদ্র নয়।

দ্রৌপদী। সত্য বটে কাল অসীম, কিন্তু তাতে আমার কি? আমি যে ক্ষুদ্র কালের অধিবাসী।

ভীষ্ম। ধর্মের লীলা বিপুল কালের পরিবেশে।

দ্রৌপদী। তাই আমাকে অপমান সহ্য করতে হবে।

ভীষ্ম। সত্যই তাই। সীতাকেও কি সহ্য করতে হয় নি অপমান।

দ্রৌপদী। কিন্তু সীতার অপমানের অবসান হয় নি কি বর্ণলঙ্কা ধ্বংসে।

ভীষ্ম। তোমার অপমানের অবসানেও ঘটবে কৌরব কুলের বিনাশ।

দ্রৌপদী। তবে?

ভীষ্ম। যথা সময়ে।

দ্রৌপদী। কার যথা সময়ে?

ভীষ্ম। ধর্মের।

দ্রৌপদী। যে ধর্ম এখন নিষ্ক্রিয় সেই ধর্ম যে হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠবে কি তার প্রমাণ?

ভীষ্ম। আজ অনুমান মাত্র তবুও, যেদিন প্রমাণ হবে সেদিন তোমাকে আগে থাকতে দিয়ে যেতে হবে না।

দ্রৌপদী। তত্তদিন?

ভীষ্ম। ধর্মের উপরে বিশ্বাস রেখে সহ্য করে যাও।

দ্রৌপদী। চমৎকার উপদেশ। অসহায় ধর্মের অনুশীলন কর্তার উপদেশ।

ভীষ্ম। ধর্ম পালোয়ানী করে না, ভিতরে ভিতরে কাটল ধরিয়ে দেয়, একদিন সব ভেঙে পড়ে।

দ্রৌপদী। সত্যই যদি আপনার এ বিশ্বাস তবে অন্নদাতাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন না কেন!

ভীষ্ম। ধর্ম যাকে মারতে উদ্যত তাকে রক্ষা করবে কে?

দ্রৌপদী। তবে অসহায়কে রক্ষা করছেন না কেন? সেই তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।

ভীষ্ম। কল্যাণী, সব বুঝেও যে কিছু করতে অসমর্থ সেখানেই নিয়তির হস্তক্ষেপ।

দ্রৌপদী। তবে আমার অপমানের প্রতিকার নেই।

ভীষ্ম। আজ প্রতিকার নেই।

দ্রৌপদী। কত দিন?

ভীষ্ম। ঐ যে বলরাম ধর্মের উপরে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সহ্য ক'রে যাও। ধর্ম ধর্মাচারীকে কখনো বিমুখ হন না।

দ্রৌপদী। রক্ষাও করেন না। এই যদি ধর্মের বিধান হয় তবে সেই ধর্মের বিদ্রোহ জানাই ধর্ম।

ভীষ্ম। তাতেও যে ধর্মেরই জয় হ'বে কল্যাণী।

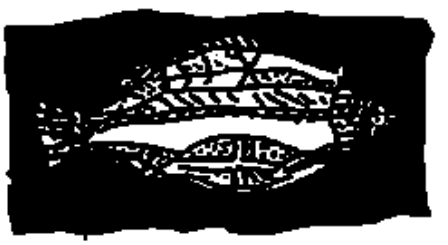

ইরা, মৃদুলা ও অন্যান্যরা

বিমল কর

ওভার ব্রিজের শেষ সিঁড়ি অবধি লাফ দিয়ে পৌঁছে গেল নবীন। আপ প্লাটফর্ম ধরে গাড়িটা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। গর্ডের কামরার পা দানিতে ব্রেকম্যান, আর ব্রেকভ্যানের দরজা ঘুঁড়ে একটি মাত্র আলো। নবীন কোনোরকমে ছুটতে লাগল। শানওলা ব্রোকরোটাকে একরকম ধাক্কা মেরেই চলন্ত গাড়ির কামরাগুলির পৌঁছতেই নবীন দেখল, সামান্য তফাতে তাকে আরও জোরে ঠেকে সেই কামরাটা এগিয়ে যাচ্ছে যেন।

"এদিকে—এদিকে তাড়াতাড়ি... ছুটে আসুন"—কামরার খোলা দরজা দিয়ে কে যেন ডাকছে। নবীন পাড়ি-মরি করে ছুটতে ছুটতে গিয়ে কম্পার্টমেন্টের হাতল ধরে ফেলল।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে তখন বেচারী। দৌড় তো একটু নয়, সেই সাইকেল

া থেকে মেয়ে পর্যন্ত সৌড় শুরু
ই। ঘাট বাবদটা সিঁড়ি ওঠা,
রিজের এক প্রান্ত থেকে আরেক
ঝোটামুটি, তারপর আবার সিঁড়ি-
চলন্ত ট্রেনের ভিতু যাওয়া কী—
ার পক্ষে এই পরিশ্রম যথেষ্ট।
ওপর, বলতে নেই, না না করেও
যাওয়া হয়েছে। তবু সেটে
ার সৌড় ঝাঁপ তবু কইতর।
ালা ফরজার সামনে কিছুক্ষণ
র নবীন দাঁড়িয়ে ওঠার জায়গা
মিল। হেলটবার্ড প্রায় শেষ,
ছু পোস্টের মাথা থেকে যে আলো
ড়িয়ে পড়ছিল এতক্ষণ, এখন
পরিয়ে পড়ছে, একটা গুমট
। হল করে ইয়ার্ডের শেষ লাইন
াথায় চলে গেল, কোথায় পেরিয়ে
ট্যাক পড়ল, তারপর সব
।

নি ফরজা বন্ধ করে জায়গায়
মুখ ফেরাল। ফলনাশ! এ যে
কম্পার্টমেন্ট। অন্তত: মাথা বলে
তারা সবাই মহিলা। নবীন
ঘাবড়ে গেল! অমন বিপজ্জনক
অবস্থাটা। তিনটি মহিলা যাত্রী
দিক আর কেউ নেই গাড়িতে,
নি দেখল, তিনজনের সকলেই
া। এক পোশাকের সকল বয়স
হলেই একই অফিসের মেয়েরা,
। আর ওই মেয়ে তিনটি যেখানে
নবীনও সেখানে এসেছিল,
এবং অফলাব বিয়েতে।
ফিরেও এদের চোখে লেগেছে
ন্যাথাটা হয় নি, তবার উপায়
নবীনকে প্রায় অভাবনীয় সাহসিক
করে তাদের সেই যে পালিয়ে
ীন সারক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে
ই বা ছে। আসার সময় একটু
ত পারে। নিয়েছিল তারপর।
াটা ছোট। এই গাড়িও লম্বা
ক দেয় না। লাইন ট্রেন
একরকম তাদেরই গাড়ি,
ন্তন মেয়েরা আর মেয়েদিগের
জন্যে, বাথরুমটার আর মেয়ের
ন্যে।

তারা, তিনটি বাঙালি মেয়ে।
াঁদকে আরতি বয়, একটায়-
মেয়াদের মেয়াদী; মাঝের
মুন্না চাটার্জী, আংলোইণ্ডিয়ান
চাইনিজ। অন্য মেয়েটি ইয়া
মিত্র,—নবীনের মেয়াদেরই কাছ কাছে।
ইয়াই তাকে ডেকেছিল থাকতে।

নবীনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইয়া
তৃতীয় বেঞ্চি ছেড়ে মাঝের বেঞ্চিতে
চলে গেলেন নবীন বলল, "আপনারা
কখন বেরিয়েছেন, বৌদি ত?"

ইয়া বলল, "আমরাও ছুটতে ছুটতে
এসেছি। এতে লাফের কাছে যা পেলাম
উঠে পড়লাম।"

"এটাপি মেডাম?"

"বোধ হয়। কোনো লোকজন
দেখছি না তখন—"

"বাইরেটা দেখেন নি?"

"না।...উঠে পড়ে যা ভয় লাগছিল।
যাব যা!"

নবীন হাসার মতন মুখ করল, তবে
তার জন্যে নিজেই বেঁকিতে বিয়ে বসল।

মুন্না হাসি হাসি চোখ করে বলল,
"শান্তিনিকেতনে একসঙ্গে কোথাও যেতে নেই,
জানেন তো? আপনাকে তাই ইয়া ডেকে
নিল। নাকি আরতি দি?"

আরতি যদি পারত শুয়ে পড়ত;
হয়ত সে যা ছড়িয়ে শুয়েও পড়েছিল,
নবীন আসায় উঠে আর সোজা আর ঘন
হয়ে বসে আছে। আরতি বলল, "ইয়ার
আবার বেশী ভয়!"

ইয়া একবার আরতির দিকে তাকিয়ে
নবীনের দিকে মুখ ফেরাল। বলল,
"আচ্ছা, আপনিই বলুন— এই যার
মাঝার সময় এই লাইনে মেয়েদের একা
একা যাওয়া বিধি কি না?...গত বছরে
সে যে চার ছিঁড়ে নেবার কেসটা
হয়েছিল....."

"সে তোমার কথার কথায় শুধু অমুক
হয়েছিল অমুক হয়েছিল." আরতি বাধা
দিয়ে বলল। "আজ পাঁচ ছ বছর ধ-
বেলা এই করছি, কোথাও তো কিছু হয়ে
দেখলাম না।"

ইয়া বলল, "দখবে কোথ থেকে;
কেন তো বিকেল সোয়া পাঁচটায় ট্রেনে।
সে যাই হোক, আমার বাবা গা হয়তম
ভয়ে তা বলছি। আমের কমপার্টমেন্টে
উঠলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম—কিন্তু
তখন গাড়ি ছাড় ছাড়...অত কি
দেখেছি।"

মুন্না বলল, "দেখবে আমরা চোখ
থাকতে, সমঝ—" কথা শেষ না করেই
হাসল মুন্না।

নবীন লক্ষ্য করল ইয়া ও মুন্নার
মধ্যে চোখে চোখে কেন যেনো হঠাৎ
হাসি-দেওয়া কথা হয়ে গেল। কি কথা
নবীন বুঝল না।

তবে, নবীন মুখে একটু হাসল।
বাঙালি ইয়াকে ভীতু বলা কেন? শুধু এই
জায়গায় নয় কটি মহিলারই ভয় থাকার
কথা। তিনজনেই যুবতী এবং কুমারী
মেয়ে। অর্ধদিন আগে শুধু অফিস
করতে, আজ অফিস সেরে বিয়ে বাড়ির
নেমন্তন্নে যাবে বলে সাজগোজ করেছে,
গহনাগাটি পরেছে। অফিসের জামা-
কাপড়, অফিসের শুকনো ক্লান্ত মুখ
কোথায় যে মেখে রেখে এরা এ-রকম
সাজগোজ করেছে, চুল বেঁধেছে, খোঁপায়
ফুল দিয়েছে কে জানে। আর কিছু না
হোক, অল্পবয়স এবং অল্পসংসারের জন্যে
এদের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

আরতির দিকে তাকিয়ে নবীন
বলল "আপনি ঠিকই বলেছেন। এ-ট্রেন
তো আমাদের, পুরো লাইনটাই আমাদের
মৌরসি পাট্টা। আজ আবার সোটা
গাড়িতেই বিয়ে-কেরতা আমাদের লোক
যাচ্ছে? ভয়ের কিছু নেই।...আমি বরং
সবের হল্ট স্টেশনে নেমে যাই, আপনারা
আরাম করে আসুন।"

ইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ছিঃ না।
না—না। আপনাকে কষ্ট করে যাবতে
হবে না।"

আরতি মস্ত এক হাই তুলল। সে
মাথায় বেঁটে, গোলগাল, বেশ মোটা-
সোটা চেহারা। মুখটি কিন্তু সে তুলনায়
নরম ও মিষ্টি। সন্তবত যথেষ্ট খাওয়া
দাওয়া হয়েছে বলে ঠেলে উঠে তার একটু
ঘুমোবার ইচ্ছে ছিল।

মুন্না লম্বা, ছিপছিপে। মুখটি
গড়নও পাকাটে, বড় বড় কলা না আজ
বড় দেখাচ্ছে। মাথার খোঁপা ঢুকো
করে বাঁধা; গায়ে সিল্কের শাড়ি।
মুন্নার চোখ তর্কার জন্যে বেশ টানা
টানা দেখাচ্ছিল।

ইয়া ঘোলাটে গড়নের, মুখটি পান-
পাতা চেহারা, গায়ের রঙ ফরসা, চোখ
দুটিতে এখনও যথেষ্ট মেয়েমানুষী
রয়েছে। বেশ সুশ্রী ও সপ্রতিভ মেয়ে।
ইয়ার সাজসজ্জা দেখে মনে হয় যেন
বিয়ের পিঁড়িতে ওকে বসানো হবেই
কথা ছিল। সিঁদুর লাল হয়ে যাবে,
গাড়ী ফেল হয়ে যাবে বলে সে বিয়ের
পিঁড়ি থেকে উঠে এসেছে।

নবীন মনে মনে খুব মজা পাচ্ছিল।
এই তিনটি মেয়েই অফিসের অফিসার

সহকর্মী, কিন্তু কখনও মৌখিক আলাপ, সৌজন্য সূচক স্মিত হাসি ছাড়া কোনো রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। ইরার সঙ্গে অবশ্য পরিচয় কিছুটা বেশী, কেননা একই সেক্সনে ওরা কাজ করে। অবশ্য কী আশ্চর্য, আজ তিন চার বছর ধরে এরা সকলেই একই ট্রেণে আফিস যাচ্ছে, একই ট্রেণে ফিরছে অথচ, কখনও বা আফিসের পর সিনেমা দেখে এই শেষ লোকাল ট্রেণেও তারা ফিরেছে। তবু সামান্য পরিচয় ছাড়া এর পা আত্মীয়তা হল না কেউ। অন্য অনেক ছেলের সঙ্গে এদের পরিচয় অনেক বেশী। বৃহুলা আসার আফিস ক্রাবে থিয়েটার করে বলে তার অনুরাগীর সংখ্যা সবার বেশী।

নবীন নিজের প্রকৃতির কথা ভাবল। সে তার বন্ধুদের চেয়ে একটু অন্য রকম। বেশী আড্ডা ইয়ার্কি চড় তার ধাতে সয় না সে আফিসের ফুটবল টীমের সঙ্গে মাঠে গিয়ে চেঁচায় না, তাস টাস খেলে না, থিয়েটারের গ্রীনরুমে যেতে না। তার মানে এই নয় যে সে বদ্ধ বিদ্বেষজ্ঞ বা একেবারে নেরস ছেলে। না, তা নয়। নবীন একটু অন্যরকম থাকার স্বভাব পেয়েছে, তার মন একটু ফ্যাসাদেবল, সে একটু বেশী রকম অন্তরঙ্গতার চর্চা করে। কিংবা এই সবও ঠিক তার চরিত্রের বিশ্লেষণ নয়, আসলে নবীন কিছুটা অহংভাবী, আত্মমগ্ন।

অহংভাবী স্বভাব তাকে এই, নবীন তার দাদা বাবা এবং লেখে। তার লেখা কলকাতার মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজে অনেকগুলো ছাপা হয়েছে। লেখক নবীন নিজেকে এই সকল সহকর্মের আফিসের বন্ধুদের ঠিক নিজের মতন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করে না। অবশ্য, এমনও নয় যে সেই অহমিকায় সে বন্ধুদের অবজ্ঞা করে।

আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে নিজের সহকর্মী এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে মেতে মেতে নবীন যেন মনে মনে কিছু ভাবছিল। সে ইচ্ছে করলেই বিকাশ, কুমার, চৌধুরী, হরেনদের মতন হয়ে পারে। পারে না?

বৃহুলা বলল। "বিয়ে কেমন দেখলেন?"

নবীন আকাশের কাঁচটা তুলে দিল। ফাল্গুন মাস, চমৎকার হাওয়া এল, মুখের ওপর কাপড়টা ছিল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, "আমি আর বিয়ে দেখতে গেলাম কই! তীর্থপদ আমায় এমন বেয়াড়া কাজে লাগিয়ে দিল……"

"সে কি, একেবারেই বিয়ে দেখলেন না?" বৃহুলা শুধলো।

"না। আসার সময় একবার কনের ঘরে চুঁ মেরেছিলাম।"

"অরুণাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল।" ইরা বলল।

কথাটা স্বীকার করল নবীন। অরুণা তাদের আফিসের মেয়ে। তারাপদও তাদের সহকর্মী। প্রেম করে তারা বিয়ে করেছে। অরুণা দেখতে খুবই সাধারণ ছিল কিন্তু আজ তাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিল। বিয়ের দিনে দেখাতেই হয়ত।

আরতি বলল, "খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু ভালই করেছিল।…… আপনাদের চৌধুরীবাবু কাজের লোক।"

চৌধুরীকে যে কোনো কাজের জায়গায় ছুড়ে দিলেই সে সেখানে পাকা করে যাবে। কাজের ছেলে। তারাপদর বিয়েতে খাবার দাবারের পুরো ভারটাই তার ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল। তা চৌধুরী তার নাম এবং তারাপদর নাম রেখেছে।

এই বিয়ের সবই সুখের, একমাত্র অ-সুখ বলতে তারাপদদের বাড়িতে বেশ খানিকটা অশান্তি। ইঁটো-কাটা ম্যারেজ, তারাপদর বাবা মা কেমন খুশি না। তারাপদর বাবাকে নবীন দেখে নি আজ।

বৃহুলা বলল, "আচ্ছা বলুন তো, এরপর কি হবে?"

নবীন বুঝতে পারল না বৃহুলা কি বলতে চাইছে। বলল, "কিসের কি হবে?"

"আহা, অরুণাদের কথা বলছি। তারাপদবাবু আর অরুণা তো আফিসে সাপে নেউলের মতন ঝগড়া করত—একজন আর্টিস্ট অন্য জন অ্যাকাউন্টস। এবার কি করবে!" খিল খিল করে হেসে উঠল বৃহুলা।

নবীন একটু ভাবল, বলল, "এখন আরও দুমুল ঝগড়া হবে।"

"সে কি! কেন কেন?" ইরা শুধলো।

"অরুণাই এখন কড়া ধরনের আর্টিস্টার হবে। বেচারী তারাপদ…।"

সমস্বরে হেসে উঠল সবাই। আরতিও হাসল।

হাসি থামলে আরতি বলল, "আমি যদি তারাপদর হতাম, ওদের একজনকে পাঠাতাম দিল্লি সেক্সনে, আর-একজনকে এস্টাবলিশমেন্টে।…তাকি যাচ্ছে পারত না।"

বৃহুলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তাহলেই তুমি আফিসার হতে। বাব্বা, কী জুলুম আফিসারই না হতে তবে—!"

ইরা এবার সবার ওপরে গলা উঁচিয়ে হাসল।

আরতি কিন্তু ঘরে করল না। বলল, "বাড়িতে লক্ষ্য বউ, আফিসে আবার বস্তি কি। কাজ করতে এসেছি, কাজ করছি।"

ইরা বলল, "তোমার বড় কাজ কাজ বাতিক। কি হবে অত কাজ করে! বাইরে যাবে? প্রমোশান হবে? সবাই যে কত কাজ করে তা তো দেখছি। কাকি দিয়েই তো বরাবর চলছে বাপু!"

টিফিনের একটা স্টেশন এসে গিয়েছিল। নবীন মাখবার কথা ভাবল না। ছোট স্টেশন, লোকাল গাড়ি, কেউ উঠল না; কনের জন্য যা নেমে গেল। গাড়ি দাঁড়াবার না দাঁড়াবেই ছেড়ে দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে নবীন হেসে বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

ওরা তিন জনেই নবীনের দিকে তাকাল। নবীন বলল, "রাগ করবেন না তো?"

বৃহুলা ঘাড় কাত করে জবাব দিল, "করব না, মশাই। আপনি নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করুন।"

"আপনারা এ-রকম বিয়ে বাড়ির সাজ করলেন কোথায়? আফিসে আসার সময় তো দেখি নি মনে হচ্ছে।"

"এই কথা!" বৃহুলা ঘাড় কাত করে, হেলিয়ে চোখের ভুরু টান করে পরিহাসের একটা ভাঙ্গি করল, তারপর আঙুল দিয়ে খোঁপার ফুল দেখাল, আরতির পাশে একটা ছোট অ্যাটাচি দেখাল। বলল, "আমরা সাজি আমা গয়নাগাটি সব সঙ্গে করে এনেছিলাম। আফিস ছুটির পর জেনারে বাড়ি গিয়ে সাজগোজ করেছি। ইরার তো ওদের চৌদ্দ আনা ওই ঘরে। এক গয়নাগাটি সঙ্গে রয়েছে।……"

আরতি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল, বলল, "এত বলিস না, শুধু এই কথা।"

বিদেশ পক্ষে এই ক'টাই যথেষ্ট ন্ত।"

কথাটা আরতি কেন বলল নবীন ঝে পারল না। হয়ত এই জন্যে যে, নবা মোটামুটি সচ্ছল, হয়ত মস্ত এক ঠ অফিসার। হয়ত আরতি একটু খেঁচো ছিল নবীনের আত্মীয়দের।" হয়ত নবীনের মাথায় কেমন এক এল। একটু ভেবে নবীন বলল: মেরা তুমি বুঝিয়ে, কিন্তু আপনাদের া কোনো বুদ্ধি নেই।"

আরতি, বুধুলা ইরার মুখে চোখে া "কেন-কেন" ভাব ফুটল। এ-কথা । মানে কি? কোথায় তাদের বুদ্ধির ব দেখল নবীন?

বুধুলাই কথা বলল, "আমাদের বুদ্ধির " দিকটা আপনি দেখছেন?"

"বুদ্ধির একটাই দিক থাকে।"

"না, মোটেই নয়।" বুধুলা দৃঢ়ভাবে ভবে জবাব দিল, "মেয়েদের বুদ্ধির দিক। একটাই আপনারা দেখতে অন্যটা পান না। চাঁদের যেমন পাশ দেখা যায়, অন্য পাশ অদেখা থাকে।"

তন নবীনেই হাসল আবার। চমৎকার জবাব করেছে। সাধে কি বুধুলা আজন্ম বিয়েবাড়ির নায়িকার পার্ট করে।

নবীনও না হেসে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, "আপনাদের সেই অন্য বুদ্ধি আমার অজানা থাক। কিন্তু এই কাজটা "ভাল করেন নি। মোটেই বুদ্ধিমানের মতন কাজ নি।"

"কোন কাজ?" আরতি জিজ্ঞেস করল।

"এ-ভাবে গয়নাগাটি খাকে কাছা কাছরায় ফেলে ওয়া। অ্যাটাচিতে নিশ্চয় আরও কিছু রেখেছেন?"

বুধুলা চোখে চোখে তাকিয়ে কি ভেবে বলল, "হ্যাঁ; যা পরে আছি তার বাইরে যা সবই ওর অ্যাটাচিতে।"

নবীন এবার রীতিমত অপহরণের ভাব করল। বিকৃতির গলায় বলল, "আপনাদের সমস্ত ব্যাপারে ছেলে-মানুষী। বরং ইরাই ঠিক বলেছেন, সোনা দানা নিয়ে এ-ভাবে ঘোরে মেয়েদের এক। একা যাওয়া সত্যই চরের। সেদিন অতাল-সাঁইথিয়া লাইনে একটা কেস যা হয়েছে..." বলতে বলতে নবীন থেমে গেল।

তিন সখীই যেন আগ্রহান্বিত হল শুনতে। ওদের মুখে সামান্য বিচলিত ভাবও ফুটে উঠল।

"কি হয়েছিল?" আরতি শুধোল।

"আপনারা জানেন না?" কারোর মুখে বিস্ময়, মনত আজ এ-রকম দুঃসাহস হত না।"

ইরা বড় বড় চোখ করল, বলল, "আমি যা ভাবছি ঠিক তাই। গয়না-গাটি কেড়ে নিয়েছিল মেয়েদের গা থেকে? না?"

নবীন বলল, "শুধু কি কেড়ে নেওয়া। মারধর: সে-সব শুনে দরকার নেই আপনাদের তবে এ-ভাবে আর আসা যাওয়া করবেন না।

বুধুলা বলল, "শুনতে আপত্তি কি। আপনি বলুন।"

আরতি বলল, "শুনিই না ব্যাপারটা।"

অগত্যা নবীনকে সাঁইথিয়া লাইনের ঘটনাটা বলতে হল। এই তো সেদিনের ঘটনা—দিন পনেরো দিন আগেই ঘটেছে। এক ছোকরা, একেবারে নতুন জামাই, শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল বরযাত্রীর ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে। তার বউ নিয়ে ফিরছে। নতুন বিয়ের যাদী

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দ ছিনিয়েছে দেশ ছেয়ে।

BEWARE OF IMITATION

MANUFACTURER & REPAIRER OF
SCALE, BALANCE, WEIGHT ETC.
AND CONTRACTOR TO THE INDIA GOVT. ETC.
SINCE-1852

Wooma Chun Kurmohar

OFFICE-58, CLIVE ST.
WORKS: 21/B, MADHUSUDAN DARGA MAIN ROAD.
CALCUTTA-11

BEWARE OF IMITATION

BEWARE OF IMITATION

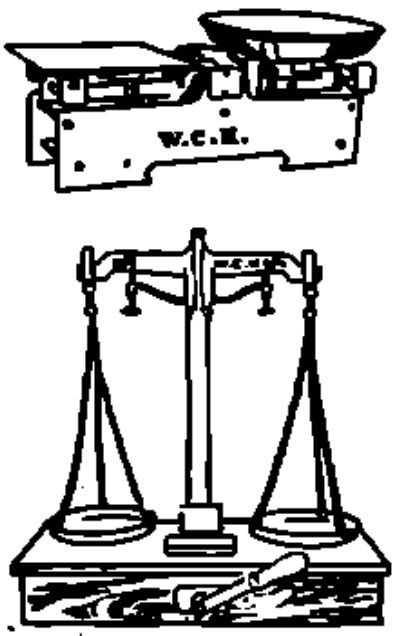

BEFORE PURCHASE

স্ত্রী ছো. মেয়ে মেয়ে এক ঁাকা মতন কামরায় উঠেছিল। তা বলে একেবারে ফাঁকা নয়, ছিল দু-একজন। যতে তখন ভত আর ন'টা, সাড়ে ন'টা। দু-ন'টা যাত্রীর এক-এ ন এক স্টেশনে নেমে গেল। থাকল শুধু স্বামী-স্ত্রী এবং আরেক যাত্রী। স্ত্রীর গায়ে যথেষ্ট অলংকার। তার ওপর বাপের বাড়িতে তার কিছু গয়না গাটি বদল করতে দেওয়া ছিল, সেগুলোও অ্যাটাচি করে নিয়ে ফিরছে। তা গাড়ি ছাড়ল, স্বামী স্ত্রী মনের সুখে গল্প করছে, ওদের কোনো গ্রাহ্যই নেই। অন্য যাত্রীটি চুপচাপ সব দেখছিল, শুনছিল।... পরের স্টেশনে যখন গাড়ি থামবে লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবু— আমি একটু জল, দেখি যদি এই স্টেশনে গাড়ি থামলে আমায় চাকরি করে নামিয়ে দেবেন। ছোকরা ও তাই চায়, ট্রাম নেমে যাও বাপু, আমরা একা একা যাই।...গাড়ি যখন স্টেশনের কাছাকাছি, লোকটা গেল ল্যাভাটরিতে। কিন্তু যখন তখন স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে হাড় ছাড় করছে আবার। সে নামবে এখানে। ছোকরাকে বলল, নামিয়ে দিন বাবু। ওদিকের প্রাটফর্ম লাম্বাই বড় লীডু।... ছোকরা লোকটাকে নামাতে গেল। টালবাহানা করে গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত সময়টা কাটিয়ে দিল লোকটা। থামে ও বুঝি একটা মিনিট গাড়ি। গাড়ি ছাড়ার পরই অন্য চেয়ারে লোকটার। সেই স্বামী ছোকরার গলা টিপে ধরল, ঘরে যতগুলি করে কামরার খোলা দরজা দিয়ে ফেলে দিল নীচে। ঘটনা ঘটে তখনে ভয়ে অজ্ঞানের মতন। তার মুখ বেঁধে চোখে, গয়নাগাটি যেখানে যা ছিল নিয়ে পরের স্টেশনে গাড়ি থামবার আগেই নেমে পড়ল। তারপর...

ঘটনা শুনে ছিনটি মেয়ের মুখ তখনে শুকিয়ে লাল হয়ে গেছে। আরতি বোকার মতন আটাচিটা কোলে টেনে নিয়েছে। বুলুদার মতন চঞ্চল মেয়েটির বাকবাণীও মেয়ের মুখেও আর শব্দ নেই, ইরা ভীতিমত আতঙ্ক অনুভব করছে।

আরতি কোনো রকমে শুধালো, —সেই ছেলেটির কি হল? ধরা পড়ল নাকি?"

—ও কি আর বাঁচে!" নবীন বলল।

ক'।-কে উঠল বুলুদা। বলল, "খুনে ন'টার!"

—সে তখন বেঁচেছে। কিন্তু তার বাঁচা মরা সমান।" নবীন সহজভাবে জবাব দিল।

ইরা বেশ যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আরতিকে বলল, "দেখলে তো, আমি যখন বলছিলাম তোমরা তো হা হা করে উঠিয়ে দিচ্ছিলে। বিপদ এই ভাবে আসে।" বলে ইরা নবীনের দিকে তাকাল, "আপনাকে ডেকে নিয়ে ছিলাম। না ভাবা, আমি আর ফারুক ফিরেছে মেসজ পেয়ে আসছি না। যদি বা আসি একবারে সোনা দানা গায়ে দেব না, কাঁকা গাড়িতে উঠব না।"

নবীন এবার একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে আরও একটা ঘটনার কথা সে বলল। সেটাও কাছাকাছি লাইনে হয়েছিল। এই ঘটনাটা আরও মর্মান্তিক, শুধু শরীরের অলংকার নয়, মেয়েটিকে পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল ক'টা লম্পটে মিলে।

দেখতে দেখতে তিন চারটে স্টেশন পেরিয়ে এসেছিল গাড়িটা। এখন প্রায় পৌনে দশ। বাইরে ঘন অন্ধকার। কিছু চোখে পড়ে না। প্রায় যেন পঞ্চাশে পৌঁছে গেছে বলে ট্রেনটা প্রাণপণ ছুটছিল, জলন্ত কয়লার গুলকি এঞ্জিনের মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে নক্ষত্র চূর্ণের মতন নিকষ কালো শূন্যে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে নিবে যাচ্ছিল।

পরের স্টেশন আসার মুখে আরতি বলল, "এবার আমি নামব।...অবশ্য স্টেশনে নেমে ভয়ের কিছু নেই। শুধু অ্যাটাচিটা ছোকরার কাছে থাক এখন। অত একসময় নিয়ে নিলে হবে, আমার তো তেমন কিছু নেই ওর মধ্যে।"

বুলুদা বলল, "তাই ভাল। তোমায় আর অযথা ভাবিয়ে লাভ নেই।"

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতে আরতি নেমে গেল। নবীনকে বলল, "ধন্যবাদ। আপনি সঙ্গে রয়েছেন, নয়ত ওই মেয়ে দুটোকে অত গাড়িতে চাপিয়ে দিতাম।" আচ্ছা চলি, কাল দেখা হবে আবার।

এই সব স্টেশনের মতনই এই। ক'টা দাঁড়িয়ে থাকে, টিমটিমে ক'টা বাতি প্রাটফর্মে। গাড়ি থামতে না থামতে আবার চলে।

গাড়ি ছাড়ার পর নবীন যেন হঠাৎ আরও একটা ঘটনার কথা মনে করতে পারল। এটা অবশ্য আলতা-বাবুদের দিকে হয়েছিল। সামান্য একটা ঝগড়া থেকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল এক ছাত্র সৌম্যদের বুকে, তার আবার একেবারে সাঙ্গোপাঙ্গোতে।

ইরা বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বলল, "থাক বাবা, আর শুনে কাজ নেই। যা করার তা তো করে ফেলেছি, আর কখনও না, কান মলছি।"

নবীনও বলল, "দাত্তা, এ-সব গল্প না করাই ভাল। সংসারে বড় বিচিত্র জায়গা, দেখে শুনে মনে হয় মানুষকে বিশ্বাস করাই অন্যায়।"

বুলুদা এবার উঠল। বলল, "থাক গে, সে রকম বিশ্বাস কেউ না করে।... এখন তো আমার নামার সময় হল। ইরা, ছোকে আর ছাঁদকে তোমারো না। সুটকেসটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুই অ্যাটাচিটা নিয়ে যা। নবীনবাবু আছেন, ভয় নেই। একই ভাইবন্ধু নামাব। আপনি কিন্তু ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।"

নবীন এমন মুখ করল যেন মনে হল, এই শেষ কাজটাও তাকে করতে হবে যদি শুধে বাবু কোন সালসে তোমরা তিনজনে একভাবে এক ক'কা কামরায় উঠেছিলে!

পরের স্টেশনে বুলুদা নামল। নেমে বার বার সাবধান করে দিল দুজনকেই। বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দিন। অবশ্য পরের স্টেশনেই তো যাবেন আপনারা। তবু, সাবধানের মার নেই।"

গাড়ি ছাড়ল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেঞ্চিতে ফিরে এসে নবীন একটা সিগারেট ধরাল। ইরা উলটো দিকের বেঞ্চিতে বসে।

কয়েক মুহূর্ত ইরার দিকে তাকিয়ে থেকে নবীনের মনে হল, ইরা যেন এখনও ভয় ভয় ভাব করে বসে আছে।

নবীন বলল, "আপনার এখনও ভয় যায় নি?"

ইরা জবাব দিল না। সে কেমন মুখ নীচু করে বসে। হয়ত ভাবছে, বিপদে একটু সাহায্যই করবে বলে যা, দিদি, বাসি—এদের গয়নাগাটি নিয়ে কেনই যা এসেছিল! ছি ছি!

নবীন হঠাৎ জোর গলায় হেসে উঠল। খোলা দরজাপথে সেই হাসি অদ্ভুত লাগল এই চলন্ত গাড়ির কামরায়। থেমে নবীন বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত

বাজুন। অতগুলো ঘটনার কথা ভাবলেন, এর সব কটাই বানানো। সাহা মিথ্যে।"

এবারে ইরা চোখ খুব খুলল। যেন বিষম খেয়ে গেছে। বলল, "মিথ্যে?"

"একটি পারসেন্ট মিথ্যে।" নবীন ঘন আবেগে বলল।

"তা হলে আপনি বললেন কেন? আমাদের ভয় দেখাতে?" ইরা বেশ খুশি।

নবীন কি বলবে যেন ভেবে নিল। বলল, "আপনাকে অন্তত ভয় দেখাতে।"

"আমাকে?"

এবারে নবীনকে ঘাড় মাথা চুলকোতে। আমতা আমতা করে বলল, "মানে কিছু মনে করবেন না। একটা চান্স এসে গেল হুট্টাৎ। আপনাদের... মানে, বিশেষ করে আপনাকে এত ভাল লাগল...। যদি বলেন আমি যাব চাইছি।"

ইরা কয়েকমুহূর্ত এক নজরে দেখল নবীনকে, তারপর কেমন মুখর এক শব্দ করে হেসে ফেলল। বলল, "থাক, থাক —আর ভাল লাগা দেখাতে হবে না। যা ভাকলে কি আসতেন নাকি!"

নবীনের যেন হঠাৎ খেয়াল হল, এখন তো নয়—ওই তিন সখী মিলে আগরোড়া তাকে জব্দ করেছে। নবীন বার দুয়েক ঢোঁক গিলল, তারপর বলল, "না ডাকলেও আসতাম, যদি জানতাম আপনি আছেন।"

ইরা চোখের কোণে কটাক্ষ করল, বলল, "মাহা, আপনি যেন কোয়াদিনই কিছু জানেন না।"

নবীন এত আশ্চর্য ঈষৎ চর্য অনুভব করল। তারপর একপাশে মুখ ভার মনে পড়ল। ইরাকে যে তার ভাল লাগে তাও তার চকিতের খেয়াল পড়ছিল এখন।

ইরা বলল, "আপনি আজ যা অসভ্যতা করলেন, জানি আফসে গিয়ে ওরা কী সব যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করবে! এ-ভাবে দু জনে যাওয়া।"

নবীন হেসে বলল, "আপনারই বা কম কি করলেন!"

ইরা খিল খিল করে হেসে উঠল। নবীনও হাসল লজ্জায় মলায়।

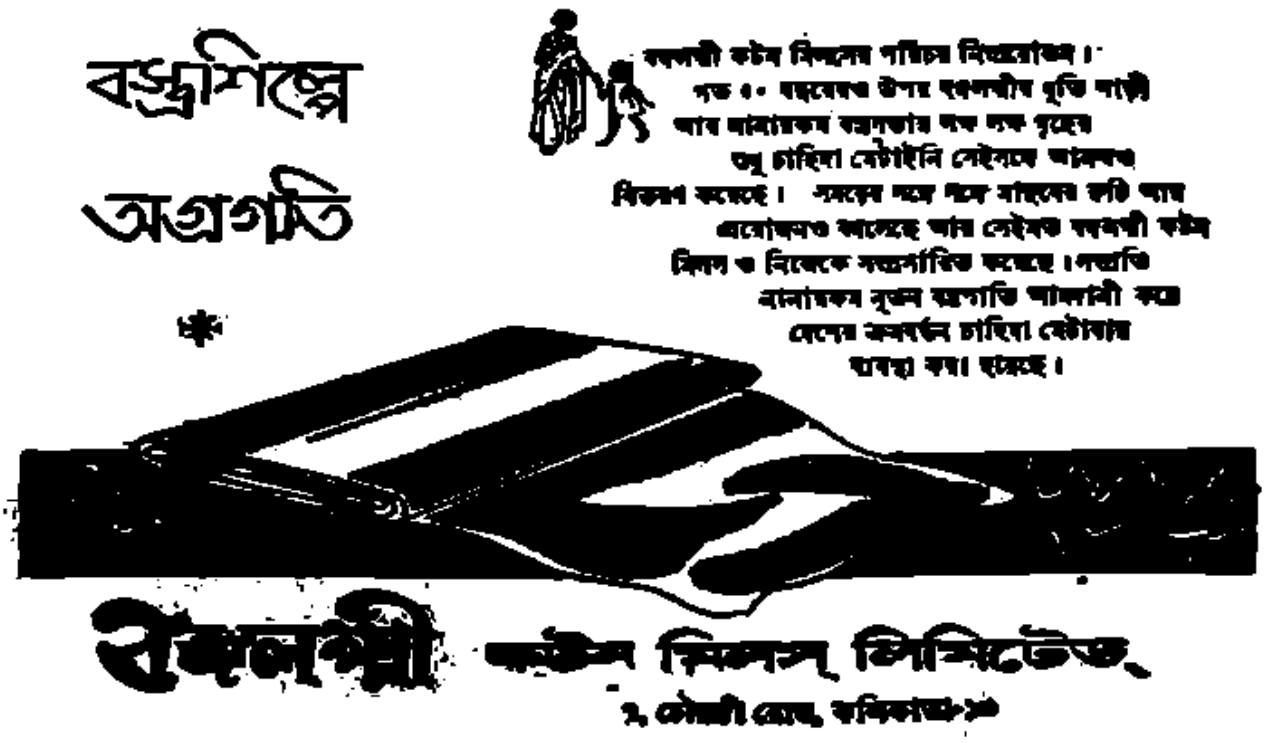

রূপের পূজারী কবি দেবেন্দ্রনাথ

কালিদাস রায়

বিধাতার সৃষ্টিতে ফুলেই চরম সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের পূজারী দেবেন্দ্রনাথ তাই প্রধানতঃ ফুলের কবি। তাঁর প্রথম চারিখানি কাব্যের নামকরণেই সে সমাদর লাভ করেছে—অশোক-গুচ্ছ, কেতকীগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ ও বিজাতগুচ্ছ। ফুলের আধার, ফুলের সংকবিতায় ফুলের উপমায় ফুলের রূপায় তাঁর বহু কবিতাই বাঙ্ময়রূপ লাভ করেছে। তাঁর ছন্দের ফুল মালঞ্চেই তিনি কবিতাবধূকে আমন্ত্রণও করেছেন—

। যে—গোলাপে গোলাপে ছাইয়ে
ফেলেছে এ মধু কানন দেশ,
খি—তুমিও আইস গোলাপী
অধরে, ধরিয়া গোলাপী বেশ।
খি—ফুল-কবি আমি, থাকি
চিরদিন গোলাপের সুখ-দুঃখপুরে,
াই—গোলাপী গাথার গাঁথি
তব নাম গাহিনু গোলাপী সুরে।
[গোলাপগুচ্ছ]

কবি আত্মপরিচয়ে বলেছেন—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী—
া সন্ধ্যা সারা নিশি রূপ বৃন্দাবনে বসি
গোলাপ গোলে মাখি,
আনন্দে মেতেছি।
ারে রঙের হাস বিদ্যুতের পরকাশ
রূপের উৎসবে সাজে রাগের কুমারী।
নতী ওড়না সাজে
প্রকৃতি রাধিকা সাজে
রূপে ভুবন ভরে আনন্দে অথাবি।

রূপের পূজারী কবি রূপ-বৃন্দাবনে সখা প্রকৃতি-রাধিকার ফুলদোল লীলা প্রত্যক্ষ করেন। পুষ্পময়ী প্রকৃতিই কবিকে রূপের পূজারী করে তুলেছে। পুষ্পময়ী প্রকৃতিই দূতী হয়ে কবিকে, পুষ্প যার অঙ্গে ঠাঁই পেয়ে চরম-সার্থকতা লাভ করে, তার লীলা মন্দিরে নিয়ে গিয়েছে; যেমন করে জ্যোৎস্নালোকের মালিনীর কুসুম মালিকা সুন্দরকে বিদ্যার মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রাচীন সাহিত্যের তরুণী নায়িকারা হীরা-মতী-সোনার ভূষণে পরিচ্ছন্ন থাকত না—তারা চাইত সর্বাঙ্গে ফুলের ভূষণ। তাইতো মালিনীর প্রয়োজন হ'তো। তা ছাড়া, ফুলই তো অনঙ্গের প্রহরণ—পঞ্চশরের তূণের শোভা। রূপের কবির একচোখ তরুণীর অঙ্গে—আর এক চোখ ফুলের মধুমানবের তুঙ্গে।

তাই ফুল-কবি ও রূপের পূজারী বলে কবি যাযাবর নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

এই যে রূপের পূজারী তাঁর তো ফুল-কবি হওয়ারই কথা। রূপ-বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ মনোরম সৃষ্টিই যে ফুল। নারীর রূপ তো বিধাতার অর্ধসৃষ্টি—পুরুষ আপন মনের মাধুরী দিয়ে ত্রিলে ত্রিলে সৌন্দর্য আহরণ করে রক্ত মাংসের প্রেয়সীকে ত্রিলোত্তমা করে তোলে। রূপের পূজারী কবি বাল্যকাল থেকেই রূপের পূজারী। তখন প্রেয়সী ছিল কোথায়? সে তো এলো যৌবনের উন্মেষে কবি আসে হতেই তো ফুলের রূপে মুগ্ধ। কুসুমাস্তীর্ণ পথেই এলেন প্রেয়সী, ফুলেরই মুক্তিমালাতে ফুলশয্যাতেই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

ফুল ছিল নারীরূপের উপমান, উপমানের আকর্ষণেই এসেছে উপমেয়। উপমানের পূজারী তখন উপমেয়ের পূজারী হলেন। শুধু তাই নয়,—ফুল তো দেবতার উপভোগ্য, ফুলতো পূজার উপাচার এ ফুল দিয়ে কবি কার উপাসনা করবেন? যৌবনের উন্মেষে স্বর্গের কাম্যতা দেবতাদের পূজা অঙ্গের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কবির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। দেবতাকে প্রিয় করবার বয়স্কাল সেটা নয়—যৌবনে প্রিয়েরেই দেবতা করতে হয়েছে উপবনের ফুল দিয়ে প্রিয়েরে দেবতা করা যায় না। কিন্তু কবির মনের উপবনেও যে তখন অজস্র ফুল ফুটছে। কবি মনোবনের ফুলের মাধুরী ও সুষমা দিয়ে রক্তমাংসের প্রিয়েরে পূজার দেবতা রূপে রচনা করেছেন।

খোঁপায় গোলাপ চাঁপা দিলাম বসায়ে
গলে পরাইয়া দিনু মালতীর মালা।
সীঁথিটি,অশোক পুষ্পে দিলাম সাজায়ে
দু'করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা।
উরস কলসে ফুলে নাগেশ্বর হার
হেসে হেসে সযতনে দিলাম জড়ায়ে।
শ্রী-চরণে গোলাপ পদ্ম দিলাম ধরায়ে
কাঞ্চনের চরণহারে কবি কি যাহার।
দুইটি কদম্ব নিয়ে কর্ণে দিনু দুল
তারপর ধীরে ধীরে খোকা পুষ্প দিয়া
সুন্দরীর চারু বক্ষ দিনু সাজাইয়া
লোচন-ভ্রমর যুগে কবিরা আকুল।
আমার এ রূপ-তৃষ্ণা হইয়া মালিনী
মালঞ্চের মধ্য-ভাগে বসিল তখনি।

এই সকল পুষ্প একসঙ্গে বনে উপবনে ফুটে না—কবির মনেই ফুটে। রূপের পূজারী ফুলকবির রূপতৃষ্ণা এই পুষ্পময়ী কল্পসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হয়েছে।

চরম পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে মন। প্রেয়সীতে মন, প্রেয়সীতে; মনোলক্ষ্মীর চপল ছলে মন, শারদলক্ষ্মীর প্রসাদ ছলে।

প্রেয়সীর কথা আছে বলি—প্রেয়সী কবির কবিতার নানা রূপেই প্রেমাদর লাভ করেছে—কখনও সালঙ্কারা হয়ে প্রতিরূপে বর্ণনায় ধরিয়ে—এমন কি তাহলে-কাটা মনে অবচেতন স্তরে ছুলে। কখনও এসেছে নিরাভরণ অঙ্গে স্বভাব সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত ক'রে, কখনো পত্রলেখার ওচি সুষমা নিয়ে, কখনো পালঙ্কে অন্তরঙ্গমাধুরী বধূরূপে ছলে, কখনও অভিমান-কুটিলা মানিনী ছলে, কখনও আদরে বিগলিতা সোহাগিনী ছলে, কখনও উচ্চহাস্যের লেকদল ফুটিয়ে, কখনও মৃদুহাস্যের মুখী-ফুল ফুটিয়ে, কখনও মেঘ, বেদনার বাষ্পলেশের কণা ফুটিয়ে, কখনও অলক্ষ্য জিভ চরণে অলোক ফুটিয়ে। কখনও কবি এসেছেন আষাঢ়ের মেঘমালার ত আর্দ্রালিত কুন্তল হাতড়ে, কখনও শঙ্খ ছলে খোঁপা দোপাটি কুসুমে খোঁপাটি রিজিয়ে—তাই কবির কবিতায় ফুটেছে প্রেয়সীর নিত্য নব-নবায়মান রূপ। প্রেয়সীর আচার আচরণে, রীতিনীতিতে, মনে বচনে, চালচিত্রে কতই না লীলা-ভঙ্গ! রূপের কবির চোখে কোন্‌টি ফারনি—সবই কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। যুগের ফোনে ফিলটিও কবির কাব্যে মর্যাদা লাভ করেছে। সম্ভোগের কথা লালসার কথা কোথাও নেই, সর্বত্রই পরমতার কথা। এই প্রেয়সী কবির কাছে হয়ে পড়েছেন। যশোদা যাদোবার তো নিত্য সন্তান আছে নিয়ে। রূপের রাণী কবি প্রেয়সীর রূপায়ন দেখে ছেন—আকৃষ্ণকে স্তন্যদানরত কবির হৃদয়ে বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হয়েছে—এই বাৎসল্য রস কবি মনাকে মধুরভাবে লীলা-চঞ্চল করে তুলেছে।

যাকেলের চোখে দেখা প্রেয়সীর এই রূপী রূপ যেটুকু করে যত প্রিয়জনেরই নাগর হয়—তখন মুক্তকুটীর সংসার নিয়ে পরিণত হয়—তখন প্রেয়সীর ধাত্রীরূপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—এই রূপের সম্মুখে কবির মস্তক অবনত হয়েছে বার বার। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে—কোন রূপটি বেশী সুন্দর!

•

বাংলার কিশোর কিশোরীদের প্রেমলীলা চিরন্তন বৃন্দাবনকে আশ্রয় করে সাহিত্যে এতকাল চলে এসেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তা লুপ্ত হয়নি। তারপর ইংরাজী শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীস্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্র, সামাজিক বিপ্লব সে ধারাকে রূপান্তরিত করেছে। বধূর তাকে সে বৃন্দাবনী লীলারস ছেঁচে নেয়। মধুবার নাগরীদের প্রেমলীলাও এখন কাব্য ছেড়ে উপন্যাসকে আশ্রয় করেছে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যের প্রণয়লীলার আদর্শ উপন্যাসের রসজ্ঞ আর মিলবে কিনা সন্দেহ।

যদিচ্ছি কালের সেই মুকুলিতা বধূটিকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিশোর কবির প্রেমলীলার মধুময় কবিতাগুলির উপভোক্তা আর পাওয়া যাবেনা। শান্তা জীবনের যে প্রেমপরিবেশ সে পরিবেশ দেবদারু পাখার কপোত-কপোতীর কূজনে নয়, সে পরিবেশে এসে পড়ে অনেকেই। শুধু সন্তান নয়, শাশুড়ী, কত প্রিয়জন আত্মীয়কুটুম্বে ভরে ওঠে সংসার,—তাদের কথাও কবির বহু কবিতায় এসে পড়েছে। তাদের সঙ্গে এসেছে নানা ব্রত পার্বণ, গৃহাচার, লোকাচার নানা অনুষ্ঠান। তাই নারীর জীবনে প্রিয়াকে পাওয়া যায় নানা পরিস্থিতিতে। এইসব পরিস্থিতি প্রিয়াকে নব নব রূপ দান করে। এই নবনবায়মান প্রেমলীলার কাহিনী কবির কাব্যের-উপজীব্য। নারীর কল্যাণময়ীরূপ বহু রচনাকে ওচি সুন্দর করেছে—সন্ধ্যার দীপ হস্তে নারী, মঙ্গল-কলস কক্ষে নারী, সন্তান বক্ষে, অন্নে যা কক্ষে নারী, পূজার পুষ্পচয়ন-রতা নারী, নৈবেদ্য-হস্তে সমাগতা, কৌতুক-কলহ নারী—নারীর এই মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মীর রূপ রূপের পূজারী কবিকে মুগ্ধ করেছে। 'খোকা-পুকুরে' যার দিয়ে শান্তা প্রেমের সার্থক পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকা যায় না। 'সূর্যমুখী'ও প্রেয়সী থাকে না, অমরও মধু পায় করে না, সন্তানবতী কমলের শান্তা জীবনই আদর্শ। সেজন্য কবির কাব্যে স্নেহময়ী জননী রূপ কবিকে মুগ্ধ করে আছে কবিতায় রূপায়ণ লাভ করেছে। সর্বজনীন নারীর জীবনের এতবড় কবি আর কেউ নহেন। গৃহসংসারের পটভূমিকায় নারীর কল্যাণীরূপই স্নেহময়ী রূপ। নারীর প্রতি কবির উদার মনোভাব নারীমঙ্গল কবিতায় চরমোৎকর্ষলাভ করেছে—

জানি আমি নারী তুমি কবি বিধাতার
শ্রেষ্ঠকাব্য—সুকোমল ভাব পদাবলী,
রূপোরস গন্ধপ্রাণে মাঝে কি তাহার
ন্যায়ের মূরতী সম সকের কাকলী।
যাও অর্ধ মানবীরে—আনন্দ লহরী
জাগায়ে প্রমোদকক্ষে। বহু বিদ্যাবিনী
আঁকলাবিকার বেশে। নূপুর তাহার
বাজে যবে, বাজে যবে মঙ্গল ত্রিভিনী
তাহার, প্রমোদ ঘুরে তুমি মধুকরী—
কি উৎসব! হাসে দীপ, হাসে নেত্রতারা
হাসে অলকের পুষ্প; কলকে কলকে
হাসে তব বক্ষ চোল, হর্ষে হয় সারা।
সারাগৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে।
রূপে তোর পতি তব তোমার সুষমা
পান করে পঞ্চ নেত্রে। আমি মনোরমা।

এই ভাবে কবি পতিপ্রেমে সৌভাগ্যবতী প্রেয়সীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

নিশান্তে কবিতা স্নান, পরি শুভ্র শাড়ী
এলাইয়া ভিজা চুল আর্দ্র কেশ রাশি
মন্ত্রের পূজায় বসে, পরি লাল হাঁস
সাজাও পুষ্পের ডালি চন্দনের বাটী
অর্চনার আয়োজন কিবা পরিপাটী।
বধূর মুখ হেরি, মন্ত্রের আমার
নেত্রে বহে আনন্দের বারি। তুমি শাড়ী
পরি এক আটপৌরে শাড়ী। হে সুন্দরী
কোথা যাও? বিশ্বাধরে আনন্দ না ধরে
পরিহাস বচনচ্ছলে তরুণ যাজনে
তুমিছ দেবতারে কতই আদরে
শত ঘটাময়ী তবু সহজে কবিতা
তুমি সাধ অর্ধময়ী ভাবময়ী গীতা।

অশোকগুচ্ছে নারীর প্রেয়সী ও প্রেয়সীর সোম্মিলিত রূপ এই—নারীর এই রূপই হিন্দু কবিমনের কাছে বরেণ্য। রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রভাতে কবিতার কথা স্মরণীয়।

যাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি তুমি—
এসেছ প্রাণেশ্বরি
প্রাতে, যখন দেবীর বেশে তুমি—
সম্মুখে উদিলে হেসে
আমি সসম্ভ্রমে ধরেছি দাঁড়ায়ে
দুয়ে-অবনত শিরে [চিত্রা)

•

দুর্গম

শরদিন্দু পাল

একটা মোড়ার ওপর বসে সত্যেন চা খাচ্ছিল। খুব আলোচনার ফেরে ধরে বললে, বৌদি, আকেন্তাকে তাড়া দিতে আমিও বলি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রটা একটু বিবেচনা করা যেতে পারে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল সেদিন। ভারী ভালো লাগল। শুধু লোকটাই ভালো নয়, অগাধ পাণ্ডিত্য। এমন একটি লোক যদি শুধু থাকবার জায়গার অভাবে চলে যান তাহলে শুধু কলেজটার ক্ষতি নয়, আমাদের সহরেরও ক্ষতি।

অনাত্মীয় কিন্তু বহুদিনের পরিচিত এই তরুণ ছেলেটিকে মাধুরীলতা যে অত্যন্ত পছন্দ করেন তা বলাই বাহুল্য। এতদিন স্বামীর এক কথাতেও যা হয়নি, কলেজের সেক্রেটারির সহজ অনুনয়ধারা সেখানে বাণ হয়েছে, আজ এই কটি কথাতেই পাহাড়ে চলে উঠল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, ভদ্রলোক এত্তা চলে না হয় বাইরের ঘরটা ছেড়ে দিতে পারতাম, কিন্তু সঙ্গে যে আবার একটি স্ত্রী আছেন। তাঁকেই আমার ভয়। তার ওপর কলকাতার মেয়ে—বুঝতেই পারছ।

সত্যেন বললে, তাঁর স্ত্রীকেও দেখেছি। অনুমানে মনে হয়—

মাধুরীলতা হেসে বললেন, অনুমানে তোমাদের যা সহজেই মনে হয়, আমাদের অত সহজেই তা মনে হয় না।

দত্তোর্শি বললে, কিন্তু একেত্রে বাক্তিকটাকে মনে নিন বৌদি। আমার দ্বিধা বিশ্বাস, তাঁর স্ত্রী তাঁরই মতো অমায়িক হবেন। না, হাসবেন না : আমার বলার। আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, অধ্যাপক পঙ্গু। একটি পা তাঁর নেই। কাঠের ওপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে হাঁটেন। সে যে কী ক। আর ঐ তো বয়েস!

মাধুরীলতা বেদনায় চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক খোঁড়া! কী করে চলে?

—তা জানি না, কিন্তু যে কথা বলছিলাম। অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হল, সেক্রেটারির বাড়িতে। কি নিয়ে কথার সূত্র আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। পাশেই ছিলেন মিসেস দাস—অধ্যাপকের স্ত্রী। অধ্যাপকই বলছিলেন, স্ত্রী তাঁকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারেন না। এই দেখুন না ইন্টারভিউয়ের জন্যে এসেছি, গিন্নি সঙ্গ ছাড়েন নি।

সেক্রেটারি হেসে বললেন, এ যুগে এমন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের। বলেই নিমেষ দাসের দিকে তাকালেন। মিসেস দাস ক্ষুণ্ণও হলেন না, লজ্জাও পেলেন না। স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ বললেন, না, না ভুল করবেন না। নিতান্ত ক্রিপ্‌লড মানুষ—তাই ওঁর একটু বেশি ভাবনা। নইলে প্রেমে গদগদ ওরকম এ যুগের স্ত্রীদের কুণ্ঠিতে লেখে না। They are more practical.

মাধুরীলতা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এ আবার কী! প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে ঐসব কথা তোমাদের সামনে—

সত্যেন হেসে বললে, ভুলে যাবেন না বৌদি, প্রায়ে ত মোড়লে বর্ষে—আর তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে পাস দর্শনের অধ্যাপক। উনি মনস্তাত্ত্বিকতার ধার ধারেন না।

মাধুরীলতা হাসলেন। বোঝা গেল অধ্যাপকের ভাগ্য প্রসন্ন।

বিকেল বেলা।

সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েছিলেন অধ্যাপক দাস। মাথার কাছে হেলানো কাচ দুখানি। কপালে হাত রেখে চোখ বুজিয়ে ছিলেন।

দিন পনেক হল ওঁরা এসেছেন এ বাড়িতে। বেশ পছন্দ হয়েছে জায়গাটা। এক অংশে মাধুরীলতা আর এক অংশে এঁরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আলো-বাতাস প্রচুর। সহরের মধ্যে অথচ নির্জন-নিরিবিলি শান্ত পল্লীটি। চারিদিকে বাগানবাড়ি, পিছনে একটু মাঠ। সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে সরু এক ফালি পাকে-চলা পথ চলে গিয়েছে সহরের আর এক প্রান্তে। পশ্চিম দিকের জানালা খুলে পড়ন্ত বেলায় কিংবা মেঘলা দুপুরে সেই পথের দিকে তাকালে মন উদাস হয়ে যায়। এখানে থাকলে মনে হয়, এ যেন পৃথিবী-ছাড়া এক দেশ। দুটিমেয় কয়েকজন ছাড়া দুনিয়ার আর কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই। যদি চাওয়াই তাই হত তাহলে জীবন সুখের হয়ে উঠত। কিন্তু না নয়, এই অজানা জগত থেকে পুব দিকের রাস্তা দিয়ে ৫ মা বাড়ালেই পাওয়া যায় পৃথিবী—প্রয়োজনের পৃথিবী।

এরই মধ্যে ঘর-সংসার গুছিয়ে

নিয়েছেন দায়-দায়িত্ব। দুখানি ঘর, সামনে একটুখানি বারান্দা। তা হোক, এই যথেষ্ট। দুটিতো মানুষ। বাইরের কেউ এলে বারান্দায় কিম্বা বেডরুমেই দুখানা চেয়ার এগিয়ে বসতে দেওয়া হয়। বিছানা দর দামের, চুকা খাটা লাগী বেডরুমে। ওপাশে একটা বেতের উপরে মোটা কয়েক ছাত আর দুটকেশ ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। এ পাশে টেবিলের উপর মাদীজন্ত নেই – অধ্যাপকের নিত্য প্রয়োজনের। ঘরে আসবাব বা ছবির বাহুল্য কিছু নেই। দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে একটা বড়ো আয়না। র‍্যাকেটে সামান্য কিছু প্রসাধনের জিনিস, কিন্তু একটি বিলাসিতা আছে—সেটি দু বাক্স। রাত দশটা বেজে গেলেই অলকা জ্বালে ঘিয়ে ছালকা নীল আলো। সে আলো যখন নেতে ঈষাঙ্কুর অরুণাভিরুদ্ধ আঁধারও মৈথুনান প্রতিবেশীও তখন জেগে থাকেনা।

অলকা চুল আচড়াচ্ছে আয়নাতে তখন নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল অধ্যাপক টের পায় নি।

অলকা জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছ?

অধ্যাপক চোখ না খুলেই ঈষৎ হেসে বললেন, তোমার কথা।

অলকা সামনে এসে দাঁড়ালো। সলাজে বললে, আমার কথা! হঠাৎ এমন দৌভাগ্য?

—ভাবছিলাম, তোমার কলকাতার বিচ্ছে বোন, আর কোথায়—

অলকা দুই ভিরস্কারের সুরে বললে, তোমার কেবল ঐ এক কথা। বলে সামনে থেকে সরে গেল।

অধ্যাপক বললেন, না; সত্যি-সত্যি কলকাতার কথা ভুলনা করে বলছি না। আমি বলছিলাম—এখানে যা তোমার একটা স্কুল নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, সময় কেটে যেত। কিন্তু এখানে এসে—

অধ্যাপক ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীকে দেখলেন একবার অলকার দিকে।

—এখানকার স্কুলে কিন্তু তোমার একটা কাজ করে যায়।

অলকা তৎক্ষণাৎ না বলে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

এই 'না'-এর যথার্থ কারণটা কী অধ্যাপক তা অনুমান করতে পারেন।

বিয়ের পর থেকে দুজনের যৌথ জীবন বেশ কেটে যাচ্ছিল। অলকার চাকরি করার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু অধ্যাপকই জোর করে পাঠালেন। বললেন, একটা স্কুলে ঢিকে থাকা। পড়াশোনার চর্চা বন্ধ থাকলে চলবে না। অলকা আপত্তি করেনি। স্কুলের সেবে পড়েছিল।

দিন কাটছিল সুখে। কোনোদিন নিজে কিম্বা আসে, কোনোদিন বা অলকা। এক সঙ্গে চা খেতে বেরুবে পড়ত দুজনের। অধ্যাপকের ছিল বেড়াবার পথ। কিন্তু একলা নয়। অলকা আসার পর সেই পথটাই সেরা হয়ে দাঁড়ালো। দু'জনে হাঁটত পাশাপাশি। অলকা প্রায়ই পরত শাড়ি। অধ্যাপকের মনে এঁকে দিতে পারবে। ফলে ধরে ধরণ মানাবে। চওড়া কপালের ওপর উড়ে পড়ত চুল। চলতে চলতে অলকা মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে তাকাতো। কোনোদিন তারা বসত গিয়ে গঙ্গের ঘাটে, কোনদিন বা আউট-রামে যাওয়া। আবার কোনো দিন চলে যেত ডক্টরেবরে—পুণ্য সলিলের আশিসে মন স্টার্লিংডেন ইচ্ছাটা ছেঁটে পার হবার লোভে। ছুটির দিনে তাদের আর সহরের মধ্যে ঘুরোতে না, চলে যেত আশেপাশের সহরতলীতে। সেখানে চলত দুজনের পথ-পরিক্রমা। সহরে

ইট পাথরে ঠোকর খাওয়া ক্লান্ত চোখ দুটো সবুজ গাছপালা দেখে জুড়োবে। যেত।

এমনি সময়ে ঘটল দুর্ঘটনা। প্রাণটাই চলে যেত। তারা ভালো, প্রাণটা গেল না, গেল একখানা পা।

এত বড় দুর্ঘটনার পরও অধ্যাপক যেন সামলে উঠলেন, কিন্তু অলকা যেন কেমন হয়ে পড়ল। অথচ অলকা সেদিন কী কঠোর হয়েই সব সহ্য করেছিল। হাসপাতালে গিয়ে যখন স্বামীর রক্তাক্ত অচৈতন্য দেহখানা দেখল তখনও এতটুকু দুর্বলতা ধরা পড়েনি। পা অপারেশন হল; রক্ত মাংসের পা চলে গেল। যখন সেই কাটা পা খানা নিয়ে বাড়িতে তখনো অলকা শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে।

বজ্রাঘাতের পরের বদলে এল কাঠের অবলম্বন—ক্রাচ। তারপর এক পা এক পা করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন অধ্যাপক। দু হাতের বাঁচে দুটো কাঠের অবলম্বন। কাঠটা অবশ্য খুব লম্বা—পালিশটাও সুন্দর। কিন্তু অধ্যাপক কিছুতেই ভালো করে হাঁটতে পারছিলেন না। কেবলই মনে হচ্ছিল এই বুঝি পড়ে যাবেন। পাশেই ছিল অলকা। বারে বারে অধ্যাপকের চাপা ধরে উৎসাহ দিচ্ছিল—আর একবার চেষ্টা করো লক্ষ্মীটি, আর একবার।

ক্রমে অধ্যাপক সুস্থ হয়ে উঠলেন। ঘর ছেড়ে এক পা, দু'পা করে বাইরে চলতে লাগলেন। শেষে কলেজেও জয়েন করলেন। বিদ্যা করে যান, বিদ্যা করে আসেন। যতক্ষণ না তিনি বাড়ি ফেরেন অলকার দুর্ভাবনার শেষ থাকত না। ঘুম পেতে বসে থাকত বাইরের ঘরে। রিক্সার শব্দ পেলেই বাইরে বেরিয়ে আসত। তাড়াতাড়ি গিয়ে অধ্যাপককে ধরতে সাহায্য করত।

কি. এই শুধু জানেটা খুব শিগগিরই দুঃসহ হয়ে উঠল অধ্যাপকের। এমনি করে কি সারা জীবনটাই ঐ রিক্সা কিংবা ট্যাক্সি কিংবা দুটো পা ধরে কাটবে? আর ঐশ্বর্যকে তত পাবেন না? একদিন তাই কলেজ থেকে ফেরার পথে তিনি রসিক হয়ে উঠলেন ট্রামে। পারলেন না। ছয়জন ছিড়ে। ছিটকে পড়ে গেলেন ফুটপাথে। লোকে চেঁচিয়ে উঠল, ট্রাম থামল, ভিড় জমল। না, কেমন কোনো আঘাত পাননি। শুধু কলেজের ডাক্তার ডেকে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

অলকা সেদিন থেকে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিল। নিজেও নিল ছুটি ছেড়ে। বলল, আর এখানে নয়। মফস্বলে চাকরি নেবো। ছোট মাইনে হোক, ছোট মফস্বল শুধু তো সব সময়ে সাহায্য করতে পারব।

অলকার মনস্থির পূর্ণ হয়েছে। আশ্চর্য, প্রতিটি মুহূর্তে সে রয়েছে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে। কলেজ যাবে, বিদ্যা এসে দাঁড়ায়। নিজে গিয়ে তুলে দেবে স্বামীকে। এটুকু যথেষ্ট। কিন্তু অলকা পারে না। নিজেও যাবে কলেজ পর্যন্ত। স্বামীকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে। স্বামীর প্রতিদিনের কর্মসূচি জানা আছে। ঠিক সময়ে বিদ্যা নিয়ে হাজির হবে। প্রথম প্রথম লজ্জা করত অধ্যাপকের। কিন্তু ক্রমশঃ তা অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। এখন নিজেও যেন কেমন তুচ্ছ হয়ে পড়েছেন। অলকা না থাকলে একপা যেতেও ভরসা পান না। বুক কাঁপে। মনে হয়, আবার বুঝি কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে।

কিন্তু আর একটা দিকও ভাববার আছে। সেই কথাই আজ আর একবার এই অপরাহ্নে টাঁকচেয়ারে শুয়ে শুয়ে অধ্যাপক ভাবছিলেন।—সব কথা তো মুখ ফুটে বলা যায় না। এই দুর্ঘটনা শুধু যে তাদের বাইরের জীবনে একটা বিরাট ঘটিয়েছে তা নয়, দু'জনের মনের মধ্যেও একটা ওলোট পালোটের ভূমিকা তৈরী করে দিয়েছে। অধ্যাপক লক্ষ্য করেছেন অলকার হাসি মিলিয়ে গিয়েছে, যেটুকু হাসে তা জোর করে টেনে আনা হাসি। যেটুকু চাঞ্চল্য তা শুধু তাকেই খুশি করার জন্যে। লোকলৌকিকতা সব বর্জন করেছে, আরও কত কী যে হেরেছে—অধ্যাপক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

আর তাঁর নিজের মনের বিপর্যয়টা কী? সেও ঐ অলকাকে নিয়ে। তাই ভয়ে আর একটা জীবন দিনে দিনে এইভাবে শুকিয়ে যাবে এ যেন আর সহ্য হয় না। অলকা কাজ নিয়ে থাকুক, সোসাইটি নিয়ে থাকুক—গান-বাজনা সিনেমা উৎসব নিয়ে মেতে থাকুক—এর প্রাণের স্পন্দনে তাঁর নিজেরও প্রাণ মেতে উঠবে। কিন্তু অলকা তাঁকে বোঝে কই? এই কথাটাই কেবল ঘুরে ফিরে তাঁর মনে হয়, অলকা সব আনন্দ থেকে নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে নিয়ে এই কথাই তাকে বারে বারে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে সে পঙ্গু—অনুকম্পার পাত্র।

এত বেদনার মধ্যেও শুধু অধ্যাপক হঠাৎ হেসে ফেললেন,—ওগো অলকা-সুন্দরী!

অলকা হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কী আদেশ অধ্যাপক।

অধ্যাপক এ হাসি ফেলেন। তাই এই কৃত্রিম হাসিতে বিচলিত হলেন না। একটু বেদনার্তস্বরে যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা ঘটল।

—কী গো, খুব ব্যস্ত নাকি? মায়ূরীলতার গলা। একটু চমকে উঠল দুজনেই। অলকা মাথার কাপড়টা তুলে দিল। সিহনে আরও একজন।

মায়ূরীলতা বললেন, নাও বাপু একে দেখে এই লজ্জা করবে হবে না। এই আমার দেওর।

অলকা তড়াক লোফ করে নমস্কার করল।

সন্তোষ বলল, আমায় বিশ্বাস চিনতে পারছেন না। কিন্তু আমি একদিন দেখেই আপনাদের মনে রেখেছি।

অলকা কী উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, কিন্তু ভাগ্যবশে অধ্যাপক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অতিথিদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। আনন্দে উচ্ছ্বাসে কৃতজ্ঞতায় সন্তোষের দু হাত ধরে সামনের চেয়ারে বসালেন। বললেন, জানো অলকা, এ বাড়িতে আমরা আসতে পেরেছি একমাত্র এঁরই অনুগ্রহে। কী বলুন? বলে তাকালেন মায়ূরীলতার দিকে।

মায়ূরীলতা বললেন, ঠাকুরপো না বললে আমি কিছুতেই রাজি হতাম না। আর তার ফলে আপনাদের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্যও হত না।

—সুতরাং তুমি সবার আগে একটু চা আর মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করো। অধ্যাপক হাসতে হাসতে অলকাকে বললেন।

অলকা কিন্তু তখনই গেল না। মায়ূরীলতাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা মোড়ার ওপর বসল।

—এ কী। তুমি যে—

অলকা বলল, না যে। অনেক মানুষ এল, আগে আলাপ করি, তারপর তো আপ্যায়ন।

সন্তোষ বলে উঠল, ঠিক বলেছেন,

—আলাপটাই আসল, আয়োজনটা নিছক আতিশয্য। আজ দেশ জুড়ে এত ঈর্ষা হিংসা কেন জানেন? মানুষ নিজেকে ভাবে নিঃসঙ্গ তাই ভুলে গেছে। যেটুকু মেলামেশা দেখেন তা—

মানুষীলতা বলে উঠলেন, অর্থসিদ্ধির জন্যে! বলো কী ঠাকুরপো! এ তো জানতাম না। তা হলে এবার থেকে সাবধান হতে হবে।

অলকাও হেসে ফেলল। অধ্যাপক হাসি লুকোবার জন্যে আস্তে আস্তে মুখ ফেরালেন।

সন্তোষ বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালো না। বললে, আপনারা সকলেই আধুনিক—আমার যৌবন কিন্তু শিক্ষিত না হতে পারেন, কিন্তু অশিক্ষিত নন, সকলেই খবরের কাগজ পড়েন—অন্তত খবর রাখেন—এই যে এক-এক দেশের নেতারা এক-এক দেশে সফরে যাচ্ছেন, বলুন তো কতটুকু আইটেম নিয়ে তাঁরা দেখা করতে যান। তাঁদের প্রত্যেকের বুকের ওপর কি একটা করে ফুটনোটের বুকপোস আঁটা নেই? আমাদের দেশেই দেখুন না, হঠাৎ মনে দেশপ্রেম উথলে ওঠে তখনই মনে পড়ে যায় গো-সংযোগের কথা। আর কে না জানে এ সব-কিছুর পিছনেই রয়েছে ইলেকশানের তাগাদা! তাই বলছিলাম, আমরা আলাপ করতে ভুলে গেছি—মানুষের সঙ্গে মিশতে চাই না।

এবার আর কারও মুখে হাসি ফুটল না। অধ্যাপক মৃদু কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য হালকা সুরে আপনি আশ্চর্য গভীর কথা বললেন সন্তোষবাবু!

—বাবু-টাবু নয়, আমাকে বন্ধুর মতোই নাম ধরে ডাকবেন। হয় তো বা আপনার চেয়ে অনেক বছরের ছোটই হব। এমন কি মিসেস হালও যদি ইচ্ছে করেন, আমার নাম ধরে ডাকতে পারেন।

অধ্যাপক খুশি হয়ে তাকালেন অলকার দিকে। কিন্তু অলকার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

সে দিন তার পরেও অনেকক্ষণ আসর জমে রইল। অলকাও যেন সহজভাবে কথা বললে সন্তোষের সঙ্গে। হাসিতে গল্পে সেদিনের বিকেলটা বড়ো সুন্দর ভাবে কেটে গেল। অধ্যাপক লক্ষ্য করলেন, অনেক দিন পর অলকার খুশি দেখছে। অলকা যে স্বাভাবিক ভাবে ফিরে আসছে।

আসর ভাঙল সন্তোষ মুখে। সকলে উঠে দাঁড়ালো। অধ্যাপকও ওঁদের সঙ্গে চকল হয়ে উঠলেন। অলকা বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি দেওয়ালের কোণ থেকে লাঠিটা এনে দিলে। অলকার কাঁধে ভর দিয়ে অধ্যাপক উঠে দাঁড়ালেন।

—চলুন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বললে, আপনি আবার কেন—

—যা হোক।

খট্ খট্ খট্। অধ্যাপক হাঁটছেন। সামনে সন্তোষ। ওদের দেখে দিয়ে মানুষীলতা চলে গেলেন। সন্তোষকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন অধ্যাপক। দুটি হাত জোড় করে নমস্কার করলেন—আসবেন। অলকা তো নেমন্তন্ন করেইছে।

—নিশ্চয় আসবেন।

অধ্যাপক ফিরে তাকালেন।—তুমিও এসেছ?

অলকা সে কথার জবাব না দিয়ে সন্তোষকে বললে, কাল যাবেন। আজও সকাল সকাল আসবেন কিন্তু।

সন্তোষ সন্তুষ্ট জানিয়ে চলে গেল।

অধ্যাপক ফিরছিলেন, অলকা কাছে সরে এসে বললে, সাবধানে চলো। বড় পেছল। এই বলে টর্চ জ্বাললে।

বাস্তু এগারোটা।

ঘাট পাওয়ারের বাল্ব নিভে গেছে। জ্বলছে নীলচে আলো। কতক্ষণ জ্বলবে? তার ঠিক নেই। ঐ আলো জ্বেলেই ঘুমিয়ে পড়ে অলকা। মাঝ রাতে কখন আবার উঠে নিভিয়ে দেয়।

আজও জ্বলছিল সেই আলো। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে মন্থর গতিতে। এই কিছুক্ষণ আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বড় মধুর হাওয়া। অধ্যাপকের চোখে ঘুম নেই। অলকা শুয়ে আছে তার পাশেই বালিশে মুখ গুঁজে। এক-রাশ চুল বালিশ থেকে বিছানার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। অনাবৃত পিঠের ওপর নীল আলো এসে পড়েছে। অধ্যাপক একটু কাত হয়ে উঠে বসলেন। বড় অদ্ভুত লাগছে আজ অলকাকে। অনেক দিন এমন করে দেখা হয় নি, অনেক দিন এমন অনাবৃত ভাবে অলকা শোয়নি। স্থাবদ্ধ দৃষ্টিতে অধ্যাপক সেই মুখটাকে দেখতে লাগলেন। আজ অনেক দিন পর তাঁর নিজেরও কেমন যেন একটা অদ্ভুত ইচ্ছে করছে—একটা দুর্ধিবার প্রয়োজন! কিন্তু বারে বারে নিজেকে সামলে নিচ্ছেন। এবারে খুব ইচ্ছে করল ঐ পিঠের ওপর মুখটা গুঁজে রাখে। কী হত তাহলে?" ঘুম ভেঙে যাবে? বিরক্ত হবে? আরও কিছু চাইবে? না না না। সে ভাষা আজ তাঁর নয়। দুর্ঘটনার পর থেকে অলকা অনেক কিছুই ভেঙেছে—দেহের বিলাসটুকু পর্যন্ত। সেইটেই অধ্যাপকের পক্ষে চরম দণ্ড। অথচ সে দণ্ড দেব বলে অলকা প্রস্তুত ছিল না। কতবার—কতবার সে রাত্রির কথা অধ্যাপকের মনে পড়েছে, অধ্যাপক তাড়াতাড়ি তা চাপা দিতে চেয়েছে। আজ আবার মনে পড়ল।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে অনেক মাস হয়ে গেছে তখন। কোনো রাতেই এখন আর অলকা ভালো করে ঘুমোতে পারে না। একটু শব্দ হলেই চমকে জেগে ওঠে। অধ্যাপকেরও ঘুম ভেঙে যায়। অলকা তাড়াতাড়ি বেড-সুইচ টিপে আলো জেলে জিজ্ঞেস করে, তুমি বেরোবে?

—না।

—যদি দরকার হয় আমায় ডেকো। একলা উঠোনা। তখন থেকেই অলকার ভয় শুরু হয়েছে—যদি পড়ে যায়!

অনেক দিন পর সে রাতে অলকা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। এমনি অনাবৃত দেহ—এমনি নীল আলো। অধ্যাপকের এই একটা অভ্যাস ছিল, ওর ঐ অনাবৃত পিঠে মুখ দিয়ে আদর করা। সাবধানে তাঁর উঠে পিঠে মুখ রেখে বারে বারে চুমু খেলে। প্রথমটা অলকা চমকে উঠেছিল, তারপর চুল ভরে পড়ে রইল। হাঁ, অনেক দিন পর সেই গভীর রাতে নীল আলোর নীচে দেহ জেগে উঠল। ঘরে ঘরে বেজে উঠল সুরবাহার। অলকাও শুনতে পেল সে দেহের গান। একটুও বাধা দেয় নি। ঠিক যেন বিয়ের পরে নতুন বৌ। কী আদরটাই গেল! কিন্তু—

কিন্তু তার পরেই ঘটল বাধা। অধ্যাপক লাফ দিয়ে আলিঙ্গন করতে গেলেন—হঠাৎ অলকা শিউরে উঠে ছিটকে দূরে চলে গেল। চলে গেল একেবারে খাট ছেড়ে মাটিতে—চোখের আড়ালে। বিস্ময় বিমূঢ় অপমানবিদ্ধ অধ্যাপক প্রথমে বুঝতে পারেন নি। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দেখতে গেলেন। দেখলেন অলকা দু হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ঘুমে এ রাত্রি? অলকা তার উত্তর দেয় নি।

কিন্তু সে উত্তর অধ্যাপক মনে মনে পেয়েছিলেন। সেই থেকে বিছানায় তিনি একটি ব্যবধান রচনা করলেন দু জনের মাঝে। যাতে অলকার ঘুমের ঘোরেও তাঁর এ ভাঙা পা-টা অলকার গায়ে না ঠেকে।

আশ্চর্য! সে ব্যবধানে অলকা একটিবারও আপত্তি করে নি। সে ব্যবধান অতিক্রম করার চেষ্টা এতগুলো মাসের মধ্যে আর দ্বিতীয় দিন করেনি। বরঞ্চ সেদিন থেকেই।

আজ—

আজ এত মাস পর আবার একটি দুঃসহ দুঃখ করল অধ্যাপককে? পঙ্গু-মানুষের ব্যবধান ডিঙিয়ে নামিয়ে ফেলল। দু চোখ অলকার ধক্ ধক্ করে। বুকের ভিতর যন্ত্রের মতো বাজা দিচ্ছে বারে বারে। উঃ, অনেক দিন পর আবার সেই চাঁদ-ঝুলানো-রাত চিরচঞ্চল যুবতীটি স্বভাবে ফিরে এসেছে। আজ তাকে চাই। সে ধরা দেবেই। উদ্‌ভ্রান্ত অধ্যাপক লক্ষ্য সেই অনাবৃত শিরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। চমকে উঠল অলকা। ভয়ে লজ্জায় নীল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দুহাত দিয়ে প্রাণপণে ঠেলে দিল স্বামীকে পঙ্গু পুরুষ পড়ে গেল বিছানায়। অলকা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। উঠে গিয়ে খাবে ফ্লাইটটা নিয়ে নিল। তারপর আলো নিভিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল মাটিতে। অন্ধকারে পা লেগে ক্রাচ দুখানা সশব্দে পড়ে গেল—পা দিয়ে অলকা সেটা আরও দূরে ঠেলে দিলে।

একটা বোবা ভাষা অধ্যাপকের বুকের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল। শুধু লজ্জা নয়—অপমান দুঃখ বেদনা—এ দুঃসহ রাত কাটাবে কেমনে?

রাত ভোর হবার আগেই কিন্তু অধ্যাপকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরে স্ত্রীর পায়ের শব্দ। উঃ, অলকাই। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে ক্রাচ দুটো ঠিক জায়গায় রেখে দিল। তারপর আবার আলো নিয়ে মাদুরেই।

সন্তোষ বেলায় অধ্যাপক আর মুখ দেখাতে পারেন না। গম্ভীর হলেন। কিন্তু আশ্চর্য অলকা। সকাল বেলাতেই স্নান সেরে, ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজটা দিয়ে গেল। প্রত্যহ রবিবারের মতোই আজও সহজ সুরে বললে, চা-টা খেয়ে নাও পরে খাবার হলে আবার চা দেব।

অধ্যাপক চা মুখ তুলতে পারলেন না। খানিক পরে অলকা জলখাবার আর চা দিয়ে গেল। দিয়েই চলে গেল না। অধ্যাপক কাগজ পড়ছিলেন, তাঁরই পাশে একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়ে নিতান্ত অকারণেই নিবাসক্ত ভাবে দু-একটা লাবণ্যের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

কিন্তু অধ্যাপকের মন থেকে গ্লানি যায় না। কিছুক্ষণ পরে উঠে টুপ টাপ ভিতরে গেলেন। অলকে দেখতে চাইলেন অলকা কী করছে। অর্থাৎ অন্যদিনের মতোই স্বাভাবিক কিনা। রান্নাঘরের কাছে যেতেই শুনতে পেলেন অলকা গান করছে গুন গুন করে। মনটা অনেকটা হাল্কা হল। মনে মনে ভাবলেন, গত রাত্রির ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো দুজনের মন থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক না?

বিকেলবেলায় সন্তোষ এল। দু-জনেই যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেল। এতক্ষণ যাদও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে কোনো একাধা গ্লানি-বোধ ছিল না, তবুও যেন সহজভাবে মিশতে পারছিল না—কেউ কারও কাছে আসতে পারছিল না। সন্তোষ এসে এই দুই প্রান্তের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করল।

চা-পর্ব সমাধা হলে সন্তোষ অলকাকে বললে, নিন তৈরী হয়ে নিন। বেড়াতে যাব।

অলকা অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলবার আগেই সন্তোষ বলে উঠল, দাঁড়ান বৌদিকেও বলে আসি। এই বলে ত্বরিতপদে চলে গেল।

মিনিট পনেরো—আশ্চর্য মায়াবী-লতাকে নিয়ে ফিরে এল সন্তোষ। মায়াবীলতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,—দেখো দিকি ভাই, কী জ্বালা। আমি এখন বেড়াতে যাব কোথায়। সন্ধী কাজ পড়ে রইল—ভিজুরেই কি গুমরে।

অলকা ঠোঁটের ওপর মুক্তার একটি দীপ্তি করে হেসে বললে, এই তো বেশ। যান বেরিয়ে আসুন।

মায়াবীলতা মাথা নেড়ে বললেন, পাগল করেছ: তুমি বাঁচ যাও তো না হয় একটু ঘুরে আসতে পারি।

অগত্যা অলকাকেও রাজি হতে হল। সন্তোষকে ইশারা করলে অধ্যাপককে বলতে। না, অনুমতির জন্যে নয়, তাঁকেও যে সঙ্গে চাই।

অলকার ইশারাটা অধ্যাপকের চোখ এড়ায় নি। অথবা অলকা স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ইশারা করেছিল।

সন্তোষ প্রস্তাব করল। ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু অধ্যাপক কোনো কথাই বলতে পারলেন না। বেড়াতে যাওয়া। সেই বেড়ানো! ঘটনার পর থেকে আর তো কোনোদিন বেড়াবার কথা কল্পনাতেও আসে নি। অলকা আলনা মেরামতে গোছাতে লজ্জা করছিল অধ্যাপককে। অধ্যাপক বললেন, আমার আবার যেন টানছেন ভাই। আপনারাই যান না। আপনাদের চলার আনন্দে শুধু ছন্দপতন ঘটাতেই পারি।

অলকা ক্রাচের কোণে খবর দিয়ে বললে, যাবে কথা রাখো তো। ওরো। না বেড়িয়ে বেড়িয়ে পথার তো মেয়ে বলেছে।

অগত্যা অধ্যাপককে উঠতেই হল। দীর্ঘ দুপাব ফাইন সুতি, গিলের একটা পাঞ্জাবী, হাতে রিস্টওয়াচ। এক মাথা কালো কুচকুচে কোঁকড়া চুলের ওপর চিরুনিটা একবার বুলিয়ে নিলেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে অলকা সেই পরিচিত মানুষটিকে নতুন বিস্ময়ে দেখেছিল, অধ্যাপক এই সময়ে হাত বাড়ালেন। অলকা তাড়াতাড়ি কাচ দুটো এগিয়ে দিল।

—কত দূর যাবে?

সন্তোষ বললে, যাওয়ার কি শেষ আছে? যতদূর যাওয়া যায়।

অধ্যাপক সন্দিগ্ধভাবে বললেন, তা হলে আমায় সঙ্গে নিলেন কেন? আমি তো—

অলকা চলছিল স্বামীর ঠিক পাশে পাশেই আস্তে আস্তে। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললে, আমি তো আছি, ভয় কী!

কিসকে সেদিন বেশ যাওয়াই হয়েছিল। যা হোক, শুধু অধ্যাপক দেখলেন, অলকা বেশ খুশীই হয়েছে। বুঝলেন, কোন বিশেষ একজন মানুষের সঙ্গে একটানা একই পরিবেশে থাকতে থাকতে প্রাণচঞ্চল মানুষেরও প্রাণের জোরে ভাটা পড়ে যায়। মাঝে মাঝে তাই এই একঘেয়েমীর হাত থেকে পরিত্রাণ

চাই। মনের মতো [illegible] মনের [illegible]। জীবনের জীবনটা সবুজ হয়ে ওঠে, বসার জন্য গাছতলা খোঁজার মতো।

মাধবীলতা বললেন, বাবা: এইটুকু সময়ে কিছু এত দেখবার জানবার আছে তা তো জানি না।

সন্তোষ বললে, কৌতুল এখনো কিছুই দেখা হয়নি। আরও অনেক দেখার আছে। জানেন তো দেখার মতো চোখ থাকলে ভাগাড়ঙ্গিনির মধ্যেও স্বর্গলোক খুঁজে পাওয়া যায়।

বলেই অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে বললে, এবার থেকে প্রত্যেক রবিবার আমরা বেরোব। আপনাকেও কিন্তু চাই আমাদের মধ্যে।

অধ্যাপক বেদনার্ত স্বরে বলে উঠলেন আমি!

অলকা কাছেই ছিল তৎক্ষণাৎ জোর করে একটু হেসে বলেন, নিশ্চয় তোমাকে থাকতে হবে। বলেই হঠাৎ দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কে জানে, বোধ হয় ওর মনে পড়েছে আগের দিনগুলোর কথা—যখন দুজনে একসঙ্গে না বেরোলে একটা বিকেলও কাটত না সুখে।

বেজানো শুরু হল। হাঁ, প্রতি রবিবারই। দুপুরেই সব থেকে প্রফুল্ল-মুখ। মাধবীলতা কোনোদিন ডাকেন, ও অলকা, আর ঘুমিও না তিনটে যে বাজে। এখুনি চাকুরপো এসে পড়বে।

কোনোদিন অলকা গিয়ে কড়া নাড়ে—লিপি, এখনো শুয়ে আছেন! এক্ষুণি সন্তোষবাবু এসে পড়বেন।

হাঁ, সন্তোষের এই আসাটা এখন একটা পরম লাভের মতো। এসে পড়বে। একটা অত্যন্ত সুখবহবাহী ঝড়ের মতো—দারুণ প্রীতির এক পলকা ঝটিকার মতো তার আগমন।—এখনো বোঁচি জন নি! কী ঘুমকাতুরে বাবা বেরোবেন! না না আমার অত ঘটা করে চৌবিল চেয়ার দিতে হবে না। আজো চা দিন। উঃ বড্ড দেরি হয়ে গেল।

এক নিশ্বাসে কথা। একটু সুযোগ দেবে না। কেবল তাড়া—চলো চলো—বেরিয়ে পড়ো। দেরি কোরো না। আকাশ তাকাচ্ছে, বাতাস তাকাচ্ছে, মাঠ ইশারা করছে—নির্জন গঙ্গার ধার হাতছানি দিচ্ছে। এখন কি আর ঘরের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে বাজার দর বিচার করার সময়?

বেরিয়ে পড়ে তিনজনে। মাধবীলতা আর সন্তোষ যাবে যাবেই এগিয়ে যান। আবার থামেন। অনেক পিছনে অধ্যাপক। কিন্তু পাশে পাশে অলকা।

এই এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল। জীবন যেন নবযৌবনে নবীন মাধুর্যে ভরে উঠল। বেড়ানো আর বেড়ানো। এ কী নেশা ধরল এদের। অধ্যাপক স্তম্ভিত হয়ে যান। এই কদমাসে কী পরিবর্তনই না হয়েছে অলকার! সে পরিবর্তন মুখের না বেদনার বলতে পারা যায় না। তবে সে অলকা আর নেই। এখন যেন একটা ট্রানকুইলন তাকে পেয়ে বসেছে। কেবলই তিনজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলেছে। এখন বেড়াবার পরিধিও বেড়ে গেছে। এই সংসারটুকুর মধ্যে আর কুলোয় না। ইতিমধ্যে অলকার জন্মদিন সন্তোষের নেমন্তন্ন করেছিল। সে তো উপলক্ষ দিয়ে বলল কতকগুলো ভ্রমণ-কাহিনীর বই।

অধ্যাপক লক্ষ্য করেছেন আজকাল অলকার বেশির ভাগ সময়ই কাটে সন্তোষের সঙ্গে বা সন্তোষের আলো-

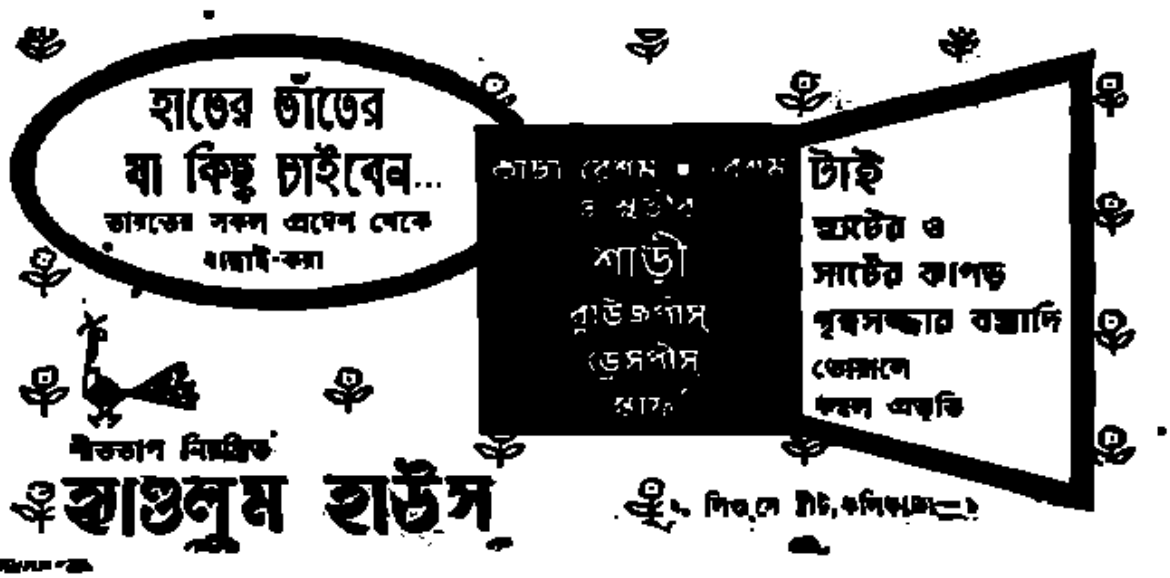

চলায়। মাধুরীলতার অনেক ভাড়া। তিনি বললেন, তোমরা দুজনে ঠিক করো কোথায় যাবে, আমার সেখানেই যাওয়া।

অলকা এতে অধ্যাপকের আনন্দ পাবার কথা। অলকা যে নিজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফিরে এসেছে—এতদিন তো এটিই তিনি চাইছিলেন। আর ও জন্যে তিনি সন্তোষের কাছে কৃতজ্ঞও। কিন্তু—

তবু অধ্যাপকের মনে কোথায় যেন একটু অভিমান। এ বাড়িতেই যদি আলোচনা হয় তা হলে কেবল মাধুরীলতার ঘরে কেন? কেন অলকাই যাবে যাবে ওঁর ঘরে গিয়ে বেড়ানোর প্রোগ্রাম করবে? আর ঘরে কি জায়গা নেই?

প্রথম প্রথম উৎসুক ভাবে প্রতীক্ষা করেছে, এখুনি বুঝি অলকা ওদের সবাইকে টেনে নিয়ে এ ঘরেই আসবে। কিন্তু সময় কেটে গিয়েছে, কেউ আসেনি।

বেলা হয়তো দশটা। ও বাড়ি থেকে ফিরের মেয়েটা ডেকে গেল, দিদিমণি, মা একবার ডাকছে। এই ডাকটি প্রত্যহ-পক্ষে তার তা অধ্যাপক জানেন। তাড়াতাড়ি একটা বই নিয়ে আড়াল করে অলকাকে লক্ষ্য করে। সব পড়ে রইল, এই অসময়েই চুকল বাসন মাজতে। তাড়াতাড়ি বাসন ধুয়ে এসে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। চুলটা ঠিক করে নিল। তারপর চলে গেল ও বাড়িতে। যাবীকে কিছু বলারও প্রয়োজন মনে করল না। একবার ফিরেও দেখল না; একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস এবের আড়াল থেকে দুটি অসহায় চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওদের পেছন থেকে কতক্ষণ নিঃশব্দে অনুসরণ করছে।

একদিন অধ্যাপক শুনতে পেলেন সন্তোষ বলছে, অলকা বৌদি, জীবনে যদি পাহাড় নাই দেখেন, আফশোষের সীমা থাকবে না। জানেন পাহাড় হাতছানি দিয়ে মানুষকে ডাকে? চলুন, ঘুরে পড়ি বদ্রীনাথের পথে।

অধ্যাপকের হৃৎপিণ্ডে সহসা তাল কাটা দিল। উৎকর্ণ হয়ে থাকলেন, অলকা কী উত্তর দেয় শোনার জন্যে। কিন্তু অলকার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তবে সৌদন সারা দুপুর উপুড় হয়ে, মাটিতে শুয়ে বুকে বালিশ দিয়ে পড়ল পথপ্রদর্শকের পথে।

অধ্যাপক হঠাৎ ডাকলেন—অলকা!

অলকা ধড়মড় করে উঠে বসল। —ডাকলে?

অধ্যাপক কোনো কথা বললেন না। চুপ করে চোখ বুজিয়ে কপালে দুটি হাত রেখে শুয়ে রইলেন।

—ওষুধটা দেব?

অধ্যাপক মাথা নাড়লেন। —না। ওঁর দু চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। অলকার বোধ হয় তা চোখে পড়েনি।

বদ্রীনাথে যাওয়া হল না, কিন্তু সেবার পুজোয় পাহাড় সাজাই ওঁদের ডাকল। চলে এলেন এঁরা ছোটো নাগপুরের একটা ছোট পাহাড়ে দেশে।

পাহাড় দেখেনি কেউ, পাহাড় দেখতেই হবে। অধ্যাপকও পাহাড় দেখেননি, কিন্তু তিনি যেতে চাইলেন না। প্রচণ্ড জিদ করে বললেন, তোমরা যাও, আমি যাব না। একটা দিন আমি একাই বেশ কাটিয়ে দিতে পারব।

অলকার দু চোখ ছল ছল করে উঠল। বললে, এমন কথা আজ তুমি বলতে পারলে! তুমি কি জান না, তোমাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

অধ্যাপক মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উঁহু, ঐ একটা কথা 'নিশ্চিন্ত'। ঐ কথাটা খুব ভালোভাবেই চিনেছেন অধ্যাপক। 'নিশ্চিন্ত' থাকতে পারে না অলকা! কিন্তু আর কিছু নয়? শুধু একটা আশঙ্কা—একটু ভাবনা? এই জন্যেই কাছে আছে থাকা? তাই দূরে পাঠাতে চাইছে? আর কিছুই কি আজ আর আশা করার নেই? বহুমানের গড়া একখানা পাথরের সঙ্গে সঙ্গে সে কি সব ভাসিয়ে ফেলেছে? হ্যাঁ, তাই। একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েও আজ আর স্বামীর অধিকারটুকু পর্যন্ত তার নেই। তার স্পর্শ পর্যন্ত অলকার সহ্য হয় না। অধ্যাপক জানেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিসত্তার প্রতি অসম্মান নয়—আসলে ঘৃণা পর্যন্ত কাটা ঐ বিকৃত দেহাংশটা অলকা সহ্য করতে পারে না। তার গা শিউরে ওঠে। সেইজন্যেই পুরো মানুষকে ভালবাসতে চায়—একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের কাছে ধরা দিতে চায়। তাই অধ্যাপক বুঝে নিয়েছেন আর দুটি বছর আগেও বিহ্বল কলঙ্ক দিনে অযাচিত ভাবে যা সে পেয়েছে এবং অকুণ্ঠভাবে যা সে দুহাতে বিলিয়ে আজ আর কিছুতেই তা পাবার উপায় নেই। অলকা অকৃতজ্ঞ নয়, তাই সে একদণ্ড ছেড়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

কিন্তু তবু অধ্যাপককে এদের সঙ্গে যেতে হল।

পাহাড়ে দেশ। এর আকর্ষণটাই পাহাড়ের। যেদিকে তাকাও শুধু পাথর আর পাহাড়। অবাক বিস্ময়ে এরা দেখে। কিন্তু শুধু দেখা নয়, পাহাড়ে উঠতে হবে। ঠিক হল বিকেলে তারা সব চেয়ে কাছের একটা পাহাড়ে উঠবে।

বেলা থাকতেই বেরিয়ে পড়ল চারজনে। মেঘলা আকাশ। ইউক্যালিপ্টাসের উগ্র গন্ধ। দূরের আকাশের গায়ে পাহাড়ের নীলিমা মিলে গেছে। দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মাদলের শব্দ। এগিয়ে চলেছে সন্তোষ আর মাধুরীলতা অলকা আর অধ্যাপক।

একটু পরেই পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়ালো সকলে। এত কাছে পাহাড় কখনো দেখেনি। অলকা ছুটে গিয়ে পাহাড়ের সব নীচের পাথরটা স্পর্শ করল। মাধুরীলতা শুধু বিস্ময়ে ঘাড় উঁচু করে দেখছেন। অলকা মুখ তুলে বললে, আমরা উঠব না? বলেই তাকালো সন্তোষের চোখের দিকে। দুজনের চোখেই উৎসাহের আলো জ্বলছে।

—নিশ্চয়। বলে তখনই সন্তোষ চটুল ওপর প্যান্টটা গুটিয়ে লম্বা লম্বা শক্ত পেশীবহুল পা ফেলে উঠতে আরম্ভ করল।

—চলে আসুন। সন্তোষ ওপর থেকে ডাকল।

অলকার দু চোখে বিপুল আনন্দ। কাঁপা কাঁপা স্বরে বললে, আমি পারব?

—কেন পারবেন না? চলে আসুন।

ঐ আহ্বানে যেন যাদু আছে। অলকা আর স্থির থাকতে পারল না। উঠতে আরম্ভ করল। কিন্তু ওঠা যে এত কঠিন তা বোধ হয় ভাবেনি। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি পা হড়কে পড়ে যাবে। একটা পাথরে পা দেয় আর টাল সামলাবার জন্যে হাত দিয়ে আর একটা পাথর অবলম্বন করে। তবু উঠছে। তবলা—সামনে উঁচুতে সন্তোষ আছে। এক সময়ে সন্তোষ পাথরের খাঁজে অবলম্বন খুঁজে উঠে

দিয়ে একটা খড়ানে পাথরে হেলানদিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অলকা একটু উঠছিল আর দুহাতে চারপাশের সন্তোষের চকল পা দুখানির দিকে। অমনি করে ওরই প্যান্টপার্শি নেও বদি উঠতে পারত।

সন্তোষ ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল অলকাকে। কেমন অদ্ভুত ভাবে ওঁড়ি মেরে মেরে উঠছে অলকা। বাতাসটা এখানে খুব জোর। মুখের ওপর চুল লুটোপুটি খাচ্ছে। বা থেকে শাড়িখানা খসেখসে যাচ্ছে—আর ঠাণ্ডার মধ্যে বাতাস চুকে এমন ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে দিচ্ছে যে—সন্তোষ চোখ সরাতে পারছে না। শেষে ভয় হল, হয়তো বা হাপড় চোপড় ছাড়িয়ে পড়েই যাবে। বা থেকে শাড়ির অনেক খুলে গিয়ে বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে। অথচ অলকার হঁশ নেই। নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে আজ বুঝি সে আত্মহারা।

অলকা একবার তাকালো। সন্তোষের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখটা লাল হয়ে উঠল। সন্তোষ শুধু ভয় করে নেমে এল খানিকটা। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধরুন হাত। অমনি করে উঠলে আজ আর বাড়ি ফিরে যেতে হবে না।

অলকা খপ্ করে সন্তোষের হাতটা ধরতেই সন্তোষ তার বলিষ্ঠ দু'পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুলে নিল একেবারে কাছে। কিছুই না, যেন একটা লিকা পাখি!

অলকা তখনো হাঁপাচ্ছিল। মুখটা লাল, কপালে কৌটা কৌটা ঘামের বিন্দু। সারে প্রচণ্ড বাতাস। কাপড় কখনো বুকের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে কখনো বা উড়ে,—যেন পাখা মেলে দিয়েছে। ভয় আনন্দে অলকা চারদিক দেখতে লাগল।—উঃ কী উঁচু! নীচের দিকে তাকালে যেন মাথা ঘুরে যায়।

—এইখানে—এই পাথরটার ওপর উঠে আসুন। ভয়ের। ভয় নেই। সন্তোষের হাতের ওপর ভর দিয়ে অলকা আর একটা উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালো।

—এইখানে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন।

অলকা চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যি একী অদ্ভুত জায়গা—কী অপূর্ব সেজা।

ওপর ভয়ে ভাবতে লাগল, এ কোথায় এল! চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর! কোনো মানুষের চিহ্ন তো কাছেপিঠে কোথাও নেই!

এতক্ষণ একটা ঝোঁকের মাথায় এতদূর চলে এসেছে। কিন্তু কোথায় আর সব? কোথায় মাদুরীদি? কোথায়—

মুহূর্তে শংকাবর্ণ হয়ে গেল অলকার মুখ। বলে উঠল,—আমায় নামিয়ে দিন, শিগ্‌গির নামিয়ে দিন।

সন্তোষ অবাক হয়ে বলল, সে কী! এখনি নামবেন! এখান থেকে সূর্যাস্ত দেখবেন না?

অলকা প্রবলভাবে মাথা নাড়ল—না, না। তৎক্ষণাৎ সন্তোষের অপেক্ষা না করে নিজেই নামতে লাগল। কত তাড়াতাড়ি কী ভাবে যে অলকা পাহাড় থেকে নেবেছে তা সে-ই জানে। ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল খানিকটা। মনেও নেই কোন্ দিক থেকে উঠেছিল।—ঐ যে মাদুরীদি একটা পাথরের ওপর বসে আছেন। কিন্তু কোথায় আর-এক জন?

মাদুরীদিও বললেন, তাই তো ওঁকে তো দেখিনি অনেকক্ষণ। বোধহয় বাড়ি চলে গেছেন। বোলো না একটু। ভারী সুন্দর জায়গাটা, নয়?

কিন্তু অলকা আর কথা শুনতে পেল না। তার কানে বারে বারে ঐ একটা কথাই মনে হতে লাগল, বাড়ি চলে গেছে।

বাড়ি চলে গেছে! একী স্বপ্ন? তেমন তো হয় না এখন। তাকে ফেলে রেখে, না জানিয়ে তিনি চলে যেতে পারেন একা!

যেতে পারবেন? তখন অলকার মনে হল, পাহাড়ে ওঠার সময় নেও তো তাকে বলে ওঠেনি। সিদ্ধান্ত যে একটা পক্ষ মানুষ তারই ওপর নির্ভর করে ছিল, পাহাড়ে ওঠার নেশায় তার কথা কি একটি বারও মনে হয়েছিল?

সন্তোষও নেমে এসেছিল। বললে, এ কী কোথায় চললেন?

অলকা বললে, আপনারা বেড়ান, আমি একটু আগেই যাচ্ছি।

মাদুরীদিও হেসে বললেন, যাও ভাই, কর্তাটির তো একা চলা অভ্যাস নেই, আর তোমারও একা থাকার।

সে বাঁকাকথাও অলকার কানে পৌঁছল না। দ্রুত বেগে চলতে আরম্ভ করল।

যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কিন্তু কোথায় সে মানুষটা? প্রতি বাঁক ফেরে আর ভাবে এবার ঘাড় ফেলবে। পক্ষ মানুষ কত দূর আর যাবে! কিন্তু কই? কোথায়? কত দূরে? আরও দ্রুত—আরো দ্রুত হাঁটে অলকা। তবু দেখা পায় না।

অধ্যাপক আজ তাঁর যৌবনের সব শক্তিটুকু নিঃশেষ করে এগিয়ে এসেছেন। উঁচুনিচু অসমান্তরাল রাস্তা। তবু চলেই গিয়েছেন, তাঁর একখানা পা নেই। প্রাণপণে এগিয়ে চলেছেন। মুখ-চোখ লাল হয়ে গিয়েছে, কপালের শিরা ফুলে ফুলে উঠছে—অস্বাভাবিক জোর পড়েছে ক্রাচ দুটোয়। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। বুকের ভিতর দুর্জয় প্রতিজ্ঞা গুমরে উঠছে। এগোতে হবে—একাই হয়তো এগোতে হবে এমনি করে সারা পথ আজীবন থেকে অপরাহ্ণের অস্ত-আলোয় দিকে।

মহাত্মা সক্রেটিস

রেজাউল করীম

আজকের উচ্চ-স্তরের জীবন শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, সাহিত্য ও ধর্মনীতির জন্য প্রধানতঃ তিনজন মহাপুরুষের নিকট ঋণী —সক্রেটিস, প্লেটো ও যিশুখ্রীষ্ট। সক্রেটিস ও প্লেটো ইউরোপকে দিয়েছেন জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য ও দর্শনের মূলসূত্র। তাদের সামনে খুলে দিয়েছেন স্বাধীন চিন্তার রাজপথ, তাদেরকে প্রদর্শন করেছেন সত্য, বাস্তব ও সহজ মানবিকতার আদর্শ। আর মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট তাদেরকে দিয়েছেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ; তাদেরকে পারলৌকিক জীবনের সন্ধান বলে-দিয়েছেন। যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা মানুষকে দিয়েছেন পথ নির্দেশ এবং নিজেদের নির্মল জীবনাদর্শের মহিমায় মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন একটা নতুন ঐতিহ্য ও উপলব্ধি। তাঁরা সকল যুগের সকল জাতির নমস্য। তাঁরা বিশেষ কোন কাল ও স্থানে বিধৃত নন। কোন জাতি বা সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাঁরা সকল যুগের সকল মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের জীবন দর্শন থেকে বর্তমান যুগের মানুষও বহু উপদেশ লাভ করতে পারে। এই প্রবন্ধে প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সক্রেটিস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

প্রাচীন যুগে গ্রীসে এমন এক সময় ছিল যখন তার্কিকগণ (Sophists) কেবল তর্কযুদ্ধের দ্বারা সত্য ও নীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে ভালবাসতেন। তাঁদের তর্কযুদ্ধে সব কিছুই মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলে মনে হত। ঠিক সেই সময় সক্রেটিস। সক্রেটিসের জন্ম আথেন্সে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭০ সালে এথেন্স নগরে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ভাস্কর। আর মাতা ছিলেন ধাত্রী। সক্রেটিসের শৈশব-জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। তিনি কতদূর লেখাপড়া করেছিলেন তা জানবার উপায় নাই। তবে এটুকু জানা যায় যে তিনি পিতার নিকট ভাস্কর্যের কাজ করতেন। পরবর্তীযুগে এথেন্সে অনেকগুলি প্রস্তর-মূর্তির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার মধ্যে কতকগুলি মূর্তি সক্রেটিসের হাতের তৈরি বলে অনেকে অনুমান করেন। কিছুদিন পিতার নিকট কাজ শিক্ষার পর তিনি একাজ পরিত্যাগ করেন। তারপর থেকে আর কোন অর্থকরী কাজ তিনি করেননি। অবশ্যই যে কাজ তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল এখন থেকে তিনি তাই করবার জন্য যেতে উঠলেন।—ঈশ্বর তাঁর জীবনের ব্রত ঠিক করে দেবার জন্য জনসাধারণকে দর্শন শিক্ষা দেওয়া। সারাজীবন দর্শন ও নীতি শিক্ষা দিয়ে কাটিয়ে দিলেন। জীবনের অধিকাংশ কাল তাঁর অতিবাহিত হয় এথেন্স নগরে। কেবলমাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য সামরিক কাজে নগরের বাইরে তাঁকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তারপর দীর্ঘ বছর এথেন্স নগরেই দর্শন শিক্ষা দিয়ে কাটিয়ে দিলেন। প্রায় সত্তর বছর বয়সের সময় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল যে তিনি এথেন্সের দেবদেবীকে অস্বীকার করেন এবং নগরের তরুণ বালকদেরকে বিভ্রান্ত করেন। এই দুটি অভিযোগের জন্য তাঁর বিচার হয়। এবং বিচার শেষে তিনি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই হল সক্রেটিসের জীবন কথা।

সক্রেটিসের চেহারা ছিল বিচিত্র-রকমের। —বেঁটে, আটোসাটো, কালোকোল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মাথায় তাঁর টাক পড়েছে। তাঁর নাক ছিল প্রশস্ত, চোখদুটো এবং একটু উঁচানো। তিনি অদ্ভুতরকমের মোটা ছিলেন। চোখ দুটি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁর পোষাক ছিল, জীর্ণ ও পুরাতন। বাহ্যিক চেহারার প্রতি তাঁর কোনরূপ লক্ষ্য নাই। তাঁকে দেখলে কারুর মনে হবে না যে তিনি একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।

অপরাপর মহাপুরুষের মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রার্থনার করবার সময় একটি দৈববাণী শোনা যায়। এবং সেই বাণীর দ্বারাই তিনি পরিচালিত হন। তিনি যখন আপন ইচ্ছামত কোন কাজ করতে উদ্যত হতেন তখন এই দৈববাণী তাঁকে পূর্ব থেকে জানিয়ে দিত কাজটি ভাল কি মন্দ। তিনি এই বাণীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। একথা সত্য যে তিনি দর্শনের কোন নীতি বা থিওরি রচনা করেননি। তবুও তিনি ছিলেন দর্শনের জনক। তিনি তাঁর মত ও সত্যকে কোন পুস্তকাকারে লিপি-বদ্ধ করে যাননি। তবে তাঁর দার্শনিক পদ্ধতি পরবর্তী যুগের অনেক গ্রন্থকে দৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর পদ্ধতিকে বলা হয় "ডায়ালেকটিক্স।" প্রশ্ন ও উত্তোপকথনের মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন ও সত্য প্রতিষ্ঠা এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। তাঁর অভ্যাস ছিল যে তিনি এথেন্সের বাজারে বেড়াতে যেতেন। অথবা যেখানে যুবলোক ভিড় করত সেখানে উপস্থিত হতেন। সেখানে গিয়ে যে কোন একজন লোকের সঙ্গে কথা-বার্তা আরম্ভ করতেন, অথবা কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তাঁর কথাবার্তার বিষয় ছিল বিবিধ প্রকার। কেউ হয়ত জীবন মৃত্যু ও পরকালের বিষয় নিয়ে তাঁর সহিত তর্ক করতে চাইত। কেউ হয়ত তর্ক করতে চাইত সাংসারিক বিষয় নিয়ে। ধনী, দরিদ্র, যুবক, বৃদ্ধ, পরিচিত, অপরিচিত যে আসত সেই সময়ে তাঁর কথা শুনত। তারা আগ্রহভরে তাঁর সহিত তর্ক করত; তিনি তাদেরকে অনেক সময় প্রশ্ন করতেন। তারা অনেক সময় তাঁর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তাঁর নিকট পরাজয় স্বীকার করত। তিনি মানুষকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তার জন্য কোন পারিশ্রমিক দাবী করতেন না। তাই তিনি চিরকালই দরিদ্র থেকে গেছেন তিনি কখনো ভিক্ষা করেন নি। অথবা কোন আড়ম্বরপূর্ণ উক্তি করে লোকের মনে আঘাত দিতেন না। সাধুসন্তের মত কোন ভণ্ডামি করতেন না। কথাবার্তা অথবা প্রশ্ন করার সময় সমস্ত আলোচনাটা নিজের হাতে একচেটিয়া করে রাখতেন না। যত সময় দেখা গেছে অপরেই বেশী কথা বলে গেছে।

আর তিনি পরম ধৈর্যের সাথে তার কথা শুনে যাচ্ছেন। তবে মাঝে মাঝে অপরের দীর্ঘ কথার মধ্যে হঠাৎ ১-একটি প্রশ্ন করতেন, অথবা নিজ মন্তব্য প্রকাশ করতেন। এতেই সে লোকটি একেবারেই হকচকিয়ে যেত। তিনি কথা খুব কমই কইতেন। তবুও তিনিই যে কথার রাজা তা প্রমাণ করে দিতেন। আলোচনার সময় প্রতিটি কথাকে কলপ্রসূ পথে প্রবাহিত করে দিতেন। অধিকাংশ কথা হত প্রশ্ন ও সংশয়ের মাধ্যমে। তিনি বার বার চতুর প্রশ্ন করে সত্য আবিষ্কার করতে চাইতেন। যার সাথে কথা কইতেন তার মূল চিন্তার সূত্রটি ধরে ফেলতেন। সে নিজের ভ্রম বুঝতে পারত। তখন তিনি তাকে সংশোধন করে দিতেন। আর সে ব্যক্তি তাঁর নিকট পরাস্ত হয়েও তাঁর সংশোধন করতে ছাড়ত না। সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে চলে যেত। প্রতিদিন এইভাবে সক্রেটিস এথেন্স নগরের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি মনে করতেন যে এইভাবে তাঁর জীবনের 'মিশন' বা ব্রত প্রচার করবার জন্য বিধাতা তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সক্রেটিসের মুখ নিঃসৃত উপদেশাবলী তাঁর প্রিয় শিষ্য প্লেটো "ডায়ালগ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

এথেন্সের বহু লোক বিশ্বাস করত যে সক্রেটিস যে যুগের সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি। এ সম্পর্কে প্লেটো একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন. একদা ডেল্‌ফিক মন্দিরে তিনি তীর্থ করতে যান। সক্রেটিস দেবীর নিকট প্রশ্ন করেন. "আমার চেয়ে বিজ্ঞতর লোক আর কে আছে?" দেবী উত্তর দিলেন "না আর কেউ নাই।" সক্রেটিস যখন এই উত্তর শুনলেন তখন তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখন সক্রেটিস নিজেকে প্রশ্ন করলেন. "দেবী এর দ্বারা কি বুঝতে চান?" কারণ বড় বিষয় জ্ঞান অথবা ছোট বিষয় জ্ঞান, কোন বিষয়েই আমি নিজেকে বিজ্ঞ মনে করি না। অথচ দেবী ঘোষণা করলেন যে আমিই বিজ্ঞতম ব্যক্তি। দেবী একবার যাহা কি ভুল করেন? দেবীর কথা ত মিথ্যা হতে পারে না। এবিষয়ে বহু চিন্তা করলাম। যে লোক নিজেকে বিজ্ঞ বলে মনে করত, তার নিকট গেলাম। মনে করলাম যে তার সঙ্গে আলোচনা করে ডেল্‌ফিক দেবীকে দেখাব যে এই লোকটি আমার চেয়েও বিজ্ঞ। তার সঙ্গে অনেক কথা বলি। কিন্তু বেশ উপলব্ধি করলাম যে যদিও তাকে বিজ্ঞ বলে মনে করলেও, সে মোটেই বিজ্ঞ নয়। সে নিজেকেও বিজ্ঞ বলেই মনে করে। কিন্তু বুঝলাম তার সে দাবী সত্য নয়। তাকে আমি দেখাতে চাইলাম যে সে নিজেকে যতই বিজ্ঞ বলে মনে করুক, আসলে সে মোটেই বিজ্ঞ নয়। এতে সে আমার উপর বাগান্বিত হয়ে উঠলো আরও অনেকে যারা আমাদের আলাপ আলোচনা শুনে ছিল তারাও আমার উপর ক্রুদ্ধ হল। তখন আমি সেখান থেকে চলে এলাম। এবং মনে মনে বলতে লাগলাম, অন্ততঃপক্ষে এটা পরিষ্কার বুঝা গেল যে আমি নিজে ঐ লোকটার চেয়ে বিজ্ঞ। যেহেতু আমাদের দুজনেরই সত্য অথবা সৌন্দর্য তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তবে লোকটা কিছুই জানে না। কিন্তু তবুও মনে করে সে সব কিছুই জানে। আর আমি যদিও কিছুই জানিনা তবুও আমি অন্ততঃ এ দাবী কিছুতেই করি না যে আমি কিছু জানি। তা হলে বেশ বুঝা গেল যে আমি তার চেয়ে একটু বেশী জানি, একটু বেশী বিজ্ঞ। যে বিষয় কিছুই জানি না, সে বিষয়ে কিছুটা জানি বলে কখনই আমি দাবী করব না। তারপর আমি অন্য একটি লোকের নিকট গেলাম। তাকে আমার চেয়ে বিজ্ঞ বলে মনে হ'ল। তার সঙ্গে কথাবার্তা, আলোচনাদি হ'ল। কিন্তু সেখানেও ঠিক একইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। আলোচনার পর সে আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। এবং আরও অনেকে আমার প্রতি একই মনোভাব দেখালো" অতঃপর সক্রেটিস বলেন যে এরপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে দেবী ঠিক কথাই বলেছেন। অজ্ঞ সত্যিই। কিন্তু অন্য লোকে জানে না যে তারা অজ্ঞ। আর আমি জানি যে "আমি অজ্ঞ।"

উপরের ঘটনা থেকে দেখা যায় যে সক্রেটিসের প্রেরণার উৎস কোথায়। যে কোন লোকের সাথে যে কোন বিষয়ের আলোচনা হোক না কেন সক্রেটিস প্রথমে দেখাতেন যে তিনি কিছুই জানেন না। যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন, আশা করতেন যে তার কাছে কিছু জ্ঞান শিখবেন। সকলের নিকট তিনি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, এর মধ্যে কোন কপটতা বা ভান ছিল না। তিনি যথার্থই বিশ্বাস করতেন যে কেবল তিনিই নন, বরং আরও বহু সংখ্যক লোক যে সব বিষয় জানা খুবই দরকার তারাই কিছুই জানে না। সত্য যা ভালর প্রকৃতি কি, সৌন্দর্য্য কি বস্তু, সত্য কি? এসব বিষয়ে বহু লোক কিছুই জানে না। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তথা কথিত বিজ্ঞ লোক জানের যে দাবী করে তা দৃষ্টান্তস্বরূপ অজ্ঞতা ব্যতীত কিছুই নয়। অন্তরে এই দীপ্তিতে তিনি অন্য সে ব্যবস্থার করতেন। এইভাবে তিনি অপরের জ্ঞানের দাবীকে খন্ডন করে দিতেন। সক্রেটিস তাঁর এই মত অন্যায় সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করতেন। যারা মনে করত সব বিষয় জানি এবং এই জ্ঞানের গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছিল তারা তাঁর প্রয়াসের ফলে পুনঃ পুনঃ নিরোধ হত। প্রমাণিত হল।

তিনি এই শ্রেণীর লোকের নিকট প্রকাশ করতেন যে তিনি কিছুই জানেন না। সেইজন্য তাদের নিকট সব বিষয় জানতে চান—যারা মনে করত যে খুব ভাল করে সব বিষয় জানে। তিনি তাদের সেই জ্ঞান থেকে কিছু শিক্ষালাভ করতে চাইলেন। ওদিকে তারা তাদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর নিকট নিজেদের জ্ঞান জাহির করবার কোন চেষ্টার ত্রুটি করত না। তারা সুনিশ্চিত ধারণা নিয়ে সক্রেটিসের সঙ্গে তর্ক করত। এদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে তিনিও কম আনন্দ উপভোগ করতেন না। তিনি তাদেরকে অতিসরল সক্রোপল প্রশ্ন করতেন। সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তাদের অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ত। এর ফলে চতুর্দিকে সক্রেটিসের জয়জয়কার পড়ে গেল।

এথেন্সের তরুণ সম্প্রদায় সক্রেটিসের চারিদিকে মিলিত হতে লাগলো। তাঁকে তারা মনে করল জ্ঞানের উৎস। তাঁর নিকট থেকে নানাবিষয়ে প্রেরণা লাভ করতে লাগলো। যারা রক্ষণশীল যারা তর্কযুদ্ধে তাঁর নিকট পুনঃপুনঃ পরাজিত হতে লাগলো, তারা এখন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। কিন্তু সক্রেটিস ছিলেন অতি মহান চরিত্রের মানুষ। তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সরল ও পবিত্র। তিনি যে শিক্ষা দিতেন তার জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন চির দরিদ্র। পার্থিব সম্পদ ও বিষয় বাসনার প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। অত্যন্ত সাধারণ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর তাঁর দরকার হ'তনা। এ সবের পরিবর্তে এক মহাসম্পদ আহরণের জন্য সদা চেষ্টা করতেন—এরূপ সম্পদ যার আছে, তার কাছে পার্থিব বৈভব কিছুই নয়—তাঁর দৃষ্টিতে সত্যিকার জ্ঞান ও ধর্মই ছিল প্রকৃত সম্পদ। তিনি সর্বপ্রকার দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতেন। তাঁর নৈতিক মনোবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। কিছুদিন দেশের জন্য সৈন্যদলেও তিনি যোগদান করেছিলেন। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসমসাহসিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। একাধিকবার নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। একবার ডেলিয়ামের যুদ্ধে যখন এথেন্সের প্রায় সমস্ত সৈন্যরা পলায়ন করছিল, তখন তিনি নির্ভীকভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সংগ্রাম করে দেশের মান রক্ষা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত সঙ্গী ও বন্ধু। অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন পদ্ধতি। এবং সমস্ত প্রকার জৈবিক প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে ছিলেন। তবুও তিনি এ সবের জন্য কখনও গর্ব প্রকাশ করতেন না। অথবা কঠোর বৈরাগ্য ব্রত ও অবলম্বন করেননি।

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যদি কেউ বাধত, তা হলে দেখা যেত যে ঠিক একইভাবে তিনি জীবনের সত্তর (৭০) বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স সত্তর অতিক্রম করল তখন বাঁচবার মাত্র কয়েকজন তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উপস্থিত করল যথাঃ—(১) তিনি জাতীয় দেবতাকে অস্বীকার করেন; (২) তিনি তার পরিবর্তে নিজের জন্য এক ঈশ্বর রচনা করেছেন; (৩) তিনি দেশের তরুণদেরকে কলুষিত করেছেন। এখন দেখা যাক এই অভিযোগগুলি কতদূর সত্য।

প্রথম অভিযোগটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। প্রাচীন যুগের যে কোন গ্রীক চিন্তাশীল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আনয়ন করা চলত। এবং তাতে তাদের দোষী প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। প্রাচীনকালের অনেক গ্রীক দার্শনিক জাতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ছিলেন। অনেকে প্রকাশ্যভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। কিন্তু সক্রেটিস কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। তিনি সর্বদাই দেববাণীকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপদেশ দিতেন। তিনি আরও বলতেন যে মানুষ যে নগরের অধিবাসী হোক না কেন, তার উচিত সেই নগরের প্রথা অনুসারে তথাকার দেবতাকে পূজা করা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। তবে তিনি বহু দেবতা ও এক ঈশ্বর, এই উভয়ের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে সে কথা নির্ভিক ভাবে ঘোষণা করতেন। তাঁর মতে এই এক ঈশ্বর হচ্ছেন নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা—তিনি, মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করেন। সুতরাং সক্রেটিসের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগটা বহুলাংশে মিথ্যা।

তার বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় অভিযোগ আনীত হয়েছিল তার মূলে কিছুটা সত্য ছিল। সক্রেটিস দাবী করতেন যে তিনি একটা দৈবী বাণী অন্তরের মধ্যে শুনতে পেতেন। এবং তিনি সেই বাণীর দ্বারা পরিচালিত হতেন। সেই ভিতরের বাণী তাঁকে বলে দিত কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ। পুরোহিতগণ এ জন্য তাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো। কারণ তারা দাবী করত, কি ভাল, আর কি মন্দ তা ঘোষণা করবার অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে। অন্য কেউ সে দাবী করতে পারে না। কিন্তু সক্রেটিসের উক্ত প্রকার দাবী সম্বন্ধে আমরা যাই বলিনা কেন, একথা বলা চলেনা যে তিনি কোন নূতন দেবতা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও পুরোহিত ও তাঁদের সমর্থকগণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ছাড়ল না।

তৃতীয় অভিযোগটি একেবারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তরুণদেরকে কলুষিত করা দূরে থাক, তিনি সর্বদাই তাদের সম্মুখে মহৎ ও উন্নত জীবনের আদর্শই তুলে ধরেছিলেন। তবে একথা সত্য যে "আলসিবিয়াদিসের" মত দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিও তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিল। এই আলসিবিয়াদিস পরে এথেন্সের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল। এবং সে উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিহীন জীবন যাপন করত। এ ধরনের কতিপয় শিষ্য তাঁর ছিল। সেইজন্য কিছুসংখ্যক লোক তাঁর উপর বাগান্বিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাই বলে আলসিবিয়াদিসের মত লোকের অপকর্মের জন্য সক্রেটিসকে দায়ী করা যেতে পারে না। এথেন্সের সাধারণ তরুণদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত হিতকারী। তিনি তাদেরকে সত্যকার মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাহলে প্রশ্ন এই: কেন তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ আনীত হল? উত্তরে বলা যেতে পারে যে তাঁর নিকট তর্কযুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়ে কতকগুলি লোক তাঁকে শত্রু মনে করতে লাগল। তারা নানাভাবে তাঁর ক্ষতি করার সুযোগ অনুসন্ধান করতে লাগল। দৈনিক যে সব তর্কযুদ্ধ হ'ত, তাতে সক্রেটিস শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকে পরাজিত করতে ছাড়তেন না। তিনি নির্ভয়ভাবে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে দিতেন। তিনজন ধনী [illegible] তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ [illegible] মিলেটাস্, লাইকন, [illegible] (Meletus, Lycon, Anytus)।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

দেখবে আমি নিজের কাছে চাঙ্গা হয়ে পড়ব। এ জীবন কিছুই নয়। সেই জীবনকে আরও একটুখানি বিলম্বিত করলে আমার কোন লাভ হবেনা। সুতরাং তুমি যাও, বাধা দিও না।"

ক্রিটিও তাঁর একথা শুনে একটি বালককে একটু ইঙ্গিত করলেন।" সে সেখান থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে যে লোক বিষ পরিবেষন করবে, সে বিষপাত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। বিষটি ঠিক ভাবে গুঁড়া হয়েছে। তাকে দেখে সক্রেটিস শান্ত ভাবে বল্লেন: "প্রিয়বন্ধু! তুমি ত এসব বিষয়ে পারদর্শী। কি কি কাজ আমাকে করতে হবে তা আমাকে সবিস্তারে বল।" উত্তরে সে বল্লো: "বেশী কিছু করতে হবে না, এই পাত্র-ভরা বিষপান করার পর একটু হাঁটবেন, তার পর পা-দুটি যখন ভারী বোধ হবে তখন শুয়ে পড়বেন। তা'হলে বিষ তার কাজ করবে।" এই বলেই সে বিষ পাত্রটি সক্রেটিসের নিকট তুলে ধরলো। অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে সক্রেটিস বিষপাত্রটি তার হাত থেকে গ্রহণ করলেন। তাঁর হাত একটু কাঁপল না। তাঁর মুখের রঙ, বা আকৃতির একটুও পরিবর্তিত হ'লনা। সেই লোকটির দিকে নম্র-নয়নে তাকালেন। এবং বল্লেন এই বিষের কিয়দংশ দেবতার উদ্দেশ্যে যদিও উৎসর্গ করব তবে তাতে কোন আপত্তি আছে কি? তা কি বিধিসঙ্গত হবে? উত্তরে লোকটি বল্লো: "না, তা করতে পারবেন না। কারণ এ সময় ঠিক যতটুকু বিষের প্রয়োজন আমরা ততটুকু বিষ গুঁড়া করি।" তখন তিনি বল্লেন: "বুঝেছি। তবে এটা নিশ্চয় বিধিসঙ্গত ও উচিত হবে যদি আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। তাহলে এজন্য থেকে আমার ত্রাণ সম্ভব হবে। সুতরাং আমি প্রার্থনা করি তাই হোক"। এই বলে তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে বিষপান করলেন।

অতঃপর প্লেটো বলছেন "এর পর্যন্ত আমরা অত্যন্ত কষ্টের সহিত অশ্রু সংবরণ করেছিলাম। কিন্তু যখন সক্রেটিসকে বিষপান করতে দেখলাম তখন আর আমরা অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমাদের নয়ন থেকে অজস্র ধারায় অশ্রুপাত হতে লাগল। আমি নিজের মুখ ঢেকে ফেললাম। এবং কাঁদতে লাগলাম। তবুও তাঁর জন্য নয়, ঘটনা নিজের জন্য। কারণ আজ আমি আমার এক পরম বন্ধুকে হারালাম।"

আমাদের কান্না দেখে সক্রেটিস বল্লেন "হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা এ কি করছো? শেষ সময় এই কারণে তবে আমি মেয়েদেরকে বিদায় করেছি যেন তারা এই ধরণের নিম্নচিন্তা না করতে পারে। আমি শুনেছি মৃত্যুর সময় কান্না অপেক্ষা শুভ ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যু বরণই ঠিক কাজ। অতএব শান্ত হও, সহ্য কর।" তাঁর এই কথায় আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হলেম। এবং অশ্রু সংবরণ করলাম। অতঃপর সক্রেটিস নির্দেশমত একটু পদচারণা করলেন। তারপর বল্লেন যে তাঁর পা ভারী বোধ হচ্ছে এই বলেই তিনি শুয়ে পড়লেন। যে বিষপায়ী নির্দেশিল সে তাঁর পায়ের তলা পরীক্ষা করে দেখলো। এবং শক্ত করে তাঁর পায়ে চাপ দিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কিছু অনুভব করছেন? তিনি বল্লেন, না, কিছুই অনুভব করছিনা। তারপর সে তাঁর উরুর উপর চাপ দিল এবং আমাদেরকে বল্লো। এই দেখ, তিনি ক্রমশঃ ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তারপর তাঁর মুখ আবৃত করে তিনি বল্লেন— আর একটি তাঁর শেষ কথা "ক্রিটিও, ইস্কুলাকাপের নিকট আমি একটি মোরগের ঋণ করি, তুমি সেটা তাকে দিও, দিতে অবহেলা করোনা।" ক্রিটিও উত্তর দিলেন: "তাকে তাই দিব। আর কিছু বলবেন কি?" কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেলনা। একটু পরে দেখা গেল যে তাঁর দেহের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তারপর তাঁর মুখ ঢেকে দেওয়া হ'ল। তাঁর চোখ দুটি স্থির আছে। ক্রিটিও অনুভব করলেন এই তাঁর শেষ। মহামানব মহাবিরাম লাভ করলেন। এই ভাবে হ'ল আমাদের পরম বন্ধুর জীবনাবসান। —যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিজ্ঞতম ও ন্যায়বান তিনি আমাদের মধ্য থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন।"

এই ভাবে আত্মা সক্রেটিস হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করলেন। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" কবির এই উক্তি তাঁর বেলায় যেমন ভাবে প্রযোজ্য খুব কম লোকের ভাগ্যে সেরূপ ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। পৃথিবীতে শহীদদের ইতিহাসে সক্রেটিস অক্ষয় অবদান। তিনি জীবনে মহান ছিলেন, মৃত্যুতেও মহান। সহস্র বছর পূর্বের এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রবন্ধ শেষ করা যায়।

তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি

তোমার কথা ভুলিনি যোগীনদা। কত লোক এজীবনে এলো গেল, আমি যেন মরা খালে একটা ভাঙা সাঁকো হ'য়ে পড়ে রইলাম! এ সাঁকো পেরিয়ে গেল কত লোক, কিন্তু কই, তোমার মতো কেউ তারা মনে আমার এমন ক'রে বাসা বাঁধতে পারেনি। তাই ফুলস্থে ফুলতে তারা সবাই অথম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল, শুধু মনে রইলে তুমি। তোমাকে বুঝি কোনদিনই ভুলতে পারবো না যোগীনদা।

সেদিন সন্ধ্যায় খুব জোর বৃষ্টি এলো, সামনেই কোথায় বাজ পড়লো আকাশ ভেঙে। বৃষ্টির তোড়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল না বাইরে. তুমি হঠাৎ ভিজতে ভিজতে এসে উঠলে পানুবাবুর চায়ের দোকানে। এমন কিছু একটা ভিড় ছিলনা তখনকার। বৃষ্টিকে যারা ভয় করে, তাড়াতাড়ি তারা চায়ের দাম দেব ক'রে প্রায় ছেলের হাতেই ছুটে পড়ে-ছিল বাড়ীমুখো। আর যারা নাদকতা যারা বাঁচাতে চায় নতুন ক'রে খুঁজে পেতে, তারা একটা লম্বা কাপ দেব ক'রে আর একটা ডবল-গ্লাসের অর্ডার দিয়ে দুটি তুলে ব'সেছিল খোলা দরজা দিয়ে বাইরে। আমি ছিলাম সেই নিশ্চিন্ত সংখ্যক চা-পায়ীদের একজন। চায়ের কাপ মুখে তুলে নিয়ে দেখ ছিলাম—বর্ষণক্লান্ত আকাশটা ধীরে ধীরে কেমন কালচে-কালো হ'য়ে উঠলো, অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অকস্মাৎ তোমার আবির্ভাব।

তোমাকে দেখে মনে হ'লো—দৃঢ়বদ্ধ লম্বাটোড়া দুটি যেন এক উদাসী মাথা ভর্তি কাকড়া কাকড়া চুল জলে ভিজে আদুথাদু হ'য়ে আছে। দুটিন দাঁড়ি না কামানোর যে বেমানা দুটে ওঠা স্বাভাবিক- তার অভাব নেই মুখে। পরণে পায়জামা আর পাঞ্জাবী জলে ভিজে সপ্ সপ্ ক'রছে। তুমি এসে দাঁড়িয়ে রুমাল বার ক'রতে পকেট থেকে টেনে। তারপর মুখ আর মাথাটা মুছে নিতে নিতে বললে: 'চা পাওয়া যাবে এখানে?'

পানুবাবু এবারে তাঁর নিজের জায়গা থেকে মুখ উঁচিয়ে জবাবদিলেন।—'যাবে বৈ কি, বসুন।'

এবারে বসতে গিয়ে প্রথম তাকিয়ে কি যেন একবার লক্ষ্য ক'রলে তুমি। তারপর হঠাৎ এসে ব'সে পড়লে আমার পাশে। তোমার ভেজা ভেজা ভাব দেখে প্রথমটা আমার যেন কেমন লাগছিল, ভাব-ছিলাম—স'রে ব'সবো কিনা! তুমি দেখলাম স্থান-কাল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, ব'সলে: 'ভয় নেই, এ ভেজা জামা-কাপড় আপনার গায়ে লাগবে না।'

অপ্রস্তুত হ'য়ে বললাম: 'না, না, সে কি কথা, আপনি ভালো হ'য়ে বসুন। কিন্তু আমি ভাবছি, এই জামা-কাপড় আপনি কি চা খেয়ে গায়েই শুকোতে চান নাকি? এখনো যে অনেক দেরী!'

—'তা আমার ইচ্ছে না: গত তিন বছরে একদিনও আমার জ্বর হয়নি।' খেয়ে তুমি ব'ললে: 'তা ছাড়া জলে ভিজবার প্রতিষেধক আমি আগেই নিয়েছি।'

—'অর্থাৎ!'

—'অর্থাৎ—তিন পেগ এক সঙ্গে খেয়ে।' ব'লে আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি হাসলে। হাসলে এমনভাবে তুমি।

বিস্ময়ের ঘোরে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম : 'আপনি মদ খান?'

ছাঁদ বললে : 'খেয়াম না, ছেড়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু আবার ধরেছি। তবে বাজার বড় আজা, এখন আর পয়লার ঝুলোঝুলি।'

কথাগুলো যে খুব একটা, আজে বলতে ছাঁদ, এমন নয়। পার্থিবাবুর জন্য অর্ঘ্য দিতে না পেরেও আমার পাশের দুটি ভদ্রলোক সবই শুনতে পেলো। কি জানি কেন তোমার মুখের দিকে একবার তাকালো তারা। ছাঁদ তা লক্ষ্য করলে না। অবলীলাক্রমে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে ছাঁদ। সেই মুহূর্তে তোমার মুখের ওপর দিয়ে আমি আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। মনে হলো—যে মেয়ে একদিনে সাধারণ বাঙালী ছাড়া কিছু ছিল, আজ তা যেন বনস্পতির মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখে যে মুখে একটা ঔজ্জ্বল্যের অভাব ছিল না, আজ তা পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে উঠেছে। একটুখানি থেমে জিজ্ঞেস করলাম : 'আপনি মদ ছেড়েই দিয়েছিলেন, তবে আবার ধরলেন কেন?'

এবারে চায়ের কাপ থেকে চোখের দৃষ্টি তুলে এনে আমার মুখের ওপর স্থির করলে ছাঁদ, বললে : 'আপনার কি কিছুতেই তা মনে হচ্ছে না?'

বললাম : 'না, বলতে পারেন। তবু কাউকে দেখে তার সম্পর্কে আমার মন যেন কেবলই সব জানতে ইচ্ছে হয়।'

উত্তরে ছাঁদ বললে : 'সবাই যে আপনার কাছে মন খুলে দেবে, এই কি আপনি আশা করেন কি করে?'

বললাম : 'না, সে আশা কীই বা করি। যে বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি তাদের সবাই কিছু না কিছু দিতে চায়, বলবার আছেও তাদের বহু। সেজন্যই এমন কত লোকের কত কি কাহিনী। তাদের কারুর জীবনের সঙ্গে কারুর জীবনের, যিল নেই, অথচ তাদের সকলের বক্তব্য যেন প্রায় একই ধাঁচে বাঁধা।'

ছাঁদ বললে : 'আজ যোরকারি হাতে সবাই ফিরবার, আছে শুধু মাস্তাল আর আমি।' বলে আপন খেয়ালেই আমার মুখের দিকে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছাঁদ কিছুক্ষণ রইলে, তারপর বললে : 'কিন্তু আমার নিজের সঙ্গে যিল নেই তাদের অনেক। আমি জানেও মাস্তাল, মানেও মাস্তাল।'

কথাগুলো যথার্থভাবে আমলে আনলাম। দেখলাম—ইতিমধ্যে আরও দু'তিনজন লোক সেই বর্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। এবারে এগিয়ে এলেন পাদ্রিবাবু, এগিয়ে ছাঁদ আর আমি। চিরকালের অপরিচয়ের বন্ধন থেকে তোমাকে বুঝি একটা মুহূর্তে পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারবো বলেই পরিবেশটা ধীরে ধীরে অনুকূল হয়ে উঠলো। বললাম : 'কিন্তু মাস্তাল হবারও তো একটা ইতিহাস থাকে! ধরুন, আমি যেমন গানে মাস্তাল, গান গেলে আমি সংসারের সবকিছু ভুলে যাই। তেমনি এই পার্থিব জীবন থেকে ভুলে থাকবার জন্যে লোকে ঈশ্বরকে ডাকে, মদ খায়, পাপ পুণ্য যা হোক কিছু করে। আপনার এমন কিছু—?'

এবারে যেন তোমার কি হলো, হঠাৎ আমার মুখের দিকে তোমার চলচলে চোখ দুটো আর একবার স্থির করে তো-তো শব্দে হেসে উঠলে ছাঁদ। ভাবলাম—এই আকস্মিক হাসির ঘমকই হঠাৎ ছাঁদ আমার ফেপে না ওঠে! তবে পাদ্রিবাবুর সামনে এখানে নিশ্চয় আবোলে আমার পক্ষে আর বসে থাকা চলবে না, উঠে যেতে হবে। কিন্তু দেখলাম—ছাঁদ একেবারে আলাদা ধাতের মানুষ। হেসে তো উঠলেই না বরং আরও নিবিড় হয়ে বসে নতুন করে আর এক কাপ চা চাইলে। বললাম : 'কিন্তু যদি মনে না করেন, তবে এ কাপের বদলে বরং আমার একটুকরো খেতেই থাক্।'

—'কেন, আমার অভাবের কথা জানিয়েছি বলে?' খেমে ছাঁদ বললে : 'অভাব আমার কোনোকালে ঘুচবে না; তাই বলে দু'চার কাপ চায়ের দাম মেটাতে পারবো না, তা নয়। আপনাকেও দিতে না আর এক কাপ। কথা যখন তুললেন, তখন কথা বলেই কিছুক্ষণ কাটাই।'

বললাম : 'তা হলে আপনি কথা বলতে ভালোবাসেন, বলুন!'

এবারে চোখের কিরকম একটা ভঙ্গি। তারপর কথা বলে ছাঁদ বললে : 'তা বাসি। বেশীক্ষণ চুপচাপ করে থাকলে কেমন যেন নিজের সঙ্গে লাগতে ওঠে।'

ইতিমধ্যে তোমার ইঙ্গিতেই দু'কাপ চা এসে টেবিলে পৌঁছালো। কিন্তু তখনও দুটি দু'বারের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বললাম : 'এতক্ষণ আমিও কি রকম যেন একাকিত্বে ভুগছিলাম। একটু আগেও যারা এখানে ভিড় করে ছিল, তাদের কাউকে যেন ঠিক কথা বলবার মতো পাওয়া যায়নি। আপনাকে দেখে মনে হলো বোধ করি এতক্ষণে কিছুটা একাকীত্ব ঘুচলো।'

ছাঁদ হঠাৎ যেন কেমন থেমে পড়লে, তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করে বসলে : 'আপনি বিয়ে করেছেন? ঘর-সংসার আছে তো নিশ্চয়ই?'

বললাম : 'একটাই যা বাকী আছে।'

ছাঁদ বললে : 'তবে তাড়াতাড়ি কি করে?'

বললাম : 'মেসে। মাঝে মাঝে অচল হয়ে পড়লেও মোটামুটি বেশ কেটে যায়।'

ছাঁদ বললে : 'আমার একটা জায়গা হয় না সেখানে?'

এবারে একটু থামতে হলো আমাকে। থেমে ভাবতে হলো—জায়গা হলেও তোমার মতো মফস্বলকে মানেজার মেসে কিনা মেসে! তারপর বললাম : 'না জেনে বলি কি করে বলুন?'

ছাঁদ বললে : 'ঠিকানা দেন তো আমি গিয়ে দেখা করতে পারি। রাত্রিটা কাটাবার মতো একটা জায়গা না হলে এখন আর চলছে না।'

কোনোকিছু ভাবন না করে এবারে আমার নাম ঠিকানা দিয়ে বললাম : 'আসবেন একদিন, খুব খুশি হবো।'

ছাঁদ বললে : 'যাঃ, বেশ লাগছে তো আপনার, ভিজবেন কাল।'

বললাম : 'কিন্তু আমার নিজের কারোই নিজের এ নাম ভালো লাগেনি; বড্ড মেয়েলি মনে হয়েছে।'

ছাঁদ বললে : 'কে যে বললেন! আপনি নিজেই হয়তো জানেন না যে, কি অদ্ভুত একটা নতুনত্ব নিয়ে সবার থেকে আপনি আলাদা হয়ে থাকছেন!'

—'তবু ভালো যে আপনি বললেন, আর কেউ এমন করে বলেনি।' খেমে বললাম : 'কেন আপনার নামের মধ্যে বুঝি নতুনত্ব কিছু নেই?'

—'কিছু নেই, বরং একটা পৌরো-পৌরো ভাব আছে।' ছাঁদ বললে : 'পৌরাণিক দরকার। প্রথমের মুখে এই কি একটা নাম হলো।'

বললাম : 'কেন, খারাপ কি, বেশ তো পুরুষালী নাম।'

—'টা, মুখচুরুও একদিন একথাই লিখিল।' ব'লেই কেমন যেন চোখ রে তার ক'রে তুমি, তারপর টোকে ঢাকবার চেষ্টা ক'রে বললে: ঘাট মন, দেশ আই এাম টাকং, পাওটা কি জানো তাই, সভ্যসমাজে ব নামে আজকাল আর চলে না। তা ু, দুটিটা খোল করি এবারে ভদের কে, আমি বেরিয়ে পড়ি। একদিন বো তার কিরকমটা ছোবার মেলে।' লে একটিমিনিটও আর অপেক্ষা ক'রলে পাশুবাবুর টেবলে চায়ের দাম মিটিয়ে যে সা ক'রে তুমি সেই বাইর মধ্যেই বার বেরিয়ে প'ড়লে। ভাবলাম— ৮ যাকা ওঁজবার কোনো ভাবনাই মার নেই, তবে ভিড়ে পুড়ে তুমি সব কোথায় গিয়ে উঠবে: কিন্তু তক্ষুণি মোর মস্তিষ্কের আর-একটা দিক যে নিজের কাছেই বিস্ময়ে ম'রে লাম। আবার সময় তুমি এমন কি স্থীর মনে ক'রে গেলে আমাকে যাতে লিনি' থেকে অনায়াসে একেবারে মি'টে নেবে আসতে পারলে! কিন্তু ও বিস্ময় মনে হ'লো তোমার মুখে ুকুস্ মাখটা শুনে। অতর্কিতেই নামটা মার মুখে এসে গিয়েছিল। বললাম—যদি সত্যিই আবার কোনদিন মার সঙ্গে দেখা হয়, তবে কে-ক'রেই ক্ অন্তত: জানতে চেষ্টা ক'রবো—কুস্ তোমার কে, আর তোমার মোটা খিনটাকে কোথায় তুমি ফেলে এসে ুমি ক'রে আজ ঘুরে ম'রছো!

দেখলাম—মিথ্যে ব'লে উঠে যাওনি ছিল। সত্যই খানেক বাদে তোমের কে একদিন খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে ছিলে তুমি আমার মেসের ঘরে। হয়তো ামার সাথের সঙ্গে একটা বাধু যোগ রে সম্বোধন ক'রতে পারতাম, কিন্তু ন যেন বাধু শব্দটা আমার মুখে ল না। তোমাকে দেখে খুশি প্রকাশ রে হ্যাৎ বলে উঠলাম: 'আরে:, : আশ্চর্য, যোগীদা যে, আসুন, ভেতরে এসে বসুন। চায়ের ীবলেম, আমাদের ক্লাবের পাবলিকটা া'হলে সত্যিই তোলেনীন দেখছি।'

লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—আজ তুমি যোজার প্রস্তুতিতে। বললে: 'ভিতরে সে বসতে পারি এক সঙ্গে।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'সঙ্গটা কি?'

তুমি ব'ললে: 'হাঁ। মনে যখন ভেবেছ তাই, তখন ঐ আপনি টাপনি-গুলো চলবে না।'

হেসে বললাম: 'না নিজে থেকেই এক সময় অচল হ'তো, তাকে জোর ক'রে সরিয়ে দিলে পরে বিশ্ব উপকার হয়, এই ভয় ছিল। তা তোমারই ভয় জোর যোগীদা, এস, এবারে ভিতরে এসে বসো, বয়কে ডেকে আমি চায়ের কথা বলি।'

—'তার জন্যে এত ব্যস্ত কেন, চা-পরে ক'লেও চলবে।' ব'লে এবারে তুমি অনায়াসে আমার ঘরে এসে বসলে।

বললাম: 'এ সময়ে আমেজার তার নিজের আফিস ঘরেই থাকে। আমি বলেও রেখেছি একটা সিটের কথা। তোমার সঙ্গে তার সাধনা-সাধনি কথা হওয়াই ভালো।'

—'তার জন্যে কিন্তু ব্যস্ততা নেই। সে জন্যে আসিও নি আমি। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম কিরণ। একটু থেমে তুমি বললে: 'সেদিন কেন যেন তোমার সঙ্গে কথা ব'লে আমার মনে হয়েছিল—তোমাকে অনায়াসে সব কথাই বলা যায়।'

বললাম: 'আমিও যে তখনো ব'লেই অপেক্ষা করছিলাম যোগীদা। কিন্তু একটি নাম শুধু উল্লেখ ক'রে তুমি নিজেই যেন কেন চেপে গেলে!'

—'কিন্তু ফেলে আর যাবতে পারলুম না। ক'দিন ধ'রে নিজেকে নিয়ে বড় জ'লে পুড়ে মরছি। তাইকে মনের কথা খুলে বলতে না পারলে এ পোড়া মনটা নিয়ে আর চলতে পারছি না।' ব'লে আমার মুখের দিকে তোমার চোখ দুটোকে তুলে ধরলে।

'ইতিমধ্যে বয় আমার তাকে চা আর কিছু খাবারের কথা বলে দিলাম।

এবারে তুমি পা তুলে কিছুটা জোকাসন কেটে বললে, তারপর পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে বললে: 'সিগারেটে তোমার আপত্তি নেই তো কিরণ?'

বললাম: 'অভ্যাস নেই, তুমি বরং ধরাও।'

এবারে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সশব্দে ক'রে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তুমি বললে: 'এলে তোমাকে ডিসটার্ব করলাম না তো ভাই?'

বললাম: 'এরকম ডিসটার্ব যাকে মাঝে এসে করলে আমি বরং খুশিই হবো। এবারে তোমার নিজের কথা কিছু বলো, শুনি।'

—'নিজের কথা বলবোই তো এলাম যে!' তুমি বললে: 'নিজেকে নিয়েই তো আর সবাই, কিন্তু তাতা সবাই চ'লে যায়, তখন নিজের বলতে কিছুই যে থাকে না কিরণ। তখন নিজের কাছেই নিজেকে বড় অচল ব'লে মনে হয়।'

এবারে তোমার মুখোমুখি আমি গালে হাত রেখে চুপ ক'রে বসলাম, কিন্তু তোমার কথার জবাবে কি যে বলবো, ভেবে পেলাম না।

একটুকাল চুপ করে থেকে তুমি নিজেই, একসময় বলতে সুরু করলে, 'মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় কিরণ জানো? মনে হয়—আত্মজীবনী লিখি। কিন্তু সেই মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাবি—ভাবী তো একটা লোক আমি তার আবার আত্মজীবনী! কিন্তু সকলের জীবনেই বোধকরি কিছু-না-কিছু ঘটনা অন্তত: থাকে: আমারও যে নেই, তাই বা বলি কি ক'রে? কিন্তু তা বলতে গেলে নানা সূত্রে মহাভারত হয়ে ওঠে। তা বলবার মতো ধৈর্যও নেই, সময়ও নেই। তবে যে পথে এসে আমার তরী ডুবলো, ডুবলো আমার একটা জীবনের সকল ঐশ্বর্য, তার স্মৃতি আজ আর আমি মনে বেড়াতে পারছি না।'

ইতিমধ্যে বয় এসে তোমার আর আমার চা আর খাবার দিয়ে গেল। বললাম: 'খাও, চা খাও যোগীদা, খেতে খেতে বরং বলো, শুনি।'

কিন্তু সেদিকে বড় একটা আসক্তি দেখা গেল না তোমার। বললে: 'তুমি অনুরোধ, তোমার হয়তো অভিজ্ঞতার আসবে না কিরণ, তবু বলি —সংসার করবো ব'লে সাধ ক'রে একসময় বিয়ে করেছিলাম। সাধ মনে তখন ঘর-পরীবের নূপুর-নিক্কণ চলেছে। তাইসময়ে তখন আমি বড় চাকরী করি। ছোটা টাকায় একটা মনোরম ফ্লাট ভাড়া নিলাম সাদি পার্কে। নবধূকে নিয়ে যে ঘরে বাস করবো আমি, তার সবটাই যাতে মনোজ্ঞানো না হয়, তবে যে বিয়ে করবার মানেই হয় না। সোফা-কাউচে কার্পেটে পর্দায় ছটা ঘরকে নিজের হাতে আমি সেজে গুছিয়ে তুলেছিলাম কিন্তু—'

ব'লতে গিয়ে হঠাৎ যেন থেমে প'ড়লে ছুমি :

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করলাম 'কিন্তু কি যোগীনদা ?'

ক্লান্তকণ্ঠে ছুমি ব'ললে : 'কিছু তার ঠিকলো না। মাধবীকে নিয়ে যে ঘর নিজের হাতে সাজিয়ে গুছিয়েছিলাম, নিজের হাতেই আবার সে ঘর ভেঙে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।'

কৌতূহলেই আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম : 'কেন, কেন তাহ'লে যোগীনদা ?'

—'তাহ'লেম আমার ঘর ভেঙে গেল বলে। প্রথম রাত্রেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—মাধবী অন্তঃসত্ত্বা। ' বললাম : নিজে পাশ ফিরিয়ে এনে আমার উপর ভার সোজা চাপাতে চেয়েছিলে, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে ; আমার আর দায়িত্বের প্রয়োজন নেই। উত্তরে তার হয়তো কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু তা শোনবার মতো আমার আর প্রবৃত্তি ছিল না। হাতের অস্ত্রটার কেটে গিয়ে তখন সবাল হতে শুধু বাকী। বেরিয়ে পড়লাম পথে। এতবড় আঘাত যে আমার জন্যে অপেক্ষা সঞ্চিত হয়ে ছিল, ভাবতে পারিনি। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। ভাবলাম হয়তো পাগল হয়ে যাবো। এতবড় একটা ষড়যন্ত্র আর প্রতারণাকে ভুলে থাকবার জন্যে সেই মদ ধরলাম। শরীর গেল, মন গেল, চাকরীটাও একদিন চলে গেল। মনে মনে বললাম—যাক্, সব যাক্, বেঁচে থাক্ শুধু আমার ঘৃণা দুর্জয়ী।'

হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছুমি আর একবার প্রশ্ন করলে, ব'ললে : 'তোমার চোখ দুটো স্থির কেন কিরণ, কই, চোখের পলক পড়ছে না তো ?'

চোখ দুটোকে একবার ঘষে নিয়ে বললাম : 'মন দিয়ে তোমার কথা শুনছিলাম, ভাই। ছুমি বলো যোগীনদা তারপর কি হলো, বলো।'

ছুমি বললে : মেয়ে জাতটার উপর সেদিন যখন মন থেকে সব বিশ্বাস একেবারেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল, এমনি দিনে কুমকুম এলো অপূর্ণতার মতো আমার জীবনে। আমার সেদিন হঁস ছিলনা, কোথায় যেন পথে সেদিন বেহঁস হয়ে পড়ে ছিলাম : যখন জ্ঞান ফিরলো, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম—তার ঘরে আমারই কোলের উপর মাথা রেখে আমি শুয়ে আছি। চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম : 'কে ছুমি ?' আমার মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহ বিহ্বল কণ্ঠে সে বললে : আমি কুমকুম। জিজ্ঞেস করলাম : এ আমি কোথায় আছি ? সে বললে : আমার ঘরে, ভয় নেই, পথ থেকে তোমায় কুড়িয়ে পেয়েছি, কিন্তু ওপথ তোমার জন্যে নয়।'

ব'লে ছুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে যোগীনদা।

জিজ্ঞেস করলাম : 'কুমকুম সেবা কে, বললে না তো ?'

গোপন করলে না, বললে : আমার জীবনে সে অপূর্ণতা, কিন্তু তার আগেও একটা জীবন ছিল তার,সেজীবনে সে ছিল আমার মতো কোনো পুরুষের বাঞ্ছিতা ও কিন্তু নারী যে কী মর্মান্তিকা হতে পারে, কুমকুমকে না দেখলে বুঝতে পারতুম না। সে আমাকে ঘর ছাড়ালো, পরিপূর্ণতা এনে দিল আমার জীবনে। তার মত গানের গলা আমি কারুর শুনিনি। গানই ছিল তার জীবিকা।'

জিজ্ঞেস করলাম : 'এখন তিনি কোথায় ?'

এবারে বুকি গলাটা তোমার একবার ধরে এলো, উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ব'ললে : 'স্বর্গে।' তারপর একটুকাল থেমে ব'ললে : পাঁচ বছর আমি আর কুমকুম একসঙ্গে ছিলাম ; সে আমাকে স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিল, অকুণ্ঠ কর্মোদ্যমনা এনে দিয়েছিল সে আমার মধ্যে। আমি আবার একটা নতুন ফার্মে জয়েন করলুম। পাঁচটা বছর কি অদ্ভুত ভাবেই না কেটে গেল আমার। কিন্তু এ পোড়া অদৃষ্টে সুখ থাকলে তো ! কিসের মধ্যে কিসু নেই, সামান্য জ্বরে হঠাৎ একদিন ভাটিয়ে গেল কুমকুম। তার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখখানিকে সজোরে দু'হাতে চেপে ধরে বললাম : আবার তো আমাকে ছুমি পথেই নামিয়ে দিয়ে গেলে !—সেদিন থেকে আবার পথে পথেই ঘুরছি কিরণ। ঘরে তুলে নিয়ে যে-মন আমাকে ছাড়িয়েছিল কুমকুম, সে চলে গিয়ে সেই মনই আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।'

শেষ লক্ষ্য করলাম—কথা শেষ করতে এবারে টস্ টস্ ক'রে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো তোমার চোখ বেয়ে। নতুন ক'রে আর যে কিছু প্রশ্ন করবো, এমন উপায় রইল না। পাশে তাকিয়ে দেখলাম—বয় এসে বেডটি চা আর খাবার রেখে গিয়েছিল, সেই ট্রাবেই উঁড়ে আছে। তা না উঠলো তোমার মুখে, না উঠলো আমার। বললাম : 'কিছু যে খেলে না, নতুন ক'রে আবার গরম চা দিয়ে যাক্, কেমন ?'

ছুমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লে। বললে : 'না, থাক, আজ আর কিছু খাবো না।'

বললাম : 'ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে তো ?'

ছুমি বললে : 'থাক, দরকার নেই।' তারপর একটুকালও আর দাঁড়ালে না, সিঁড়িতে পা বাড়িয়ে ব'ললে : 'চলি ভাই।' এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঝড়ের মতো উধাও হয়ে গেলে।

ভাবলাম—হয়তো খুব শীগ্‌গিরই ছুমি আর একদিন আসবে। কিন্তু দিনের পর দিন অপেক্ষা ক'রেও আর তোমার দেখা পেলাম না। আজও তোমার সঙ্গে পরিচয়ের সেই প্রথম দিনের মতো পাদুবাবুর দোকানে ব'সে চা খাচ্ছি। বাইরে সন্ধ্যা, আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু সোদনের মতো বর্ষণ নেই। এক-একজন ক'রে কাস্টোমার এসে পরদা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, ভাবছি—এমনি ক'রে হঠাৎ যদি ছুমি এসে পড়ো ! কিন্তু আমার শুধু ব'সে ব'সে একমুখ থেকে আর এক মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এক কাপ থেকে আর এক কাপে চুমুক দেওয়াই সার হ'লো, তোমার উপস্থিতি আর অনুভব করতে পারলুম না। আমার সারা হৃদয় জুড়ে একটা চিহ্ন রাখিয়ে দিয়ে ছুমি হয়তো চিরদিনের মতই নিজেকে আড়াল ক'রে নিলে। কিন্তু আমি যে আজও তোমাকে ভুলতে পারলুম না যোগীনদা, হয়তো কোনদিনই ভুলতে পারবোনা। জীবনের কোন কোন মুহূর্ত যে চিরকাল এত উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে, একথা এর আগে এমন ক'রে কখনও ভাবিনি ? কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রশ্ন আজও আমার মন থেকে যায়নি।, মাধবীর শেষ পর্যন্ত কি হ'লো, কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো সে তার সন্তানকে নিয়ে ? তার সন্তানের ছুমি পিতা নও, কিন্তু হ'তেও তো পারতে।

কানের ভিতরদিয়া

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধার শ্যাম নাম শুনে প্রাণ আকুলি বিকুলি করেছিল। আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে শুধু শ্যামনামেই মন কানের ভিতর দিয়া মরমে যা পশে তার সব কিছুতেই। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দুটো ইন্দ্রিয়ের আর বিশ্রাম নেই। নাক আর চোখ। কিশলয়ের খেলা ঘরে অপরূপাকে দেখতে দেখতে যখন চোখ পচে যাবে তখন চোখ বন্ধ করতে পারেন—কিন্তু কান। কান যেন অষ্টপ্রহর কাটায়। দিনরাত সেখানে কাজ চলছে। সাধ্যাতিনের ঘাড়ভাঙা প্রাক্টিস শুরু আপনার বন্ধুর বিজ্ঞানের ঘরে আপনার ঘরের ইন্টিরিয়রে একটু হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। চোখ দুটোকে আরাম দিতে দিয়েছেন। কিন্তু কান আপনার ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। আপনি শুনছেন, পাশের ফ্ল্যাট থেকে কোন তীক্ষ্ণলোচন শর্মা হাসপাতাল বাংলা গান (যে বাংলা গান শুনে প্রমানন্দ: যায় হয়) ধরেছেন। নিশ্চয়ই রেডিও। কারণ রেডিওর দাতাদা ছাড়া এত বিকট চিৎকার মানুষ করতে পারে না। শুনছেন, আপনার পাশের ঘরেই আপনার ছেলেমেয়েরা। রাজনৈতিক নেতাদের মত উচ্চগ্রামে ঝগড়ায় মত্ত হয়েছে। আর, আর আপনারই স্নেহের অবিমেষ অঙ্গ কান নীরবে নির্বিকারভাবে তা শুনে যাচ্ছে। হায় খুশীমত চোখ বন্ধ করার মত কান বন্ধ করার যদি কোন উপায় থাকত!

পিঠে বৈরোঁয় কুলো এবং কানে নিরোঁয় কুলো—কিন্তু তুলনায় তেমন কোন ফল পাইনি। তুলোয় সুখ বাধ হেড় করে শব্দ তরঙ্গ কানের ভিতর দিয়া আমার মরমে প্রবেশ করেছেই। শাস্ত্রে বলেছে, পরের কথায় কান দিওনা, কিন্তু এই প্রবচনেই বা কে কান দিতে যাচ্ছে। স্বয়ং শ্রীইশো বলেছেন: 'হেভ্ড ইয়ার্স টু হিয়ার।' আর না দিয়েই বা উপায় কি! স্কুল লাইফে আমি বহুবার কান দিয়েছি। অতএব মাষ্টার মশাই, আর হেডপণ্ডিতের কাছে আমি বিনম্রভাবে আমার ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। এই যে দেখছেন আমার শ্রবণশক্তি, তা লম্ব কানে বলে তা কানে শুনতে পাইনি বলেই অথবা 'এ' এর পরের সপ্তমীর বহুবচনে কি হবে, তা পণ্ডিত মশাইর বহুবার বচনের পর নিরুত্তর থাকার জন্যেই।

নয়ত মশায়, আমারও আপনার মত কান ছিল। মহাভারতের কর্ণের মত কর্ণ। কবচ কুণ্ডল পরালেই যে কর্ণ কর্ণীর রূপ ধারণ করত। কিন্তু স্কুল লাইফে অতিরিক্ত কর্ণপাতের ফলেই আমি আজ লম্ব কর্ণ। নিয়মিত কর্ণপাতের ফলে অন্তত পাঁচ সেন্টিমেটার আমার কর্ণবৃদ্ধি ঘটেছে। যদিও কানের দান ওজনে বাড়ে। তবু সম্পর্কে কানের এমন তুলনা ইতি আগে হয় না।

কানের সঙ্গে চোখের তফাৎ এল, চোখ আপনার অনুমতি চাইবে। কার আপনার নিকেল চাইবে। আরামে অথবা আজকে ইচ্ছে করলেই চোখ বুঁজতে পারেন। কিন্তু যতই বুজুন মরমের শ্রুতি [illegible]

নেই। কানে আঙুল দিয়ে অথবা তুলো দিয়ে কেউ কি বোউডম হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে। বোউডম এই পদ্ধতিটা বিস্ময়কর আবিষ্কার। কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার বোউডম বন্ধ করার চাবি। বোউডম হাত থেকে কান ও প্রাণ বাঁচানোর প্রথম আর এক দল বোউডম বন্ধ করবি চাবি। এই চাবির আছেই কান জন্ম। সবচেয়ে Cunning method হল এটি।

কিন্তু সে যা হক হল, আজকের দুনিয়ায় সোনা কি শুধু একটাই? বোউডম সোনার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আপনি না হয় বাঁহাতকেই বর করলেন। কিন্তু তবু আমনা বাসনা থেকে মুক্ত পুরুষেরও সোনার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ও হাঁ। শুনছেন'। আপনি চকচকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন আপনার কোন পরিচিত ভদ্রলোক। পথের মাঝে আপনাকে কোন সোপন কথা শোনাবার জন্য দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

আমার মনে হয় সকাল থেকে একটা মানুষকে যেসব বস্তুগুলি শুনতে হয়, সেগুলি মোটামুটি এই।

ঘুম থেকে উঠেই স্ত্রীর কাছে এটা নেই ওটা নেই ফিরিস্তি। বাজারে গিয়ে কি ধরনের বাজার করতে হবে সে সম্পর্কে একটা ছোট খাট লেক্চার। বাজার থেকে ফেরার পর আপনি যে কি ধরনের অপদার্থ সে সম্পর্কে একটা ভাষণ। ছেলে স্কুলে চলে আসার পথে কোন সহযাত্রীর কাছ থেকে তাঁর জীবনের গল্প চলেও সাতটা ধরনের কিছু ঘটনা। তারপর চল কি জানেন আমিও মুখের ওপর জবাব দিয়ে চলে এলুম। জীবনে ছেলে কাউকে চিনিনি, ও ব্যাটাকে দিতে দিতে যাব কেন? তারপর চল কি জানেন'—এই তারপর যে কি ভোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটোছল এবং আপনার সহযাত্রী সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনায় কিভাবে নায়ক হয়েছেন, তা আপনাকে শুনতে হবে। তারপর আপিসে গিয়ে আপনার কলীগের কাছ থেকে আপনার ডিপার্টমেন্টাল কল সম্পর্কে খিস্তি, ছেলে ও ভাস্তুবধূদের চালের অনটন এবং মাছ কিনতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ইত্যাদি শুনতে হবে। কমবয়সীর কলীগ হলে, তার প্রেমিকার সঙ্গে গত শনিবারে রাতের মাঠে কি কি কথা হল, তাও শোনার তালিকার মধ্যে।

মাঝে বাড়ি ফিরে করতে হবে আপনাকে একটু বিশ্রাম নেবেন ভাবছেন। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে একটা বই পড়ছেন, এমন সময় স্ত্রী এসে বলবেন: শুনছ।

আপনি বলবেন: বলনা।

স্ত্রী বলবেন, ওই যে পাশের ফ্লাটের লক্ষ্মী তার মাসশাশুড়ীকে আজ দেখলুম, যা লক্ষ্মাল বাঁহনা। ওর ছেলে নাকি বিলেতে গেছে। ভাগো, লোক ছাগল বিলেত চলে যাচ্ছে, ছুঁচো যেতে পারলে না, কই শুনছ?

আপনি একটা আকুলাসিক ধ্বনি ছাড়বেন: হাঁ।

অবশ্য কোন ইংরাজী ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, স্ত্রীর সুভাষিতাবলি থেকে কান এবং মান বাঁচাতে গেলে কতগুলি আকুলাসিক ধ্বনি শিখে রাখতে হয় ও প্রতি এক্সাক্টলি অন্তর তার প্রয়োগ করতে হয়। এই ধ্বনিগুলি হল—হুম, চ'-চ', হোঁ, আচ্ছা, তারপর, ইত্যাদি।

জীবনে সবচেয়ে বেশী শুনতে হয় বোধ হয় আদালতের বিচারকদের। শুধুই শোনা। একটা চেয়ারে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে শুধুই সওয়াল আর জেরা শোনা। বিজ্ঞানসম্মত শ্রবণের অবস্থাও ভীষণ।

তবু তাঁদের শোনার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু টেলিফোন অপারেটরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন। তাকে দিনরাত শুধু নম্বর আর লোকের নাম শুনতে হচ্ছে। নাম পেলেই তাঁকে থ্রীক্ত।

...বিলেতের বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন একজন সাধারণ মানুষকে সারা দিনে প্রায় এককোটি শব্দ শুনতে হয়। ছাত্রদের ও বিচারকদের শুনতে হয় আরও বেশী প্রায় দেড়কোটির মত।

আপনি নীরব থাকতে পারেন। শুনব না-না-না বলতে পারেন, কিন্তু তার বদলেও আপনাকেও কথা শুনতে হবে। শুনতে হবে, আপনি ছদ্মবেশী, আপনি অসামাজিক, স্বার্থপর।

তবু বদনামকে যদি আপনি থোড়াই কেয়ার করেন, তাহলে সোনার হাত থেকে আপনি নিষ্কৃতি পাবেন। কেউ কিছু সোনাতে এলেই প্রথমতঃ দুটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তখন কেউ আপনার সামনে এসে খুব উৎসাহ সহকারে কিছু বলে যাচ্ছে, তখন আপনি ঘুমোবার ভান করতে পারেন, চারটে ইঞ্জিনবাহী মালগাড়ি পাঠাতে পারেন, অথবা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে পারেন। অবশ্য স্ত্রীর কাছে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আমি একজন স্ত্রীকে জানি, যিনি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করে ছিলেন। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপারটা কি মাতাম?

স্ত্রী বললেন: আর বলবেন না, ধর্ম,বতার। আমি কিছু বলতে গেলেই আমার স্বামী চিৎকার এইটুকু কাণ থেকে নামিয়ে রাখেন।

যাই হোক, আজ আমি কয়েকজন ফেলসেবককে জানি যাঁরা শ্রবণের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অযোধ ফল পেয়েছেন। ইলেকশনের পর নির্বাচন কেন্দ্রের লোকেরা অভাব অভিযোগ শোনাতে এলেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন। এই মেথডটির উদ্ভাবক চক্ষেন, কিন্তু কেস্টিভালের বিচারকেরা। যে ভাব দেখে তাঁদের যত তাড়াতাড়ি ঘুম আসে, সে ভাবকেই তাঁরা প্রাইজ দেন। সাবপ্রাইজ বলে মনে হলেও ঘটনাগুলি সত্যি।

অবশ্য দ্বিতীয় মেথডও আছে। এটি একটু কড়া। মানে, আপনি যদি বেশ কড়া প্রকৃতির লোক হন, তাহলে মাক্কাতের টিট করতে সময় লাগবে না। আপনাকে শোনাতে এলে আপনিও শুনিয়ে দেবেন। আরও কড়া করে শুনিয়ে দেবেন। মরম পাবের ওপর আরও কড়া পাড়।

আমি এক ভদ্রলোককে জানি, যাঁর কাছে এলেন তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি।

এসেই বলতে শুরু করলেন: ভাল ভাবনা বাসুর বিষে জানেন নাকি মশায়—।

ভদ্রলোক চোখ পাকিয়ে বললেন: তাতে আমার কি!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন: আজ্ঞে, আপনাকে মেসেজ করতে আসবে বলেছিল কি-না।

প্রথম ভদ্রলোক তেমনি চোখ পাকিয়ে বললেন: তাতে আপনার কি?

বলাবাহুল্য এর ফলে প্রথম ভদ্রলোকের আর কিছু শুনতে হল না। নয়ত শুনতে হত ভাবনা বাসুর কিস

ফুলের চাহিদা। আনন্দে পেলাম থেকে চিঠি কিছুই বাকী রাখছেন না ভদ্রলোক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে নির্বোধ এবং দুঃসাহসিক লোকের অভাব নেই, যারা কিছু শুনবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে। সিনেমা থিয়েটার ও যাত্রা শোনবার ভিড়ের কথা ছেড়েই দিলাম—যাদব প্রভুর চরিতসংকীর্তন থেকে যাবজ্জীবন রামনাম সত্য, মুহুর্মুহু বক্তা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন থেকে ভেজালদাতা ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশন সমস্ত কিছুই শোনবার লোকের অভাবে হয় না। এমনকি কলকাতায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লোকে পাগলের প্রলাপ পর্যন্ত শোনে। বোধহয় আমার এই ট্রাম প্রবন্ধটি যদি চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়তে সুরু করি, তাহলেও শোনবার লোকের অভাব হবে না।

শোনবার লোক শুধু শ্রোতার মধ্যে শোনবার লোক বক্তারও। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, মুখে ফেনা উঠছে, বক্তা তবুও বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। একবার এক সভায় এক বক্তা আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর খুব লজ্জিত হয়ে শ্রোতাদের বললেন: দাঁত, আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। আমার হাতে ঘড়ি ছিল না।

অর্মনি শ্রোতাদের একজন উঠে বললেন: কিন্তু দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারটা তো ছিল!

কিন্তু অনেক শোনা আছে, মনে হয় যা নাকি অনন্তকাল ধরে শুনি। শ্রীরাধা মৃদুস্বরে যখন শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শ্রবণ করতেন, তখন নিশ্চয়ই মনে হত এক একটি প্রহর যেন এক একটি শতাব্দী। আবার পুংকাদের সেই শ্রীরাধাই যখন আক্ষেপানুরাগের নায়িকা, যখন দূতীর কাছে শ্রীনায়িকা চন্দ্রাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাত্রিবাস শুনছেন, তখন মনে হচ্ছে এক একটি দণ্ড কি দুঃসহ।

এমন মুহূর্ত আপনার জীবনেও নিশ্চয়ই এসেছে। মফস্বলে, কিংবা আউট্রামঘাটে চাঁদে বাঁশের থেকে নেমে, আপনার প্রিয়তমার আবোল তাবোল প্রেমালাপ আপনার কানে মধু বর্ষণ করেছে। অথবা চৌরঙ্গীতে আপনার প্রোমোশন বন্ধুর ওনে আপনি সেই ছিপ মাইনাস ছয়ফুটের কুকুরটির মত আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে উঠেছেন। ঘণ্টাখানেক ধরে কানে মধু বর্ষণ করার পর তিনি, যখন বললেন, আজ তাহলে রেখে দেই—প্রাণ একঘণ্টা হয়ে গেল, মা'র আবার ঘুম ভাঙবার সময় হয়ে এল। বাবাও আপিস থেকে বাড়ি ফিরবেন।

তখনই আপনি সান্ত্বনার বলেছেন, আর একটু, থাকোনা মিনু, আরও কিছু বল।

কিন্তু মিনি যখন রেজিগ্নেশন অফার করে, রেজিগ্নেশন হয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে আপনার ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন? তারপরেই মনে হবে আপনার 'লাইফের টিক গোজেন।' কোন বিলাতি কাগজে যেন পড়েছিলাম, হিথ্যাংক এইড দাঁত বাবদ খরচ করেন, তাঁদের পক্ষেও আপনিই বিবাহিত।

বিলাতি পত্রিকার মর্মের কাটুন দেখে ছিলাম। সবাই বলে আছে। কেউ কোন কথা বলছে না। মনে হয় ধর্ম সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দর আইডিয়া আর হতে পারে না।

কিন্তু শুধু কথা নয়—শব্দ থেকেও কর্পোরেশনের আজ নিষ্কৃতি নেই। কিছুকাল আগে, টৌকিও বিমান বন্দরের পাশে এক ভদ্রলোক আদালতে বিমান কোম্পানীর নামে নালিশ করেছিল এই বলে, যে বিমানের বিকট আওয়াজে নাকি তার রাতে ঘুম হয় না। অদূর ভবিষ্যতে হেট ঘুম আসবে, যখন বিমানের শব্দের জন্যেই লিসিং চার্জের বিল বেড়ে যাবে। যাচ্ছেটে অধিক টাকা বরাদ্দ করতে হবে ছেটের শব্দ নিবারণের জন্য। কিন্তু এতো গেল বিমানের শব্দ—সাধারণ নাগরিককে দৈনিক যে সব কর্মিবাহী শব্দের সম্মুখীন হতে হয়, তার একটা তালিকা করেছি। মিলিয়ে নিতে পারেন।

কয়লা ডাম্পার শব্দ, ট্রাম থেকে জল পড়ার শব্দ, প্রাইভেটদের হৌচকর শব্দ, ছেলেমেয়েদের কান্না, ঝগড়া, এয়ারোপ্লেনের পড়াশুনা, পাড়ার ছেলেদের বল খেলা উপলক্ষে হল্লা, ভজন চুরেছ ফেরিওলা ও ভিখিরির পাঁয়তারা চিৎকার। বাড়ির পাশে কারখানা থাকলে তার শব্দ, রাস্তার ধারে বাড়ি হলে ট্রাম-বাস, ট্রাক ঘন্টি, মাইক্রোফোন—এ সবের শব্দ। সুতরাং আমার মতে এ পৃথিবীতে সুখী হল মাঝিরেরা। ঘোষার শব্দ নেই, কিন্তু কালাদের কোন বন্ধু নেই। এবং শত্রুর চেয়ে মিত্রই ভয়াবহ। কারণ মিত্র আপনার নিত্য সঙ্গী এবং আপনাকে কিছু শোনাবার মৌলিক অধিকার তারই।

কালাদের তাই নয় ও অন্ধের উপরই আছে। আমি একজন অন্ধ ভদ্রলোককে জানি। নাম তার শ্যামবাবু। ত্রিশ বছর ধরে ষ্টেরোর কাজ করছিলেন ভদ্রলোক। আপন মনে লোক চক্ষুর অন্তরালে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন শ্যামবাবু। কিন্তু একদিন তিনি কালা হয়ে গেলেন।

খুব ঘুমচ্ছে পড়েছিলেন শ্যামবাবু। কিন্তু টেলিফোনে খবরটা শুনের ডিপোর্টের বো আহ্লাদে আটখানা।

: কি বললেন শ্যামবাবু কালা হয়ে গেছেন? ওঁকে তাহলে এখনই প্রমোশন দেওয়া। ওঁকে এখনি পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করে দিন।

ট্রী ট্যা টীমিওরেটোল। ফিটন অর্ডার পরে পাঠাচ্ছি।

শ্যামবাবু এখন পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টে আছেন। পাবলিক খুব খুশি। ওঁরা বলেন, জনসাধারণের অভিযোগ এত মন দিয়ে শুনতে আর কোন অফিসারকে এর আগে নাকি দেখা যায়নি।

পুজো এসে গেল ....

বাজারে দোকানে এত ভীড়
কিন্তু প্রকাইকার নয়—
বোরোলীন
কমনীয় ত্বকের মসৃণতা বৃদ্ধি করে
সুন্দরীকে সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে তুলতে
বোরোলীন
ছাড়া আর কি আছে

বোরোলীন

[illegible]

চারন-কবি মুকুন্দ দাস

নগেন্দ্র কুমার গুহ রায়

সুদূর অতীত কালে বাঙলাদেশের যাত্রাপুত্র চারণ কবিরা নিজ নিজ স্বদেশানুরাগ ও বীরত্বের মহিমা বর্ণনা করে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করতেন এবং সেগুলো সভার বৈঠকে ও বাড়ী বাড়ী গেয়ে শোনাতেন। তাতে যোদ্ধাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ত বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার এবং প্রাণে সংরক্ষণ জাগত স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য আত্ম-বলিদানের। তাঁদের প্রাণ-মাতানো গানে, মর্মস্পর্শী তানে, স্বদেশের কেবল যে পুরুষেরাও উদ্দীপিত হ'তেন তা' নয়, নারীরাও হতেন সমভাবেই। বীর শ্রেষ্ঠত্বসমৃদ্ধ জাতির ইতিহাসে চারণ-কবিদের অবদান অবিস্মরণীয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলা-দেশেও একজন শক্তিধর চারণ-কবির আবির্ভাব হয়েছিল। মজেশ্বর যে তাঁর পিতৃদত্ত নাম, কিন্তু মুকুন্দ দাস হ'লেই তিনি ছিলেন নিখিল বঙ্গে পরিচিত। তবে নাম দু'টি বটে, কিন্তু অর্থ একই। মজেশ্বর বলতে যোদ্ধার বিষ্ণুকে, আর মুকুন্দ হলেন বিষ্ণু ও কৃষ্ণ দুই-ই। তিনি দরিদ্র ঘরের ছেলে, লেখা-পড়া শিখেছিলেন সামান্য, কিন্তু উচ্চ-কালে অনুশীলনে ও চর্চায় যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল তাঁর রচিত ও গীত স্বদেশী যাত্রার পালাগানগুলোতে। জ্ঞানি পিপাসা দুর্নিবার থাকায় তরুণই তিনি যাত্রা-গান, কবি-গান ও কথকতা খুব মন দিয়ে শুনতেন। গলাখানি ছিল মিষ্টি, গাইতেও পারতেন। সাধকের সব গুণেরই সমাবেশ দেখতে পাওয়া গেছে তাঁর জীবনে।

মুকুন্দের জন্ম হয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বানরি গ্রামে ১২৮৪ সালে—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি মূল্যকাল অবধি মাতামহের সঙ্গে বরিশাল শহরে বাস করেছেন। বরিশাল স্বদেশভক্ত সাধনার জন্য পীঠস্থান এবং প্রাতঃস্মরণীয় দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের কর্মক্ষেত্রে। স্বদেশী আন্দোলন বা বয়কট আন্দোলনের যুগের মধ্যে পর্বে (১৯০৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে) বাংলা দেশের যে কয় জন রাজনীতিক নেতা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে রাজবন্দী ক'রে নির্বাসিত (deported) করেছিলেন, তাঁদের তিন জনই বরিশালের। ওই তিনের অশ্বিনীকুমার দত্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সাংবাদিক নারিকেল মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। মুকুন্দ ওই তীর্থক্ষেত্রের আবহাওয়ায় সজ্জনের পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠেছেন।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও অধিক কাল পূর্বের কথা। বাঙালীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তৎকালীন বিদেশী শাসক কর্তারা শাসন-কার্যের সুবিধার অজুহাতে বাংলা দেশকে বিভক্ত করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আসামকে যুক্ত ক'রে একটা পৃথক প্রদেশ গঠন করা হ'ল। কূট-নীতিবিদ রক্ষণশীল দলভুক্ত লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের রাজপ্রতিনিধি (Vice-roy) ও বড় লাট (Governor General) এবং তাঁরই পরিকল্পিত ছিল বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বা Partion of Beogal। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট-নাগপুরকে নিয়ে গঠিত হল আর একটি প্রদেশ। নব-গঠিত দুটোই প্রদেশেই বাঙালীরা হয়ে গেলেন সংখ্যালঘু সুতরাং পূর্বোক্ত দেশ-বিভাগের প্রকৃতের মূলে যে কি দুরভিসন্ধি ছিল, তা' ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালী নেতৃবৃন্দ। দেশব্যাপী প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর—১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন। বয়কট বা কিনা করার বিরুদ্ধে আরম্ভ হল বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের আন্দোলন—যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'বয়কট' আন্দোলন নামেও বিদিত। এই আন্দোলনে যাদবমন্ত্র কেন্দ্র ছিল অগ্রণামী। বরিশালের উপর দিয়ে নিগ্রহ-নির্যাতনের প্রবল ঝটিকা বয়ে গেছে। তবু নত হয়ে যায় নি বরিশাল বাসীরা। বাঙালী স্বভাবের মতো মুকুন্দও যোগ দিলেন আন্দোলনে। স্বদেশী যুগে তিনি ও ছিলেন সাহসে বলের একজন প্রধান সাধক। তিনি গাইতে লিখে-ছিলেন নানা রকমের জাতীয় সংগীত। স্বদেশপ্রেমের গান রচনা করতেও শুরু করলেন। নিজের রচিত গানে নিজেই সুর যোজনা করতেন।

অশ্বিনীকুমারের সঙ্গ ও স্নেহ মুকুন্দ কি ভাবে পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিশেষ প্রকারের কথা শোনা যায়। সবগুলো যাচাই করতে পেরে যা দাঁড়িয়ে তা শোনাচ্ছি।

একদিন বরিশালের কালীবাড়ির আঙিনায় একটি নিভৃত কোণে মুকুন্দ একাকী বসে অত্যন্ত মনে গাইছিলেন একটা নব সংগীত। তখন উষা হয়ে গেছে সন্ধ্যা। অশ্বিনীকুমার দত্ত সেই স্থানের পার্শ্ববর্তী রাজপথ দিয়ে নদীতীরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বেড়াতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েক জন ভদ্রলোক। যুবক মুকুন্দের মধুর কণ্ঠে গীত সংগীতের একটি চিত্তাকর্ষক কলি বাতাসে ভেসে এসে তাঁর কানে গেল। তিনি থেমে গেলেন। মুকুন্দ আগে থেকেই জানতেন অশ্বিনী-বাবুকে। তাঁকে প্রণাম করলেন যুক্তকরে। অশ্বিনীবাবু মাথার হাতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—বাবা, তোমার গলাখানা বেশ মিষ্টি। আত্ম-বাম জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁর পরিচয় নিলেন এবং মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরে তাঁর বাড়ীতে যেতে বলে দিলেন।

তাঁকে গান গেয়ে শোনাতে হবে, এও তিনি বললেন। তখন চলছিল স্বদেশী আন্দোলন। অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে জান? মুকুন্দ বললেন—হাঁ জানি। শুনে অশ্বিনীবাবু আরও খুশি হলেন। সঙ্গের একজন সহকর্মীকে বললেন—একে নিয়ে নিন আমাদের কর্মী-দলে। একেবারে কাঁচের ছেলে ব'লেই মনে হয়, আর সরীসৃপের গঠনও সাধনী পুরুষের মতো। দীর্ঘদেহ দেশপ্রেমের স্নেহ

পূর্ণ বিপরীত হল মুকুন্দের পর। ঐ দুঃখের মন খুশীতে ভ'রে উঠল আশ্বিনী বাবুর অমায়িক স্নেহ পেয়ে। স্কুলের লেখাপড়ার অনুরাগী হবার সুযোগ পেয়ে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করল।

এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মুকুন্দ গিয়ে হাজির হতেন আশ্বিনীবাবুর বাড়িতে। গোনাতেন তাঁকে এবং দাদা বৌদিকে উপস্থিত অন্যান্যদের তাঁরই সংগীত শেখাত। সবাই মুগ্ধ হতেন তাঁর গান শুনে। মিষ্টি গলার সঙ্গে আবেগ মিশ্রিত হয়ে শ্রোতাদের প্রাণকে স্পর্শ করত মুকুন্দের রচিত স্বদেশী সংগীতগুলি।

একদিন আশ্বিনীবাবু মুকুন্দের গান শুনে দুই হয়ে বললেন—দুই ভাই আমাদের চাকর, দেশের লোককে মাতিয়ে তুলবি তোরা সংগীত শেখে। অন্তর্যামী দাদার আশীর্বাদ নিষ্ফল হয় নি। তিনি ভবিষ্যতটাকে দেখে নেছেন চাক্ষুষভাবে ও স্বদেশী যাত্রাওয়ালারূপে মুকুন্দের সারা বাংলাদেশ জুড়ে সমাদর ও প্রখ্যাতি।

বরিশাল সহরে অনেক স্বদেশী কর্মীর ভাই থেকে মুকুন্দ উৎসাহ পেলেন স্বদেশী যাত্রাগানের দল গ'ড়ে তুলতে। আশ্বিনী-বাবুরও সম্মতি ছিল তাতে। তিনি বললেন মুকুন্দকে—তুই ভালো যাত্রার দল গ'ড়ে তুলতে পারবি? স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে সাধারণ লোকের একবার মতো ক'রে একটা পালা লিখে ফেল দেখি। ভালো ক'রে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড় গাঁয়ে গাঁয়ে। দেখবি দেশের কাজের সঙ্গে পয়সাও আসবে তোর প্রাকেটে। নাম-যশ মান-সম্মান তো পাবিই।

মুকুন্দ আশ্বিনীবাবুর উৎসাহ পেয়ে একাগ্রচিত্তে লেগে গেলেন পালা রচনায়। তিনি লিখলেন 'মাতৃপূজা' পালা। তাতে আছে দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা, বিদেশী বণিকদের শোষণের কাহিনী, জাতি-ভেদের কুফলের কথা, স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী এবং স্বদেশের সেবায় জীবনদানের কথা। সাধারণ জনের বোধগম্য ক'রে প্রাণস্পর্শী পালা রচনা করলেন মুকুন্দ। পালাটি ছিল অনেক সময়োপযোগী জাতীয় সঙ্গীত।

মাতৃপূজা পালার প্রধান অভিনেতা (যাত্রক) ছিলেন মুকুন্দ নিজে। বাংলা-দেশের সহরে ও গ্রামে তিনি তাঁর নব-রচিত যাত্রার দল নিয়ে গেয়ে ও অভিনয় ক'রে শোনাতে লাগলেন 'মাতৃপূজা' পালা। সারা দেশে সমাদৃত হ'ল স্বদেশী যাত্রা। 'মাতৃপূজা' পালার অভিনয় দেখে ও গান শুনে দেশকর্মীদের অনেক স্বদেশী নেতা বলেছেন—স্বদেশী আন্দোলনের বহু বড় নেতাদের বক্তৃতার যা কাজ হয়েছে, তার চাইতেও বেশী কাজ হইয়েছে মুকুন্দের 'মাতৃপূজা' পালার গানে।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ 'মাতৃ-পূজা' পালা থেকে খুঁজে বের করলেন রাজদ্রোহাত্মক উক্তি। রাজদ্রোহের অভিযোগে আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন মুকুন্দ।

জেলখানায় তাঁর উপর দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল যথেষ্ট। তাঁকে চোর-ডাকাত-খুনী আসামীদের মতো ঘানী টানতে দেওয়া হয়েছিল। জেলে থাকতেই তিনি স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ পান। একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে রেখে তাঁর সহধর্মিণী স্বর্গে যান। তাতেও কিন্তু মরে যান নি মুকুন্দ। 'মাতৃ-পূজা' পুস্তকখানা সরকারী আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। 'মাতৃপূজা' পালার একটি লোকপ্রিয় গান নিয়ে দেওয়া হল :

ছেড়ে দাও তাদের চাঁদ বদনারী
কত কাঁদে আর পরো না।
আর গো ও জননী, ও ভগিনী,
মোদের ঘুমে আর থেক না।
কাদের মায়াতে ভুলে সখ্য ফেলে
কলঙ্ক কালে পরো না।
তোমা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম সাক্ষী,
জনম ভরে আছে জামী।
চটকলার আদের বালা, কুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না।
নাই বা থাক মনের মতন স্বর্ণ ভূষণ,
তাতেও যে দুঃখ ভোগ না;
সিঁথিতে সিন্দুর ধর, বদনারী,
জগতে সতী গৌরবনা।
বলিতে লজ্জা করে, গ্রাম বিদরে
কোটি টাকার কম হবে না;
শুক্তি কাচ মুক্তা মুক্তার, এ বাংলার,
মেয় বিদেশে কেউ জানে না।
ঐ শোন বজ্রনাদ, আহ্বানবাণী,
ভাগো আমার মত বন্ধু।
যে মা সব কাঁদালে পর, মায়ের এ দুঃখ
বিদেশে উড়ে যাবে না।

আমি যে অভাগিনী বাঙালিনী,
দুঃখের অন্ত কোটে না।
কি ছিলেম কি হইলাম,
কোথায় এলাম,
মা যে তোরা ভাবিলি না।

পথ, নাথী, সমাজ, সন্ধ্যাসেবা, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি পালাগুলিও মুকুন্দ দাসের রচিত।

'মাতৃপূজা' পালার আর একটা গান শোনাচ্ছি :

দেটের ক্ষিদায় জ্বইলা গো মইলাম,
উপায় কি তার?
ও কি দারুন আহাল
সৈক্কারে যে ভাই?
মান টাকায় বিকায় এক পণ্যারী॥
আড়াই কুড়ি টাকা গো দেনা,
কর্জ্জ ভাওলাত পাওয়া যায় না,
মহাজনে ডোক দিছে তার
আর বাড়ী,
আমার চৌকিদারী টেক্স গো নিল,
আমার খালি লোটা নীলাম করি॥
পাটের টাকায় বিলায় গো কিন না,
বিবির জামদানির গহনা,
আর তাওয়ায় চুড়ী।
জামদানির গহনা কেউ বহুক
মেয় নারে
ভাইঙ্গা গেছে চুনকো চুড়ী।
মনের দুঃখ কইমু যা কারে
চাইলা থাইয়া কাইন্দা মরে।
পরিবার তাই তাত বেরয়ে
হৈয়ারে পাটখাঁর।
আমার হাতে কাইট্টা মার
যে খেইব্যা
আয়া আমি কেস না করি।
মরিন বলে তার গো স্বামী
তাদের দুঃখ আর সয়ে না।
বিদেশী চিজ আর কিনব না,
কত কলম করি।
তবে দেশের টাকা রবে যে দেশে
লক্ষ্মী ঘরে আসবেরে ফিরি॥

কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তি পেয়ে মুকুন্দদাস আত্মনিয়োগ করলেন নূতন ক'রে যাত্রার দল গড়ে তুলতে এবং নূতন পালা রচনায়। সমাজ, সন্ধ্যাসেবা, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র—এই তিনখানা পালা সুলিখিত ও সময়োপযোগী। এই পালাগুলির জন্য নিয়ে তিনি প্রচার করেছেন জাতি-ভেদ প্রথার এবং বিবাহে পণ গ্রহণের বিরুদ্ধে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণে তিনি দিয়েছেন

উৎসবে। পল্লীদেবী পালা :
ধ্বনি শোনাচ্ছে :

ভাইয়ের নামে বন্দনার সুর,
ভাই-ভাসিয়া খেলার কুয়া :
ছুঁলে পরেই ভাই যাবে,
ভাই ছেলের হাতের নড়ক মোয়া।
চরকার তল আর ভাতের হাঁড়ি,
ভাবোল এতে ভাইয়ের জান।
ভাই তো বেকুব কবাল ছোবা,
এক ভাইতে এতন খান :
এমন দেশের ভাবক ছোড়া,
পড়ে আছিস বাসী মড়া।
ভাই নাই আজ আছে শুধু
ভাই খেয়ালের গুড়া ঘুরা।

মুকুন্দ দাস তাঁর পালাগুলির মধ্য দিয়ে প্রচার ক'রে গেছেন কালোপযোগী বাণী। বাঙালীর বর্তমান অবস্থাতেও সেই বাণী শোনবার প্রয়োজন আছে। তিনি একজন নায়কের মুখ দিয়ে বলছেন :

"তাই তো আমি নেতাদের বলি, যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভই করতে চাও, তবে চাউনি বিদেশপ্রভু পাওয়া বন্ধ করুন. পায়ীতে জনসাধারণের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ান. জাতীয় জীবনের প্রাণ কোথায়, তার সন্ধান নিলে যাবে। তাই আজ তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, সাড়া পাব কি? হে বাংলার ধর্মপুরোহিতগণ! যদি বিজ্ঞানের মাপকোঠায় ব'সে আপন ধর্মকে নিরিখ ক'রে নেবে থাকো. তবে এ মিলনে তোমার জাতির বৈশিষ্ট্য যা নেতৃত্বের সন্ধান শুরু হবে না. বরং অন্ধকারেই মুখায় লুটিয়ে পড়বে। তার প্রাণ আছে? যে আজ যিনি প্রত্যাশায় আপনার গণ্ডী ছেড়ে বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াতে প্রস্তুত. সিদ্ধপীঠ তোমার বাংলায় আজ যে লীলা সংগঠনের সূচনা দেখা যাচ্ছে এ মহা লীলার সহযোগী কে আছ? কার চরণ আজ মহাকালীর পদতলে অর্পণ করতে পারবে, সে ছুটে এসো। আমি আমার সর্বস্বখানি প্রাণ দিয়ে তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই।"

মুকুন্দের যাত্রার পালা থেকে শোনাচ্ছি একটী চাষার গান :

বল এ দেশের চাষা,
এদের চলন-বলন পড়লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা।
কন্টিরার ধার ধারে না,
সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না,
ভায়ের কথা শুনিয়ে বলায়
নাইকো এদের তুলা।
প্রাণভরা আনন্দ এদের,
শুকটী ছেলের বাসা,
চিনলে এদের সোনার মানুষ,
মিটবে দেশের সব পিয়াসা।
নাই ছুটা নাই ছেলেন কাপড়,
ঢেঁড়া নেংটী ছেঁড়া চাদর,
তাদেরই দুটী এমনি মিষ্টি
যেন প্রেম-সাগরে ভাসা :
এ সব দেবতা ছুঁলেই
জাতে যায় মেরেব,
মোল এমনি বুদ্ধি নাস্য।
যাদের বক্ষে জগৎ দুই,
তাদের দেখলে ফুলিক্ত হয় নাসা :
এরা কর্মীনষ্ট বীরই বটে,
ছোট বড়ে খুবই চটে,
তাবো দুঃখ দেখলে গিইরে ওঠে,
এদের এমনি ভালোবাসা।
অন্ধ মানব ছিন্নাল যাবে,
এই দেশের চাষা,
যারা প্রাণ দিয়েও মানব বাঁচায়,
এই স্বর্গটি যাদের আশা :

প্রসঙ্গতঃ এখানে ব'লে নিচ্ছি যে— মুকুন্দ অন্যান্য লীলা নিয়োজনের বক্তিমাল সঙ্ঘ নামের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাতনামা নিবারিক্তত বিপ্লবী নেতা. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজের (গার্হস্থ আশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) পূর্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্গীয়া সরোজিনী দেবীর কাছ থেকে। তাঁরই আদেশে তিনি বক্তিমাল সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে তাঁর অন্যান্য উদ্দেশ্যে মাতৃ-জাতির হিতার্থে একটা মহিলা আশ্রমের প্রকল্প প্রণয়ন করে ছিলেন। কিন্তু মুকুন্দের অকাল মৃত্যু ও দেশ-বিভাগের ফলে তা কার্যকর হ'তে পারে নি। সরোজিনী দেবী বৈপ্লবিক কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি সন্ন্যাসিনী হ'য়ে কাশীধামে ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছে বারাণসী তীর্থ ক্ষেত্রে।

বাংলার প্রিয় চারণ-কবি মুকুন্দ আমাদের শুনিয়ে গেছেন এই বাণী :—

"মা! একদিন ছিল, যেদিন বাঙলার বাঙালী তোমার আহ্বানে জাগরে। অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাদের কোলাগারের ঘর মুক্ত করে সমগ্র পৃথিবীর অন্নের সংস্থান করে দিয়েছে। বাঙলার পুজার দিনেতে শুধু বাঙালী নয়, পৃথিবীর দুরবাসী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তো। কিন্তু আজ বাঙালীর কোলাগার শূন্য, আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে প্রাণ, এক মুষ্টি অন্নের জন্য আজ তারা পরের দ্বারস্থ। তোমার পায়ে অর্ঘ্য দেবার সামর্থ্য তার নেই। সে দিন অক্ষীতের কাল-স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে কোন্ সাগরের অতল জল চুমিয়ে দিয়েছে, তা কে জানে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ গাইছেন :—

যার কপালে আগুন জ্বলে,
তার কেউ দেখে না মুখ, ভাঙাও বৈমুখ।
সুখ নাই তার ত্রিসংসারে :
আগে তার ঘরে প্রবেশ করে যাবি
পরে ঘরে তার পুত্র পৌত্রাদি—
তাদেরও কি ভদ্রা সৌভাগ্য থাকে যদি,
সোনা পুত্র নিলেও হরে।
জলে ভরলে ঘর ঘরে লাগে আগুন,
পোড়ে কোটা বাড়ী ছোটে চাঁদ ধুম :
যার কপালে যখন লাগাও আগুন,
তার লোহার অট্টালেও ঘুন ধরে।
ক্ষেতে জন্ম না শস্য বুকে জন্ম না জল,
দুঃখবতী গাভী দুগ্ধহীন সকল :
দরোবর শুষ্ক শুকিয়ে যায় জল,
জল বিনে মীন মরে।

সত্য সত্যই বাঙালীর কপালে আগুন জ্বলেছে। বাঙালী তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আজ সে পরমুখাপেক্ষী, লাঞ্ছিত, পদদলিত, সবে নিলে সে যায় —মরলে তার উপায়! তাই বড় দুর্দিনের সময়ে মা, তোমার শারদীয় উৎসবের ঘটা বাড়লো! আজ কি দিয়ে তোমায় সাজালী বরণ করে ঘরে নিয়ে যাবে? তার আছে কি? কপালে থাকে কি? আছে চিন্তা-ভগ্ন, আছে ভাঙা কপাল। অর্ধাচারা চরকায়, নয় বাঙালী অনাহারে, অর্ধাহারে আজ সে মরণ-সাগরের পারে দাঁড়িয়ে। তাই আজ মরণের পথে মরণ-আহ্বা কেঁদেই সে তোমার আহ্বান করবে।

বাঙলায় আজ যে ঘোর অমানিশা। ঘরে ঘরে বেকারী—এসো মা, আজ লক্ষ কোটি বাঙালীর ভগ্ন হৃদয়ে তোমার দৈবরী শক্তি নিয়ে। বাঙালীর মরণ-পণ সঙ্কল্প করে মহোল্লাসে আবার বাঙালীর মুক্ত-আকাশে জেগে আজ আগুন বুক্তা। শিবা-মুণ্ডমালিনী ভয়াল

গানে 'ঠি লি-ঠি লি ঠি লি-ঠি লি,
যে নাচুক তোমের চাকনী খোঁপানী;
যে না তোমার আশ্রমদের বৈষ্ণবী
লোর গান-বজের চির সমাধান।"
এই যা বাঙালায় আজ এক নূতন বীধ
ছি. দেখ তাদের নূতন প্রাণ. নতু-
নে নবোন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হয়ে
ন তারা প্রতিপুরে তোমার পারণীয়
নবের মঙ্গল-ঘট স্থাপন্ন। বাদুক
া-রা কাড়া ঘন্টা, ঢোল, শঙ্খ, করতাল,
ডঙ্কা, খোল, নাচুক রমণী তাদিবে সে
ন, সপ্ত-কোটী কণ্ঠ-কলকল-নিনাদে
বিকাশিত করে বাঙালী অকপ
বার বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা। কেও
র যাবতে পাঁচ. চরণের বন্ধের
। প্রাণে নূতন প্রেরণা: তথোরাপে
বরণে পাঁচর বাঙালী করুক তোমার
ব খেলা ভঙ্গ: বাঁধাতার বন্ধনালা
তারে অকপ তোমার জয়ধ্বনি ঘোষের
ই অবধারণ।"

প্রায় ছাঁড়ন তখনও পূর্বের বাঙলা ও
পীর যে চির দুরুন আমাদের
ন ভুলে বরোঁছলেন. তার কাল
গুলো ঘুচে যায় নি। স্বাধীনতা-
ন পরেও বাঙলা ও বাঙালার
যে কোন পরিবর্তন চোখে দিতে
া আজও দেখতে পাচ্ছি না।
খাঁটুক বাঙালীর দুঃখ-দুর্দশা কত
যে বেড়ে গেছে তার অন্ত নেই।
দুরুন লাল ছিলেন খাঁটি বাঙালী।
। ও বাঙালী ছিল তাঁর প্রিয়।
তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন
লে'—"যাই করো বাঙালার আজ
ছিন বীধ ভাঙি. দেখ তাদের নূতন
রব-ভাবে নবোন্মাদনায় আজ...ই
করুক তারা প্রতি গৃহে তোমার
যে উৎসবের মঙ্গল-ঘট স্থাপনা।"
ছাড়লীতে আসুর করে ঘরে তোলার
ছিল চাষে-ভাষের। তাই তাঁর
আমরা শুনতে পেয়েছি এই গান।

"আসুর নাই এ দেশে
সকল দেবী, সকল ভাবী,
যে যার ইচ্ছে আপন মনে।
দেখায় তত্ত্ব পত্র,
আসাই আপন নিয়ে যাত্র,
মুখখানা বড় মিষ্টি,
অন্তর ভরা বিষে।
তখন বেলায় ছহস্পতি,
তাকে কেউ না দেখে,
ডলতে গেলে এদের বংশে—

ওরে পাগল ঘরে দেখে যেতে।
আর ছাড়া অন্য নয় না
আর ছাড়া আজ তবে না,
দেখতে শুনতে ভদ্রমতো বেশ,
ভিতরটায় যে নাই বেশ,
ছেলের মাস বসে আছেন,
পাঁচ হাজারের আশে,
মেয়ের বাপের ভাঙা কপাল,
চোখের জলে ভাসে।
যে দেশ সকল দেশের সেরা,
সে দেশের এমন ধারা,
দেখে শুনে ইচ্ছা নয়,
চলে যাই বিদেশে।
শুধু কেবল বসে আছি,
কেপা-মায়ীর আশে,
দুরুন্তের ভরসা আছে,
আসবে বেটী নিতে নিতে।"

দুরুন্তের মাজার পালাগুলিতে যে সকল জাতীয় লক্ষণ দেখে দেওয়া হয়েছে, তাকে বাইরে থেকে মেলানো উৎসাহের প্রচলিত গানও রয়েছে। এরূপ সংকলনে পালা-গুলির কোন ক্রম রাখা হয় নাই, বরং মৌখর পেয়েছে প্রাধান্য, আর মাধুর্য হয়েছে উপেক্ষণীয়। দুরুন্তের জীবন গড়ে উঠেছে কাঁবিত্বের মধ্যে দিয়ে। সেজন্য তাঁর বাঁচার আশার পালার চাষীর কথা মনে পড়েনি। তিনি দেশবন্দনাতে ভাবিয়ে তোলেন :—

"নে চষে যে চষে ফুঁই।
এই লাঙলে পাঁঠা মাড়ী,
এই লাঙলে খোলা মাড়ী,
নিজের উপর উঠে বসি,
খাঁড় লাঙল খুই।
জমি লাঙো বাবুদের
তিন লাঙো সোনা ফলা,
বাড়িতো ছেলের খাট বিছানা
খাটের উপর শুই।
চাই নাতো ভাই খোড়া মিষ্টি,
চিড়া মুড়ির অভাব কি ভাই,
ঘরে আছে লক্ষ্মী মাই,
দেখায় দুধ দই।
সোনা ঘরে ঢুকলে যাদু,
আ...ন্দ সাগর বাড়বে যাদু,
ধরাল ঠাকুর ভরসা,
তাকে বলে ভাই।"

পরাধীন অবস্থায় তিনি দেশবন্দনাতে
বাঙালীর জন্যে চাষে-ভাষে এগিয়ে যেতে বলেছেন :—

"এগিয়ে চলে, উঠিয়ে চলে,
নামতে চলে ঘরে,
ওরে সবে কেউ বসে নাই,
ছোটে সবে কাজে।
ছোটে সবে নাবালের পর,
(এখন) ছাড়তে হবে ছেড়ুর কোঁচ
ওলতে হবে জমে খাঁজ,
কোন্ চষেতে যাবে।
পরের খেয়ে, পরের ল'য়ে,
চলবে না দিন খেয়ে ব'য়ে,
পা বাড়িয়ে নিতে নাড়ি,
ভাবে লোক সমাজে।
যাদের যা উপজনী,
তাদের ঘুরে হয় নাশ,
খেয়ে দুকুল যায় যায় আজ,
তবু আঁতমায় নাজে।"

১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসের (১৯৩৪ খ্রীঃ এপ্রিল-মে) কথা। দুরুন্ত ছাদের বয়স তখন পঞ্চাশ কি ছাপান্ন। অসহযোগের এলোডালের তিনি আ-ার দল নিয়ে পালা গাইবার আসরে নেবে। বারের পর বার গাইতে গাইতে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসায় কোন ফল ভাল হয় নি। চৌঠা জৈষ্ঠ (১৩৪১ কিংবা ১৯৩৪ সে) তাঁর জীবন দীপ নিবে গেল। বাংলার ও বাঙালীর প্রিয় চাষে-ভাষের দুরুন্ত সাঁতা-সাঁতা ধন-ক্ষেত্রে দুরন্তপনা করার বয়সের অভাবই। তাঁর ফলেই এতগুলি দেশবাসী জন্মেছে।

"সাধ তাদের ভাঙ্গ নাই,
বাসনা না মেটে যাই,
ভবনের ভাসাভাসে
উঠেছে নিনাদ।"

* * *

দুরন্ত-ভাষের আকস্মিক অবসান প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা, আমাদের চরম দুঃখের কথা বলতে হবে। পরলোকগত মহাকবি তাঁর প্রিয় সাধক-সন্তানকে ডেকে নিয়ে গেলেন দুলোক লোকে। নিরবচ্ছিন্ন বাক্‌সেবকে ভাষের চিরন্তন প্রভাত-সমাধানে ই পরাণী যে। চাষে ভাষের অনুষ্ঠানের পূর্ণ হয় নি। তবে সান্ত্বনা এই যে, তিনি উৎসবের ভারাক্রান্তে বিজয়ীর উৎসবে দেখে যেতে পারেন নি সত্য, কিন্তু দেখে গেছেন অসহযোগের পূর্ণ বিজয় রাজন দ্বারে রাজন এবং উৎসবের সোনার পালার মধ্যে আকস্মিক আঘাতে পূর্ণ ছেদ। চাষে-ভাষের সোনাঝরানি ধরার ধন যেন বন্ধ আর পরাধীনতা না হয়ে যায় বাঙালীর চাষে-ভাষে ছেদ পড়েছে।

হরিহর চাটুজ্জের একমাত্র ছেলের অসুখ। অবস্থা গুরুতর। ডাক্তার বদ্যিতে বাড়ি ভর্তি। ১৯ বছরের ছেলে। ফাল্গুন মাসে ফুল টসের বলে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাঠে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় বাড়ি নিয়ে আসা হয়। এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি। তাবা হচ্ছে ছেলের চিকিৎসা চলছে। কিন্তু রোগটা যে কি, এখন পর্যন্ত কেউ তা নির্ণয় করতে পারেন নি।

ছেলের জ্যেঠামশায় রামরাম চাটুজ্জের জিজ্ঞাসায় উত্তরে তখন ডাক্তার তো সে কথা খোলাখুলি বলেই ফেললেন, আপনাকে চিকিৎসা করাই বৃথা। লাখে দুই না লাখে এক। তখন ডাক্তারের বুড়ো হয়েছেন। এই সহরে প্রায় তিরিশ বছর ধরে চিকিৎসা করছেন। নাম ডাক প্রচুর। মানের পাশে কোন ডিগ্রী নেই। সহরের প্রাচীনরা বলেন, ডিগ্রী দিয়ে কি হবে! রোগী সারা নিয়ে কথা। তখন ডাক্তারের মত চিকিৎসে কটা লোক করতে পারে!

কথাটা মিথ্যে নয়। তখন ডাক্তার চিকিৎসা করেন ভাল। তাঁর চিকিৎসায় রোগা সেরে ওঠে। তাঁর প্রত্যয় প্রতি-পত্তির মূলে আছে এই সাফল্য।

তিনি চাটুজ্জেদের পুরু চিকিৎসক। পরিবারের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর মুখে এ কথা শুনে রামরাম চাটুজ্জে প্রায় কেঁদে পড়ার উপক্রম করলেন। হালদার তো কেবল হরিহর চাটুজ্জের একমাত্র ছেলে নয়। এই বয়সে চাটুজ্জে পরিবারের একমাত্র অবলম্বন।

রামরাম চাটুজ্জে রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দুজন তরুণ ডাক্তারও বাইরের বসবার পার্শ্ব থেকে উঠে এলেন তাঁরা দুজনেই হালদার ডাক্তার। একজনের নামের পাশে তো এক লাইন ভর্তি দেশী বিদেশী ডিগ্রী

রামরাম বাবুর কথার উত্তরে তিনি বললেন, ওভাবে করবার কোন মানে নেই। চিকিৎসা ঠিকমতই চলছে। অবশ্য ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। ডিগ্রীর কুল মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন।

আবার বিরোধ আসবে, এই আশঙ্কায় তিনি, চাটুজ্জে বাড়ি থেকে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় ছেলের জ্যেঠাইমা ছুটে এসে তাঁদের পথ-রোধ করে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, তা হবে না বাবা। নীলুর জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাদের যাওয়া হবে না। তোমরা এখানেই চান খাওয়া করে বিশ্রাম কর। টাকার জন্যে ভেবো না। যত টাকা লাগে আমি দেব। তোমরা আমার নীলুকে সারিয়ে দাও।

লম্বা ডিগ্রীধারী ডাঃ রায় বললেন, আমরা যা করতে পারি, তা তো দিয়েছি। ওষুধের জল কমতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। এখন আর আমাদের এখানে থেকে কোন লাভ নেই। তা ছাড়া দুজনেরই তো যাওয়া দরকার। চাটুজ্জেরা রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে তা আমরাই করতে পারবেন।

ছেলের জ্যেঠাইমা কিন্তু নাছোড়-বান্দা। তিনি ডাঃ রায়ের দুটো হাত ধরে বললেন, না বাবা আমি কোন কথা শুনব না। তোমাদের দুজনকেই থাকতে হবে। ডাঃ রায়ের মতলবটা ডাঃ সোমের থাকতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। তিনি নতুন প্র্যাকটিস সুরু করেছেন। এখনও বিশেষ জমাতে পারেন নি। তবু ডাক্তারখানায় ফিরে গিয়ে রোগীর জন্যে ডিসপেন্সারি ঘরে বসে থাকার চেয়ে তিনি চাটুজ্জে বাড়িতে বসে থাকাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলেন। চাটুজ্জে বাড়িতে থাকলে মোটা কি পাওয়া যাবে, আর তাছাড়া ছেলেটা যদি ঘুম ভেঙে একবার চোখ মেলে তাকায়, তাহলে এটোঁকুড় ডাক্তার ছিসাবে, সহরে তাঁর নামডাকও বেশ কিছুটা বাড়তে পারবে। এই লাইনে চিন্তা করে ডাঃ ঘোষ ডাঃ রায়কে বললেন, উনি যখন এত করে বলছেন তখন না হয় কিছুক্ষণ থেকেই যাওয়া যাক। আপনি কি বলেন!

ডাঃ রায় আর কিছু বললেন না। তবে দুজনেই থেকে গেলেন। কবিরাজ

মজুমদার সেক্রেটারি কোটীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর বন্ধুর কানে কানে কিসফিস করে বললেন, লাভের অবস্থা ভাল বুঝছি না। সুরেশ ডাক্তারের মনের ভাব আন্দাজ করা প্রফেসর ওরাঙ্গ ওরফে ভোলাচাঁদের বললেন, কি লেখেছি ঠিক মিলিয়ে। তাঁর কথা শুনে মুরলী ডাক্তারই তাড়াতাড়ি কোটীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কোটীর ঘরের বাইরে বারান্দায় মোটা কয়েক চেয়ার ও মোটা দুই বেঞ্চি পাতা। আত্মীয় স্বজন ছাড়া সভ্যের সাধারণ অনেকেই কোটীর ঘরে ঢুকতে আসছেন। তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা।

একটা বেঞ্চের এক কোণে নীলুর বাবা চাঁদের চাটুজ্জে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা চেয়ারে বসে সভ্যের সিনিয়র জোড়াসনাথ ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যো তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বহুল প্রচারের কথা বোঝাচ্ছেন।

ডাঃ বসাক বলছেন, আমার দৃঢ় ধারণা, বেঞ্জিন ফর্ম, সিঙ্গ এক্স, এই ডোজে মাত্রেই সিলেই রোগীর 'কোমার' ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু বাঁচবে কি মরবে, ব্যালেন্সশীটের ওপর বড় না হলে মানুষ ওষুধে কাজ করে না।

বাঁচার সম্ভাবনা কম বলা, তাঁর মনে কোন কথা ঢুকছে বলে মনে হোল না। চাঁদের চাটুজ্জে তাঁর বন্ধুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন।

পাড়ার এই ছোট সভ্যটি বাঙালী প্রধান। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির ভাড়াটেদের মধ্যে প্রায় সবাই বাঙালী। বাঙালীদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ বা অধ্যাপক। দু-একজন শিল্পবিশারদও আছেন। চাটুজ্জেরা অবশ্য ব্যবসাদারদের মধ্যে।

কাঠের ব্যবসা। সভ্যের সামনে পাশ দিয়ে যত বড় বড় প্রায় সব 'ফুল' গুলোই তাঁদের দখলে। সভ্যের কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে ই সব 'ফুল' তাঁরা বন্দোবস্ত নিয়েছেন। রাস্তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে সভ্যের কাঠের গুদামের তাঁদের অনেক-গুলো 'ফুল' রয়েছে। 'চাটুজ্জে অ্যান্ড সন্স' দুই ভাই চালান তাঁরা। দাঁত ছেড়াই কারবারের জন্য সভ্যের সদস্যদের মধ্যে এঁদের একটা বিশেষ খাতির আছে।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বাবসায় ও ব্যবসার চাটুজ্জের পূর্বপুরুষ ভক্তপ্রসাদ চাটুজ্জে বাংলা দেশ থেকে এসে এই সহরে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনিই কাঠের ব্যবসার গোড়া পত্তন করেন। ভক্তপ্রসাদের একমাত্র ছেলে সুধাময়ের আমলে চাটুজ্জে পরিবার কেলেঙ্কারিতে পড়ে। তাঁর ব্যবসা বুদ্ধির প্রভাবে লক্ষ্মী বন ছেড়ে তাঁদের বাড়িতে এসে আবীর হন। সেই অবধি চাটুজ্জে পরিবারে লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন। পুজো-আচ্চা খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়া করে চাটুজ্জেরা সহরের শীর্ষস্থান দখল করে আছেন। বাবসায় চাটুজ্জের কোন সন্তান নেই। ছোটকর্তা হরিসাধনের একটি পুত্র সন্তান হওয়ায় বাবসায়ের ও তাঁর স্ত্রীর নিজেদের সন্তান না থাকার দুঃখ কোন ক্ষোভ ছিল না। নিজের ভাগ্নেবাবুদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করে বাবসায় চাটুজ্জে পরিবারের একমাত্র বংশধরের মত বাখলেন নীলমাধব। ডাক নাম ছোট নীলু। বাপ মা, জ্যেঠা জ্যেঠাইমার চোখের মণি হয়ে নীলু বড় হয়ে উঠতে লাগল। তার সুন্দর মুখশ্রী, সুঠাম চেহারা ও বিনয় নম্র আচরণে নীলু আত্মীয় স্বজন মহলে যে ঘটেই, সহরের ছেলে বুড়ো সকলের প্রিয়পাত্রটিতে উঠল। নীলু লেখা পড়ায় ভাল, আবার খেলাধুলোর দিকেও তার খুব ঝোঁক। সহরের সকলের বাড়ীতে তার অবাধিত যায়। সহরের বাঁধাধরা বাড়ির গৃহিণীরা তাকে যখন তখন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছেন। নীলুর মা, জ্যেঠাইমা ঐ ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই খুঁতখুঁত করতেন কিন্তু নীলুর জ্যেঠা বাবসায় চাটুজ্জে নীলুকে চালাও হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, আদর করে যে যাকে খেতে দেবে সেই খাইয়ে যাবে। সহরের সবাই তোমার আপনজন। প্রবাসে বাঙালীরা সবাই এক পরিবার-ভুক্ত, এই ছিল তাঁর অভিমত। সহরের বাঙালী মাত্রই দরে অকারে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াত। তিনি সাধ্যে যথাশক্তি সাহায্য করতেন। নীলুর অন্নপ্রাশনে সংবাদপত্রে সহরের অনেক বাড়ির দাওয়া খাওয়া বন্ধ করার উপক্রম হোল। পর পর তিন ঘরে চাটুজ্জেদের বাড়ীতে লোক আমন্ত্রণের অন্ত ছিল না। চাটুজ্জেরা বুঝমান বলে দুর্গাপূজা করতেন। চাটুজ্জেদের দেখে মনে হত সাধন বাঁচবে দুর্গা পূজা ৩৫ বছরে।

আরও দু ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু নীলুর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। অবশ্য বন্ধু বান্ধবদের কিন্তেই যাচ্ছে বলে মনে হোল। ডাক্তারেরা ওষুধ দুধে ঘন্টাকে ঘন্টা করে যাচ্ছেন। শুধু আবহাওয়া ভারে মাঝে মাঝে দার্জিলিঙ্গের দিকে চাকাগুলোর লোক ছুটে যাচ্ছে। তাতেও কোন এমন নব শুধুর সম্বন্ধে পরেও রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি না ঘটায় ডাঃ বসু দুই দুবে দুবন ডাক্তারকে বললেন, লেটেই বোডাদিন কিন্তেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বড় সিরিয়াসলি কেস বলে মনে হচ্ছে। কোন কথা না বলে দুবন ডাক্তার শুধু মাথে মাথে মাথা নাড়তে লাগলেন।

রোগীর জীবন রক্ষার এখনও আশা রয়েছে। সহরের ও এ ব্রাঞ্চের সব চেয়ে বড় ডাক্তার জীবন মুখার্জী এখনও এসে পৌঁছান নি। সকলেই এ বিষয়ে একমত, তিনি এসে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্তটি ভালে লাগবে রোগী না বেঁচে পারবে না। সহরের প্রায় সাঁয়ত্রিশ জনের ডাক্তারি ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ি। ডাক্তার মুখার্জী বাড়ি নেই। গত ৩ দিন ধরে তাঁর বাড়িতে চাটুজ্জেদের লোক বসে আছে। ডাক্তার মুখার্জী নিরুদ্দেশ।

ডাঃ মুখার্জী মাঝে মাঝে এরকম নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তিনের পর তিন তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কেউ বলে, সহর থেকে মোটরে যত দূর যাওয়া যায়, দৈবজ্ঞদের সন্ধানে তিনি তাই করে ঘুরে বেড়ান। ডাক্তার বাবুরা, ডাঃ মুখার্জী অন্তর্ধান। সহর থেকে মিনিটিশ মাইল দূরে গভীর জঙ্গলের মাঝে যে মহাকালীর পীঠস্থান ও আশ্রম আছে, তিনি সেখানে গিয়ে সাধনা করেন। কিন্তু কেউ তাঁর সম্বন্ধে সঠিক কোন কথা বলতে পারে না। এই অবসরে চাটুজ্জে বাড়ির লোকেরা ডাঃ মুখার্জীর খোঁজে সহর অঞ্চলের সকল ডাক্তারের দুরে বেড়িয়েছে কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পায় নি।

নীলুর জ্যাঠাইমা দুঃ দেবরা ঝিনুর মোগাসনের কাঁধের চুকে দেবরকে পাশে বাখা দুরে বললেন, নীলুকে নাবিয়ে নাও

চারুদা, শীঘ্রই সাহিত্যে নাম করা। ছেলে মেয়ে উঠলে তোমার ভয়ে আর এত ভয় তোমারই মতন বড়বার ইচ্ছা হবে। সোনার মতন্যার মেয়েকে সাহেবের মেমরা খুব বেশী চঞ্চল করে উঠলেন বলে মনে হোল না। ছুটী সমাপ্তপ্রায় জানা তাদের সাহেবের চোখ মেলে ছিনি পুজাবিশেষ দিকেই চেয়ে রইলেন। শীঘ্রই অবশ্য উপোরোক্ত ধারণার দিকে যেতে লাগল।

আরও ২৪ ঘন্টা কেটে গেছে। শীঘ্রই জীবনপ্রদীপ আরও স্তিমিত হয়ে এসেছে। জীবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোগীর মাথা ধরে বসে আছেন। তাঁর মুখ অসম্ভব গম্ভীর। ডাঃ সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। ডাঃ সমাজ নির্নিমেষ চোখে রোগীর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর যেন যেন চোখ মেলে জীবনের মহান্ত জ্যোতিষ্মানের মুখ বন্ধ করবে। রোগী নিস্পন্দ। কলকাতে আর সাড়া দিতে পারছে না। অবশেষে ধীরে ধীরে রোগীর মাথাটী বিছানার উপর নামিয়ে রেখে মুখ তুলে বললেন "সমাপ্তপ্রাণ"। সবের মধ্যে যেন্দ্রনাথ ধরা বলেছিলেন, অনেকে মনাদের কথা ভাবে মেরেই তারা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অনেক পুর মুহূর্তে যারা এসেছি যেমন মনমর অনেকে থাকে, চারিদিক বাড়ির আবহাওয়া তেমনি মনমরে হয়ে উঠল।

ঠাকুর একজনা থেকে একটী চাদর নোবলেল নোয়া মেল। ডাঃ জীবন মুখার্জী এসে পড়েছেন। ডাঃ মুখার্জী ধীরে ধীরে বাড়িতে ঢুকলেন। সাদা সাদে ৪ ফুট লম্বা। মুখে ঈষৎ-পাকা দাড়ির জঙ্গল। দেখে মনে হয় "ঠিক এদের দাড়ি আমার হবার।" পরনে সাদা ফিনের পাজামা ও পাঞ্জাবী সাদা ধোপা। কোটে কোট ছটী বোতাম আছে। পাঞ্জাবী ও জামার ভিতর আর একটী বোতাম। বোতামগুলি ইচ্ছে করলে পিছে গায়ে দেওয়াও যায়। ডাঃ মুখার্জী গাড়ি থেকে নামেন না। বোতাম গুলি তেমনি আছে। ওঁকে দেখে লোকের ছুটি ডিসিজ করা যায়। পায়ে সাদা মোজা ও সিলিটারী, বয়সের গাছ। তিনি যখন হাটেন তখন তাঁর ধোপাদুরী চলা দেখে

লোকে বলে। তাঁর চেহারার মধ্যে একটা ঔদার্য্য আছে। চোখ দুটো বেশ বড় বড়, চোখের কোলে কালো দুটী পুরু পুরু রেখা। মাথার চুলের ভিতর তাঁর দু একটা পাকা চুলের ঝলক মাঝে মাঝে দেখা যায়।

ডাঃ মুখার্জী রোগীর ঘরে ঢুকে রোগীর মুখ দেখেই বুঝলেন ও অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে। তিনি ডাঃ সমাজের কাঁধে হাত রেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

রোগীর পরিবারবর্গের একটী চেয়ারে বসে ডাঃ মুখার্জী রোগীর ফাইলটা নিজের কাছের মধ্যে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর তিনি তাঁর বিখ্যাত ব্যবস্থাটার জন্যে কোটের পকেট হাতড়ে কলম বোজলেন। এ পকেট ও পকেট হাতড়ে ব্যবস্থা পাওয়া গেল না। ডাঃ মুখার্জী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর সার্টের ছ-পকেটের মধ্যে দুবার তোকালেন। না, ব্যবস্থাটি সার্টের পকেটেও নেই। কোটের ভেতর দিকে তিনি পকেট করান না কিন্তু তবুও একবার কোটের ভেতর দিকে হাত চালালেন। কি আশ্চর্য! কোথাও কোট খুঁজে পাওয়া গেল না। রোগী দেখতে এসেছেন অথচ ব্যবস্থাটি লিখে আনেননি, এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। নিজের ভুল দেখে ডাঃ মুখার্জী বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

তাঁর মনে পড়ল, তিনি তো নিজের বাড়ির মধ্যে কোথাও জামাকাপড় পালটান। ব্যবস্থাটা আনবেন কি করে? তিনি বাড়ির ভেতরে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই চাটুজ্জেদের বাড়ির লোকেরা তাঁকে একেবারে ঘেরাও করে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। কাজেই ব্যবস্থাটা বাড়ির ঘরের মধ্যে চাবিবন্ধ হয়ে রয়েছে।

ডাঃ মুখার্জী তাঁর বাড়ির চাকরটাকে ডেকে তার হাতে একটী চাবি দিয়ে তাকে খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যবস্থাটা নিয়ে আসতে বললেন। সে ছুটে চলে গেল।

তিনি তখন একটা সাদা কাগজ নিয়েছে মুখার্জী করতে লাগলেন। সারা ঘরে স্তব্ধীভূতদের নেমন্তন্ন বিরাজ করতে লাগল। ডাঃ মুখার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক নিজেদের মধ্যে আরও সরাই হয়ে আছেন। ওঁরা ডাঃ সোম তাঁর নিজের চক্ষুকে ব্যবস্থাটা ডাঃ মুখার্জীর নিজের এইমাত্র লিখে দেওয়া, তাঁ মুখার্জী আশ্চর্য হয়ে ওঁদের আরেকটা নিয়ে কত চান দে পারেন।

ডাঃ মুখার্জী মুখ তুলে ডাঃ সোমের মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিপাতের ডাঃ সোম যেন কিছুতে বিমুখ হয়ে তাঁর মনে হোল ডাঃ মুখার্জীর চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে তাঁকে একটা প্রশ্ন করে যেন তাঁর চোখমুখ ধরলে নিয়ে গেল। তারপরে ধরা ব্যবস্থাটা পকেটে রেখের উপর পড়ে গেল। ডাঃ ধরে ব্যবস্থাটা তুলে নিয়ে ডাঃ সোমের হাতে দিলেন।

ধরে উপস্থিত আর সবাই নিস্তব্ধতাপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ সোমের দিকে তাকাতে লাগলেন, যেন ডাঃ মুখার্জীকে নিজের ব্যবস্থাটা দিতে দিয়ে তিনি ভোরের অপরাধ করে ফেলেছেন।

অন্তরের মধ্যেই ডাঃ মুখার্জীর ছাইরঙ এসে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি তাঁর হাতে ছিল। ডাঃ মুখার্জী সাহেবের তাঁর নিজের থেকে তাঁর বিদ্যার ব্যবস্থাটা নেন করলেন।

ব্যবস্থাটার ভিতরে তাকিয়ে উপস্থিত সকলের মন যেমন যেন একটা ভয় মিশ্রিত সন্দেহে ভরে উঠল। ডাঃ ধরের পরিবেশ ভৌতিক দুর্বে উঠল। কেবল ডাঃ সোম তাঁচ্ছিল্য ভরা চোখে ব্যবস্থাটা দেখতে লাগলেন। ধরের বলটা জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। ঘরীয় বাষ্পাধারের ফলে এলটা নিজের স্যাতসেঁতে ধর ভাবিয়ে তাদের ফুরফুরে করে উঠেছে। ঘড়ীর কাঁটাটার ৭ মোল মুহূর্তটির উপরের পালিশ চটে যাওয়ায় ভেতরের তামা ধাতুটা বেরিয়ে পড়েছে। ব্যবস্থাটা দেখে ডাঃ সোমের মনে সন্দেহের ভাব ভাসা হো দূরে থাকুক তাঁকে যেন একটা ঘৃণার ভাব ছেয়ে উঠল। চাটুজ্জেদের বাড়ি আসার পথে তিনি একটা ছোট্ট কুকুর দেখেছিলেন। সেই কুকুরটার কথা ডাঃ তাঁর মনে পড়ল। তাঁর সারা শরীরটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। তাঁর মনের ভাবে বোধ হয় ঘৃণায় মনে ব্যবস্থাটা বিষের ভয়ে ছেড়ে উঠেছিল।

ডাঃ মুখার্জী ব্যবস্থাটা নিয়ে উপস্থিত সাহেব রোগীকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করার সময় রোগীর শরীরের এক এক জায়গায় ব্যবস্থার ছোঁয়াটী লেগে

ছেলে ছেলে ধরতে লাগলেন যে রোগীর শরীরের সেই সব জায়গায় ঘোল লাগে হয়ে গেল। বুক ও পিঠের প্রতি দীর্ঘ পরীক্ষা করার পর তিনি রোগীর ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর বক্ষযন্ত্রটির মুখটা রেখে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন শুনতে লাগলেন।

অবিনাশ বলাবলি ডাঃ রায়ের কানে কানে বললেন, ঐ দেখুন এবার যন্ত্রটা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে সুরু করেছে। রোগের ভোগ অনুপ যোগের অঙ্গুলে যোগটা দূর করে আজ যন্ত্রটা সেই খবরই ওঁকে জানাচ্ছে। তাঁর চোখ মুখের ওপর বক্ষযন্ত্র বসানো আলমারি আমার মত ধুকধুক করছে, সোনেন না। বক্ষযন্ত্রটা ওঁকে শুধু ওপরে কেবল রোগের খারাপ কথাই বলছে না, রোগের ভাল কি, তাও জানাচ্ছে, ওষুধের কথাও বলে দেয়। ঠেক যাচ্ছে মশায়, ঠেক যাচ্ছে।

রোগী পরীক্ষা শেষ করে ডাঃ মুখার্জী উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ঠোঁটের প্রান্তে শয়তানির হাসি ফুটে ওঠে। তাঁর চোখের আগুনটাও যেন একটু ঘোলাটে হয়ে আসে। তাঁর নির্দেশে তাঁর কম্পাউণ্ডার একটি ইঞ্জেকশন তৈরী করে। ডাঃ মুখার্জী নিজে হাতে রোগীকে তার কিছুটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় একটা আরাম চেয়ারে হাতলের ওপর পা তুলে দিয়ে বসেন। সেবার দুজনেই আবার আত্মসংযোগ করে চীৎকার শুরু করেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। দুজনেরই হাঁক ঘুমের ঘোরে। এবার নতুন রোগীর ঘরের ভেতর থেকে একটা আরামের উল্লাস শোনা যায়।

পাঁচমিনিট অজ্ঞান থাকার পর বাঁদু ঘোষ পুনে তাকিয়েছে। ওজনের বাম চাইতেই ছুটে এসে ডাক্তারের মিলিটারী বুট জোড়ার উপর মাথা ঠোকতে প্রণাম করেন।

অবিনাশ বলাবলি ডাঃ মুখার্জীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, আপনার মানুষ নয়, দেবতা। ডাঃ মুখার্জীর সাফল্য দেখে ডাঃ রায়ও মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি ডাঃ মুখার্জীকে আঙুলনন্দন জানান। কেবল ডাঃ ঘোষের মনে এই সাফল্য কোন রেখাপাত করে না। তিনি ঘনোযোগ সহকারে সব লক্ষ্য করছিলেন। রোগীকে একটু সবল হয়ে বাওয়ায়ার নির্দেশ দিয়ে ডাঃ মুখার্জী মিলিটারী বুটের খট খট শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান। অবশেষে চাকরের কোমটি নাকে ধরে তিনি ধড়ফড় করে উঠে বসেন। সবার আগে, মাথা ঘিরে দাঁড়ায়। মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে।

ডাঃ ঘোষ কিছু আগেই চাটুজ্জেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। গাড়িটা চলে করে তাঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, হারামজাদা।

ডাঃ ঘোষের একমাত্র পুত্র প্রণবের বেশ বিলাসিতায় মধ্যে মধ্যে চলেছে। ধনীর দুলালের মোসাহেব জুটেছে বেশ। বাব-চোদ্দ দিনের অসুখে যেন বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে গেছে। ডাঃ রায় চিকিৎসা করছেন। দুবার ডাক্তারও দিন দুই দেখে গেছেন। অবশেষে ডাঃ মুখার্জীও দেখতে এসেছিলেন। ডাঃ ঘোষের স্ত্রী নিরুপমাকে একান্তে পেয়ে তিনি বললেন, দেখুন, ডাঃ রায় আপনার ছেলের চিকিৎসা করছেন। বলার কিছু নেই। অসুখও সেরে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ছেলেটি বড় অবিনয় হয়ে পড়েছে। আমি যদি একবার সুযোগ পেতাম, তাহলে ব্রাহ্মোনিয়া ... এক ডোজ দিয়ে ওকে সারিয়ে তুলতে পারতাম।

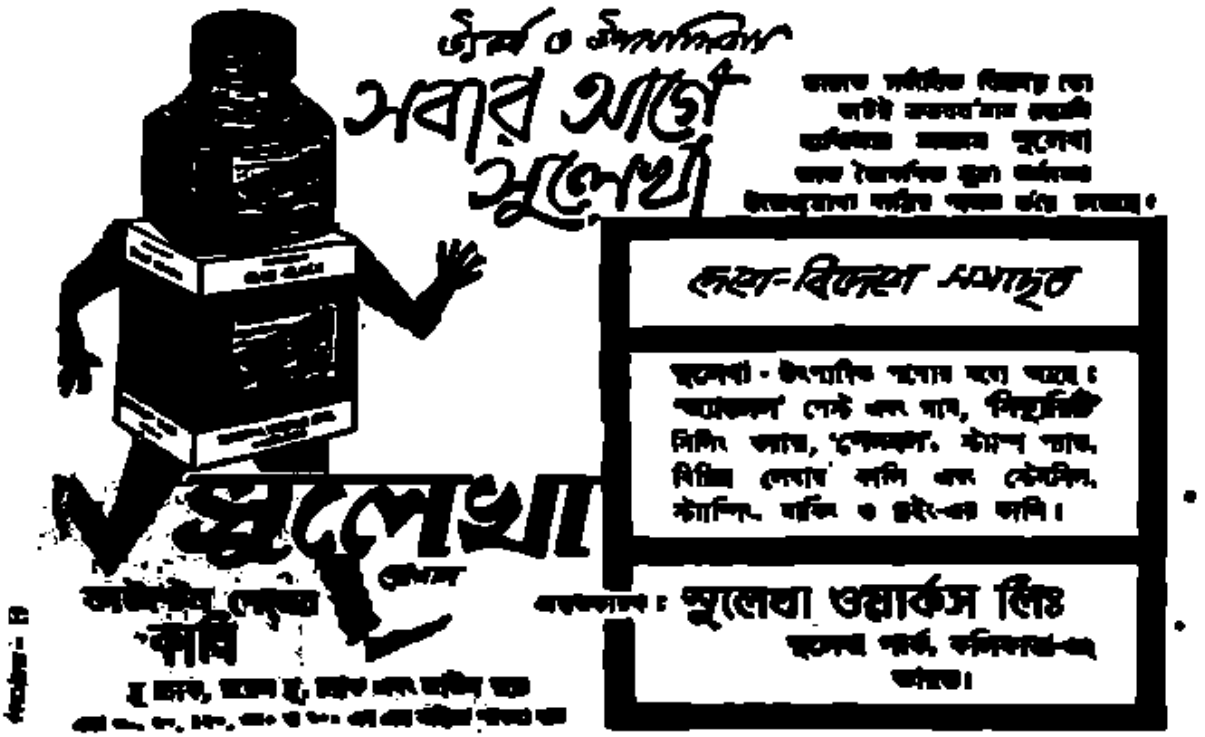

ডাঃ ঘোষ সবচেয়ে ভালো হাসপাতালের ডাক্তার। প্রাইভেট প্র্যাক্টিসও আছে। সকাল সন্ধ্যে তাঁকে হাসপাতালে থেকে হয়। সৌম্য সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন, স্ত্রী নিরুপমা এসে কাছে দাঁড়ালেন। ডাঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন কি বলছ নিরু? খোকা তো আজ অনেক ভাল আছে। বাসন্তীকে ছেড়ে একটু অনেক কম। আর ও-একটা দিনের মধ্যেই একটা রোগিনকে ওরে ঘরে পাঠিয়ে দেয়া যাবে। ভালো কথা ছুটি নিয়ে তুমি আর একবার টেম্পারেচারটা চেকআপ করিয়ে নিও। আর ডাঃ রায় যদি আসেন, আমার একটা খবর পাঠিও।

স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে নিরুপমা আর দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

ডাঃ ঘোষ বললেন, নিরু তুমি যেন একটা কিছু বলতে এসেছ মনে হচ্ছে। যা বলবার বলে ফেল। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

নিরু ধীরে ধীরে বললো, খোকাকে ছেড়ে আমার কোন দিন ভাল লাগবে না। যার চোখ দিয়ে জল। এরা এখন কিছু বলছে না, তাহলেও অনেকটা ভাল। যার চোখদিয়ে জল দিয়ে আমাদের ছোটটিকে এনেছে। তুমি পরীক্ষা করে ওষুধ দেবার পর আমার ছেড়ে চলে যেতে। এ তো আমি অনেকবার দিয়ে দেখেই দেখেছি। কিন্তু আমাদের খোকা এখন তিন থেকেই যেমন যেন ভিন্নরকম হয়ে গেছে। এখন তো তার পাশ ফেরার শক্তি পর্যন্ত নেই। আর সকাল থেকে দেখছি, চোখগুলো কেমন যেন একটু ঘোলা ঘোলা টেকছে। পাতলা চামড়া ওরে একবারে সাদা দিয়ে।

আমার ভয় ভয় করছে। তুমি বরং একবার ডাঃ মুখার্জীকে ডাকো। ডাঃ মুখার্জীর নাম শুনেই ডাঃ ঘোষ একেবারে খেপে গেলেন। স্ত্রীর দিকে আগুনভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমার ছেলেকে দেখবার জন্যে আমি নেই হাসপাতালে ডেকে আনবো। খোকা যদি বেঁচে না ওঠে তাও সই কিন্তু ওষুধ আমি ডাঃ মুখার্জীকে কল দেব না। ডাক্তারদের মধ্যে এও এক লোকের সামনে তাঁর আবার অপমান করেছেন। এ অপমানের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না।

আমি বরং কাঁকনবাগ থেকে ডাঃ রায়কে ডেকে আনার ছেলের চিকিৎসা করুন, ডাঃ ঘোষকে ছেড়ে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাবার কথা কোনদিন স্বপ্নেও নিতে দেখবে না।

স্বামীর রাগ দেখে নিরু চুপ করে যায়। ডাঃ ঘোষ হাসপাতালে যাবার জন্যে বেরিয়ে যান।

আরও তিন দিনের মধ্যে ছেলে সেরে ওঠে। প্রলাপের ঘোর কাটে নি। তার অবস্থা তিন তিন বারের দিনেই মনে হচ্ছে। সৌম্য তার সকাল থেকে ফিরে ঘরে, ছেলেরই কিছু করা যাচ্ছে না।

ডাঃ রায় ঘরে আসেন। তুষার ডাক্তারও ঘরে আসেন।

ডাঃ নিরু তুষারে ডেকে উঠে বলল আমার কপালে হাত আছে আমি যেন বুঝতে পারছি। আপনারা তো অনেক করলেন। কিছুই তো হল না। এখন তো সব শেষ হয়ে এসেছে। এবার একবার ডাঃ মুখার্জীকে ডাকুন। সব শেষ হয়ে যাবার আগে তিনি একবার এসে দেখুন, এই আমার ইচ্ছা।

তার কথা শুনে ডাঃ ঘোষ কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তুষার ডাক্তার তাকে থামিয়ে বললেন এ সময় ঝগড়াঝাটির সময় নয় ডাঃ ঘোষ। এ জীবনমরণ সমস্যা। আমরা যে এতদিন কিছুই করতে পারিনি, সে তো রোগীর অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমরা কেউ বলতেও পারিনি, আপনাকে চিকিৎসা করে চলেছি। লাভে হাত না লাভে মুল। এ ভাবে আর রোগীকে ফেলে রাখা যায় না। আমি এখুনি ডাঃ মুখার্জীকে ডেকে নিয়ে আসছি।

কাকে ডেকে কথার ওপর একটা কথা না বলে তিনি ঘরে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডাঃ ঘোষ একবার ডাঃ রায়ের মুখের দিকে আর একবার পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। তুষার ডাক্তারের কথা শুনে ডাঃ রায়ের মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন ডোবার কথা নয়কিন্তু, চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে কিনা ওষুধে কোন যে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

কটাখানেকের মধ্যেই ডাঃ রায়ের মুখার্জীকে নিয়ে তুষার ডাক্তার ফিরে এলেন। ডাঃ ঘোষ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বার বার এই লোকটার কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাঁর মনের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। মুখে তাড়াতাড়ি হাসি টেনে নিয়ে এনে তিনি ডাঃ মুখার্জীকে আসন গ্রহণ করালেন।

ডাঃ মুখার্জী সব চেয়ে আগেই ও সাধ্য সাধনা সেবনের নিরুপমার কাছ থেকে। নিরুর চাহনিতে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার ছেলে মরণের মোকাবেলার পর আজ আরোগ্য লাভ করেছে। তাঃ মুখার্জীর মেজাজ খুবই ভাল। সাদা ফিনের শার্ট। বলার মাথা মোটা মোটা ফিনের চোরার নেই। পায়ে সাদা মোজা ও ফিনফিনে মুচি।

ডাঃ মুখার্জী চামড়ার ব্যাগ থেকে তার নিত্যদিন ব্যবহারী যেন ওরে আলমারী ঘরে ছোট্ট পাকেট রোগীকে পরীক্ষা করলেন। তারপর তিনি নিজে লাল ওরে একটা ওষুধ তৈরী করে রোগীকে খাইয়ে দিলেন। আরও ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। আধঘণ্টা ১৪ ঘন্টায় রোগীর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটলে, তাও বললেন।

ডাঃ মুখার্জী বেশীক্ষণ বসলেন না। তাঁর অন্য একটা কেস ছিল। তিনি একটা লম্বা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ওরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ফিনফিনে মুচি জোড়ার তলা থেকে খট খট শব্দ উঠতে লাগল। তিনি বাইরে যাবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাঃ ঘোষ গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাঃ মুখার্জী তাঁর চোখ আগেই ঘোড়ের ছেলে বাঁধার চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে ডাঃ ঘোষের দিকে তাকালেন। ডাঃ ঘোষের মুখে হাসি, ডাঃ মুখার্জীর দৃষ্টিতে আর আগুনের ঝলক নেই। তাঁর দৃষ্টিতে আজ যেন ভোরবেলার আকাশের।

ছেলের রোগমুক্তির সম্পর্কে তখন যেন একটা নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে ডাঃ ঘোষ বাড়ির ভিতর এলেন। ২৪ ঘন্টা যেতে না যেতেই রোগের অবস্থার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যেন। তার জ্বর পরিষ্কার হয়ে গেল। চোখের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল। রোগী কথা বলতে চাইল।

ছেলে সেরে ওঠার ডাঃ ঘোষের মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দেল। তিনি ডাঃ মুখার্জীর ভক্ত হয়ে উঠলেন। আর প্রতিদিনই ডাঃ মুখার্জীর বাড়িতে তাঁদের দেখা হতে লাগল।

ডাঃ জীবন মুখার্জীর বিখ্যাত বক-আটি চুরি গেছে। একদিন সকাল বেলা রোগী দেখতে যেতোবার সময় তিনি হাসপাতালের আয়াটা ওঁর কম্পাউণ্ডারের হাতে দিয়ে বকযন্ত্রের চামড়ার কেসটা বের করে আনতে বললেন। কম্পাউণ্ডার ছুটতে ছুটতে এসে ওঁকে জানাল, চামড়ের আলা খোলা, বকযন্ত্রের চামড়ার কেসটা তার মধ্যে নেই।

ডাঃ মুখার্জী ছুটে এলেন। বকযন্ত্রের জন্য বাড়ির সমস্ত আসবাব সকল স্থানে খোঁজ চলল কিন্তু তা কোথাও পাওয়া গেল না।

আগের দিন ডাঃ মুখার্জী যে সব জায়গায় রোগী দেখতে গিয়েছিলেন সেই জায়গায় লোক ছুটল কিন্তু কোথাও বকযন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

ডাঃ মুখার্জীর বকযন্ত্র চুরির সংবাদ সাবানদের মধ্য সহরে ছড়িয়ে পড়ল। সারা সহর এই দুঃসংবাদ শুনে ডাঃ মুখার্জীর বাড়িতে ছুটে এল।

থানায় চাটুজ্জে পুলিশে খবর দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, প্রয়োজন হলে তিনি কলকাতা থেকে গোয়েন্দা আনিয়ে বকযন্ত্রের চোর বের করবেন। ডাঃ মুখার্জী তাঁকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, খোঁজাখুঁজি করা বৃথা। তার কোন প্রয়োজনও নেই। চিকিৎসক হিসেবে আমার প্রয়োজনও শেষ হয়ে ফুরিয়েছে তাই আমার চিকিৎসার সবচেয়ে দামিজিনিষটি হারিয়ে গেছে আমার দুঃখ হচ্ছে না, এমন কথা বলব না। আমি বিয়ে করিনি কিন্তু সন্তানের অভাব কোনদিন অনুভব করিনি। ঐ বকযন্ত্রটি ছিল আমার সন্তান। লোকে সন্তানের গায়ে হাত দিতে যেমন আপত্তি করে ঐ বকযন্ত্রটি হাতে ধরে আমিও তেমনি আপত্তি করতাম। কোনদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি হাসপাতালে গিয়ে বক-যন্ত্রটি বের করে নিয়ে এসে রোগের মলটাতে প্রিয় লাগাতাম। এমন দিনও গেছে যখন বিনের পর দিন বকযন্ত্রটি আমার সঙ্গ ছাড়া করিনি। দিনের বেলা সারাক্ষণ ওকে আমার কাছে বসিয়ে রেখেছি, রাতে বুকে বুকে করেই ঘুমিয়েছি। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডাঃ মুখার্জী চুপ করলেন। ঘরে উপস্থিত সকলেই চুপ করে রইলেন। ডাঃ মুখার্জীকে সান্ত্বনা দেবার একটা কথাও খুঁজে পেলেন না।

কয়েকদিন কেটে গেল। ডাঃ মুখার্জীর বকযন্ত্রের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। সেদিন সকাল বেলা ডাঃ রায় হাসপাতালে ডিউটিতে এসেছেন, এমন সময় দুজন চাষার ও কাঁধমাত্র বলা-বলককে সঙ্গে নিয়ে রামদয়াল চাটুজ্জে এসে হাজির হলেন।

দুজন চাষার ডাঃ রায়কে বললেন ওষুধ কেন। ডাঃ মুখার্জী তখনও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বকযন্ত্র চুরি যাওয়ার দিন থেকে জলটুকু পর্যন্ত খাচ্ছেন না। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। সেবা শুশ্রূষা তো দূরে থাকুক কারুকে কাছে পর্যন্ত যেতে দিচ্ছেন না। আপনি একবার চলুন। আপনাকে কথা শুনলেও শুনতে পারেন। ডাঃ রায় ঔষুধ আর সকলের সঙ্গে ডাঃ মুখার্জীর বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

কাজ কিছু কিছু হোল না। ডাঃ মুখার্জী বললেন, আপনি আমাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে সারাতে পারবেন না। আমার রোগ মেকানিক্যাল। কোন চিকিৎসাতেই এর উপশম হবে না। আপনি আমার একটা উপকার করতে পারেন। সহরের লোকজন আমার বাড়িতে আসতে বারণ করে দিন। আপনারাও আর আমাকে দেখতে আসবেন না। আমি একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই। এই বলে ডাঃ মুখার্জী মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। ডাঃ রায় আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বকযন্ত্র চুরির সংবাদ শুনে সহরের সকলেই ডাঃ মুখার্জীর বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন, কেবল একজন ওঁর বাড়ি যেতে পারেন নি। তিনি ডাঃ ঘোষ। যেদিন ডাঃ মুখার্জীর বকযন্ত্রটা চুরি যায়, সেইদিন থেকেই ডাঃ ঘোষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর মাথা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে। তিনি বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসতে পারছেন না। এমনি অবস্থা। তাঁর মনে হচ্ছে ডাঃ মুখার্জীর অসুখের একটা বিষয়ে মিল আছে। তিনিও ডাক্তার যন্ত্রকে কারে যেতে দিচ্ছেন না। স্ত্রী নিরুপায়কে তিনি বলেছেন, আমি নিজে ডাক্তার। নিজের চিকিৎসা নিজে করব। অন্য কারুকে দিয়ে নিজের চিকিৎসা আমি করাব না।

সেদিন ডাঃ মুখার্জীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাঃ রায় ডাঃ ঘোষের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তিনি সব শুনলেন, ডাঃ ঘোষ যেন ভাঙ্গিয়া পড়েছেন। তাঁর মুখ যেমন একটা মাতৃত্বেই ভার ফুটে উঠেছে। শুধু তাঁর চোখ দুটো কি কারণে যেন অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডাঃ রায়ের মুখে ডাঃ মুখার্জীর কথা শুনে ডাঃ ঘোষ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অসুখের জন্যে ডাঃ মুখার্জীর বাড়ী যেতে না পারার তিনি কি ভাবছেন, তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাটাই বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বসে ডাঃ রায় বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ডাঃ ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন।

ভোর হয়ে এসেছে। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। ডাঃ মুখার্জী ঘুমে আছেন। তিনি জেগে আছেন কিন্তু দুর্বলতায় তাঁর চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। হঠাৎ তাঁর মনে হোল তাঁর শোবার ঘরে কে যেন একজন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে "কে" বলে উঠেই দরজা খোলার একটা আওয়াজ হোল এবং কে যেন তাঁর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তিনি বিছানা থেকে উঠে আলো জেলে টলতে টলতে বাথ-রুমের কাছে গিয়ে দেখেন, বাথ রুমের ওপর বকযন্ত্রের চামড়ার কেসটি পড়ে রয়েছে। কেসের ভিতর থেকে বকযন্ত্রটি বের করে দুহাতে বিকে বুকে চেপে ধরে তিনি কাঁপতে কাঁপতে মেঝের ওপর বসে পড়লেন।

ডাঃ মুখার্জী বকযন্ত্রটি ফিরে পেয়েছেন, এই সংবাদ প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সারা সহর আবার ডাঃ মুখার্জীর বাড়িতে ভেঙে পড়ল। কেমন করে বক-যন্ত্রটি ফিরে পাওয়া গেল, এই প্রশ্নের কোন উত্তর ডাঃ মুখার্জী দিলেন না। তিনি হাসিমুখে সকলের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যার পর তিনি নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন। হাতে বকযন্ত্রের চামড়ার কেসটি। গাড়ি নোজা গিয়ে উচু রোগের বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে নেমে ডাঃ মুখার্জী ডাঃ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে ডাঃ ঘোষ কুশ দেবার পর উঠে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কিছু বলবার উঁকে আগে আসন।

ডাঃ মুখার্জী ডাঃ ঘোষকে বললেন,

তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সেই জন্যে তোমাকে আপনি না বলে তুমি বলছি। তুমি নতুন প্র্যাকটিস শুরু করেছ। প্র্যাকটিস জমাতে তোমার দেরি হবে। আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি যে আমার অজান্তে আমার রোগগুলি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছ এ আমি প্রথম থেকেই জানতাম। তুমি যখন আমার ঘরের অন্ধকারে সেটা ফিরিয়ে নিয়ে এলে তখনও আমি চোখ মেলে দেখলাম। আজ আমি বক্তৃতাটা তোমাকে উপহার দেবার জন্যে এসেছি।

সভাস্থলে ঢাকপ্রাণ আমি বক্তৃতার মাইক্রোফোন খুঁজে বের করি। এই ব্যাপারটা ঠিক নয়। যে রোগী দেখতে দেখতে আমার ঘরে রোগ নির্ণয়ের একটা ক্ষমতা জন্মেছে। কার্ডিওলজি পড়ে আমি রোগ নির্ণয় করতে শিখিনি। রোগীর মুখ চোখের ভেতরে দেখে আমার তার রোগ সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায়। বক্তৃতাটা লিখে পরীক্ষা করে আমি সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হই। রোগীর বুকে একবার স্টেথোস্কোপ বসাবার আগেই কে যেন কানে কানে তার রোগের আসল কারণটা আমাকে জানিয়ে দেয়। ইংরাজীতে এটাকে বলে "ডিভাইন গেস"। বাংলায় এর নাম দিতে পার ঈশ্বরিক প্রেরণা। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিখুঁত নির্ভুলভাবে ডায়াগনোসিস করতে হলে যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া দরকার। যেমন কার্ডিওলজির যুগল ক্ষেত্রে তা হয়।

আমি আর প্র্যাকটিস করবো না ঠিক করেছি। তোমাকে এই বক্তৃতাটা দিয়ে যেতে। তুমি পারবে এটা করে নিতে।

ডাঃ মুখার্জী ডাঃ ঘোষের হাতে বক্তৃতাটা পাঠিয়ে দিলেন। ডাঃ ঘোষ একটা কথাও বলতে পারলেন না। স্থির শুধু তাঁকে প্রণাম করলেন। তাঁর দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

ডাঃ মুখার্জী আস্তে আস্তে ডাঃ ঘোষের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। ডাঃ ঘোষ বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে গাড়ির পিছনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছবি : রবীন দা

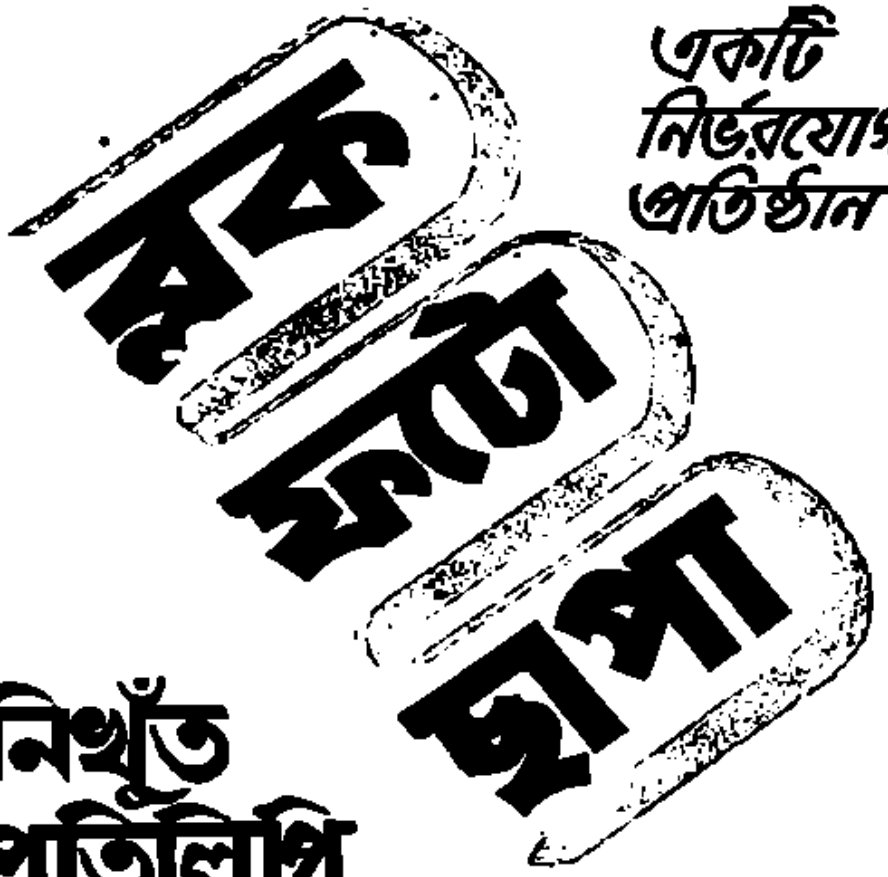

একটি
নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান

- নিখুঁত প্রতিলিপি
- মনোরম
- চিত্তাকর্ষক

ফোন : ৩৫-১৭০২

বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬ ঈ, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯

প্রশ্নের পাথার ও ভূয়োদর্শী "বনফুল"

হরপ্রসাদ মিত্র

দার্শনিক যেমন সময়ের নদী দেখতে পান, যথার্থ বিজ্ঞান যিনি, তাঁরও তেমনি নানা বই পড়ে, জীবনের ছন্দা নদীর নানা ঢেউয়ের সঙ্গে যোগ রেখে, জনমনের বিপুল ধারাকে তাঁর ধ্যানের বশ করে তোলেন। বাংলার একালের কথাসাহিত্যের কথা ভাবতে গেলে, সেই সূত্র ধরেই 'বনফুলের' কথা মনে আসে। তিনি আমাদের একালের প্রধান লেখকদের মধ্যে সেরা। নানা বিষয় এবং অজস্র প্রশ্নের সঙ্গে নিজের সাহিত্যিক সত্তাকে তিনি জড়িয়ে রেখেছেন। তার মানে এ নয় যে তিনি শুধু তত্ত্বজ্ঞানীই। তিনি দক্ষ কথাশিল্পী এবং নানা প্রশ্ন-ভাবনায় ভাবুক।

১৯৪৫-এ—অর্থাৎ তাঁর 'ডানা' যে বছর বই করে বেরোয়,—সেই জ্যৈষ্ঠের পর্যালোচনায় সজনীকান্ত দাস তাঁর সেই বছর 'শ্রেষ্ঠ গল্পের' এক ভূমিকা লিখেছিলেন। সেই ভূমিকা লেখা হবার আগে, বাংলা উপন্যাসধারা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কথানি বইয়ে 'বনফুল' সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ ছিল না বলে সজনীকান্ত খুবই ক্ষুব্ধ হন; এবং তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে সেই ক্ষোভের চিত্রকল্পে চিহ্নিত। মাত্র দু-পৃষ্ঠার সেই ভূমিকায় লেখকদের তিনি লেখেন—'বনফুল আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল। তিনি তাঁহার গল্পে উপন্যাসে কমপক্ষে আড়াইখানেক চরিত্রের আমদানি করিয়াছেন—যাহাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় বিশিষ্টতায় ঝলমল করিতেছে।'

বনফুলের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাতে আরো লেখা হয়—'অল্প কয়েকটি ঋজুরেখ কথায় একটি চরিত্রকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করার অপূর্ব কৌশল 'বনফুলের' আয়ত্ত। এই আর্টে তিনি লক্ষজয়—একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রসন্ন কিউবায়ের ভিয়ানে তাঁহার গল্প-উপন্যাসগুলি পাক করা, তাঁহার ভাষা সরল প্রাঞ্জল ও সর্ববিধ বাহুল্য-বর্জিত হইয়াও সবল ও স্নিগ্ধ-সুষমামণ্ডিত।'

তাঁর গল্প বলার ভঙ্গির এবং তাঁর মনোভাবিতার উদাহরণ দিতে গিয়ে সজনীকান্ত 'তৃণখণ্ড' এবং 'কিমুকল্প' বই-দু'খানির নাম করেন। এ-ছাড়া তাঁর আরো একটি মন্তব্য মনে পড়ে—'চটচটে সেন্টিমেন্টালিজম্ অথবা খসখসে জাকামির সহিত বনফুলের দূরে-নেইলে সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলা দেশের চলন্ত রস জয় করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার শিল্পসৃজন-ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা বড় প্রশংসাপত্র। 'বনফুল' বলিতেই আজ মেরুদণ্ডের একজন সুস্থ সবল রসিক শিল্পীর কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়।'

অল্প কথায় 'বনফুলে'র শিল্পস্বভাব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সব কথাই এই লেখাটিতে বলা হয়েছিল। 'বনফুল' যে তাঁর নিজের সাহিত্যে কেবলই পরীক্ষা করে চলেছেন, সে-কথা অনেকেই বলেছেন। সেই পরীক্ষার কেবটি ভঙ্গিগত এবং বিষয়গত দুই-ই। সজনীকান্তের মন্তব্য আবার স্মরণ করতে হয়—'তাঁহার স্বাভাবগত অভিজ্ঞতা ও অনুচ্ছুতির সহিত একনিষ্ঠ ছাত্রের মত অধ্যবসায়ের জোর মিলাইয়া তিনি যে বিভিন্ন শ্রেণীর রস সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব চলমান চিত্তের পরিচয় লইয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। তাঁহার এই গতিশীল মনই তাঁহাকে 'তৃণখণ্ড', 'বৈতরণী-তীরে' ও 'নির্মোকে'ই আবদ্ধ রাখে নাই, তিনি 'বৈরথ', 'কিমুকল্প', 'মৃগয়া' ত্যাগ করিয়া 'বাহির' অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছেন, 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'আঁধার', 'অগ্নিসম্ভব' সম্ভব হইয়াছে, 'বিদ্যাসাগর', 'মধুসূদনকে' তিনি জীবন্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অজস্র মন তাঁহাকে দিয়া 'জঙ্গম' রচনায় পরও 'ডানা' হইতে পারিতেছে, পঞ্চাশের 'ডানায়' ভর করিতে তিনি সাহস করিয়াছেন। ছোটগল্প ও নাটকে তাঁহার পরীক্ষার অন্ত নাই।'

এই ভূমিকার কের বছর আগে 'বনফুলের' 'তৃণখণ্ড' বেরোয়। ধর্মবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র দাস দু'জনেই ডাক্তার। এঁদের উদ্দেশে বইখানির উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন—'যাঁহারা নিজেরা তৃণখণ্ড হইয়াও এই 'তৃণখণ্ডকে' সংসার-সমুদ্রে ভাসমান করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিতেছি।'

সেই 'তৃণখণ্ডের' সূচনাতে সজনীকান্তের একটি কবিতার কয়েকছত্র উদ্ধৃতি ছিল। সে-কবিতার প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তির মধ্যেই গল্পে, পদ্যে অন্ধকারের বন্দনা ছিল। একালের দৃষ্টি থেকে হঠাৎ যেন বাঁকুড়-মুখে সরে যাবার মানে ছিল তাঁর সে সব উক্তিতে। আলো আর অন্ধকার বনফুলের প্রিয় রূপক। তাঁর রচনার অবিস্মরণীয় বাক্যগুলির মধ্যে নক্ষত্রের-মাংসোরের গল্প। 'ডাক্তি'

'সন্ধ্যা' 'উষা' 'নিশা' নামগুলি খুবই সাধারণ। তুলনায় বলে তিনি লেখেন—

'সমস্ত অন্তর ভরিয়া যে অনুভব, তোমাকে নমস্কার করি। ও তো নক্ষত্র প্রকাশক, হে অরুণ, অথচ তোমাকে প্রণাম করি। ঘনঘোরের নাবিক তুমি, অন্ধকারকে সরস কর, ক্লান্তকে নিকটে আন, অন্তরকে বাহিরে লইয়া যাও।'...

পরে বলা হয়—

কেবা সন্ধ্যা কেবা নিশা
যে বালায় দিবে মোরে অন্ন,
দিবস, না রজনী আঁধার।
মুক্তি তবু মুক্তি সেই
চিত্ত মোর ভাবে অহরহ
উৎসিসিতে প্রেমের পাথারে।

'বনফুলে'র আসল নাম তাঁর এই সাহিত্যিক নামের সঙ্গেই সাহিত্য-সমাজে আজ সর্ব-পরিচিত। তিনি শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুরের ডাক্তার। তাঁর রচনার সংখ্যা অজস্র,—পরিমাণ অনেক। এখন তিনি প্রবীণ। চিকিৎসক জীবনে এই দর্শন-ভাবনাময়, বস্তুনিষ্ঠ মানুষটিই তাঁর 'তৃণখণ্ড' কাহিনীর কথক হয়েছিলেন। সেখানের তিনি ডাক্তার। মানুষের আধিব্যাধির খাঁটি সঙ্গী তিনি। কাহিনীর শেষ দিকে ঘরের মধ্যে এক রাত্রিবাস তিনি বলেন—

আজ কি তবে তারায় কেন দেখব
আজকে ছাদ যদিও আমি নক্ষত্র।
সখী, আমার সাদা ছদম ছুড়ে দে
আজকে ছাদ দেওয়ার এই আসন,
আন দেখায় তব আঙুল পুকেয়ে
তর্জাদনের তরু স্মৃতি-শাসন?

আজও তরু জলে এবং স্নেহে,
সে সব কথা নাহক কি বল কেবে?
আজ মুগ্ধ এস্থানি তো দেবে
চুম্বনেতে উদ্ভাসিত আনন,
উৎসবেতে প্রেমের চলে কি?
মানবে কি তা শ্রীমিয়ানের শাসন?

গল্পের ভরতুলে তাঁর এইসব প্রেমের আড়ালে যাহিতা একজন নায়িকা ছিলেন বটে,—কিন্তু ভক্তদাসের নায়িকার ইশারাটা এখানে ইশারা মাত্র। আসল কথা 'তৃণখণ্ডে' বনফুল তাঁর জীবনবোধের কথাই জানিয়েছেন। এ-কাহিনীতে ডাক্তারদের সহযোগিতায় কলেরাবিধ্বস্ত তৃতীয় গঞ্জকেও পালিয়ে যেতে দেখা যায় নি। ডাক্তারের কর্তব্য আসে যায়, কর্মী মরে, চাকা ঘোরবার চলতেই থাকে। তাঁরই মনে হয়—

'কি চাই বুঝিতে পারিনা। এই জন্যই বোধ হয় মানুষ শেষ বয়সে ভগবানকে চায়, অর্থাৎ এমন একটা জিনিষকে আঁকড়াতে চায়, যাহা পাওয়া যায় না সুতরাং মোহ ভুলায় না, শিশুর চাঁদ পাওয়ার মত।'

পরিবেশের একঘেয়েমি, চরিত্রের বহুলতা,—বিপুল চলন—এবং তারই মধ্যে অন্তরে অন্তরে—'প্রেম' নামে চুম্বকের এক প্রবাহিত পরিক্রমা—, 'তৃণখণ্ডের' ডাক্তার-জীবনের আত্মকথা বলতে এই যোগাযোগ। আপাতনীরস ভূমির পরে, কাহিনীর শেষ কবিতাটিতে তিনি বলেছেন—

ছোট্ট-মুখে তৃণখণ্ড। বুকে তার
প্রেম-মরীচিকা।
দুঃখে সুখে কাঁপে তার জানু।
আমারে পড়িতে চায়ে অদৃষ্টের রুক্ষ-
লিপিকা।
সবে আজ আনিশ্চিত আমু।

'তৃণখণ্ড' এই আমাদের মনুষ্য-জীবন! এবং সেই তৃণের নাম 'বনফুল' যা প্রচারহীন, প্রাণস্পন্দিত ক্ষুদ্র অস্তিত্বের ফুল। এই জীবন-তৃণখণ্ডকে নিজের অনুভূতিতে ধরেছেন যিনি, তিনি নিজের নামটি বিনয়বশে ঐ 'বনফুল' নামটি গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো প্রসিদ্ধ ফুলদের প্রথা মতে অন্তরাবে নিজের স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে তিনি রাজী ছিলেন না বলেই নিজের নাম রেখেছিলেন 'বনফুল'!

মানব-অভিজ্ঞতার আপাতপরিচিতজনের এই ক্ষুদ্রতাকে সেন্টিমেন্টালিজমের তুলনে ভুলে তার যথার্থ মহানে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া সহজ কাজ নয়। সেই কাজে মনোযোগী তিনি। জীবনের গভীর গৌরব অনুভব করেছেন তিনি। বিজ্ঞানীর বিরীক্ষা আর বিশ্লেষণ দিয়েছে শিল্পীর কল্পনাকে। সেই মানসিক অবয়বের নাম 'বনফুল'।

সজনীকান্ত তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর সুশীলকুমার দে, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষাদী প্রভৃতি কবি, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, বিদগ্ধজনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা অনেক-কালের। সজনীকান্তের নামে তাঁর 'কলম' উৎসর্গ করা হয়। বুদ্ধদেবের বসুর নামে 'সুরোদর্শন'। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে-কে তাঁর 'পঞ্চাশর' বইখানি উৎসর্গ করেন। নির্মলবাবুর নামে উৎসর্গ করেছেন 'স্থাবর'। পরিমলবাবুকে দিয়েছেন 'বিস্ফুলিঙ্গ' গল্পগ্রন্থ। 'নবতরঙ্গ'কে উৎসর্গ করেছেন বুদ্ধদেবকে চট্টোপাধ্যায়ের নামে।

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় একদা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি 'বনফুলে'র একান্তিক রচনার বিজ্ঞান। জীবনে নানা ঢেউয়ের মানে খুঁজেছেন 'বনফুল' তাঁর সৃষ্টির পরিমণ্ডলে প্রবেশ করলে মনে হয় যে, তাঁর বিদ্যা, পরিবেশ আর প্রেম পাওয়ার কথাই বিশেষভাবে আলোচ্য।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' তৃতীয় সংস্করণে 'বনফুলের' রচনা পরিবর্তনের যৌলিকতার দিকটি উল্লেখ করেছেন,—তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতার কথাও বলেছেন।

১৩২১এর আশ্বিনের প্রবাসীতে 'হো গেল' নামে একটি গল্প বেরোয়। সেটি যার সেটিই বনফুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প। ভাইয়ের ভুলের চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প ও গল্পকার' বইখানিতে সে-ইতিহাস সরল করে বলেছেন—বস্তুত প্রথম বিশ্বের মতই গল্প। 'বনফুল' 'বিচিত্রা চারী'। এবং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যও তিনি স্মরণ করেছেন। বনফুল যে 'বিজ্ঞান মেজাজের সাহিত্যিক,' সেকথা রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন।

তিরিশের দশকে তাঁর অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩এ বেরোয় 'বনফুলের গল্প', ১৯৩৫এ 'বনফুলের আরো গল্প'। ১৯৩৬এর অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ 'পরিচয়ের চিঠিতে' প্রকাশিত তাঁর চিঠিতে 'বনফুলের' সেই সব গল্প সম্বন্ধে প্রধান যে দুটি কথা বলেন তার একটিতে ছিল এই বিজ্ঞান মেজাজের উল্লেখ,—দ্বিতীয়টিতে 'বনফুলে পর্যবেক্ষণের বিশেষত্ব পাচ্ছে,—অর্থাৎ তথ্যনিষ্ঠ ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়েও তিনি যে মানবজীবনের গভীর আবেদনকে সত্য করতে পারেন, সেই দিকটি দেখা দেওয়া হয়।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, পাখিবিদ্যা, ক্ষুদ্র প্রাণি-বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ছোঁ ঘটেই,-

'বনফুলের' ছোটগল্পে এই সব বস্তুনিষ্ঠতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কৌতূহলমনে তিনি আমাদের মনোযোগকে বন্দনাদানী। অধ্যাপক তুলের চৌধুরী এ সব কথা বেশ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

বনফুলের নানুষ-নারিকার নামগুলিও স্মরণীয় অথবা চমকপ্রদ। তাঁর 'পর্ণাদি', 'রাত্রি' ইত্যাদি বইয়ের কথা অন্যত্র আলোচনা করেছি বটেই, তাছাড়া এই ধরনের বিভিন্ন নামের জন্যেও বার-বার মনে পড়ে। 'জঙ্গমে'যেমন 'জন্তু' আছে, 'কবালী' আছে,—'উদয়-অস্ত'তে সূর্যসুন্দর, মহাশান্ত,—'সপ্তর্ষিতে' হংসধ্বজ, সোমধ্বজ, মৃগাঙ্কধ্বজ ইত্যাদি,—'কলন্তরে' শ্রীমতী বর্ণিমা,—'ওরা, সব পারে'তে শুচিস্মা,—'নবদিগন্তে, যেমন 'শিবম' আছে, 'বহ্নি' আছে। 'পিতামহ' তাঁর অদ্ভুত কৌশলের উদাহরণ। তাতে শিবম দেবের চারিত্রিক বিবরণ তো আছেই, সেই সঙ্গে 'চারুকে', 'তরণীকে', 'নীলকণ্ঠ', 'নীলোৎপলা,' 'মহাশঙ্খ' ইত্যাদি নামগুলিও অবিস্মরণীয়। অনেক ছলক এই সব নাম। অনেক গল্প উঠেছে এইসব চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে। মানুষের মন যে অবস্থার দাস, সে-কথাও উঁকিতে দেখানো হয়েছে। 'নবদিগন্ত' (১৩৬৬) উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে নায়ক 'শিবম' বিশেষ এক সঙ্কটে পড়ে বাবুর কাছে হঠাৎ কিছু অর্থ সাহায্য পেয়ে বিদায়ের কথা জেনেছে—

'মনে হচ্ছিল, তাঁর তাতে দোষ হয় ভেবেই সে দুইয়ের মতো কিছু একটা আছে। ঠিক মতো আলো যা অন্ধকার করে দিতে পারেন দুর্বাসার মতো। আলোয় বহ্নি বললে দিতে পারেন দুর্গম মতো। খানিকক্ষণ আগেই হতাশার অন্ধকার নেমে এসেছিল চারিদিকে, এখন আশার কি চমৎকার হয়ে গেল।'

'জঙ্গম' এর (প্রথম খণ্ড ১৩৫০) ভূমিকে গভীর রাতে কবালীচরণ শিবমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি আশাকরি উপন্যাস পড়েছেন জন্তুবাবু?

জন্তুবাবু তা পড়েছেন শুনে কবালীচরণ বলেন—'আমি ছোড়াটাকে আজ, সাহায্যের আশে এক মুসলমান ছোকরাকে ফিরে যেতে আর ছোকরাকে মেরে ফেলেছ। মনে আছে?'

জন্তুবাবু তা মনে ছিলনা।

কবালীচরণ বলেছিলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকত, আমিও তাই করতাম।

এসব দৃশ্যের মানে কি? এইসব পার্শ্বচরিত্র দিয়ে তাঁর যে বিশেষ কোন কাজ ছিল, তা এক নজরেই বোঝা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় যে, ঘ দার্শনিকতার পাশে জীবনের গভীর কোন উপলব্ধি পরিবেশন করতে গিয়ে তাঁর বোধ হয় উপায়, মাঝখান থেকে পথ-নির্মাণে কিছু কিছু গল্প হয়েছে। যেমন 'পিতামহ' বইয়ে পিতামহ জিজ্ঞেস করেছেন বিষ্ণুকে—

'আশ্রম যুগে যেসব বিশাল সরীসৃপ, বিরাট পশু, ছিলো এখানকার তুমার প্রান্তর সৃষ্টি করেছিলো তার চিহ্ন পর্যন্ত আজ আর?'

বিষ্ণু বলেছেন যে পিতামহ নিজেই যেহেতু নক্ষত্রালির পরিবেশ বদলে দিয়েছিলেন, সেই কারণে অনেকের কিঞ্চিৎ সুযোগ পেয়ে সে সব ধ্বংস করেছেন।

উত্তরে পিতামহ বলেন—'হিসেব রাখিনি তখন তুমি'।

সেই আদি ভয়ঙ্কর ঘোরের আবহাওয়ায় উৎসাহীকে আসতে দেখে, পিতামহ তাঁকেও ধমক দিয়েছেন। পৃথিবীর মানব-সমাজের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মুখ-বিস্তারের কথা উঠেছে। সূর্য, মহাশঙ্খ, বরাহ ইত্যাদি অবতারের কথা উঠেছে। পরীক্ষণের খবর টানতে দেবার জন্যে বিষ্ণু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ছেলেদেরকে নিয়ে ফিরেছেন। ফেরেন এসে শিল্পীকুল কবালের কথা তুলেছেন। পিতামহ তাঁর নিজের আদিপুরুষের সঙ্গীন এই কলিল অবস্থা-ভবের খবর পেয়ে কাঁদিয়ে উঠেছেন! তাঁর মুখ থেকে তখন গরম গরম বাষ্প গলানোর স্রোত বয়ে গেছে! তারপর ডাক্তাররা এসেছেন। পিতামহের পাগলামি প্রশমিত হয়েছে সবাইকে দেবতাদের সম্মিলিত স্তবে। সুস্থ হয়ে বিষ্ণুকে তিনি বলেছেন চার্বাককে আবু করে এই দুনিয়ায় কবিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

এ তত্ত্ব চিত্তাকর্ষকবটে, কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এ পর্যন্ত যা এ বইয়ে অভিনব। অভিনবত্ব যেখানে পাঠকের প্রত্যাশিত ভাবের খুব বেশি বিরোধী হয়ে ওঠে, সে-সব ক্ষেত্রে লেখককে আরো সতর্ক থাকতে হয়। বনফুলের গল্প-উপন্যাস শুধু বলবার নয়, ভাববার, ভাববারও। এবং তাঁর এই 'পিতামহ' উপন্যাস হিসাবে অভিনবত্বের একটি চড়া উদাহরণ। সেই কারণেই এখানে বিশেষভাবে সে বইয়ের উল্লেখ করা গেল। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণযোগ্য উপন্যাসের কথাও স্মরণীয়। 'বিন্দুবিসর্গ' গল্প-গ্রন্থে মোট ছাব্বিশটি গল্প আছে। গল্পের উপস্থাপনা এবং বর্ণনার প্রকার বহু। এ দিক থেকেই এই লেখা-গুলিতে 'বনফুল' তাঁর পরীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তাঁর 'কবর' গল্পটিতে দেখা গেছে এই আত্মকথার ভঙ্গি—

আমার জন্ম বিশালক্ষ হইয়াছে। কিসে বিশালক্ষ হইয়াছে, কেন বিশালক্ষ হইয়াছে, যে কারণেই হোক তাহা আমি বলিব না। বলিতে পারিব না। বলিতে গেলে আমার জন্ম আবার বিশালক্ষ হইয়া যাইবে, তখন আর আমি নিজেকে সামলাইতে পারিব না, সম্পূর্ণরূপে বিশালক্ষ হইয়া সব কথা বলিয়া ফেলিব। আমার অবচেতন মনের অন্তরালে যে সকল নিগূঢ়বাণী নিগূঢ়ভাবে চাপা আছে তাহাদের বিকল্প উদ্ভাস জন্মকে বিশালক্ষ করিতে পারে কি না সে এক অবাক্ত কারণ—

বাজাও—ও-

ওগো আবগোরা.....

ছোট গল্পের ভাঙ-বৈচিত্র্যের কথা নতুন নয়। কিন্তু এইভাবে আত্মচিন্তা প্রকাশ করা, যা মনের ভাষায় কোনো তর্ক চলবার অবস্থাটাই মোলায়েম করে রাখে, যথা যা আছিতে বলিয়ে দেওয়া অভিনব ব্যাপার। এ-গল্পে পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন আছে—

—আকাশ দেখিয়াছেন?

যে আকাশ দেখা যায় না, যাহার কর্ণ অবলম্বিত, যাহা কোন স্থানবিশেষের বিস্তীর্ণ নয়, সেই আকাশ। দেখিয়াছেন?

আর একটি প্রশ্ন—

কাঁদিয়াছেন কখনও? যে ক্রন্দনে অশ্রু নাই, আর্দ্র নাই, এমন কি বেদনা-বোধও নাই!

চতুর্থ অধ্যায়টি এই—

আকাশে সৃষ্টি উঁকিঝুঁকি দিতেছে। ও সৃষ্টি নয়, মানুষের মন। চিন্তাধারায়—দুই পড়িয়াছে। ভাবিতেছেন—একটা। ভাবিবার চেষ্টা—আর দোষা। ভাবিতেছে দোষার—একটা। ভাবিবার—একটা।

...কথা আলোচনার সূচনায় দেখা যায়—
...ন আকাশে ওঠে।

...পরস্পর উৎসাহিত হয়ে ওঠে সন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে চড়াতে। ...ওঠে না, সে ছুটিকার, সে সহযোগে, সে ওজার। চন্দ্রশিলকার অবতারণা করিতেছি না, বরং মনে হয় সে তাহা বলার সময় পায়নাই। বস্তুতঃ যাহা সহজে মনে হয় না তাহাই মনে পড়াইয়া দেওয়ার এক সার্থকতা। যাহা বহুর মধ্যে এক অথবা একে দেখে তাহাই দর্শন, বহুকে অথবা দেখে তাহাও এক প্রকার দর্শন, কিন্তু তাহা মহত্তর দর্শন, বড় জোর দেখাদর্শন, শুদ্ধদর্শন নয়। বিচার।

এই ভাবে পর পর আটটি অনুচ্ছেদ এগিয়েছে।

এ গল্পের 'ফরম' নামটির সার্থকতা কি? মনের এই ক্ষুদ্র ভাবনা-সমস্যার আলো-অন্ধকারের এলাকাকে, অর্থাৎকে জীবনের মহত্তর অন্তর্দাসায়—দুইয়েরই অনুষ্ঠান এতে অনুসৃত হয়ে থাকে। এবং অনুচ্ছেদে দৃশ্যের ক্রম যায়—

'অফিসের মধ্যে একটা ঘরে অনেক কাজের ভিড় আছে। তাহাদের মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধতা হয়, আবার চলে বলে হাসতে হাসতে কাজে তখন তাহারা আত্মপ্রকাশ করে দুই, আলমারী সমূহে—উহাদের মধ্যে চাঁইয়া দেখেন। তাহারা কখন আসে যায় তিনি না। উহাদের অন্তরালে যে ফাইলগুলি রহিয়াছে তাহা বাহির করিয়া আনিতে হয়। সেই ফাইলগুলি আটিয়া প্রত্যেকটির ভিতরে কাগজ ভরিয়া আসিতে চায়। আবার তখন তাহাদের সেই নামগুলি আবার কাগজে আসে তাহারা আমার জীবনের সমস্ত ঘরকে ফাইল করিয়া দিয়াছে—বন্ধুরা, শত্রু, আত্মীয়, স্বজন। আবার কাগজ ঘরে সমস্ত প্রত্যাশায় আমার ঘটি হইয়া যায়। তখন আবিষ্কার করিয়াছি।'

ঐ 'ফরম' গল্পের আকার, শব্দ-বন্ধন এবং বিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য। তাহাতেই মনে অনুকরণ-অনুসরণের কৌশলে ছিন্ন কাগজ মনের আবিষ্কার আর তাহার পরিণাম হলে নিজের অভিজ্ঞতা এবং বোধ-বোধের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সোনা কই' বিষ্ণু-বিশ্বাসের আর একটি গল্প। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর পরনে খদ্দরের মোটা কাপড়, গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর মুখে দাড়ি, বুক বোতাম। কথায়-কথায় ভদ্রলোক বলা ভদ্রলোক নিজে বলেন—'দেশভাগের' বিভীষিকা বলা এঁরেছেন। এই হল ভদ্রলোক পরিচয়ের ভূমিকা। কিন্তু একটা কথা কি জানেন - ভদ্রলোক বেশি দিন চেপে না। আসল মানুষটাকে দেখবার কথা লিখেই হয়।

এই ভূমিকার পরে নীলমাধবের সঙ্গে বিমলাংশু-ভূষণবাবু প্রেমের গল্প শোনা যায়। রেলেবেলায় যে-বালককে বাবিয়ে

মায়েদের চির আদরের

ধীরেন ও গৌরী

মার্কা কড়াই

ব্যবহার করুন

ডি, এন, সিংহ এ্যাণ্ড কোং

১৬১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৩-৫৮২৬

নীলমাধব দুই সম্পর্কের নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। আই-এ ফেল সে; বেশির ভাগই নিজের খরচায় মেসে থেকে একটা ছোটখাটো মেয়েকে পড়িয়ে কিছু; এটা-ওটা করে আর একটা মেয়ের বাপ হয়।

স্ত্রীর মৃত্যুর সময় নীলমাধব বাড়ি ছিল না। বাড়ি এসে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে—স্ত্রীর মৃতদেহ থেকে অলঙ্কার খুলে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কেউ অলঙ্কারের লোভ পাওয়া মেয়ে আইন জানে। তাই নিয়ে কিশোরী কুমারীদের পাঠ্যপুস্তক-সুলভ উপন্যাস তৈরি করে থাকে। এর চেয়ে মেয়েদের উপন্যাস লিখেছিল। অবশ্য মুখরোচক নীলমাধব প্রকাশক নাম 'জীবনসর্বস্ব'। তারপর একদিনে গোটা দুই ছেলে আর্থিক দেখে ব. 'জীবনসর্বস্ব' আর মধ্যাদর্শন নিয়ে ভাবছে'। ঘরনার বাপের স্পষ্ট ভাষায় ঠাকুর পরনা ছিল।

বছর-দুয়েক পরে নির্মুক্ত দুই আর মধুক্ত ছিপ্রী ধারণ করে নীলমাধব যখন কলকাতায় পদার্পণ করে তখন সেই শিলেন্দ্রাই তাঁর মেয়েটিকে নাচের ভাবে নিজে বর্ণাবেগে করেছেন।

এদের সঙ্গেও সেই লোকটি কিন্তু ছাড়িয়ে দেশের ভাবে সব কিছুর মাঝ দাঁড়িয়ে বোঝাতে পড়ে!

এই ভদ্রলোকের নাম বনী লাল। ট্রেন যাত্রার পরে জানা গেছে যে, অত বড় বলতে ছিপ্রী একটি গল্প শুনিয়েছেন তার নামে। সে গল্পের নায়ক হয়েছে বনী লাল—বলা নিজের নাম বলেছেন নীলমাধব।

কৃতার গল্প 'মাধুবির মা'-র্ডে গাড়ুরী-বৌ সম্পর্কে আলাপ বিবরণ আছে,—সেই সঙ্গে বন্ধুদের প্রতীক বাক। মাধুবির স্ত্রীকে সোকারবুদ্ধি বলে গাল দিয়ে মাধুবির বাপ ডোমেল আটকে যায়। ডাক্তার এসে তাকে মৃত ঘোষণা করে। ডোমেল ঠিক করে নিয়ে ডাক্তার তাকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু ডাক্তার ঠিক হয়েই গালাগালির মধ্যেকার শেষ অংশটুকু উচ্চারিত হলো।

'ডেপুটি গল্প', 'সংসেপে উপন্যাস', 'আই-প্রস্তুতিক', ইত্যাদি বিষু-বিষয়ের নজর প্রকাশিত আর্থিক এবং তাঁদের মত থেকে অনেক। তাঁর ক খ গ ছিল নিজে নেয়া 'আর্থিকিক' পর্যন্ত তাঁদের থেকে ভোমে পড়বার মতন।

'ভাবের ঘর' বা 'মেলা' ঠিক এ-ধরনের নয়। 'মাধ' গল্পটিতে পাত্রের ঘরনিবাসু বেশির ভাগ ছিপ্রীবাদের ভিত্তিতে একটি উচ্চাঙ্গ অবলম্বন করে গড়ে বিষয়ের তাঁর আবেগের সংযমের অভাব হয়। দু-আবেগের এ-ধরনের প্রকাশের মেয়ে মেলা নিয়েছে।

এদের ছেড়ে ছিপ্রী যে মধ্যবর্তী আর্থিক বা বৈজ্ঞানিক গল্প চুলেছেন তা নয়। 'বন্ধুদের' নায়ক যে-লিখটিকে আবিষ্কার করে, এর আগেও সেই লিখের বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু মোকদ্দমা এর না হোক্,—বন, সংসদ, আন্তর্জাতিক মেলায় এদের ঘরনাকের আবিষ্কার আবিষ্কার হয়েছে আগে। যেমন, 'ভাব' গল্পের মধ্যে অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় বিভাগে মেলা মেয়ে, যেমন এই আর অনুচ্ছেদেও—

'আমেরিকে বলেন কোনো কিছুই আবশ্যক ভালো নয়, এমন কি আন্ত-ভাষা ভগবান আশ্চর্যের। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? যদি মানুষ আন্তরিক হইতে না পারিল তাহা হইলে সে কিছুই করিতে পারিল না। আন্ত-ভাষাটার সহিত আর্থ-ভাষা আবশ্যকভাবে জড়িত হইলেও তাহা দুইটি একার্থক নয়। আন্তরিক হই আর্থেরই প্রেরণায়। প্রেমে আন্তরিক হই, অন্যায়ে আন্তরিক হই, ক্রোধে আন্তরিক হই, বিশ্বাসে আন্তরিক হই, চিন্তায় আন্তরিক হই। সকলেরই মূলে একটা-না-একটা আর্থ প্রবৃত্তি অথবা প্রয়াস আছে। যাহারা আন্তরিক হইয়া সংসার স্থাপন করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের লক্ষ্য মোক্ষলাভ।..... প্রথম যৌবনে আন্তরিক হইয়া যখন নীলিমাকে ভালোবাসি তিরস্কারিলাম তখন...

ফেরোসিন তেল—একটিন
পাড়ি—দুই জোড়া...'ইত্যাদি

তাঁর অনুকরণকারীদের আজকাল আন্তরের চিহ্নই প্রকাশ এখন বলে মনে হয়। কিন্তু পাঁচটি ছোটো ছোটো আন্তরের সম্পূর্ণ 'অনুকরণে' গল্পটিকে ফেলবার আধিকের যেমন বলা সঙ্গত নয়। তিনের আলোয় নীলমাধবের দুরন্তপনা সংসারে 'বিষ্ণুলোকটি এক ছেলে-মানুষ সাধারণ প্রকাশের ছেলেটি,—কুমিং ভাত-খেকে-ওয়া ছবি আমরা দে,—একদিন এক ছেলেমেয়েরে বাস,—বৌদির আর লেখাই প্রায় হবে না আমে,—অনেকেই বলে থেকে।' কিন্তু যাহে এ ঘরনাকে অনুপ্রেরণা আছে। মানুষ অন্তরালে ভাব আছে, অন্তরালোক থেকে মেয়ে আসে পাঁচমনী,—তার ঘরনার আকৃতে মেয়ে ঘরনাকে'।

এই বইখানির 'আরম্ভপুরে' এক পৃষ্ঠার মত-কথা। 'আমরাদার,' 'নদের নিমাই,' 'আলাবলল' ইত্যাদি নিবন্ধগুলির পরবর্তী নমুনা দু অধ্যায়টি গল্প পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কথা মনে পড়ে। লিপিকার ভাষাভঙ্গি ছবির মেজাজ মনে আসে। তাঁর অন্যান্য গল্প-প্রবন্ধের অন্যান্য গল্প সম্বন্ধেও সাধারণভাবে এইসব লক্ষণই চোখে পড়ে।

গল্প-উপন্যাসের বাহনে আত্মজীবনীর পথ ধরে ছিপ্রী যেমন পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর এইসব মন্তব্য পরিবেশন করেছেন, তেমনি তখনো তখনো ছিপ্রীকে নিয়ে পথের সে চেষ্টা ঘটেছে। 'পুরোহিতদর্পণ' রচনাটি এদিক থেকে স্মরণীয়। ১৩৫৩এ তৃতীয়সংস্করণ প্রথম বেরোয়। পাঁচজনের মনোরঞ্জনের এই লেখাগুলিকে সাইই বিদ্রূপাত্মক। 'অযোধ্যার' বিশ্বাবিদ্যালয়ের ডক্টরী ধার। সে লেখাগুলিকে: মুক্তিতে ভরে যায় সে। এই অযোধ্যকে ছিপ্রী লেখকদের 'আত্মপ্রশংসায়' আলোচনাকের যোগ্য পুরোহিত হিসেবে। 'আধুনিক বাঙ্গালা' লেখাটিকে বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের আমার নয়, আসলে শরৎচন্দ্র, নাশিক, ঈশ্বি ইত্যাদিই আমাদের ভাষার সংসারে ঘাত-ঘাত নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে রেখেছে। 'আধুনিক গল্প-সাহিত্য' 'সমস্যা', 'সমস্ত খড়', 'খোলাখোল', 'খুলনখ', 'চিত্তের কথা' ইত্যাদি অন্য-গুলির প্রত্যেকটিই বাঙ্গ এবং আত্মসমীক্ষাত্মক। 'আধুনিক গল্পসাহিত্য' নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে, বাঙ্গালীর গল্প-সাহিত্যের নিজের স্বাধীন ঘটেনি,—এর পাশ্চাত্য প্রভাবের ধারণা যে পাঠক-সমাজের ক্ষতি হয়, একটি আদর্শ যা একটি আদেশ ধারণা যে লেখা লিখতে পারে না।' এ-কথা যাঁরা মনের কথা বলে, কিন্তু আলোয় গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে চোখে যাঁদের পাঠক এটিকে 'বন্ধুদের'

স্থির সিদ্ধান্ত মনে করবেন না। এ তাঁর আর এক ছেলেমানুষী।

তাঁর 'অন্তরঙ্গপুরুষ'-এ বিদেশী কাহিনীর বিষয়-প্রকৃতি ও রূপ-বীতির ছায়া পড়েছে বটে, কিন্তু সেটি 'মনচুরের' স্বভাব-অনুকূল নির্বাচন। তাঁর 'চুরন মোম' যেমন তাঁর নিজস্ব লোকচরিত্র বিশ্লেষণের বিশেষ উদাহরণ, এই বইয়ের পুরন্দর, মুরল ইত্যাদিও সেইরকম। ১৯৩৩এ কিয়ের ডস্টয়েভস্কির 'দি ইডিয়েট অফ্ দ্যাত' অবলম্বনে লেখা এই বইখানির প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়। তাঁর নিজের কথা বলায় শেষে—এ উপন্যাসের কাহিনী সংক্ষেপে এই—

প্রীষ্মকাল এসে পড়ল, কিন্তু পুরন্দর-বাবু কার্যগতিকে কলকাতা ছাড়তে পারলেন না। ডার্জিলিং যাবেন ঠিক ছিল, কিন্তু সব পণ্ড হয়ে গেল। হাইকোর্টে তাঁর মামলা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে। জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। স্নায়বাক্যে আছেন, —ডার্জিলিংএ কোনো মতেই যেতে পারেন না। এ অবস্থায় তাঁর স্নায়বিক বিকার যেন বাড়ছে বোধ।

এমন পরিপূর্ণ এবং বিচিত্র জীবন ছিল এই পুরন্দর ভারতীবুরীর। এখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর—এরই মধ্যে প্রৌঢ়ত্ব এসে গেছে। আগে তিনি ছিলেন মুরশন, দু-আলাদী। পাওনা লাভুনাএক্ষিত্রেও নিজের নাম কামুকভাবে অক্ষরূপে এখন তাঁর বুকে একটা নাম-হীন ব্যথা এবং অনির্দিষ্ট অতৃপ্তি। তাঁর দার্শনিকতা নেই, কোন কিছুর ওপরেই আস্থা ছিল না তাঁর। একটা 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার সবসময়ই তাঁর মন আকুল করে রাখে। তিনি সেই সব ধারণাকেই 'আধ্যাত্মিক' বলেন—যা কিছুতেই ছেলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইদানীং এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। যাকে তিনি যা ভাবেন, যা সত্য বলে অনুভব করেন, সকালে ঠিক তা ভাবতে পারেন না, সকালে তা সত্য বলে মানার করতে দ্বিধা হয়। ক্রমশঃ যাকে যা ঘটছে। দিনেও তা ঘটতে আরম্ভ করলো। যেসব ঘটনা অতীতের গহ্বরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনি সে-সব আবার প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন। তাঁর আত্মজ্ঞানিতে তিনি নিজেই যেন ছেলে উঠতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধেবেলা। প্রচণ্ড গরম। অপেরেশনের ব্যবস্থা দেখার এবং টাকা বিষয়ক্ষয়ে সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। ঠিক করেছেন সন্ধ্যাবেলা তাঁর বান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করবেন। হোটেলে চুকে খেয়ে বসে ডিনারিক মেজাজের মধ্যেই হঠাৎ মনে হোলো তাঁর অবসাদের কারণ সেই বেঁটে লোকটা। দিন পনের আগে মেসেজ স্ট্রীট, হারিসন রোডের চৌমাথার সেই লোকটার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। পর পর পাঁচবার দেখা হোলো সেদিন থেকে এই কয়েক দিনের মধ্যে। একবার তো বাস্তার পুরন্দরবাবু চীৎকার করে তাকে ডেকেই ফেলে-ছিলেন। বেঁটে লোকটা চকচকিয়ে একবার তাকিয়েছিল একটু। পরমুহূর্তে দিয়া ভাব একটু দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটা দেয়। তারপর এই বার সাক্ষাৎ।

ঘড়ি ঘড়ি ঘুরিয়ে হঠাৎ হাতঘড়ি দেখে জেগে উঠলেন পুরন্দরবাবু। নিজের অতীতের স্মৃতিতার তাঁর বুকে। মনে হয় সত্যই রাতে যেন ঘরে এলো সেই বেঁটে লোকটা—মুরল পালিত।

ক-বছর আগে আলাপ হয়েছিল

নতুন জীবনের
নতুন প্রয়োজন।

নতুন জীবনেরধাত্রী যেটাতে নবজাতকের জন্মদাতে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্বনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইটো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, রক্তস্বল্পতায় সাহায্য করে এবং ক্লান্ত স্নায়ু ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

যেন ইন্ডিয়ার তৈরী

ভাইটো-মল্ট

বর্ধমানে। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল যে, তার স্ত্রী অপর্ণা মারা গেছে। পুরন্দর চমকে ওঠেন। অপর্ণাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। তার গর্ভে পুরন্দরের একটি সন্তান হয়। পুরন্দরবাবুর ধারণা অপর্ণার স্বামী মুরল এসব জানতো না।

মুরলু এলেছে তার মেয়ে পার্লিয়াকে নিয়ে। পুরন্দরবাবু মুরলকে ফলা করেন। অপর্ণাকে খুব ভালোবাসতেন—কিন্তু অপর্ণা তাকে একটি বছর খানিক খুব ভালোবেসেছিল, তারপরে সন্তান-সম্ভাবনার সবেই সে তাঁকে ছেড়ে করে বুকিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে নতুন এক পুলিশ অফিসারের কাছে আত্মদান করে।

মুরলের কাছ থেকে পার্লিয়াকে উদ্ধার করে পুরন্দরবাবু তাকে রেখে আসেন তাঁর ভূতপূর্ব প্রণয়িনী—বর্তমানে ভূবেনবাবুর পত্নী নীলিমা দেবীর যাদবপুরের বাড়িতে। পুরন্দরবাবু তাঁর সেই বর্ধমানের ব্যাপারটি ভূবেনবাবুকে কিছুই বলেন নি। নীলিমা দেবীকে সবই বলেছিলেন। নীলিমা পার্লিয়ার পরিচয় পেয়ে মহেছে কাছে টেনে নেন। তবু পার্লিয়া মারা যায়।

মুরল পার্লিয়ার এলো না। মদ আর মেয়ে নিয়ে মেতে রইলো সে। ভূবেনবাবুর কাছে পাঁচশ টাকার চেক পাঠিয়ে দিল মেয়েটার জন্যে। পুরন্দরবাবুকে মুরল পার্লিয়া প্রথম দিনেই বলেছিল যে, পূর্ণ গাঙ্গুলির সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। পূর্ণ গাঙ্গুলি দারুণ অসুখে মারা যান।

এই পূর্ণ গাঙ্গুলিও ছিলেন অপর্ণার অন্যতম প্রণয়ী। মুরল পার্লিয়া মদ খেয়ে পুরন্দর বাবুকেও মদ খেতে বাধ্য করে। অপর্ণার মৃত্যু হয় মদ্যপানে। তার মৃত্যুর পরে তার সমস্ত প্রেমপত্র পাওয়া যায়।

একদিন মুরল পুরন্দরবাবুকে এক রকম জোর করেই বিষ্ণুবাবুর বাড়ি নিয়ে যায়। সে বিষ্ণুবাবুর মেয়ে পারুলকে বিয়ে করতে চায়। তার জন্যে তিনশ টাকার এক ডেসলেট নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু উপহার প্রত্যাখ্যাত হোলো। পারুলের পাণিপ্রার্থী দিলীপ চাকলাদার পুরন্দরবাবুর বাড়িতে এসে মুরলকে ধমক দিয়ে গেল। দিলীপ চাকলাদার চলে যাবার পরে নিজামের অজুহাতে পুরন্দরবাবু ষ্টেটকট করতে থাকেন। তাতে মুরল পার্লিয়া তাঁকে সেবার জন্যেই থেকে যায় বটে, কিন্তু পুরন্দরবাবুর মুরল অবহারণাকে ক্ষমা দিতে খুন করতে শুরু। পুরন্দরবাবু তাঁর আত্মার আধ্যাত্মিক বন্ধুর সঙ্গে, সে আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন, মুরলকে বেঁধে রাখলেন; মিতে আহত হলেন। পরদিন সকালে মুরলকে ছিঁড়ি তাকিয়ে দিলেন। পুরন্দর বুঝলেন, মুরল একটা উন্মাদজনক পিশাচ মাত্র—প্রকৃতির তার যা নয়, সবই—সে খুন করতে উদ্যত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানতো না যে, খুন করবে। পুরন্দর পরিজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছেন, তখন পথে দিলীপ চাকলাদারের সঙ্গে দেখা হয়। দিলীপ চাকলাদার বলে যে, মুরল বিষ্ণুবাবুর কাছে পুরন্দরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে, মদ খেতে খেতে বেঁচে উঠে চলে গেছে। দিলীপের হাত দিয়ে পুরন্দরের কাছে সে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। খাম খুলে চোখে পড়লো অপর্ণার চিঠি। এ চিঠিতে সে বিষয় চেয়েছে। লিখেছে যে আর একজনকে সে ভালোবেসেছে—সে সন্তানসম্ভবা.—এবং—'যদি বলেন আপনার সন্তানকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারি—হাজার হোক আপনারও একটা কর্তব্য আছে তো।'

মুরলের পরে ষোলসন্ধ্যা ইস্টবেলে মেয়ে মুরল পার্লিয়ের সঙ্গে দেখা করেছিল। সে তার নতুন স্ত্রী 'লিলু' এবং মুরলসর্দের বেকার, মদন তাই বীরেনবাবুকে নিয়ে চলিয়াবার যাচ্ছে। পুরন্দরকে লিলু চলিয়াবারে যেতে বলে। 'মুরল বললে, যাবেন না'।

পুরন্দর-মুরল-অপর্ণা ত্রিভুজের গভীর কুয়াশা ব্যাপি তিনি যে বিশ্লেষণ পাঠিয়েছেন তা পেলে লিখতেন না, তা নয়। ভূবোদর্শী বন্ধুকুলের নিজস্ব খেয়ালের জন্যে এই রকমই। অনেক রকম প্রশ্নের পাথারে ডুবে থাকতে চান তিনি। মানুষের ভেতরকার সামাজিক মানুষের গভীরে যে অসামাজিক মন তার আদিম রূপটি বিদ্যমান, 'বনফুল' সেই মনের কারিগর। তাঁর ক খ গ জ্যামিতিক গল্পের ক ও খ ছিল অতিরঞ্জনের বস্তু: ক বহুতাত্ত্বিক, খ জাবতাত্ত্বিক, গ জোড়পাঁ, 'ক'-এর একমাত্র মানুষটিকে বলা। ক, খ, গ—পিতা, পিতৃব্য আর বলা। খ-কে গ-এর সঙ্গে কলকাতে প্রণয়রত দেখে ক বাইরে থেকে চলমান ভালো লাগিয়ে বেরিয়ে যায়, ঘণ্টাখানেক পরে একেবারে পুরন্দর সঙ্গে নিয়ে এসে বলে—আর পালা নিয়ে এস'। খ রাজি হয়ে যায়।

এই ধরনের নাটকের নাট্যভাষ 'বনফুল'। তাই, 'নবকলেবর' তাঁর নিজেরই ভূয়োদর্শনের উদাহরণ।

'লক্ষ্মীর আগমন'-এর মতন অন্য লেখকের গল্পেও নিয়তি ভাকারের প্রবল ভাবিকীর আভাস রয়েছে। আমার সেই শিকারিদের আবহাওয়ার জোৎস্না রাতের উল্লাসও যেমন আছে, বাঘ শিকারের কালে কোয়াটার খিচুড়ী লিখবার, এ ধরনও আছে।

তাঁর 'ডানা' যেমোর 'লক্ষ্মীর আগমন'-এর পাঁচ-ছ বছর আগে। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে নানা বই পড়তে দেন। তাঁরসন্তানী 'বনফুল' সে সব বই পড়েছেন। তারপর 'ডানার' পরিকল্পনা জানিয়েছেন বইয়েরবন্ধুকে—

'স্বাধি এবং বৈজ্ঞানিক বৌঝাবেকের পরিচয় করতে। সঙ্গে আছেন বন্ধু রূপচাঁদ মৌলিক। রূপচাঁদ ভাবুক নয়, বৈজ্ঞানিকও নয়, অথচ উভয় জগতেই প্রতিবাধ আছে তাঁহার। উভয় জগতেই রূপ রস গন্ধ তাঁকে আকুল করে। কিন্তু মায়া হারিয়ে ফেলেনয়া তিনি কখনও। বিদগ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু ভালবোধ আছে।'

'বনফুল' নিজেও সেইরকম ভালবোধসম্পন্ন শিল্পী। লেখক হিসেবে, বাস্তব জগতের আধুনিক সমস্যাগুলি সমস্যাই তিনি তাঁর নিজের ভালের লক্ষ্য বলে ভাবতে নারাজ মন। গল্পের পাথারে তিনি মেয়ার ডুব দিয়েছেন। শিল্পের বৈচিত্র্যে তিনি গভীর উৎসাহী। বিজ্ঞানে দর্শনে তাঁর প্রবল আগ্রহ। সংসারের 'ভাল-বোধের গুরুত্ব তিনি একটু জোর দিয়েই লেখায় ভালবাসেন। কিন্তু কল্পনার লীলা-বিলাসেও তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। আশ্চর্য সব গল্পের শিল্পী তিনি—আশ্চর্য সব অনুভূতির জনক। 'ডানার' প্রথম পরিচ্ছেদের নিস্তব্ধ সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে—সর্বাঙ্গসুন্দর পোড়ো বাড়িটাতে ডানা বিজ্ঞানীর ঘুম ভেঙে ওঠে অতি ক্ষীণ দুরাগত চাঁদসওয়াল শুনতে শুনতে নিজের অতীতের কথা চিন্তা করে। দূরে বন্দুকের শব্দ শুনে মনে পড়ে বর্ষা থেকে বেরোবার পরে আলোর জঙ্গলে তাঁর যাত্রা, সন্ধ্যা

আর ছোটো দল ভাইটি দাদা খুশি। নিজের অসহায় অবস্থাটা ভেবে দেখবার ফুরসৎ পায় না সে।

অনেকগুলো টুসি মেরে নিয়ে, লাটাই কবি এবং বৈজ্ঞানিক ইনস [illegible] সর্বাঙ্গবাদের সেই বাড়িতে এসে, তাদের শিষ্ট আহ্বানেই যাঁদের শুরু বেন, চা খান। যাঁদের চাক সম্বন্ধে কি আর বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কথা' ছিল। কবি বললেন, কালিদাস লেছেন, 'ভামকল্পসবতম্'...ইত্যাদি। মা বলে চক্রবাকের অন্ধ নাম ছিলনাথ। তারপর এল কালিদাসের বিদ্যা আবৃত্তি করে। কবি এবং জানিক দুজনেই অবাক হন,—রূপচাঁদ কে ওঠেন। কবি সেই রাত্রেই কবিতা লিখলেন—

জনা জলে আর না কেনো
নাচিক গাঁও পরিধি তার
বাষ্পযানস লোচনও তারাতে
ধরা পড়ে যায় বারংবার।

তারপর চঠাৎ মধুর কণ্ঠে গান র উঠল কে যেন. অন্ধকারের ভিতর ক। সংস্কৃত গান—'তানামি ধর্ম নত প্রবৃত্তি।' পাঁচকড়ি বুক্তি গিয়ে র ঘরের আউট-হাউস থেকে কটিকে নিয়ে এল। সংগ্রামপুর থেকে ভিখিরী বাউল কেটে এসেছেন তিনি। সন্ন্যাসী।

'মহাযানী' বোমাঞ্চে 'বনফুলের' এই অনুনাই আমুল চড়া সমাদোহের ওপর সষ্টি করেছে। কিন্তু 'বনফুল' কেবলমাত্র সমাদোহবিলাসী শিল্পী নন। তিনি একজন জীবনসন্ধানী সাহিত্যিক, এবং তাঁর জীবিকা না হোক, বিচিত্র বৃত্তি চিকিৎসকসূত্রে। ডাক্তারের মন তাঁর জীবনকে বদখাত করেনি, বরং সেই জীবনই ডাক্তারের চোখ দিয়ে মানুষের মনোরহস্য দেখবার চেষ্টা করেছে। জীবনের সব গন্ধ, স্পর্শ, ক্ষুধা খাদ্য তিনি সুমান আগ্রহে দেখতে চান, দেখতে পানও। 'লক্ষা লঙ্কায়,' 'ক্ষেপচুরিবাস' এর মতন গল্পেও তাঁর আপত্তি নেই—কিংকু, রসনদা, ভয়ঙ্করাজ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে খুবই সংক্ষেপে—অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশদভাবে আয়োজনে নতুন ভালের সুখান ঘটনাতেও তাঁর আলস্য নেই। 'বিদ্যাসাগর' ও 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে তিনি যেমন দেশের উনিশ শতকের ইতিহাসের রূপ দেখিয়েছেন, সপ্তর্ষির ভূমিকায় তেমনি লিখেছেন—এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত, জীবন্ত বলে দেবার জন্য সমসাময়িক ইতিহাসের পরিবেশ সাহায্যে করেছে। এদের মুখ দিয়ে যে সব নৈতিক বা রাজনৈতিক মন্তব্য বা [illegible] হয়েছে তাও এদের নিজের, আমার নয়। সমসাময়িক ইতিহাস প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সে সবের যাথার্থ্য যাচাই করবার যোগ্যতা আমার নেই, প্রয়োজনও বোধ করিনি।...'

এই স্বীকারোক্তিও তাঁর আত্মবোধের উদাহরণ। ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি, এসবের কোনো কিছু নিয়ে ভাল চৌকা তাঁর স্বভাব নয়। তিনি সংকোচহীন ভাবুক,—এবং গল্পে, প্রবন্ধে, গল্পে গল্পে বেশবোধ্য পরীক্ষানিষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর 'ভুবন সোম', 'চাষে ভাতারে', 'দুই পাখিক', 'কষ্টিপাথর,' 'পঞ্চপর্ব', 'অচীশ্বর' ইত্যাদি আরো অনেক রচনার কথা মনে পড়ে। কিন্তু, আরো কথা দরকার সেজন্যে। এপ্রবন্ধে লেখক হিসাবে তাঁর প্রকৃতি পরিচয় দেওয়া গেল। 'বনফুল' যে আমাদের সমকালের বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উজ্জ্বল এক সত্তা, সে বিষয়ে মতান্তর অবান্তর। তাঁর জীবনদৃষ্টির বিশেষত্বের কথা ভাবতে গেলে 'অঙ্গার' প্রথম পর্বে শরতের কথা মনে পড়ে। 'বনফুল' সেখানে বলেছেন—'তাহার মনের মধ্যে একটা মুগ্ধ পশু, একটা মুগ্ধ কবি এবং একটা আর্ত প্রেমিক পাশাপাশি বসিয়া ভিন্নরকম চিন্তা করিতে লাগিল।'

ক্লান্তি

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অপরাহ্নের শেষ কয়েকটা মুহূর্তে ধূলোমাখা বড় বড় গাছের কাছাকাছি কলধ্বনি কোলের বড় ঈষৎ সবুজ মনে হচ্ছিল। আরও দূর থেকে অনেকবার কাকের কর্কশ ডাক ছোট মাঠ পেরিয়ে এখানে ভেসে আসছিল।

একটু আগে ডাক্তার মুখার্জি আঁতুরঘরে আসতে চলে গেছেন। ঘরে অনেক লোক ছিল। শ্রীলতা মা-র মাথার কাছে বসে কান্না চাপবার খুব চেষ্টা করছিল। একেবারে ঘুমিয়ে যাবার আগে আর একবার চোখ খুলল কাঁপিকা। তার ঠোঁট কাঁপল। সে কথা বলতে চাইল। কাঁপিকা বোধহয় শুভেশকেই খুঁজল।

ঘরে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছিল শুভেশের। যারা কাঁপিকার আশেপাশে ছিল তারা শুভেশের সঙ্গে চাপাস্বরে কিস কিস করে কথা বলছিল। উপদেশ দিচ্ছিল। বলছিল, এখন আরও বড় ডাক্তার আনা দরকার।

এইসব শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল শুভেশ। হঠাৎ কলধ্বনি কোল হারিয়ে গেল। কাকের ডাক থেমে গেল। যে প্রেসক্রিপশনটা শুভেশের হাতে ছিল তা খসখস করে উঠল। আর এখন সে কি করবে ঠিক করবার আগেই ঘরের মধ্যে থেকে শ্রীলতা খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা!"

শুভেশের খুব ভয় লাগল। একটা তাতা লোভ তার বুক ঠেলে গলার কাছে আসছিল। শ্রীলতার চিৎকার শুনে শুভেশের হাত-পা সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেল। তার ঘরে ঢোকবার সাহস হল না। সে বুঝতে পেরেছিল—সব শেষ হয়ে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব মিথ্যের পাত্রার ফাঁক দিয়ে ফাঁকা চোখে শুভেশ তখন গোল আয়নার মতো খুব সাদা আকাশ দেখছিল।

আরও অনেক লোক আসছিল। অন্ধকারের দেখি থাকলেও ঘরের আলো জ্বেলে দেয়া হয়েছিল। এখানে দাঁড়িয়ে শুভেশের নাকে ধূপের মিষ্টি গন্ধ লাগছিল। আর সব ইন্দ্রিয় হঠাৎ খুব সজাগ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাহলেও এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখল শুভেশ আর তার মন সেখানেও উথলে উঠছিল।

তারও আগে আর একদিন আকাশের আলো ঘরের মধ্যে ঠিকরে পড়েছিল। সেদিন আকাশ অবশ্য এই মাখামাখি ওভেশের। সব বন্ধ ছিল এক শ্রীলতা জানলার কাছ দিয়ে রহস্যময় আলোর ঢেলা ঘরের মধ্যে আসছিল সেই আলোয় সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সেদিন শুভেশ আকাশের রহস্যময় আলোয় কাঁপিকাকে দেখছিল।

ক্লান্তির আবেশে কাঁপিকার চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ভিড় লোকের মাঝখানে হঠাৎ সে ঘরের ভিতর দিয়ে কথা বলছিল, "এত পরিশ্রম সহ্য হবে না— আমি বলে দিলাম এবার একটু বিশ্রাম কর।"

"না।"

"কী না?"

"অনেক বিশ্রাম করেছি। আর না।"

"চাকরি তো করছ।"

"ভাল লাগে না। আরও কত কিছুই তো করতে চেয়েছিলাম—" নিজের অতীতকে শুভেশের তখন অনেক দূরের মনে হয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বাস্তবের মতন সে নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

"কী করতে চেয়েছিলে?"

"রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প—সব। কিছুই হল না।"

"হলই তো।"

শুভেশ বলল, "ব্যবসার অর্ধেকটা পাকাপাকি হয়ে গেছে। পরশু থেকে বাড়ি ফিরতে আমার অনেক রাত হবে।"

"কী দরকার ছিল এ সবের মধ্যে যাবার। যখন তখন যেখানে সেখানে যা-তা খাবে। শরীরের আর কিছুই থাকবে না।"

শুভেশ হাসল, "টাকার দরকার নেই।"

"না।"

"টাকার অনেক দরকার কাঁপিকা।"

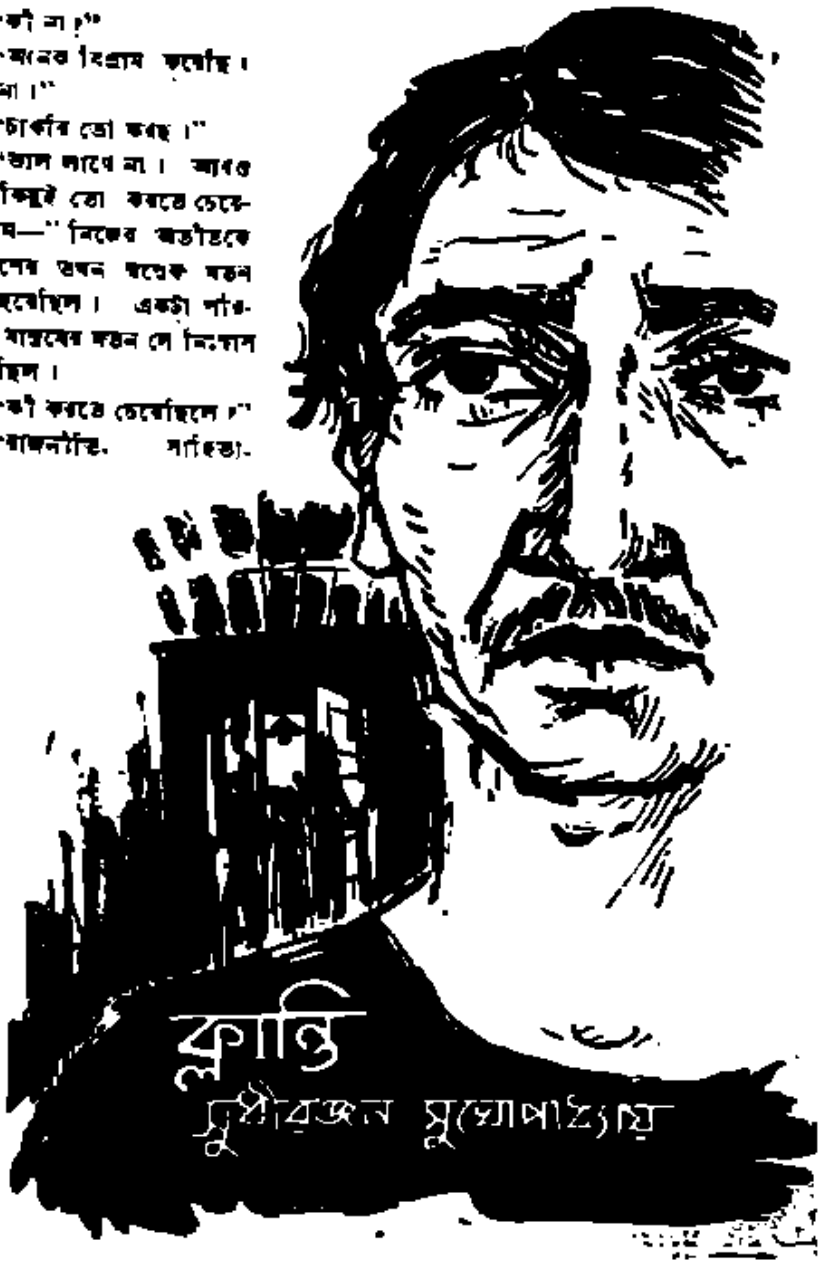

"তোমার দরকার নেই," জীবন্ত মড়ার আসন পরীক্ষা করতে করতে বলেছিল: "তুমি তিন ঘণ্টা বাইরে বাইরে ঘুরে চাষিদের পরীক্ষা করবে আর আমি ঘরে বসে আরাম করব—তা হয় না। আমি সাথে যাব।"

খুব জোরে সাথের সঙ্গ চাইল। মড়ার মতো ফ্যাকাশে আলোয় বেশ চমকও লাগছিল। সেই আলোয় চাঁদকাকে দেখতে দেখতে ভাজন খেয়ে খাবে বলল, "আমাদের প্রাণ বড় সংখ্যাতিক। আমি তা সহ্য করতে পারব না। আমাকে আপনি অনেক বাঁশ ঝাড় করতে হবে—হবেই!"

আর একদিন আরও বড় আকাশ বসেছিল ওরা। তালকৌদী জোয়ারে ঢেউ আবার আগে চৈত্রের সন্ধ্যা বয়েস অনেকগুলি চাঁদাছিল। বাড় মানুষের অবহেলা সহ্য করেও ছোট বড় ডিঙ্গিগুলো নিজ নিজ সাথের সঙ্গ ধরেছিল। তখন হঠাৎ একটা অদ্ভুত চাঁদিতে ওভেনের নিজেরই বুক জমে গেছিল।

সে খুব আস্তে আস্তে চাঁদাছিল। বড় ডিঙ্গার খরচা যেমন করে চাঁদে ঠিক তেমন করে। তার কোন বাঁধা ছিল না। লক্ষ্য ছিল না। সঙ্গীদের চাঁদে চাঁদে ডিঙ্গি নিয়ে একটা ঝড়ের মতো সে বাঁধ ভেঙ্গে বার করে প্রস্তুত চাঁদাছিল।

আরও আস্তে চাঁদিল ওভেন। তার নিজস্ব কয়েকটা মুহূর্ত এভা এভা ভ্রুত করবার জন্যে জোর করে একবার বড়ো ছোট গাছের ডালায় চাঁড়াল। মন উৎকট আবেগের জন্য শুধু মনে হল, লাগাও কিছু নেই। চারপাশ কী নূরন্ত হয়ে গেছে! ওটা নাকি পরিবর্তন—এসবের মানে অর্থই তার কাছে আর নেই। ওটা তারী নিশ্বাসের সঙ্গের জন্যে কেন পাই করে মুখল, এখন তার সঙ্গীরই দু'নড়ে। আর আর কোন নাড়া লাগে না।

তালকৌদী জোয়ারে গায়ের জলায় ছাপ চাঁড়িয়ে থাকল ওভেন। বাঁশ ঘটাতে দু-হাত দিয়ে সে খুব জোরে জলায় নাড়া দিতে চাইল। দু-একটা ডাল মরে পড়ুক!

অনেক আগে চাঁদা ডালার জলায় চাঁড়ায় বাড়ি-বেশম বাজনা বাজিয়ে কানের তালি বাজিয়ে ডাকাতরা ডাকাত সে-ও তেমন থেকে টেনে টেনে ডাকাত জলায় দু খেলবার চেষ্টা করল।

তখন আরও অনেক পরিচিত ওভেন। তার কাছে জীবন্ত শ্রীলতা—তার সোটা সংসার নিয়ে অনে চাঁদাছিল। নিজের একটা মড়ে ধরা দেবার জন্যে যেন তার চাঁদার নিচ্ছে একটা বড়ের মতন ছিলে ছিলে আর আর অনে একেবারে শেষ মরে দিচ্ছিল।

পরক্ষণেই নিজে চাঁদাল, এখান থেকে সেই সেই পুরনো নিজেই সে বাঁচ যাবে। তোকজার মতো জীবন্ত মড় আজকাল জমা হয়ে আছে, একে-একে সব ডুববে। চাঁদদের কক্ষপথের নিজের ভয়ে ভয়ে তার মাথা নিশ্চিন্ত করবে। চাঁদকে সঙ্গীর আসবে—আরও ভারবে। পরদিন জোরে আসার আকাশে সেই এক প্রশ্ন মুখ চাঁদবে।

তালকৌদী জোয়ারে আস্তে আস্তে ঘরে নদী নিজেল চুবে আঁচল আর চৈত্রমাস ঘ-ও ঘরে অনেক ঘুলো চাঁড়বে চাঁদাছিল তখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হল ওভেনের। তার যৌবন যেমন সবদের আরও আগেই শান্ত হয়ে নিয়েছিল তেমন—বসন্তের যাবার খুব নিচু তালে একটা হাত রেখে ওভেন আর একবার নূরন্ত হয়ে ভাবল, তার জীবনে কোন বাঁধ নেই। জোড়ি নেই। প্রেম ভালবাসা ভাল-লাগা তেমন কোন অনুভূতিও নেই।

আরও মনে হল ওভেনের—যৌবনের প্রথম প্রথম একটা অসম্ভবের ভাবনা তার মনের মধ্যে যে আবছালোক গড়ে করত—তা একেবারে নিচে গেছে। শুধু সংসার আর অভিজ্ঞতা—দুটোতেই এক খাঁচা থেকে আর এক খাঁচায় যাবার ছাড়া ওভেনের জীবনে আর কোন কর্ম নেই।

চোখ দুটো খোলাই ছিল ওভেনের। সে ঘুরে-ঘুরে তাকিয়েও দেখছিল। কিন্তু তার চোখের যেন দৃষ্টি ছিল না। সব আলাদা মনে হচ্ছিল। শেষ বিকেলের চাদা আলোয় যেন মোহার মোহার চারপাশ আরও নরম হয়ে গিয়েছিল। আর এক পা চাঁটলেই সে জলায় নেমে পড়বে।

চৈত্রমাসের সন্ধ্যা আলোয় বাঁশ গাছের আগে চাঁড়িয়ে মৌন ওভেনের নিজেকে খুব একা একা লাগছিল মৌন ওর অতীত জীবনের স্মৃতিগুলো যেন খুব ভারী হয়ে গিয়েছিল। ওভেনের জীবন নিজের ওপর তার আর এক মুহূর্তের ওভেনের মতন আরও একজন ওভেনকে দেখতে পেল।

ওভেন তার মুহূর্তে আবার ফিরে চাঁড়াল।

জীবন্তার নদী নিজে মেয়ের কথা খুব ঘনে ঘনে শ্রীলতা ভাবছিল। আর বাড়ালদের ঘর নিজের সংসার পাঁক নিয়ে আপনা ঘোরে ঘোর আসবার ঘরে। আকাশ দেখতে দেখতে ওভেন একটা সাথের মুহূর্তে ঘরে নিয়ে ঘরে চাঁড়াছিল। শ্রীলতা হঠাৎ এক সময় খুব থেকে মুখোমুখি দেখল। জীবন্তার মুখের ওপর থেকে খুব তুলে সে আর একবার আবার জোরে ডেকে উঠল, "বাবা!" কিন্তু তখনও ঘরে এল না ওভেন। তাড়া তাড়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে একটা অচেনা মানুষের মতন শ্রীলতার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার চেহারা দেখে জীবন্তার মেয়ের সাথে বসেই শ্রীলতা আরও অনেক বোশ আদুর ঘরে উঠল। এক-একবার সব মানুষের ভিড় ঠেলে সে তার কাছে নিয়ে চাঁড়াবার চাইছিল।

ওভেনকে দেখতে দেখতে শ্রীলতার মনে হচ্ছিল যে লোকের এই আচার সে সহ্য করতে পারবে না। এখুনি হয়তো তার অবচেতন মন ঘাটিতে আছড়ে পড়বে। যেমন সে তাকে ও পথার মুহূর্তে আঘাত ছাড়া আরও একটা মজা ওভেনকে সাথের মুহূর্তে ঘরে নিয়ে দেখেছিল।

শ্রীলতা এখান থেকে ওভেনকে দেখতে দেখতে বুঝতে পারছিল সোম আর মজা—এই দুই অনুভূতির উত্তেজনা কী প্রাণপণ চেষ্টায় সজ্ঞানের আড়ালে চাঁড়িয়ে সে তখন ঘরে রাখছে।

তখন তার নজে নজে নিজের অবস্থার শ্রীলতাকে আরও আতঙ্কিত করে তুলছিল। আরও অসহায় করে তুলছিল।

একদিন আয়নার সামনে চাঁড়িয়ে একটি সোম সময় নিজেকে শ্রীলতা। নিজেকে আপনজন দেখাচ্ছিল। নিজের থেকেও আপনার দৃষ্টিতে জীবন্তার জন্যে মমতা করছিল। একটু পরে একটা ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীলতা মুখ ফেরাল। পর মুহূর্তে নিজে ওভেনের গালে জীবন্তা সোজার চাকাচ্ছিল।

শ্রীলতা জিজ্ঞেস করল, "খাওয়ার কী করেছ মা?"

শান্তু বলে:

"চোখে এত খারাপ দেখাচ্ছে? অই-টুকু বাবা তো!"

না যে". কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, "তোমার বেরোনো?"

শ্রীনন্দা মুখে টিপ্পনি কাটল, "তোমার কিন্তু মাঝে মাঝে ভীমরতি হয়। সকালবেলা কলসীর বদলে কি আজ মানুষকে জিরেটাই আনছ?"

তাপসী খুব অপ্রস্তুত হল, "তোমায় আমাকে আসতে বলেছিল?"

"আবার কেন আসি নাই যে মনে?" তাপসী ভয়ে চুপ করে রইল। তারপর আমার সাড়ি বোতাম টিপতে টিপতে মুখ নামিয়ে বলল, "আমায় আর মেরে ফেলো না তুমি। আমায় আর অনেক কিছু করতে হবে।"

"যেমন যা?"

"তখন আমি আর থাকব না।"

"তোমার যাবে?"

তাপসী হেসে ফেলল, "তুমি ভেতরে আসবে—"

শ্রীনন্দা খুব জোরে বলল, "তোমার আজকাল কী হয়েছে বলো তো? সারাদিন শুধু শ্রীনন্দা যাবে কথা বলো। কথা এলেই আমি আমি নয় বলে কেন?"

তাপসীর গ্রীবা ভঙ্গিতে আর একটু নত হয়ে পড়ল। সে ভাঙ্গা গলায় বলল, "তোমার কথা মনে আসে।" তারপরে সাড়ি সরিয়ে ভেতরে ঢুকল তাপসী। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হলে আলমারির কাছে গিয়ে বলল, "কখন যেতে হবে?"

"সাড়ে দশটা সোয়া দশটা নাগাদ। এখনও অনেক সময় আছে।"

আবার নিস্তব্ধ চুপ করে রইল তাপসী। শ্রীনন্দার দু হাতের মধ্যে ঘিরে বসে আসছিল। সাড়ির ঘষা লেগে ত্বক জ্বালা করছিল। তাকে ফেলে ফেলে তাপসী অস্ফুটস্বরে বলল, "আচ্ছা, তুমি বেরোবার সময় আমায় ডেকে তুলে দিয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে আমার কাইকে দিয়ে যাবে না।"

কলসের ভেতর একটি টিপ ফেলেছিল শ্রীনন্দা। তাপসীর কথা শুনে তার হাত স্তব্ধ হয়ে গেল। একবার সাদা চোখে সে মানুষ মুখের দিকেও তাকাল। তাপসীর মুখটি তখন খুব কঠিন আর গম্ভীর শ্রীনন্দার। কাকাতে, তার-আত্মা—এরা সবাই আসে-আসে মানুষের চোখে মেলে এই টিপ ফেলেন।

"আমায় কথা ভাবছিস?"

"হুঁ"।

তাপসী চোখে আবার আলো, কলসের ভেতরে সমস্ত মনে তাপসী দিয়ে বলল—

শ্রীনন্দা তখন আর কোনো কথা বলতে পারল না।"

"এ যে।"

তাপসীর কথা শ্রীনন্দার বিশ্বাস হয়নি। সে যা-র কাছে মনে হল। তাপসীর চোখ থেকে তখন সব ঠিক মনে হয়ে গেল শ্রীনন্দার। শ্রীনন্দার খুব ভালো লাগল। যা-র সামনে দাঁড়িয়েছিল সে অন্যরকম। তার মনের সম্পর্ক নয়। তাকে তাপসী ভালবাসে বলে শ্রীনন্দার আজকে খুব ভয় হল যে তাপসীর তাকে বেশী প্রেম করে ফেলতে পারে।

সেজন্য তাপসীকে শ্রীনন্দা কিছু বলল, কি—বলতে পারে কি। কিন্তু একটা কথা এখন তাপসীর নিজের চোখের কাছে খুব খারাপ করতে শ্রীনন্দার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে তাকেও তাকে ভুল বোঝা কি নিজের একটা বিশ্বাস নিজের জন্যে তাপসী আসল মনে করেছিল। আজ সেখানেই তার বিশ্বাসের অবোধ্য। সে-জন্যেই সীমা অতিক্রম করে সে বাইরে আসতে আসতে পারে কি। মনে মনে শ্রীনন্দা খুব ভালোছিল

আর একটিন নিজের নিজের বাড়ি ফিরে এসেছিল তাপসী। তাপসীর মনের ছুটে নিজেদের টাকাটি নিয়ে বলেছিল, "তুমি আর দেরী করো না—খুব ভাল হবে।"

"তুমি যাবে না?" টাকা ছুটো দেখতে দেখতে উজ্জ্বল চোখে তাপসী জিজ্ঞেস করল।

"না, সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরেছি—খুব ক্লান্ত। তোমরা চলে যেলে আমি একটু বাঁচব যেন।"

তাপসী বলল, "তাই-তাই যেখানে আমার ভাল লাগে না। তুমি আর দেরী করো—"

শ্রীনন্দা আর একবার বলল, "আমি যাব না বলেই তো ছুটো টাকা আনালাম। তোমরা যাও—ঘুরে এসো।"

তাপসী চৌধুরীর কাছ টাকা ছুটো দেখে আরো বলল "না যাব, তোমরাই যাও।"

"তুমি যাবে না কেন?"

তাপসী খুব আস্তে মাথা নেড়ে বলল, "না।"

বিরক্ত হয়ে শ্রীনন্দা টাকাগুলো কাছে রেখে দিয়ে বলল, "তাপসী, তোমার কি হয়েছে বলো তো? তুমি এত ছেলেমানুষ করছ কেন?"

"আমার ভাল লাগছে না।"

"ভাল লাগছে না বলে কিছুই করবে না? একটিন তোমার একটার জন্যে আমাকে এত বিপদে ফেলে দিলে কী করে তোমার?"

তাপসী বলল, "বিপদে কার না হয়?"

"যাও", একটা অসহায়তার অনুভবের সঙ্গে একলোমেলো না ফেলে তাপসীর কাছে চৌধুরে গেল শ্রীনন্দা।

তাপসী নড়ল না। তার চোখ ভারী হয়ে আসছিল। শরীর ধরে ধরে আসছিল। শ্রীনন্দা ধরে মনে মনে তাপসীর কাছের একটা মানে খোঁজবার চেষ্টা করে সে বার্থ হচ্ছিল।

"না" মাটির ওপরের দিকে ঝোলা টাকা ছুটো দেখতে দেখতে শ্রীনন্দা বলল, "তুমি কেন যেতে না?"

তাপসী বলল, "আমার খুশি! তোর টাকা নিয়ে আমাকে পাঠাতে তোমার কি?"

"না, এখন তখনকে ফেলেছিলেন না। আমরা চলে যেলেই পারবে—"

তাপসী তার নিজের কথার কথা শুনল। আমার সঙ্গে তোমার আর তোমাদিনের সময় হয় না।"

শ্রীনন্দা যা-র নিয়ে আসবার জন্যে তেড়া করে বলল, "আমরা তো আসবার আর তোমার আমার সময় নাই। কি যে তার—এর মধ্যে এত ভাব হয়ে গেল?"

"চুপ চুপ কর। আমি সব জানি।"

এমন কথা করে দাঁড়াল শ্রীনন্দা। যা-র মানে তাপসী করেছিল। আর সারাদিন তাপসী করতে পারছিল না। খুব আস্তে তাপসীর যে ভুল সে নিয়ে তখন করে নিয়ে এসেছিল সেই ভাবনা ভীষণ আবার হয়ে নিয়ে আসছে পুরানো পুরু পুরু অন্ধকারে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিল।

তাপসীর নিস্তব্ধ তো, শ্রীনন্দার কাছ, একবার তাপসী তাকে তো সোফের এই চরম মুহূর্তে মানুষ করে। তাপসী একটা নিজের আরাম খুঁজছিল।

কিন্তু মুহূর্তে নিজের আরামের জন্যে

আর কিছু ছিল না। শুভেশ চুপে দাঁড়িয়ে। শ্রীলতার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপনার আর এক মুহূর্তের কথা আর মনে হচ্ছিল।

"এত দেরি করলে?" একটু ধৈর্য দোষে কাঁপনা জিজ্ঞেস করেছিল। তার কৌতূহলে তার চোখ দুটো বড় বড় করছিল। আসলে মুখ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

শুভেশ তা লক্ষ্য করল না। শেষ বিকেলে ডালহৌসী স্কোয়ারে যে মুহূর্তে সে অনুভব করেছিল এখন আবার অধীর হয়ে ফিসফিসে বলল, "কেন? আমার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তোমার আর কিছু করবার নেই?"

তার আবদার প্রশ্নের উত্তরে এমন জড় মন হয়ে কাঁপনার চেতনা প্রবলে খুব রুক্ষ হয়ে উঠল। আঘাত লক্ষ করে নিজে কিছু সময় লাগল। শ্রীলতা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর সব যাত্রীরা চুপ চাপ হয়ে বিমোচ্ছিল।

কাঁপনা বলল, "অপেক্ষা করব কেন? আপনাকে কথা দিই না। কিন্তু বলে যাওনি তাই হয়ত কোন বিপদ হতে পারে মনে করে—"

শুভেশ কাঁপনার কথা শেষ হবার আগেই অধীরভূ হয়ে উঠল, "সেই তো দুই শরীরের তোমার কাছেই ফিরে এসেছি।"

"এসে দেখছি", কাঁপনা নিজেকে এমনও সংযত করবার খুব চেষ্টা করছিল। তবুও একটা ঝেঁজ তার বুকের মধ্যে কোনদিন উঠলেও সে শুভেশকে বলার সাহস পেল, "যাবে? বাঁচি তা জিজ্ঞেস করার দরকার?"

নিরাভরণ কয়েকটা বেলা শুভেশের মুখ আরও কঠিন করে তুলল, "আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।"

"এখানেই অনেকক্ষণ থেকে নেবে।"

"থেকে যাক", চুরুট খুলতে খুলতে শুভেশ মুখ তুলে একবার কাঁপনার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে ঝাঁজ ছিল। পাশে পাশে কাঁপনার অভাবও সে সহ্য করতে পারছিল না।

"অত হিংসেয় করে কথা বলছ কেন?" কাঁপনার মন ভারী হয়ে উঠছিল, "আমি তো কারো নাম। সব শুনতে পাচ্ছি। কথায় কথায় আজকাল অত মেজাজ দেখাও কেন ছুটি? কী চাও? চাও আমাকে পাঠিয়ে করে বলে দিও আমি ঠিক যেমন-তেমন করবার চেষ্টা করব।"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না।" আরও গলায় খুব আস্তে কথা বলল শুভেশ, "আমাকে একটু একা থাকতে দিও। ট্রেন মোড় না নেয় পর্যন্ত এমন অনেক করলে—এর আগেও যাওনি বড় রাত লাগে—বিরক্তি আসে।"

"আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পার?"

"কোথায়?"

"যেখানে হয়। আমি এখানে থাকতে পারছি না। লজ্জা বড় হয়েছে। তার সামনে এত অপমান আমিও আর সহ্য করতে পারব না। সৌদনও বলছিল—"তারা আর চাপতে পারছিল না বলে কথা শেষ করল না কাঁপনা।

শ্রীলতা কী বলেছে তা জানবার কোন কৌতূহল ছিল না শুভেশের। কাঁপনার কান্নাও সে সহ্য করতে পারছিল না। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া সেরে সে অন্ধকার সিঁড়ানার এককোণে গাঁড়িয়ে পড়তে চাইছিল। ঘুমোবার আগে কতকগুলো নিজস্ব মুহূর্তে নিজের একাকীত্ব অনুভব করবার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তা হলেও শুভেশ জিজ্ঞেস করল, "কী বলছিল লজ্জা?"

কেন্টিজাল অ্যাকাউন্ট

আপনার সঞ্চয়ের সুদের সমান সমান আপনার রেকারিং ডিপোজিট হিসেবে
সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

এখনও আপনার রিকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে আপনার জমার সুবিধা আছে।

যোগাযোগ করুন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

আপনার সেবার সাথে যিনি আছেন নিত্য

"বলছিলে যে তখন তোমার সঙ্গে যখন ওরা কথা বলেছে আমার সঙ্গে তখন ওরা বললে আমি ঠিক বাড়ী ফিরে চলে যেতাম?"

"হুঁ।" আরও খানিক ঘরে শেষ হয়েছে। খুব ঘনঘন নাকছিল। ভেতরেটারের ভিজে এক হাতে টেনে সে নাকা মুখ-চোখে চোখে চালিয়ে বলল, "তুমি রাগলে?" তাঁপকা কিছু বলবার আগেই প্রকেশ আবার বলল, "এতো খেয়ে নি: মাথাল তোমার খেল?"

"ঘুমোচ্ছে। একটু আগে আমি তাকে দুটি বিস্কোট।" তারপর বিছানার ঘুরে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ঘড়ঘড়ানির আর খুব একা না। নিজেকে ঘণ্টার মূল্য বলে মনে হল। তাঁপকার কথা ভেবে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এক সময় সে ভাবল তাঁপকাকে অন্তত খেয়ার দৌড়বে নিজের অক্ষমতা চাপা-বার চেষ্টা করবার কোন মানে হয় না। একটা স্বাভাবিক নিয়মেই এখন ওরা চেতনা লাভে যাচ্ছে। এর ভেতে একটি নিখাদ মানুষকে অযথেলা করবার তার কোন অধিকার নেই।

প্রকেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে খুব আস্তে বলল, "শুনিবে শুনলে নাকি?"

"আ, কেন?"

প্রকেশের বলবার কিছু ছিল না। তাই সে চুপ করে থাকল। একাশ ঘনাশ হল। অনেক পরে একটা খুব দুঃখ মানুষের মতন ভেবে ভেবে বলল, "কাকে কাকে লক্ষ্য করে তোমার বেড়াতে যেতেই তো পার—"

"যাব।"

"সারাদিন ঘরে বসে থাক। সারা-দিন শুধু আমার কথা ভেবে কাটাও—এসব কেন কর তুমি?"

দূর থেকে অন্ধকারেই প্রকেশ বুঝতে পারে হল তাঁপকা কাঁদছে। প্রকেশের তা ভাল লাগল না। তার মেজাজ আবার উগ্র হয়ে উঠছিল, "কথায়-কথায় কাঁদ কেন?"

"তুমি বুঝবে না।"

"একটা লোককে তোর করে ঘরে রাখলে তার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না সব ভেস্তে হয়ে যায়—"

তাঁপকা আস্তে বলল, "তুমি বুঝবে।"

প্রকেশ থামল না। আরও নতুন করে তার মনে হল তাঁপকার অভিনয়ের সবটা সত্যি নয়। তার মধ্যে একটা খুব ছোট খাঁচায় মেয়ে লুকিয়ে আছে। একটু জোরে প্রকেশ বলল, "যে-ব্যবসাটা আজ ওই ঘরে শুরু করেছিলে, তুমি তা করতে গিলে না—"

তাঁপকা ধীরে ধীরে বলল, "তোমার জানার তাতে আমি বলেছিলাম। আজকের পর অন্তত আমি ছুটোছুটি করে টাকার পরীক্ষের যা অবস্থা হয়েছিল—"

প্রকেশ আরও জোরে বলল, "অন্যের তার চেয়ে বেশি ছুটোছুটি করে। আমার সব কাজে তুমি শুধু বাধা দিয়ে এসেছ। কী লাভ হল পরীক্ষা জাল বেচে? সারাক্ষণ তাকে বোঝ করতে পারছে না। সে তাবছে তুমি ভাবছে?"

"একটা বাচ্চাদের কাছে শুধে মত একটা কলেজে তাঁপ করলে আমার অনেক ভয় করত তখন—"

প্রকেশ হেসে উঠল, "তুমি সব জানার মত করছেও পার শুধু আমাকে বোঝার চেষ্টা করবে না। আজকে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে—আশ্চর্য!"

অন্ধকারে খুব ভাবিয়ে তাঁপকা দাঁড়াল। কোন শব্দ না করেও প্রকেশ তা বুঝতে পেরে ওঠঘরে বলল, "পাঁচশ টাকার জন্যে আমাকে তোমার জানা আবার মানুষ যাতে না হা বুঝতে পার।"

"আমি সব বুঝতে পারি। তুমি চুপ কর। আমি চলে যাব—খুব শিগগিরই চলে যাব—"

প্রকেশ রুক্ষ করে বলল, "কোথায়?"

তাঁপকা উত্তর দিল না। প্রকেশ আরও তার বলবার কিছু নেই। সে আস্তে হাসল। একটু পরে থেমে থেমে বলল, "তোমার যদি তোন বন্ধু থাকত—আজকাল এই বয়সের অনেক মেয়েরই তো বন্ধু থাকে—" এক মিনিট চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "আমি তুমি যদি তার সঙ্গে দেখা তোমার চলে যেতে পারতে—"

কথা শেষ করতে পারল না প্রকেশ। তাঁপকা খাটের কাছে উঠে এসেছিল। তার কান্না থেমে গিয়েছিল। প্রকেশ তাকিয়ে ছিলেছিল। সে তীক্ষ্ণ করে তার উঠল, "কী বললে?"

প্রকেশ তাঁপকার চোখে চোখ রেখে প্রথম তাদের দুজনই চিনে ফেলল। তারপর আস্তে—খুব আস্তে বলল, "আমি তাড়াতাড়ি কথা বলেছিলাম। আজকাল তো অনেকে আন্দাজ করে যায়।"

তাঁপকা ঠোঁকেরে চুপ করে দিয়েছিল। তার চোখে ছিলেছিল। তারপর চড়ের মুখোমুখি থেকে থেকে তাঁপ আসার প্রকেশের কাছ থেকে, তার নিজের সাজানো সংসার থেকে আস্তে আস্তে সে আলগা হয়ে যাচ্ছিল—চলে যাচ্ছিল। আর, সে-কারণে কিছু দুঃখের তার মনে প্রকেশ করে নিজে পেরেছিল বলেই এই মুহূর্তে কাঁদা বাইরে জানবার অবকাশ তার আর ছিল না। নিজেকে, খুব আপনজনের মতো একেবারে চুপ করে গেল তাঁপকা।

ধারেকাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকেশের মাথার আবার অসহ্য হয়ে যাচ্ছিল। তার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা ক্রমশ ভরে উঠছিল। এক একবার ঘরের ভিতরে তাকিয়ে সে শ্রীলতাকে দেখছিল। তাকে সান্ত্বনার অনেকটা কথা বলবার ইচ্ছায় অধীর হচ্ছিল। কিন্তু তাঁপকার প্রাথমিক ভেতের পাশে তার কোন স্থান ছিল না প্রকেশের।

বাইরে অন্ধকার ঘরে আসছিল।

অন্ধকারের অতলে ডুবতে ডুবতে তার মনুষ্যত্বের আত্মা চাঁদের ফেলছিল প্রকেশ। শুধু একটা প্রাণী পাওয়ার পাওয়ার অনুভব করছিল। তার মনে হচ্ছিল প্রেম-ভালবাসার সোনালীর মতিরা যেন এই ঘরের প্রাণীর মধ্যে প্রায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

এই কয়েক মুহূর্তের অন্ধকার একাকী-ত্বের চাপে স্থিরভাবে ঘরে একটা দুর্বল আলোর জন্যে মতো ব্যাকুল প্রার্থনায় তাঁপকার আত্মাকে আহ্বান জানাচ্ছিল প্রকেশ।

"বাবা!" বারান্দায় এসে প্রকেশের বুকে মুখ ঘেষে শ্রীলতা আর একবার চিৎকার করে কাঁদল। প্রকেশ খুব শক্ত করে শ্রীলতাকে-বুকে-চেপে ধরল। আর তখন প্রাণীর সব তাঁপ ধীরে ধীরে একে একে পার করে সে আবার তাঁপকার কাছেই পৌঁছে যাচ্ছিল।

তাঁপকার ঘোর অন্ধকারে ঘরে ঘরে স্থির আস্তে সময় হল।

কলিকাতা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ

সিকিউরিটি হাউস

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

ফোন ঃ—২২-৫৪৭৬ এবং ২২-৫৪৭৭

যান্ত্রিক উন্নতির পটভূমিতে * রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রের শাসন কৌশলে আমাদের দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়েছে, এমন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে একথা শোনা যেতো। আমাদের কাছে দেশের মঙ্গলের চরিত্রার্থের ছিল inical progress. রেলরাস্তা, টেলিগ্রাফ, ছাপাখানা এবং অন্যান্য এই আবিষ্কার বিষয়ে আমাদিগকে অভিভূত ক'রে দিয়েছে। চোখ-ঝলসানো চাকচিক্যে তখন মুগ্ধ।

দেশে এমনি একটা অবস্থায় ফেপা-ন-পথা একজন ডেপুটি তাঁর বে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে একটা প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নটা ছিল: এত মঙ্গল? ইংরেজ-শাসন কি কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের জীবনকে মধু করতে পেরেছে? ঐ যে লাখো বুকভরা যারা বৈষয়িক আর দেখ ধরা মাথার ঘাম পায়ে মাটি মাটি জল জলায় কিন্তু ওরা পায় করে মাঠের ফসল, দেবে কুল-লক্ষ্মী দিবে তাহা। যা খায় তাতে ওদের পেট ভরে ইংরেজী সভ্যতার এত আড়ম্বর ওদের অধিকারী ?

দের জবাব বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ন্ম। সেই জবাব ইংরেজ শাসনের এক প্রচণ্ড কশাঘাত। সৌন্দর্যের ও সমাজের স্বাভাবিক অবস্থানের বঙ্কিমচন্দ্র জলদমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করেন, ইংরেজ শাসনের যারা কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপকার ত্র করুন, কল্যাণও না। আরও া অধিকন্তু, যেহেতু দেশের াংশ চাষাভূষা কৃষিজীবী সেইহেতু তাই দেশ।

সেই মঙ্গল চক্ষুতীর মতো ভেদবাদীর উদ্ভাসিত হয়েছিল, আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় চলুধ্বনি দিব না।' সেই ভেদবাদী বঙ্কিমের একজন সাহিত্যিকের বংশ—। পৃথিবীর দেশে দেশে মনীষী আর শিল্পীরা যে যুগে যুগে এক্যবাদে পুরাতন আদর্শকে ভেঙেছেন এবং অন্যকালে সৃষ্টি করেছেন নূতন আদর্শ। মন্ত্রের তান ধরে প্রবল যেখানে জনতার কুটিল পেতে আসতে প্রতিভা সেখানে নির্ভয় বক্ষে আসন ছেড়ে তারে যৌবরের আসন থেকে নামিয়ে আনে। পক্ষান্তরে যারা সকলের পিছে দাঁড়িয়ে আছে অনাদিনের দলে তাদের মাথায় হুকুট পরানোরই প্রতিভার আনন্দ। Have lock Ellis তাঁর The New spirit গ্রন্থে একটা সাধী কথা বলেছেন। বলেছেন:

To find a new vision of the World, a new path to truth, is the instinct of the artist or the thinker. He changes the whole system of our organised perceptions.

শিল্পীর অথবা মনীষীর সহজাত প্রবৃত্তিই হচ্ছে জগতের একটা নূতন ব্যাখ্যা, নতুন পৌরাণের একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করা। আমাদের মনে যে সকল ধারণা নানাশাস্ত্রের যোগে গড়ে ওঠে সেই বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে তিনি পাল্টে দেন।

আসলে যারা কবি, যারা সাহিত্যিক ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা হচ্ছে বিদ্রোহীর ভূমিকা। তাঁরা পুঁথির বোঝা বয়ে বলেন না, উল্টো কথাই বলেন। যে সুরে তাঁরা গান ধরেন সেই সুর আমাদের সুর থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের কাছে যা বস্তুজগতের স্বরূপ শিল্পী তাতে দেখেন পরমের বাঞ্ছনা: আর যাকে আমরা পরমের খেয়াল বলে ধরছে অনাদি শিল্পীর কাছে তা নবধ্যান বস্তুজগতের রূপ নয়।

রবীন্দ্রনাথের রূপক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীর সম্মুখে বেদোচ্চারণ একটা মোক্ষম জিজ্ঞাসা। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক ও 'মুক্তধারা' নাটকে সেদিন যেন হয়েছে একটি প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা। এ যুগের দুটো বিপুল সমাজিক শক্তি অর্থাৎ আমাদের জীবনধারায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নিঃসংশয়ে এনেছে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই শক্তি দুটীর একটী যন্ত্রশিল্পের প্রসার (Industrialism) এবং অপরটি গণতন্ত্র Democracy). বৈজ্ঞানিক মানুষের যান্ত্রিক বুদ্ধির শিক্ষকের অভিযান আর চরমতম সাফল্যে আমাদের মনে যে একটি ভাবের ভয়ঙ্কর ভুলেছিল তাকে নিঃশঙ্ক প্রত্যয় ভাবই বলা যেতে পারে। সেই শ্রদ্ধা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে এমন কথা আর বলা চলে না। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতের মহাকর্ণধারা যাকে আমরা যান্ত্রিক উন্নতি বলছি তাকে বিলক্ষণ সন্দেহের এবং ভয়ের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। "কালি-কাপড়-কলের মনুষ্যত্ব হেয় ক'রে মানুষের সৃষ্টি করে জন্মী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ তাঁতীর ছেলে মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।" দুবরাজ অভিজিতের প্রেমের মুক্তের প্রশ্নের এই ভাষায় জবাব দিয়েছে 'মুক্তধারা' নাটকের যন্ত্ররাজ বিভূতিরা।

টেকনলজির উন্নতিতে আজ যারা নিজেদের বৈজ্ঞানিক মানুষের নিজস্বতম আবিষ্কার চাঁদের সকল ভবিষ্যতের জন্যে জেনেবুঝে যে জলধারা ফেলে দিচ্ছেন সেই মুক্তজলকে বাঁধ বন্ধ করে, বাঁধ "মরুবেদীর উপর তুলারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা" করে "শস্যের-বদলে চাষ", চাষীর মঙ্গল-অমঙ্গলকে গণনার মধ্যে না এনে, কৃষিক্ষেত্রের আয়ের কর্পোরেট না করে তাকে যন্ত্রশাসিত মহিমার কথা ভেবে এত উল্লসিত হবার কি কারণ থাকতে পারে? মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি? আর্থিক উন্নতিই কি লক্ষ্য কি? বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশে আনতে অথবা ভৌগোলিক দূরত্বকে বিলুপ্ত করতে পারলেই কি ইতিহাসে মানুষের জয়যাত্রা চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেল? আর একটা মহত্তর যাত্রার বিরুদ্ধে কঠিনতর সংগ্রাম শুরু করবার দুর্জয় আহ্বান কি এই যুগের চিন্তানায়কদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে না? আর রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীকে কি আমরা এই মূলগতকালী বিপ্লবের যুগ সারথী ব'লে বরণ করতে পারিনে? এবং এই মহত্তর যাত্রা কি একটা নৈতিক যাত্রা নয়?

প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সমাজেই কোন কোন নৈতিক সমস্যা অত্যুগ্র হয়ে দেখা দেয় আর বুদ্ধির সঙ্গে সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যার সমুখীন হ'তে না পারলে সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা করবার আর কিছুই থাকে না। আমাদের ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মপ্রকাশের পথে আজও অন্তরায় হয়ে আছে। কোটি কোটি ক্ষুধাতুর অর্ধ-উলঙ্গ মানুষ ঘুরছে পাথরের মতো স্থিরযৌবন

করছে। তাঁদের কাছে একটা অন্তর্জীবনই সত্য। উপরে যাদের ক্ষুধার আগুন জ্বলছে তারা ভগবানের কথা ভাববে কেমন ক'রে? সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির দিকে তাদের মন দেবার অবসর কোথায়? ভারতবর্ষের সাংঘাতিক এই অসমস্যার যদি আমরা একটা সন্তোষজনক সমাধান করতে পারি তবেই এই কর্মকীর্তিহীন জাতি আবার তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু খাদ্য শস্যের প্রচুর ফলন নির্ভর করছে ভূমির অন্তরতরকে রস করবার শক্তির উপরে। আর এই শক্তি বিজ্ঞান ছাড়া আমাদিগকে দান করতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক-শক্তিকে উপেক্ষা করার মধ্যে নিছক গোঁড়ামিরই পরিচয় আছে। গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ এঁরা দুজনেই আদর্শের আকাশে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গমের মতোই বিচরণ করেছেন। তবুও এঁরা উভয়েই মানুষের এবং বর্তমানের রূঢ় দাবীকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন, এমন কথা জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে। 'সংকেটিক' যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির বিচার করেছেন এবং যা কিছু চিন্তার নির্ভীক স্বাধীনতার পরিপন্থী ব'লে বিবেচিত হয়েছে তাকে বাস্তবজগৎ থেকে দূরে নিক্ষেপ ক'রে সত্যের জন্যে মরিয়া হ'য়ে লেগেছেন। সমপ্রকাশের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত স্বাধীনচেতা বাস্তববাদী মানুষ ভারতবর্ষের দিগন্ত-প্রসারী ভবিষ্যতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানকে কখনো উপেক্ষা করতে পারে? "শান্তি সম্ভাষণ" প্রবন্ধে মর্মবিলাসী উচ্ছ্বাসপ্রবণ তরুণ সম্প্রদায়কে বাস্তবমুখী করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যে তূর্যধ্বনি বেজে উঠেছে তারই প্রকাশ নিম্নোদ্ধৃত লাইনগুলিতে:

"ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতি পরিমাণে। কর্মযোগে নিজেকেও অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব-কিছুকে অপ্রান্তিবর্জিত ক'রে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে তারা আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবে চেষ্টা হবে চিত্তের দুর্লক্ষণ।"

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে এই এক বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছে:

"বিশ্বের লাভ, আধিভৌতিক বিশ্বে নয়, সে তাকে কাজে দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় তবে যায় ন তাকে বিশুদ্ধজ্ঞানে পূর্ণ করে ত উঠতে হয়। তাই উপনি বলেছেন: অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ব বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার দিকে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ তারপর বিদ্যার তীর্থে অমৃত ল করবে। গুরুচার্য এই মৃত্যু থে বাঁচবার বিদ্যা নিয়ে আসেন, ত অন্তঃকরণের দ্বার কেবলই বিদ্যা দেখাবার জন্যে দৈত্যাচার্যদের খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।"

জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মা মুক্ত করবার সাধনায় ব্রতী আ পাশ্চিম মহাদেশের বৈজ্ঞানিকেরা। সাধনা হোপকিন্সের অবিদের, ফ্রাঙ্কি ব্রহ্মের রামকৃষ্ণের অথবা পণ্ডিচে শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক সাধনা সত্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভা বিজ্ঞান সাধনার বিরুদ্ধে পাওয়া কর না পারলে, বস্তুবিশ্বের নিয়মতন্ত্রকে জানলে ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম বে দৈন্যের মূলে আমরা আ পাবো না, মৃত্যুর হাত থেকে ব পাবো না, অধিকাংশ মানুষের অধিকা পাঁজরই পেটের দায়ে জড়ের গোলা করতে থাকবে।" ক্ষুধা সত্য, তৃ সত্য, শৈত্যের অনুভূতি সত্য, যোগ্য সত্য। মর্ত্যের মানুষ বাস্তব সত্যের দা ক্ষুধা যখন চারুক মারে তখন স্বর্গ নথের খাঁচায় কাঁকড়ার মতো ম কিছুতেই আমরা চুঁবিয়ে রাখতে পারি ঈশ্বর চিন্তা কোথায় পলায়ন ক তাই ঠাকুর বলেছিলেন, "খালি পে ধর্ম হয় না।" আর গান্ধী বলেছি যেখানে হাজার হাজার মানুষ উপব থাকতে বাধ্য হয় সেই শূন্য জা সম্মুখে ভগবান শুধু একটি ক্ষুধা আবির্ভূত হতে সাহস পান আর মূর্তি হচ্ছে অন্নপূর্ণার মূর্তি।"

কিন্তু 'ক্ষুধাতুরা' আর 'মরুবেদী মাটকে বস্তুগত মনস্তত্ত্বের এবং শ আবিষ্কারের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে

...টি বিস্ফোরণের মুখ আনিল করেছে, আনিক মানুষের মানসিক বৃত্তির ঔদ্ধত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ যে একটি প্রবল ইতিহাসের সম্মুখীন হইয়াছেন—সেই ... সেই আনিল মধ্যেও গভীর সত্যের ভাস আছে। কর্ম আর শিল্পের ক্ষেত্রে ত্রিক উন্নতির মানুষের সভ্যতার সীমা... মের প্রগতির পরিচয়ের নাম ক'রে ছে। এমনও হতে পারে মন্ত্রশক্তি ভরা থেকে মানিবার শিখরে উঠিয়ে ছ আসল সভ্যতা অনেকটা থেকে মানুষের মাপে ক্রমশই নেমে যাচ্ছে। । বিপরীত ঘটনার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে ওয়া যায়।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত অধ্যায় থেকে ...টি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক আমাদের ...মাকে আরও পরিস্ফুট করবার জন্যে। ...চীন মিসরের নীলনদের দক্ষিণাংশের ...তাকার বিজয়ী পরিচালকের দল যখন ...ম অনুন্নতাবস্থাকে জয় করেছে বৈজ্ঞানিক ...ন প্রয়োগের দ্বারা। প্রকৃতির ...ষ্টানীর বাধাগুলিকে অপসারিত ...রে মানুষের দুর্গত লক্ষ মূলক ...প্রান্তরগুলি ফলপ্রসবিত করেছে সুফল ...ক্ষেত্রে। সেই প্রাচীনকালে একটি ...ক্ষম প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল মিসরে। ...টা ছিল, মিসরের এবং মিসরবাসীদের ...শক্তি কিভাবে ব্যবহার করবেন ...মস্ত প্রজাদের বিপুল কর্মোদ্যমকে।

বস্তুসত্য ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-...বিস্তারে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা অদ্ভুত ...পারিতে তখন অগ্রসর হচ্ছে। ...ই ধনসঞ্চয়কে এবং মানব-শক্তিকে ...ার অধিপতি কি ব্যবহার করবেন ...পুরের ঐশ্বর্য বিধানের জন্যে? ...দের রাজা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ...ধবর্গ কে-কল্পনাসত্তার ফুরে যান ...ছেন মিসরপতি কি প্রজাদের ...ছুরে ঐশ্বর্য করবার জন্যে সচেষ্ট ...ন? It was a moral challenge. ...ছোস পড়ে আমরা তাঁর প্রশ্নের ...ব। মিসরপতি পীরামীডগুলি তৈরী ...রিছিলেন আর এই পীরামীডগুলি ...হাচারীদের ত্রিমূর্তি উৎপাটনের বাস্তব ...শেষে যুগ যুগ ধ'রে বহন করছে। ...ডোটাসের লোকসঙ্গীতগুলিতে এবং ...তাসিক হেরোডোটাসের (Herodo-...) চির আমরা দেখার সে যুগের ...তাকার সম্রাটদের নির্যাতনের কাহিনী ...ল্যমান হ'য়ে আছে। পীরামীড ...যারা তৈরী করেছিলেন তাঁদের আমরা ...ধর্ম তাঁর পরিবেশের বস্তুসম্ভোগকারী ...নিছক প্রজাপীড়ক হিসাবে, প্রজাবাদের ...মর্পিত হিসাবে নয়। মন্ত্রশক্তিকে এবং ...মানবশক্তিকে একইভাবে প্রজাপীড়নের ...ন্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রে প্রাচীন মিসরের নিছক ঐশ্বর্যশালী মীরবীয় সভ্যতার অস্তিত্বটিকে অক্ষয়রূপে রক্ষা ক'রে গিয়েছে কি সেই সভ্যতা আর যথার্থ ফুলে উঠতে পারেনি না ইতিহাসের এই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর উল্লেখ ক'রে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Arnold J. Toynbee একটি চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটি এই,

In the some what similar situation of our own world to-day. When the challenge of Industrialism is being transferred from the sphere of technique to the sphere of morals. the out come—is still unknown. since our reaction to the new situation is still undecided.

"আমাদের নিজেদেরই আজকের জগতে প্রায় এই জাতীয়ের একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। যন্ত্র সভ্যতা একটা নূতনতর বিশ্ব আমাদের সম্মুখে এনেছে। এই যান্ত্রিক নীতিগত যন্ত্রের প্রয়োগ নিয়ে নয়। এর পরিণতি এখনও আমাদের কাছে লুক্কায়িত। এই জটিল নূতন পরিস্থিতির বিষয়ে আমরা কতটা সচেতন তার উপরেই আমাদের ভবিষ্যতের ভালো মন্দ নির্ভর করছে।"

যন্ত্র-সভ্যতা আমাদের দেশে যে একটা নৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে—সেই সঙ্কটটিকে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী উভয়েই তাঁদের সুতীব্র সমালোচনার বিষয়ীভূত করেছেন। গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাছেই যান্ত্রিক ঐশ্বর্যের প্রয়োজন কতটা চলেছে এবং কেউ ঐ ঐশ্বর্যকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। এঁরা দুজনেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের (individualism) ঐকান্তিক সমর্থক। মহাত্মাগান্ধীর জীবন ও বাণীর মধ্যে দুই জিনিষ তিনিই বলেছেন, The individual was his central concern. গান্ধীর সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রে ছিল ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও একই বোধের সঙ্গে এই কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে বিশ্বমানব অনুভূতি না ক'রে। আর ব্যক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করলেই মানুষটা ছিল সম্পূর্ণ বড়, ব্যক্তি—বহুজনের ঐশ্বর্য নয়, মানুষের কল্যাণ। আমাদেরই এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ পথে ভুলে যাওয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে চাপে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়:

"সঙ্কীর্ণ, মাটি, সমাজ, পরিবার, সমস্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রবল চক্রান্ত করেছে আমাদের আত্মার উপরে তাদের মোহাল চাপিয়ে দিয়ে, তাদের ছাঁচে আমাদের ঢালাই করতে, আমাদিগকে তাদের যান্ত্রিক প্রয়োজন সিদ্ধির যন্ত্র বানাতে, তাদের আত্ম প্রয়োজন আমাদের দিয়ে মেটাতে। আমরা যন্ত্রেরই অঙ্গীভূত হ'য়ে যাই; আমরা আর মানুষ থাকিনে; আমাদের আত্মা আর মন থাকে কিছু পাকে না; অভ্যাসের দাসীর পুত্র-কন্যা হয়ে আমরা অন্ধেই আমাদের সমাজ বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণতার মধ্যে বিকসিত করে তুলবার শক্তি নিয়ে যাতে সেই পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের দ্বারা আমরা ঈশ্বর সেবা করতে পারি। কিন্তু প্রতিকূল শক্তি পরিবার চক্রান্তে আমরা আমরা তাদিকে কোন।"

মানুষের এই দুর্ভাগ্য থেকে, ব্যক্তিত্বের মহিমা থেকে, আমাদের যে গৌরব থেকে বঞ্চিত ক'রে অন্যের প্রয়োজন সিদ্ধির মধ্যে পরিচালিত করবার এই যে অন্ধকারী চক্রান্তের মোহ তৈরী হয়েছে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জ—এই চক্রান্তের বিরুদ্ধের একটি প্রবল প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে দুজনার জীবনের বিভিন্ন বিভিন্নতার পুরুষের কাছে। এই বিভিন্নের একজন ঋষি অরবিন্দ, দ্বিতীয়জন ঋষি সত্যই রবীন্দ্রনাথ এবং তৃতীয় জন রাজর্ষি মহাত্মা গান্ধী।

যন্ত্র যাঁর লক্ষ লক্ষ কল্যাণের কথাকে প্রসন্ন না ক'রে তাদের টেনে নেয় অমঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে তবে তো যন্ত্রশক্তির মধ্যে একটা আত্মিক শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। এই জন্যেই যন্ত্রকে বিদ্রূপ পাঁচশ বছর ধরে যেটা তৈরী করেছিল তাকে যন্ত্রমুখ বলতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা হয়নি। সেই যন্ত্রের দিকে বিদ্রূপের

যান্ত্রিক সুবিধা বিক্রয় করা যত বড়ো ব্যবসা হোক না—সেই বস্তুটা তো আসলে অসুবিধা। কারণ যত মানুষ আজ্ঞাবাহনের উপর ভরসা করে পা ফেলতে ভুলে গিয়েছে, তত তাদের চলচ্ছক্তিকে জননীর গর্ভাশয়ে সে আচ্ছন্ন, মুক্ত-আকাশ তার পক্ষে বন্ধ ক'রে পঙ্গুত্বশালায়। তত চাকার গুহায় ছেলেকে ঐ যন্ত্র ভাবতে বসেছে। তখন নিছক যন্ত্র রবীন্দ্রনাথের মতো মানব-দরদী মহাকবির কাছ থেকে একটি আবেদন ছাড়া আর কি সাহায্যের আশা করতে পারে? সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মুখোমুখি আত্মাভিমানকে দিয়ে মুক্তআকাশে যাত্রা করিয়েছেন। যন্ত্র যেখানে মানুষকে হারিয়ে যায় সেখানে সে অসুর। 'কেমনে দাঁড়াবে মুখোমুখি যদি নাহি রবে'—মানুষের এই বক্তব্যকে কত বিচিত্র ভঙ্গীতে যে কত থেকে উৎসারিত হ'য়েছিল তিনি যন্ত্রমানুষকে জন্ম করবেন কেমন ক'রে? যন্ত্রের আত্মীয়ক পাকচক্রে এমনে যারা মত্ততম আঘাত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম! গান্ধী তো বটেই!

পুঁজিবাদের মধ্যেও মানুষের প্রতি মমতার একটা সোচ্চার অভাব। তাই 'বক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদকে নিছক আঘাত হেনেছেন। যক্ষপুরীর যারা সোনার মোহে মেতে পড়েছে। গাঁয়ের মানুষগুলি তাঁর লোভের খনিতে এসে তাল তাল সোনা তুলছে। যারা অন্ধকূপে দিবা রাত্রি আর প্রাণগুলো ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। মাটির তলা থেকে সোনা তোলার কাজে নিযুক্ত যারা তাদের জীবনের প্রতি বাইরে অনুকম্পা তারা নেই। রাজার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সোনার ঢাল তৈরানো। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে তারপর যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে সেটুকু দিয়ে বাকি বিশ্বভুবন কুধা অনুভব করবে। যক্ষপুরীর আলোহীন আলোহীন জীবনে সৌন্দর্যে মানুষগুলো আর মানুষ নেই। তারা সংখ্যায় পর্যবসিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ নব-দেবতার এই অমানুষিকে ক্ষমা করেননি। নন্দিনী যক্ষপুরীতে এনেছে বিশ্বের ঋতু। মুক্তআকাশ আত্মাভিমানীদের যক্ষপুরীতে নন্দিনী তার করেছে।

বৈজ্ঞানিক মানুষের যান্ত্রিক দৃষ্টির ঔদ্ধত্য যে অভিশাপ ডেকে এনেছে লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবনে সেই অভিশাপের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী কেউই উদাসীন থাকতে পারেন নি। যন্ত্র যদি মানুষের জীবনের আলো নিভিয়ে দেয় তবে তো যন্ত্র অসুর ছাড়া আর কিছু হ'তে পারেনা আর যন্ত্রসুর গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের দ্বারাই অভূত ভাষায় ধিকৃত হয়েছে।

আমোদকার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলেন, সোনার দুয়ার লোহার অন্ধ কারাগার। পাশ্চাত্য যে-পথে চলেছে সে পথ বাইরের ঐশ্বর্য থাকলেও অন্তরাত্মার পক্ষে পূর্ণ হবার উপায় নেই। 'মুক্তধারা' প্রবন্ধে এই অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "সাতচল্লিশ বছর আগে যে বিজ্ঞান আকাশের বজ্রকে দাসত্বে বেঁধেছিল ঐশ্বর্যপুরীর ঘরে এই দাসত্বের উল্টো পথে চলে দেখে এলেম। সেখানে 'ধনাৎ ধর্ম্মস্ততঃ সুখং' সেইটাই যন্ত্র হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশানাস্তাময়ং জগৎ' সেইটেই তলাবের অনুকূল আজ্ঞা।"

যক্ষকরবীর "রাজা" তলাব-পুরীর প্রভু। রাজার অন্ধকারাপ্রিয়—তাই তিনি নন্দিনীকে বলছেন, "তাদের যে, আর। যারা পড়ে, কেবল আনন্দ যারা পড়েনা।

বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্যের ভোগের এবং যন্ত্রসভ্যতার বাড়াবাড়ি ভেদবুদ্ধির প্রতিষ্ঠাতে। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী উভয়েরই মনে প্রেমের এবং প্রেমের অভাবনা। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "প্রেম সব করে দেয়। ভেদবুদ্ধি ঘটায় না।" তাই গান্ধী অথবা রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের ভোগবাদকে যেমন দমন করতে পারেননি তেমনি যন্ত্রসুর মনোভাবকেও অনুর্ধ্ব করতে পারেনি।

ঝিনুকে লুকনো মুক্তো

*

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রথমে আকাশ, পরে বড় বাড়ির ঘড়িটা দেখল জীবন মিত্র। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এখন তিনটে বাজতে দশ।

মাথার ওপরে প্রখর সূর্যের আলো। ঘড়ি খানেক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু কে বলবে তা। ঠা ঠা করছে এখন রোদ। বৃষ্টি হয়ে গিয়ে যেন রোদের তেজ বেড়ে গেছে আরো। রাস্তার পিচ যেন চক চক করছে। দশাহ ঘুড়ে পোড়ানি। চোখ জ্বলে যায় হলকা হাওয়ায়।

: কোথায় যাবি, এস্থুনি বাড়ি ফিরবি? জীবন মিত্র মেয়েকে প্রশ্ন করল।

মেয়ে অর্থে সতী। বলল, যা বলবে।

: তোর যা ইচ্ছে। জীবন মিত্র নিরাসক্ত স্বরে উত্তর দিল। আজ তো খুব তাড়াতাড়িই কাজ মিটে গেল। কিছু খাবি?

: না। অস্ফুটে বলল সতী। এতক্ষণ সে মাঠের দিকে চেয়েছিল। সামনের রুক্ষ মাঠটা সোজাসুজি ওপারে থেকে মাঠের শুরু। চলে গেছে বহুদূর ঘাট পর্যন্ত। মাঠের মাঝে মাঝে কাঁকড়া গাছ। ছায়ার নীচে ক্লান্ত মানুষ। ওরে বসে। যেন সবাই জীবন সম্বন্ধে হঠাৎ বিরাগভাজন হয়ে উঠেছে।

সতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আলো দেখছিল। একটু আগে মধুমদার ডাক্তারের চেম্বার থেকে ফিরেছে ওরা। এতক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল।

: সিনেমা দেখবি? ঔষধপত্রী বই? জীবন মিত্র জোর করে হাসল। বলল। জীবন মিত্র মেয়ের মুখের দিকে তাকাল এখনও সময় আছে।

সেই চোখে চোখে চেয়েই সতী জবাব দিল। অস্ফুটে বলল, আমার খুব একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে। সামনে খোলা মাঠ থাকবে তাকালে একটা বড় জঙ্গল।

চোখ নামিয়ে নিল জীবন মিত্র। কেন আকাশ দেখল, বড় বাড়ির ঘড়িটা দেখল। যেন এড়াতে চায় কিছুই দেখার কি তখন নেই তার। যেন ক্লান্ত, অবসন্ন লাগছে।

আজও ঠিক মত ঘুম হয়নি। প্রথম শিউরেটা ভোর হবার শেষ করেই বাড়ি ফিরে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

অথচ এ তার জীবনে বাড়াবাড়ি। চিরটাকাল নিরুদ্বেগ করে এসেছে। খুব না ঠেকলে ঘুম ভাঙাই করেনি। ঘুমে সে ভয়ে তার খাটিও ছিল। কিন্তু বাড়িতে কোনদিনই তার ভয়ে একটি ঘুমোতে করেনি। সতীর মা মেয়ের দিকে প্রায় তাকাই যাওয়াত না। বলত বিয়েটা ওর কাছে একটা সামাজিক ব্যাপার। সন্তানের বাপ হয়েছে এইমাত্র আর কোন দায়িত্বই পালন করেনি।

সে সব না শোনার ভান করেই কাটাত সে। কি বলবে? মাস্তানী করাটা তার কাছে একটা নেশার মত। সবদায় তাই অনিবার্যভাবেই বঞ্চিত হয়েছে।

সেই অভাব অনেকটা পূরণ করেছিল মেয়েরা। চার কন্যা। এখন তিন জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এরা

সবাই পর পর বাবাকে চোখে চোখে রেখেছে, শাসন করেছে, অভিযোগ জানিয়েছে। সব চেয়ে অভিমানী ছিল এই সতী। ওর যখন বিচ্ছুর টিকি দেখা চোখ ছলছল করে বলেছিল, তুমি আবার স্বাধীন হলে। শাসন করার কেউ আর রইল না কাছে। ছিরের পরও মেয়েটা নানা ছুতো করে চলে আসত। বলত, আমার যেন কেন মনে হয় তোমার ঠিকমত সেবা যত্ন হচ্ছে না।

সেই আসা যাওয়া বন্ধ হয়েছিল ওর প্রথম বাচ্চা হবার পর।

চোখ মাসিয়ে সতীকে দেখল একদৃষ্টে। দেখে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

একটা বাস এসেছিল। সতী বলল, উঠবে?

: থাক এটায় উঠব। অন্যটায় যাব। কিন্তু খাবি তুই? সেই তো তখন খেয়েছিস।

নবনীতার পাতা কাঁপল একবার সতীর। সেখার মত একটু হাসি ফুটল ওর মুখে। বলল, থাক বাড়ি গিয়েই খাব।

: তোর বোনের কোন কিছুতেই উৎসাহ হয় না, তাই না? জীবন মিত্র মেয়েকে প্রশ্ন করল।

: চল, বসে কাটি। প্রশ্ন এড়িয়ে বলল সতী। বাসে চড়তে ইচ্ছে করে না আমার। সেই একঘেয়ে যাতায়াত, সেই ভীড়, আমার যেন কেমন লাগে।

: এই বয়সে? তা হবে না? জীবন মিত্র বলল।

: তোমার তো ভাবা আছে।

: আমি তোর কথা বলছি।

: আমার কষ্ট হবে না। বন্ধুরে বেড়াতে ভাল লাগে আমার। সতী মিষ্টি হাসল এবার। চা বাগানে থাকতে অনেক সময় একা একাই আমি বন্ধুরে ঘরে বেড়াতাম।

জীবন মিত্র কের সতীকে দেখল। এমনি হঠাৎ হঠাৎ যখন মেয়েকে উজ্জ্বল হতে দেখে তখন বুকটা ভরে যায় তার। আর তখন তাদের সেই হয় মেয়ে এমন একটা অদ্ভুত অসুখে ভুগছে যা এর জীবনটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।

কিন্তু বেশী খুব হাঁটল না সতী। পাকদণ্ডীটের মোড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তার চেয়ে চল, বাসেই যাই।

: বেশ, তাই চ। পায়ের গতি কমাল জীবন মিত্র। মেয়ের স্নেহ যেন কখন বাড়ছে।

সেক আর সাউদার্ণ পার্কের মুখে বাস থেকে নামল ওরা। প্রথম মোড়ের মধ্যে এখানেই যেন একটু ছায়া। সেদিন মোড়ে মোড়ে ঘাস কিনল জীবন মিত্র।

কিন্তু চওড়া রাস্তাটা পেরুতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। রাস্তার ওপার থেকে একটা মেয়ে আসছে এক গাল হেসে। সতীর, কিন্তু চেনা।

: কিরে! কাছাকাছি আসতেই সতীকে প্রশ্ন করল। কেমন আছিস। তবে এলি তোলাকাড়া। বাবা, কি কালো হয়ে গেছিস। ইস।

সতীর ক্লান্ত চোখের পাতা শংকের জন্য কাঁপল। জিভের জলে ঠোঁট ভিজিয়ে উত্তরে হাসবার চেষ্টা করল সতী। বলল, তুইও তো কেমন রুটিয়ে যাচ্ছিস।

জীবন মিত্র আর এক ঝলক মেয়েটিকে দেখল। আসলে মোটা নয়, বিয়াট চেহারার মেয়েটা।

: কি করছিস এখন। সতী প্রশ্ন করল। সেই মাস্টারিই বুঝি?

: হাঁ। এবার বি টি পাস করেছি।

সতী ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে বাপকে একবার দেখল। তারপর ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এ দীর্ঘশ্বাসের কারণটা জীবন মিত্রকে বোঝাবার কথা নয়। মেয়েও একদিনে সাধ ছিল ফুল মিষ্টেস হবে। তাই নিয়ে কম আশাভঙ্গ হয়নি সংসারে। কিন্তু জীবন মিত্র সতীর সে ইচ্ছাকে বাঁচতে দেয়নি। বরং পাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছিল।

: তারপর তুই কেমন আছিস বল্। কের প্রশ্ন করল মেয়েটি। এত কালো হয়েছিস কেন?

: আগে, তবে যেন অবাধ্য কালো ছিলুম। সতী এবার বিব্রত হয়ে উত্তর দিল। পরে বাবার দিকে ফিরে বলল একে চিনতে পারলে? অনু, অনুপ্রভা হালদার। আমাদের বাড়ি ও মেয়ে।

জীবন মিত্র কের তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে। মিষ্টি, শ্রীময় মুখ খানা। হেসে বলল, সবাইকে কি আর মনে থাকে? তবে মুখখানা খুব চেনা চেনা ঠেকছে।

: আমাদের অনেক ছোট দেখেছেন। বিব্রত ভাবে হাসল অনু। মনে না থাকাই স্বাভাবিক।

: কোথায় থাক?

: এই তো কাছেই। সাউদার্ণ পার্কে।

: নিজেদের বাড়ি?

: হাঁ। সুন্দর বলল মেয়েটি।

: মাস্টারী করছ বুঝি?

: ঐ একটা করছি।

: তাই বিয়ের কথা মনে নেই। চাপা হাসল জীবন মিত্র। অথচ দেখতো, সতী কেমন সংসার গুছিয়ে বসেছে।

যেন ধমক খেল, এমনি ভাবে দৃষ্টি ফেরাল সতী বাবার দিকে। ভ্রূ কুঁচকে ভয় দেখানো মুখখানা কালো হল তার।

: তা তো দেখেই বুঝতে পারছি। খুশি ছড়াল এবার অনু।

: কি বুঝলি। আবার তাড়া করে প্রশ্ন করল সতী।

: তোরা না হয় কথা বল। আমি বরং বাড়ি যাই। জীবন মিত্র সতীর দিকে তাকাল। না হয় একটু ঘুরে-টুরে আয়। যা না।

অনু কের উজ্জ্বল হাসল। খুশ করে সতীর একটা হাত ধরে বলল, চল না। খুব ভাল হবে। এবা এই দুপুরে বেরুতে ভাল লাগছিল না।

: যা, ঘুরে আয়। বাড়িতে তো কোন কাজ নেই। কিছু সময়টা কাটবে ভাল। জীবন মিত্র বলল। আমি বরং যাই। বুড়ো হয়েছি তো, জীবন ক্লান্ত লাগছে।

সতী প্রথমটায় পিতৃ দৃষ্টি মেপে বাবার মুখখানা দেখল তার পর অনুর। শেষে লাই তোলায় জোর করে বলল, আজ থাক, শরীরটা তেমন ভাল নয়। আমি তো এখন আসিই আছি। আর একদিন না হয়—আসনা একদিন বাড়িতে?

খুশ করে তার আর একটা হাত চেপে ধরল অনু। বলল, যাবা যাবা, বিয়ে হলেই কি অমনি ঘরলে যেতে হয়? চল্। হালদার লাইব্রেরীতে একটু কাজ আছে। যাবো আর আসবো।

চোখে চোখে মেয়ে ক্লান্ত হাসল সতী। বলল, বিশ্বাস কর, শরীরটা তাই ভাল নেই। মাইলে বাবা তো বলছিল ইংরিজি বই দেখবার কথা।

একটু অপ্রস্তুত, একটু কৌতুকের হাসি ফুটল অনুর মুখে চোখে। হাত ছেড়ে দিয়ে একধার ঘাড় নেড়ে, জীবন

মিত্রকে আড়ালে ডেকে কিছু কিছু ওষুধ বলল,—এগুলি আমি ও বদলাব একদিন। আর তখন, তখন তোকে চিনতেই পারব না।

বলে পা বাড়াল অনু। এবং সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ঘুরেই জীবন মিত্রর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, চলি ন্যাটামশাই।

: এসো। ছোট্ট করে উত্তর দিল জীবন মিত্র। এ ছাড়া আর কোন কথা খুঁজে পেলনা সহসা।

অনু যাওয়াটা পেছিয়ে যায় ইপে গিয়ে দাঁড়াল। সেই পর্যন্ত স্থির নিষ্পলক রইল সতী, তারপর মুখে বলল, চল বাবা।

: হ্যাঁ, চল। বলতে বলতে ছাতাটা খুলে মাথার ওপর দিয়ে পা বাড়াল জীবন মিত্র।

: বেশ তো, ঘুরে আসতে পারতিস। অনেকটা এগিয়ে মুখ খুলল জীবন মিত্র। জায়গাটা লাইব্রেরীর পরিবেশটা খুব সুন্দর। অনেকটা জায়গা নিয়ে···প্রচুর গাছপালা আর নিজন—

কথার মাঝে থেমে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল সে। কিন্তু সতী কোন কথা বলল না দেখে, বলল, কোথাও না গিয়ে যেন ঘরকুনো হয়ে গেছিস।

এবার হাসল সতী। বলল, আসলে আমার যে কি ভাল লাগে তা আমি নিজেও জানি না।

সন্ন্যাসেরও কথাটা মনে পড়ল জীবন মিত্রর। সতী বলেছিল, সে নির্জনতা পছন্দ করে। খোলা নির্জন প্রান্তরে হাঁটতে তার ভীষণ ইচ্ছে।

কের এক সপ্তাহ পরে ডাঃ মজুমদারের ডাকে সতীকে নিয়ে এসেছিল। আসবার আগে সতী হেসে বলেছে, ভাল না লাগাটা একটা রোগই নয়। তবু তুমি জোর করে আমাকে চিকিৎসা করাচ্ছ। ন্যাপারটা লোকে জানলে বলবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

: মাথা না হয়ে হার্ট কি লিভের অন্য কোন জরুরী অংগেরও তো কোন ত্রুটি বা গণ্ডগোল হতে পারে। জীবন মিত্র তখন খুব ভয় পেয়েছিল। ঘনটা শুধু মানুষের থাকের মতো, কিন্তু তেমনটা নয়।

ঠিক সেই কথাটাই ডাঃ মজুমদারও বলল। "এ ঠিক মনের নয় মেয়ের চিকিৎসা। আমাদের এই মেডটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিনের ওষুধ। অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদানে গড়া। আর তাই সেডিক্যাল সায়েন্স ছাড়া অন্য কেউ জানে না।"

জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চোখ রেখে কথাগুলি শুনছিল সতী। কিন্তু সম্পূর্ণ মনটা ডাক্তারের কথার দিকে ছিল না, তার মধ্যেই সে আকাশের মেঘ দেখছিল, ঘাসফুলী পাখিদের ডেকে যেতার দেখছিল।

"আমরাই যা করবার করছি বল।" ডাঃ মজুমদার বলছিল। "সিমটম খুঁজে খুঁজে ডাক্তারে ডাক্তারে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোই। তারপর তার ওপর ভিত্তি করে ওষুধ দি। এই তো।"

সেই কথার মধ্যেই একবার দৃষ্টি ফিরিয়েছিল সতী। ডাক্তারকে দেখবার চেষ্টা করেছিল। কের চোখ ফেরাতেই ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হল। সতী হেসে ফেলল। বলল, কিন্তু কি পেলেন? বাবা তো এর মধ্যেই সাইকোলজিস্টকে ডেকেছে, বাড়ীর ফেউদের ডাক্তারদের মেডো সাহেবকে দেখাল। সবাই বলেছে কোন রোগ নেই।

: তবে?

: কি তবে! খরচমত খেল সতী।

: তা সত্ত্বেও তুমি ঠিক সহজ হচ্ছ না কেন।

: কে বললে আমি সহজ নই।

: মানুষ সহজ সুস্থ থাকলে তার মাথায় রোগে ভোগে না।

: আমার ওটা রোগ নয়—অসুখ। স্বভাব।

এবার ডাঃ মজুমদার হাসল। বলল তুমি দেখছি শেয়ানা কথা। তোমার চিকিৎসার আগে ডাক্তারের চিকিৎসা প্রয়োজন।

খিল খিল করে হেসে মুখে হাত চাপা দিল সতী। বলল শেষ পর্যন্ত তাই না করতে হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে জীবন মিত্র সতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখল। যেন হঠাৎ তার ভালো করে যাওয়া, তার সুস্থ মুখখানা সৌন্দর্যে ভরে উঠল।

: অবশ্য কথার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদেরও যে চিকিৎসা না হয় এমন নয়। ডাঃ মজুমদার হাসল। কথা কি আর সব একরকম আসে! আর তাদের হয়ে ভাবতে গিয়ে অনেক সময় ডাক্তারদেরই দেখেছি যে, মাথায় গণ্ডগোল হবার তো?

সতী কথাগুলি শুনছিল আর চুপে চুপে হাসছিল। ডাঃ মজুমদারের কথা শেষ হতেই ছিপে চোখ মুখ লাল করে বলল, আমাদের বাগানের ডাক্তারকে তো দুবার সন্দেহ করত মাথায় গণ্ডগোল আছে বলে।

সতী কথায় একটু ফেল ছিল। ডাক্তার কের বলল, আহ, লোকটাকে দেখতেও তেমনি ছিল। মোটা থলথলে চেহারা, মাথা ভরা মালকোঁচা মেরে কাপড় পরত, তার ওপর একটা জাকাশে নীল রংয়ের ফুলহাতা কোট পরত। চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা আর গলায় বুক খোলা থাকত। ভীষণ নার্ভাস ছিল। রাস্তা দিয়ে যখন চলত, লোকে তখন আড়াল থেকে মাঠে করে বলত, "পাগলটা যাচ্ছে।" কিন্তু লোকটার নাম ছিল ধনঞ্জয় পাল

সতীকে যেন হঠাৎ গল্পের নেশায় পেয়েছে। জীবন মিত্র দেখল, সতীর মুখের সেই ফ্যাকাসে ভাবটা কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। সতী যেন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে।

: তুমিও কি তাই বলবে? ডাঃ মজুমদার এবার মুখটিপে হাসল। তা হলে তুমিও ডাক্তার বাড়িদের মাঠে যাও?

: যুঃ! হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলেছিল সতী। আমি অবশ্য মুখে কিছু বলতুম না, তবে মজা পেতুম। অন্যেরা যখন বলত হাসতুম। আসলে লোকটার চাউনির ভঙ্গীটাই মজার ছিল। তবে লোকটা পাগল খুব ভাল ছিল। যা লম্বা লম্বা ডাকাবুকা বলত না।

: লোকটা বিয়ে করেছে?

: ও বাবা! সতী বিস্ময়ের ভান করল। পিল পিল করে বাচ্চা বাচ্চা।

বলতে বলতে কি হল, আচমকা সতীর চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব বদলাল।

জীবন মিত্র সেটাও লক্ষ্য করেছিল। সতী থামতেই সে হাসল। গলা ঝেড়ে বলল, সে ভগবানের দান। ও নিয়ে কাউকে কিছু বলতে নেই। কেন, আমিই তো আমার ঠাকুমার কোন অ্যাডাল্ট সর্বসাকুল্যে পাঁচটা না ছটা বিয়ে করেছিলেন। আর মৃত্যুর সময় তার বংশধর দাঁড়িয়েছিল পুরো কুড়ি

নিয়ে মোট ছোঁয় কম। তাই, ওটা একটা কথা নয়। আসলে কি কম? ছোবা চার বোন, দুই ভাই। আজকাল মানুষের মনের আর চিন্তা চুকেছে। আগে বেশী সন্তানের বাবা কি মা হতে চায় না। কিন্তু অসুখটা কি মানুষের হাত?

এলোমেলো কথাগুলি বলে যাচ্ছিল জীবন মিত্র। খেয়ে টেনে যাচ্ছিল। যেন এতক্ষণ সে অস্বস্তিকর একটা তর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

ঘরের আবহাওয়াটা যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। ডাঃ মজুমদার বিব্রত হাসবার চেষ্টা করল একবার। তারপর প্রথমে জীবন মিত্র পরে সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট করে বলল, হাঁ, তাই তু বিলিফ। তাছাড়া বলে একটা কথা আছে। আমি আমার জীবনেই তার প্রমাণ পেয়েছি।

ডাঃ মজুমদার সকলের শুরু খাবার। মনে একটা সিগারেট ধরাবে কেউ বলল, আমার এখন রাশার চলছে। বিয়ে করেছি কবে ঠিক মনে পড়েনা। তবে সুখ সহ্যাদ্রির কম নয়। কিন্তু আজও আমাদের বাড়িতে শিশুর কান্না শোনেনি। তাই নিয়ে খিটি কি না করেছে। প্রথমে ধৈর্য্যচিকিৎসা। পরে সে সব ছেড়ে ছুড়ে ডাক্তার বৈদ্যের দিকে ঝুঁকলেন। পূজা দেওয়া, মাদুলী ধারণ, তারকেশ্বরে হত্যে দেওয়া, সাধু সন্ত কিছুই বাদ দেননি। শুধু তাই নয় মানুষের আকাঙ্ক্ষা দয়া করেনি। এটা আশা ছাড়া আর কি।

এটা আসলে মজুমদারের চেষ্টায়। যে ডাঃ মজুমদারের সময়ের মূল্য বেশী। যার দরকার মানুষ প্রায় ওড়ো দিয়ে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তের জন্যে সেটা আর দয়া নয়, জীবন মিত্রই মনে হ'ল।

কিন্তু ডাঃ মজুমদার তা সামনে নিল। সতীর নিষ্পলক শুভ চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, বুঝলে? এর নামই জীবন। কিন্তু এর ওপর তো মানুষের কোন হাত নেই।

জীবন মিত্র একক্ষণ সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার বাইরের দিকে তাকাল। আকাশের কাছাকাছি ছিল কি ঐ জানলার কতগুলি পাখি ডাকছে। কালো কালো ডানা পুরু পালকের মত দেখাচ্ছে। এখানে ওখানে চালতা মেঘ। যেন স্থির হয়ে আছে।

চোখ ফিরিয়ে নিল জীবন মিত্র। দৃষ্টি বিস্তারিত করছে। চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে প্রথমে এক পরে চশমায় হাত বুলাল।

* * * *

: না, তৈরব কিছু আমার জানা নেই। জীবন মিত্র যেন অবেশি ক্লান্ত এমন সুরে ডাঃ মজুমদারের কথার উত্তর দিল। আর কথন ও পড়ছে পড়ছেই এর মিছে ভয় আজ অনেকে চুকেছিল। আর ওদের জীবন জানটা ছিল আমার। ছায়ার মত থাকত আমার সঙ্গে। ফলে, অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে মেশেনি করে..... তবে অবশ্য জানিনা, মেয়ে বড় হয়েছে, নিজের একটা ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে।

জীবন মিত্র থামল, খেয়ে লম্বা নিল। ডাঃ মজুমদার একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সেটায় শেষ টান দিয়ে টিপে টিপে এ্যাসট্রেতে নিভিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে জানালার বাইরে তাকাল।

সতী ঘরে নেই। ডাঃ মজুমদার তাকে পাশের ঘরে গিয়ে বসতে বলেছে। হেসে বলেছে, তোমার এখন রেষ্ট। এবার রোগীর মানার চিকিৎসার পালা।

With Best Compliments of

J. Stone & Co. (India) Private Limited

66, NEW TARATOLA ROAD.

CALCUTTA–27

ভীষণ মিয়র তখন ভেবেছিল। কিন্তু কথা বলেনি।

: মেয়েদের একটা বয়েস আসে, যখন তারা নিজেদের অসুস্থ বলে। মনে মনে চটপট হয়ে। এটা একটা মানসিক রোগ। বিয়ে দিলেই এটা সেরে যায় না সবক্ষেত্রে। তাঃ বসুমদার বিতীয় সিগারেটে ধরান। এবং সেটা তাদের কারো কাছেই কখনো কোনো সান্ত্বনাই বিশেষ।

ভীষণ মিয়র কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। এমনিতে এত কথা বলে না মানুষ। কিন্তু একবার কথা বলতে শুরু করলে, কথাটা শেষ কি কোনো একটা সিদ্ধান্তে না পৌঁছলে থামতে পারেই না। এটা তার স্বভাব। কিন্তু এখন তেমন হ'ল না। তাঃ বসুমদার মুখ খুলতে সে সুযোগ করে দেন।

: মনস্তত্ত্ব এটাকেও এক ধরনের রোগ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এ রোগের যে কোন ডাক্তারী চিকিৎসা নেই। এর চিকিৎসক হচ্ছে সাইকোলজিস্টরা। তাঃ বসুমদার আর একটু ঘন হয়ে বসল। আর খুঁটিয়ে দেখে এ রোগের উৎপত্তি কোথায়। কি থেকে এর সৃষ্টি। নিশ্চয় একটা মূল কারণ আছে যেটা মনে তার মনে করে। আচ্ছা এটা কত বছর বিয়ে হয়েছে?

: অন্ততঃ বছর তিনেক। ভীষণ মিয়র উত্তর দিল। এর বিয়ে হয়েছে মোটামুটি পাঁচ বছর।

: তখন ধরা পড়ে?

ভীষণ মিয়র একটু লজ্জা লাগছিল। পরে বলল, সঠিক সময়টা বলতে পারবো না তবে মেয়েটাকে বিতীয় বাচ্চাটির জন্মের মাস খানেকের মাথায়।

: কি রকম?

ভীষণ মিয়র এবার সত্যিই মজেই উত্তর দিল না। তাঃ বসুমদার চোখে একবার আড়চোখে দেখল। কিন্তু সে চাহনিতে কোন কৌতূহল নেই। পরে মুখ ফিরিয়ে মুখ নামিয়ে বলল, বিতীয় বাচ্চাটির জন্মের পর মাস খানেক কি তিন মাস পাঁচ বেশ ভাল ছিল। বাচ্চার দিকে নজর দেয়া কি বাচ্চাটির সম্পর্কে তুলনা যা সংসারের ওপরে টানা সবকিছু যাভাবিক ছিল। কিন্তু তারপরই এক সময় দেখা গেল নতুন বাচ্চা কি বাচ্চাটির দিকে তোর দেবারই নেই। সংসারের প্রতি অবহেলাও, ঘর গুছানো দূরে থাক ঘোরা ফেরা কিছুরই মন নেই। ভীষণ লক্ষ্য করে এর বিষয়ের ভাবনাই হ'ল। সত্যিই জিজ্ঞেস করল কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না? কিন্তু সে কথারও উত্তর দেবার উলুস চাহনি। অনেক সময় মনে হ'ত ও কাঁদবে। কিন্তু কাঁদত না। কথারও উত্তর দিত না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে এখানে নিয়ে যায়।

ভীষণ মিয়র একটানা এতগুলি কথা বলে হাঁফ ছেড়ে থামল। মেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তাঃ বসুমদারের যেন চেতনা ফেরে। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সেই থেকেই কি ও এখানে?

: না। প্রায় চমকে ওঠার মত উত্তর দিল ভীষণ মিয়র। মাস খানেক থেকেই মেয়ের চলে গিয়েছিল। তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ।... কিন্তু শরীর ওর খারাপ। বাচ্চাটা ওকে চব্বিশ পঁচিশ দিনের মাথায় ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

: কি রকম?

: বিয়ের আকস্মিক ব্যাপারে। সকালে এবং বিকেলে। দুপুরে খাওয়া দিয়ে মেয়েকে বাচ্চাটি বিছানায় শুয়ে রাতি রাতি চীৎকার করে কিন্তু সত্যিই কেন্দা নেই। বড় ছটির একটি ঘুমন্ত অবস্থায় ভান ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে ভয়ে থুন থুন করছে।.....শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাচ্চাকে ওদের ঘরে নিয়ে এলে সে দাঁড়িয়ে যায় আর কাঁদে না। ছ' মাসের ওদের ছোট। সেই শুরু। তার পর থেকে সেই আসের মত। কিন্তু ডিজেস করলেও ভাল উত্তর নেই। ভালো ভালো উত্তর, বলে, ভালো লাগে না। কিন্তু কেন ভালো লাগে না, সেটা স্পষ্ট করে বলতে পারে না। আমি খুব বছরের কথা বলছি।

তাঃ বসুমদার টেবিলের ওপর একটা ফাইল দেখার ওপেট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ টেবিলের ফাইলের ওপর নামান। অ্যাসট্রেতে সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে।

: এখানে আসার পর ওর মা নিজের সব দিক ওকে লক্ষ্য করছে, এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে, যাঁর অবাভাবিক কিছুই থেকে এসব করে থাকে। কিন্তু মেয়ে তাই বলে। বলেছে, আমার কোন অসুখ নেই। কিন্তু ভালো যে লাগাটা কি আমার অসুখ?

ভীষণ মিয়র বেশী উত্তেজিত হলে কথা বলতে পারেনা। তখন সে কথা খুঁজে পায় না।

: শেষ পর্যন্ত আমি ওকে প্রথমে সাক্তারে, সাইকোলজিস্ট এবং সবশেষে বাঁচাই মেন্টাল হসপিটালের সাহেবকে দেখালাম। কিন্তু কিছুই হ'ল না। মুখবাদান থেকে যতটা সাহেবের বলতে পারা গেল।

মেয়ের কথাগুলি টেনে টেনে থামল ভীষণ মিয়র। যেন অবসাদে সমস্ত দেহ মন ভার অবসন্ন।

তাঃ বসুমদার একবার চশমাটা খুলল। খুলে কাচ দুটো রুমালে দিয়ে ঘষে ঘষে মুছল। তারপর যেন নিজের মনেই বলছে, এমনি ভাবে বলল, অথচ আমার মনে হয় ব্যাপারটা আদৌ জটিল নয়। আচ্ছা, আপনি মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বলে সব কিছু খোলা-খুলি আলোচনা করেছেন? শেষের কথাগুলি ভীষণ মিয়র মুখের দিকে চেয়ে বলল।

: না। সে চেষ্টা আমি করিনি। ভীষণ মিয়র ক্লান্ত ভাবে উত্তর দিল। মেয়ে আমাকে প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলেছে। এত কথা আমি বিমলের কাছ থেকে শুনেছি।

: সে কেমন ছেলে?

: অমন ছেলে হয় না। সজ্জন, ভদ্রবান, চুপচুক ছেলে সে। সংসারে সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন।

: বাবহার?

: আমার মনে হয়না অমন ছেলের ব্যবহার কখনও খারাপ হতে পারে। ভীষণ মিয়র কেশ উত্তেজিত হ'ল। এক এক সময় ইচ্ছে করে—

: কি ইচ্ছে করে?

: না, কিছু না। ভীষণ মিয়র কেশ ক্লান্ত হ'ল। তারপর একটু থেমে নিজের চওড়া কপালে হাত চৌকিয়ে বলল, এ আমার এপালের দোষ। নইলে খুব সাধা কি মা, আকর বংশেই এ রোগ ছিল না।

বিকেলের রোদ তখনো পৌরবে লাফিয়ে অনেকটা সরে গেছে। বাইরে ট্রাম কি বাসের আওয়াজ কি মানুষের চলাচল বেড়েছে। ওরা চেয়ার ছেড়ে তার আলসামাটা ভঙ্গ।

: আমার মনে হয় মেয়েটি [illegible] সংসারের অভাবে।

কারাই কেউ খোলসা করে বলেনি। ... একটি মেয়ে পর পর চার বছর ... জননী হ'ল অথচ সংসারের ... মন বসাতে পারল না কি মা হওয়ার ... টুকু দুর্বল না—এ হতে পারে না। ... মহমুদার কেন নিশ্চয়েই দাঁড়িয়ে ... । সন্তানের জন্মের পূর্বে যে বেদের ... ভাবান্তর নেই অথচ জন্মের পর ... যে আবহ্যাদাল্ড হয়ে পড়ে... ... সংসারের বাইরে না হওয়াই ... বিধা অথচ সে মা হওয়ার

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ব বিখ্যাত ... জ্যোতির্বিদ ... রেখা বিশা... ও তান্ত্রিক, ... ম ... যে ... হো পা ধা ... ত ... ডঃ ... ক্ষত্র শাস্ত্রী যোগবলে ও ... ক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি ... কোণিত গ্রহের প্রতিকার এবং ... ধারণা-বোর্ডধারণ নিশ্চিত ... ফল করাইতে অনন্যসাধারণ। ... । গ্রহ ঘটনার ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে ... নই কোষ্ঠী উদ্ধারে অদ্বিতীয়।

। ফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ

... শান্তি কবচ :—পরীক্ষায় পাশ, ... সম্ব, শারীরিক ও মানসিক ... অকাল মৃত্যু প্রভৃতি সর্বদুর্ঘটনা ... , সাধারণ—৭৲, বিশেষ—২০৲

... হলা কবচ :—ব্যবসায় জয়, ... ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে ... হয়। সাধারণ—১২৲, ... ষ—৪০৲।

... গীতত্ত্ব মহাশয়ের লিখিত ... দ্যা বিচারের নিয়ম ও সরঞ্জামসহ ... । ডুয়েল অব পামিস্ট্রি— ... ষী) ৭৲। সাধুত্রিক ... ন্ত) পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য ... ষ সংস্করণ—৬৲ টাকা।

... ষ্ট্রাউস অব এস্ট্রোলজি ... ন ৪১-৪৬১০) ৪৫এ, এল. সি. ... ই রোড, কলিকাতা—২৬

বিরুদ্ধে এ প্রশ্নে কখনও প্রতিবাদও করেনি।

জীবন মিত্র যেন একটা ধাক্কা খেল। প্রথমটা কথা বলতে পারল না। পরে আমতা আমতা বলল, মেয়েরা বিয়ের পর সন্তানের মা হবে এটাই আমাদের স্বাভাবিক ধারণা। আমিও সংস্কার করেছি, অন্যায় কিছু করি ছেলে-পুলের মা হয়নি।

ডাঃ মহমুদার চোখে চোখে চেয়ে হাসল এবার। বলল, ডাক্তার এ চিকিৎসা-কেই বেছেছেন। কিন্তু সেটাও কি ঠিক হ'ল? আমার বিশ্বাস ওনার স্ত্রী সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু আপনি কি ওঁর মনের জটিলতার খোঁজ নিয়েছিলেন? তার চেয়েও বড় কথা দুটো দুর্ঘ এক নয়। এবং বলাবাহুল্য, আপনার স্ত্রীর মানসিক গঠন ও আপনার স্বভাব একই নয়।

জীবন মিত্রর এসব কথায় অস্বস্তি লাগছিল। চিরটাকাল মাস্টারী করে এসেছেন। কথাবার্তা চিন্তায় একটা সীমানার আদর্শ সর্বদাই লালন করে এসেছিলেন। জীবনের সঙ্গে ঠিক এমন করে মুখোমুখি হবার কথা কখনও ভাবেন নি কি বলবেন বা কি জবাব করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ছোট ছোট নিজস্ব মন নিয়ে মানুষ বাঁচে, এটা তার ধারণায় আসবে।

সেদিন ডাক্তারের চেম্বার থেকে প্রায় মাতালের মত বেরুল জীবন মিত্র। অনেকটা পথ পর্যন্ত একটাও কথা বলল না সতীর সঙ্গে।

দু'পাশে অজস্র মানুষ। ট্রাম, বাস গাড়ী। কিন্তু কোন্ কিছুই তার চোখে পড়ছিল না যেন। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে, চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট, সেইটা যেন মনে হচ্ছে চলার পাঁচড়।

: তুমি কিছু খেয়ে নাও বাবা। অনেকটা পথ আসার পর খুব জোর করে অনুনয় করল সতী। জোমার বিকেলের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

থমকে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল জীবন মিত্র। চোখে ফিরিয়ে সতীকে দেখল। তারপর বেশ পা বাড়িয়ে উত্তর দিল, না, থাক। শরীরটা ভাল লাগছে না।

কিন্তু চৌরঙ্গীর বাড়িওয়ালা বাড়িটা পেরুতে পিয়েও দাঁড়াল জীবন মিত্র। সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কি এখানি বাড়ি যেতে চাস?

চোখে চোখে চেয়ে ম্লান হাসল সতী। অস্ফুটে বলল, না।

: তা'হলে চল্ একটু ময়দানের মাঠে বসে যাই। জীবনে কোনদিন এখানে বসবার সাধ হয়নি কিন্তু আজ ইচ্ছে করছে।

।

চৌরঙ্গীর বাস্তা সিকদার সাহা পার্কে লেবিয়ে এগিয়ে এসে ধাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে অনেকটা পথ হাঁটল দু'জনে, কিন্তু কেউ কথা বলল না। না জীবন মিত্র না সতী। যেন এই বেশ, এই মা কথা বলে দু'পাশের অজস্র মানুষ, বিচিত্র পরিবেশ, গাড়ী ঘোড়ার দ্রুত চলা-ফেরা, সব কিছুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলার মধ্যে তারা দুজনেই আশ্চর্য আনন্দ পেয়েছে।

: মাঠে কোথাও বসবি? জীবন মিত্র এক সময় উদাস হয়ে মেয়েকে প্রশ্ন করল।

: না, এই বেশ লাগছে। সতী চলতে চলতেই উত্তর দিল।

: তা হলে চল গঙ্গার পাড়ে যাই। কতদিন গঙ্গা দেখিনা। ছোট বেলায় জাহাজ দেখার জীবন সখ ছিল।

: এখনও আছে। সতীর দু'চোখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হ'ল। কিন্তু তাহাতে চড়ার সখটা আর মিটল না।

জীবন মিত্র সে কথার কোন উত্তর দিল না। বলতে বলতেই ঘাড় ঘোঁকিয়ে আকাশ দেখল।

নীল আকাশের অনেকটা জুড়ে সাদা মেঘ। যেমন একটা পুজো পুজো ভাব এর ভাবের মধ্যেই যেন লাজুকায় হারিয়ে পড়েছে। অথচ এখনও বর্ষাই শেষ হ'ল না।

মোদের ছেলে অনেকটা জমে গেছে। পূর্ব ছোট উইলিয়ামের ওপাশে মেঘে যাচ্ছে জল। মাঠের এখানে ওখানে ঘাস। খেলায় মাঠগুলির আশেপাশে প্রচুর ভীড়। মানুষ এবং ফিরিওয়ালার। এখানে ওখানে বৃষ্টির জল জমে আছে। কোথাও গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়। এখানে ওখানে দু'টো একটা ঝোড়া বেলা-গাম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পঁচমে একজন চিটাচট করছিল বেহ। কিন্তু মাঠের ঘুরঘুরে ভীলা হাওয়ায় সে ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে।

: আইসক্রীম খাবি? আবার পথে কেউ একসময় সতীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

সতী চোখ তুলেই হাসল। ঘাড় নেড়ে অস্ফুটে বলল, না।

: কেন, খা না

: ঠাণ্ডা লাগে?

: খুব সাবধানী আমার কি এটা আইসক্রীম খাওয়ার বয়েস। বরং তুই খা।

: না, তা'হলে তোমাকেও খেতে হবে।

জীবন মিত্র এবার অপ্রস্তুতের হাসল, বলল, জীবনে তো কোনোকিছু কিনে দিয়ে দেখলাম না, ও সতী কেমন—

: সাধটা না হয় মিটিয়েই নাও। সতী হাসছে। কখন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মোটামুখ।

জীবন মিত্র লজ্জা করল। হেসে বলল, সাধ বলতে কিছু নেই। তোরা সুখী থাকলেই আমি সুখী।

: তা'হলে খাও, আমি তাহলে খুশি হব। টানটান করে বাবার মুখের দিকে তাকাল সতী।

: চল, বাঁস কোথাও।

: চল, তা'হলে উল্টে গার্ডেনে যাই। কতদিন যাই না। সতী বলল। সেই ভবে ঢোকার মুখেই একবার মেয়েদের সঙ্গে পিকনিক করতে এসেছিলুম।

তাই হ'ল। শেষ পর্যন্ত দু'জনে উল্টে গার্ডেনে ঢুকে জলের কাছাকাছি একটা বেঞ্চ দখল করে বসল।

সামনে ছোট লেকের জল। চারপাশে অজস্র সবুজের সমারোহ আর তাকে ছাঁড়ুয়ে কেমন ছায়া ছায়া ভাব, দুটোও মানুষ খুব বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। সতীর কেন জীবন মিত্রকেই খুব ভাল লাগছিল।

এক সময় আইসক্রীমওলাকে ডেকে দু'জনে দুটি আইসক্রীম খেল। খেতে খেতে জীবন মিত্র হেসে উঠল। নিজেকে যেন এই মুহূর্তে খুলে পড়ুয়া ছাত্রের মত মনে হচ্ছে।

সতী আইসক্রীম খাওয়া শেষ করে সামনের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, দেখাদেখি জীবন মিত্রও ছুঁড়ে দিল। তাই দেখে সতী হাসল। বলল, তোমার একটা ছেলেমানুষি দিক আছে।

জবাই বলায় মন ভরে হাসল জীবন মিত্র। বলল, তোর মা থাকলে প্রথমটা বিশ্বাস করবে না। আর করলেও তোকে হিংসে করবে।

: কেন?

: তাঁর যৌবনকালে তো এসব ভোগোনি কিনা আমার। বলে, নিজেই খুশিতে চাপা হাসল।

নিজেকে সচকিত করে দিয়ে সতী হেসে উঠল। বলল, তা'হলে আমারই কিছু বলো।

জীবন মিত্র যত দেখছে সতীকে ততই অবাক লাগছে। এ যেন এক নতুন আলোয় সে দেখছে নতুন। কি কখন বলে ফেলছে সতী নয়। ওর বোধ আছে, ও ঠিক মুখ নয়। কথাটা ভাবতেই এখন কষ্ট এবং লজ্জা পাচ্ছিল তার। কে অসুখ। সতী? এই কি তোমার লক্ষণ?

এই মুহূর্তে সতীকে চিনতে তার আর বাকিই কিছু রহে যাচ্ছে।

সতীর বিবেকের আলোটা এতক্ষণ পায়ের কাছে ছিল, সেটুকুও যেন সমস্ত ঘুরে গেল। এবং তারপর সমস্ত পরিবেশটা হঠাৎ আশ্চর্য সুন্দর এবং মিষ্টি হয়ে উঠল।

আরো পরে আকাশটা লাল হয়ে সতীর মুখের ওপর তার আভা পড়েছিল। টানটান করে মুখ খুলে। অসুখ বলে আবারও বিশ্বাস চাঁদ জীবন মিত্র। লোভটা সামলাতে পারল না। বলেই ফেলল সেই কথাটা: তোকে এখন দেখে মনেই হচ্ছে না তোর কোন রোগ আছে।

জীবন মিত্র ভেবেছিল চমকাবে সতী। কিন্তু আদৌ তা'হল না। সতী চমকাল না। হেসে বলল, কে বলেছে আমার রোগ আছে। তোমরাই তো তোর ওপর তোকটা চাপিয়ে দিয়েছ।

: তা'হলে তোর অসুখ হয় কেন। জীবন মিত্রর গলা ছোট হ'ল।

: কেমন হয়।

: তোর কাছে মন বলে না। কিছু ভালো লাগেনা।

কি—

মনে মনেই উত্তর দিল না সতী। একটু হেসে বলল, সে কথা তো কোনোদিনই তোমরা জানতে চাওনি।

সতীরও গলার স্বর ছোট হয়ে আসছিল। ভিজে ভিজে।

: কি কথা?

: এই যেন আমার কিছু ভাল লাগে না। কেন আমি সংসারে মন বসাতে পারি না।

: না হয় বল, সে কথা। জীবন মিত্র কেন সতীর মুখের দিকে তাকাল। লাল আভাটা তখন সরে যাচ্ছে। ধূসরতা এসে ক্যাকাশে।

সতী কথা বলল না। মুখ নামিয়ে জলের দিকে চোখ মেলল।

: আমি তোর বাপ আমাকে তো তুই সব খুলে বলতে পারিস। জীবন মিত্র জোর করে যেন জানাল। তোদের আমি বুঝতে পারি না।

: বুঝতে চেষ্টা করনা তাই। সতী মুখ তুলে জীবন মিত্রর দিকে তাকাল। তোমরা বড়, তোমাদের ভাবনাও বড়।

হঠাৎই দু'জনে চুপ করে গেল। যেন দু'জনেই কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে।

বিকেলের ছায়া ঢুকে পড়েছে আশপাশের ঘরে কি তার আশেপাশে। সামনের জলের উপর গাছের ছায়া এখন ঘাড়।

: আমাকে তুমি পাঠিয়ে দাও বাবা। আমি বাসায় ফিরে যাব।

: এরই মধ্যে? যেন চমকে উঠে মুখ তুলে প্রশ্ন করল জীবন মিত্র। কেন, এখানে কি অসুবিধা হচ্ছে তোর?

: না।

: তবে? ভালো লাগছে না?

এবার ম্লান হাসল সতী। বলল, ভালো তা আমার কোথাও লাগে না।

: তা'হলে আর কটা দিন এখানে থাকতে আপত্তি কি?

: তা'হলে কি হবে? ভাল হবে চিকিৎসা হবে? সতী হাসছিল। হেসেই কথা বলছিল।

সে কথার উত্তর ছিল না জীবন মিত্র। চুপ করে জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

: আমার বিয়ে হয়েছে চার বছরের ওপর এর মধ্যেই আমি তিনটি সন্তানের মা। সতী কের বলল। আর এই তিনটি সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের অসুখটাকেও আমি খুব অনুভব করেছি। কিন্তু আরো যে কত? আমি তখন কি করব বলতে পার?

সতীর গলার স্বর কি ভোরের মত পাখীদের কলরব। জীবন মিত্র পড়ুয়া হয়ে গেল। এ যেন অনেক বিদ্যুৎ আলোর সতী নয়। জীবন দৃষ্টি, কঠিন মুখের

ব। —তুমি আমার মাথা। মরা
ন এ সব কথা বলা। কিন্তু যে
কটাকে বিশ্বাস করে তুমি তার হাতে
যাকে তুলে দিয়েছিলে সে যদি সেই
না বোঝে, তা'হলে আর বোঝাব
ব বলতে পার আমায়? বলতে
।"

বলতে বলতে সতী উত্তেজিত
ল। বিস্ফারিত করে তাকাল ওর
। ঐ চোখের পাতা।

জীবন মিত্র একটু নড়ে চড়ে বসল।
ক্লান্তি দূর করার জন্যে দাঁতা ভাঙল।
"—আমি আরো লেখাপড়া শিখতে
ছিলাম তুমি জানো, আমার স্কুলে
ী করার শখ ছিল তুমি তা পূরণ
ন। তাড়াহুড়ো করে মেয়ের বিয়ে
। দিলে, মেয়েকে সুখী করার জন্যে।
ে আমার সুখ? আমি কি এই
চেয়েছিলাম?"

সতী যেন ভেঙে যাবে জীবন মিত্র'র
মনে হল। নিচে ঝরে রাখল
একটা। আর তখনই দুর্বল জীবন মিত্র
আর সে লড়াই চালাতে পারল না।

—আমার বয়েসের অনেক মেয়ের
বিয়েই হয়নি আজো। তারা আজো
জানেনা যা হওয়ার কি জ্বালা, কি ভয়।
—এ আমার ভয় তাহলে আমার সব
কিছু ওরে আঁকড়ে ধরে আমি আর যা
করে চাইনা। যা করে আমার জীবন
ভয়, জীবন ভয়....." বলতে বলতে
জীবন মিত্র'র গলায় আটকে রাখল সতী।
বোঝে, যা ভা বলে ফেলল।

কিন্তু জীবন মিত্র? সামান্য পর্যন্ত
ভাবতে পারল না সে। নিথর যেন কাঠ
হয়ে বসে রইল। সতীর চোখের জলে
তার জামার একটা দিক ভিজে গেল, সে
খেয়াল করল না, সতী কাঁদছে, কিন্তু
প্রবোধ দিতে পারল না। কি বলবে?
কোন ভাষাই কথা বলবে না।

সতীর মনে পড়ল তার।
ঠিকাদার তাকে এড়িয়ে এসেছে।
নিজের পথ নিয়ে, মানুষের পথ মানুষ যে
একাই পার হয়ে যেতে হবে। এই
একটি অনুভবের মুখ ফুটে জানানো।
—ঘর আর বাইরের কথা। সারাটি সন্ধ্যের
মুখের দিকে চেয়ে সমস্ত দুঃখ অভাব-
অভিযোগ ভুলে যে কাছে পাবার কথা ভেবেছে
সে। সেটা কি জীবন মিত্র তা'হলে
বোঝেনি?

তাহলে কি সেই ঠিকাদার মেয়েকে
আর ওরে ফিরিয়ে দিল?

আবার চোখে জীবন মিত্র'র পূর্ব
মেয়েটা ফিরে আসছিল। যেন এবার
আসল ফিরে দেখবে সতীকে নিয়ে।
দুই চোখে মোটা মোটা দুঃখ আছে, তিক্ত
বিতৃষ্ণা ঘর করছিল। চোখের দৃষ্টি
ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল।

জীবন মিত্র জোর করে চোখের পাতা
বুঁজল। বুঁজে ফেলা চোখের কান্নায়
রোধ করল।

না, জীবন মিত্র কাঁদবে না। মানা
তাকে সাজে না। শুধু সতীই কাঁদুক।

আনন্দোৎসবে
অপরিহার্য

'তাতাভুরা' মার্কা মসৃণা 'লষ্টন' মার্কা মসৃণা
'ঘোড়া' মার্কা আটা 'ঘোড়া' মার্কা আটা

প্রস্তুতকারক :
দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোঃ লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস :
শ ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ.

নিবেদক : চৌধুরী এণ্ড কোং ৪/৫, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

রূপান্তর না ভাঙন

নলিনী কিশোর গুহ

গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী সমাজ-জীবনের এত বড় পরিবর্তন আর হয়নি। ইহার নৈতিক অর্থ নৈতিক ও সামাজিক যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তালিকা দিয়া সে সম্বন্ধে মোটা কথা বলা এবং শেষ করিয়া দেওয়া যায় না। বাঙালী সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। সেই পরিবর্তন বা রূপান্তর কতটা সচেতন হইয়া আমরা আনিয়াছি, কতটা বাহিরের প্রভাবে আমাদের অজ্ঞাতে ঘটিয়াছে—অন্তরস্থ আসিয়া বিচারে তাহাও বুঝিতে হইবে। এই বাহিরের প্রভাব বলিতে সাধারণতঃ আমরা বিদেশী সাম্রাজ্যিক প্রভাব বুঝি। এই বিদেশী বাহিরের প্রভাব ছাড়াও বাঙালী সমাজজীবনে অন্তর পরিবর্তন আসিয়াছে। আমরা তাহা দেখিব।

কৃষি ব্যবস্থা ভিন্ন

আমরা জানিয়া রাখি এবং গোড়াতে জানিয়াই লইতেছি যে আমাদের দেশের শতকরা ৭৫।৮০ জনই কৃষিজীবী। ইহার অর্থ কৃষিকার্যই সমাজের অধিকাংশ লোকের একমাত্র জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল। কিন্তু আমাদের আট বেলায়, ৫০।৬০ বৎসর পূর্বের সেই "দশে কর্মে" নানা শিল্পকর্মে, নানা বৃত্তিতে সমাজের লোক-জীবিকা অর্জন করিত। যাহা আজ প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে:

"শাঁখারি কাঁসারি করে ঝনঝনি" মিলাইয়া। এ-শ্লোক মিথ্যা নহে। কিন্তু শাঁখারির সংখ্যা মুসলমান জোলার সংখ্যা কিছু কম ছিল না। ছিল তাহা সূতোর প্রভাব মিথ্যা। অথচ শিল্প হিসাবে ছিল তাঁতি-বিনাশ শিল্পের হল। কারিগর, ব্যবসায়ের এমনই বিরাট বিস্তারের বৃত্তিজীবী লোকের সংখ্যা কম ছিল না। কর্মকার কুমার ছুতার কামার—ইহারা ত' পড়াইত না—বৃত্তি—তাঁত তাঁতি তৈরী করিয়াও তাহারা জীবিকা অর্জন করিত। কুম্ভকার-হইতে জীবিকা অর্জন সহজ ছিল। তাহারা যার মধ্যে কেবল পুরুষের প্রয়োজন-মিটাই করিত না, মেয়েদের বিচিত্র কলা-কৌশল-কারু কৃষ্টিও তৈরী করিত। অন্তঃপুরের কারুশিল্পের কুমারীকন্যা ছেলে মেয়েদের খেলনা-পুতুল যোগাইত। খেলনা-পুতুল শিল্পীরা কারুর 'বাংলার' ও 'কলকাতা' খেলনা পুতুল আনিয়া ইহা লুপ্ত করিয়াছে।

মেয়েরা খেলার কলাবিদের সহজ ভাবের বৈচিত্র্যময় নির্মাণের মধ্য দিয়াই শিল্পকর্মের চর্চাও করিত। ঘরকন্না, উৎসব উপলক্ষ, ব্রত-পার্বণের। ভাইদের স্নেহ ফোঁটা, কাজল মেয়ে আনার মধ্যে বিশেষ ব্রত।

বাংলার পল্লীবাসীর নিজ অর্থ করিয়া জীবিকার পথ এই ভাবে বাঁধা বাঁধা বন্ধ হইয়াছিল। আমরা শিক্ষিত আধুনিক হইবার জন্য ঘনশ্যামিয়াছি, কিন্তু আমাদের পল্লীর এই সকল শিল্পী ও বিচিত্র বৃত্তিজীবীদের জীবিকার কোন বিকল্প ব্যবস্থা তাঁর নাই। তাই এইসব পল্লীর এই লোক অনেক সকল বৃত্তিজীবী হইয়া একবার তাহাদের উপরের জীবিকার সন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কলাবিদ্যা বা বহুল শিল্পের ও বিদ্যা জীবন উপর করে ও তা জীবিকাটানের মার-চেষ্টা করিয়াছে। উহার পরিণাম আজ চোখেই দেখিতেছি।

বিদেশী বাণিজ্যবাদের অর্থনৈতিক অন্যায়ের আক্রমণ মেরুদণ্ডীয়, বিশেষ করিয়া পল্লীর অর্থনৈতিক জীবনের উপর আঘাত হানিল—ধীরে ধীরে জীবিকার বৃত্তিগুলি লুপ্ত হইতে লাগিল—ইংরেজের শিল্প বাণিজ্য প্রসার প্রভাব পল্লীর লোককে বৃত্তি হারা করিল, বলিয়াছি। এছাড়া ঘটিল অ-বাঙালীর জন অনুপ্রবেশ। ৭৫।৮০ বছর এই অনুপ্রবেশে বাঙালী সাধারণ ভিত্তিতে জীবিকার ক্ষেত্র হইতে ক্রমে হটিয়া গিয়াছে তাহা আমাদের এই বয়।

বাঙালী জোয়ান অল্প আরেক ছিল

ঘরে পড়ে মাথের প্রথম আমলে। খুব ও ওয়াজে তখন। কিন্তু তেজের আগে-ফোটা দেখিয়া দেখিয়া কালে কি ছিল-অনুমান করা যায়। আমাদের বাড়ীতে ইট ভাঙিয়া সুরকী করিত। এক বুড়ো এর ভিতরে ও সমবয়সীদের দৈহিক শক্তির কথা ভাবিলে, অবাক লাগিত। এত ভারী সরঞ্জাম তুলিতে পারিত। বাঁশের,-আড়ির গাছিবার—এসব কাজ, তৈলাক্ত পাকিয়া, আড়াই মণ বোঝা। ইহাদের তুলিয়া ঘাড়ে, পরে মাথায় তুলিয়াছি। এমন বলিষ্ঠ দেহ অনেক ছিল।

আমাদের এক জাতি বিচার হইতে একটি কথা লিখা আসিল। বেশ জোয়ান ছিল —বাড়ির কাজ করিত। একবার একটা বেশ বড় আমলের ভাঙা নিয়ে ও বিষ্ণুপুরীর সঙ্গে আমাদের ভাইজ্যেঠা আমাদের বাড়ীতে ও পাড়ার কিন্ন মহলাদের সব কাজ করিত। বৈষ্ণবী পরিবার।। বাড়ী বাড়িয়া গাছার লাকড়ী কাটা হইবে। বিষ্ণুরাণী বলে, ছিন জোকে পারিব। এর কমে হতে পারে না ভাইজ্যেঠা বলে, আমি তেঁতুল গাছ কাটিয়া টুকরা করিয়া চলা করিয়া দিব। আমরা, ভাইজ্যেঠা তাহাই করিল। কাজ শেষ করিয়া, কলাগেছ ঘাম মুছিয়া বলে: "এই বেকতাবাদী পুত-মো—আমাদো সাথে।" এই সব ভাইজ্যেঠার দল জোয়ার বিদেশের হইয়াছে।

অবাঙালী অনুপ্রবেশ

রেললাইন বিস্তারের ফলে বাংলা-দেশে, অবাঙালী শ্রমিকের আমদানী করা হয়। তারা কুলি নামে পরিচয়। প্রথমতঃ রেল ও ষ্টীমার স্টেশনে-ঘাটগুলির আশেপাশে ছোট বেলায় দেখিয়াছি। পরিশ্রম ও পরিশ্রমী তারা বিহারীদের একচেটিয়া দেখিয়াছি।

তখনও গ্রামে হিন্দু-মুসলমান ভাবিক বা মতুরের অভাব দেখি নাই। মালদহ বন্দর কাঁধিবার মতো মানুষ তখন ছিল—মোরা ঘাটে—স্টীমার স্টেশনে, বড় বড় তরী বোঝা বাঁধিবার দীঘা ভাবিক-শ্রমে সকল হিন্দু-মুসলমান পল্লীতে ছিল। কিন্তু ক্রমে বিহারী শ্রমিক • পল্লীতেও ঘুড়ায়। আমাদের বাড়ী হইতে ১ মাইল দূরে কমলাবাটী স্টীমার স্টেশন।° বড়বন্দর। সেখানে বিহারী কুলির সংখ্যা ৫।৬ শত হইবে। ইহাদের উপার্জন কম নয়। একবার স্টীমার স্টেশনে নামিয়া (তখন আমাদের ছেলেবেলা) আমের° ঠোঙা বাঁধিতে একজন হিন্দু কি মুসলমান বাঙ্গালী পাইলাম না—যে মোট ঘুইয়া খাইতে পারে। পল্লীর অবস্থা তো জানিতাম। ইহাও তো সত্য নয়, যে পল্লীর সকল লোকই সচ্ছল, খাইয়া পরিয়া সুখেই আছে, কোন অভাবে তাহারা মোট মাথায় করিবে? আসলে কিন্তু তাহা নহে, প্রথমে ওধাই বলে তারী বিহারী কুলিদের সঙ্গে তাহারা প্রতিযোগিতায়ও টিকিতে পারে না, দৈহিক শক্তিও, অভাব অনটনে, অর্ধাহারে, অতিমাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে।

আমাদের গ্রামে পালকী ও ডুলি (পূর্ববঙ্গে বলে দোয়ারী) বহন করিত চৈতন ও বিপিন। ওরা আরো দুই চারজন ছিল। ওরা ছিল সিলেটের লোক বর্ষাকালে ওরা চলিয়া যাইত। ওদের নিজেদের পালকী ছিল—বাবুদের নিজের পালকীও বহন করিত। শুধু বাড়ীর কর্তাদেরই নয়—বাড়ীর মা বুড়িদেরও ওরা বিশেষ পরিচিত বিহারী ছিল। কয়েকবছর পরে দেখি বিহার হইতে একদল আমাদের বাজারের পাশে ঘর করিয়া বসিয়া গিয়াছে। পালকী ডুলি সবেত। চৈতন-বিপিনরা কিন্তু তখনো ছিল। হিন্দুস্থানী বেহারারা বেশ জমাইয়া লইল। ওরা সংখ্যায় ৭।৮ জন। রাত্রে 'হামা হো বাল্ হো' সঙ্গীত চালায়। ওদের পাল্কী বাড়িতেছে। চৈতনরা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। একদিন চৈতনকে ডাকিতে বিহারি সোয়ারী দিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে। চৈতনের ক্ষোভ সেদিন প্রথম দেখিলাম। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "আর আমাদের দরকার কি? এখন যেরকমের কাঁধে চড়িয়া যি-যো যায়।" ওদের একচেটে বৃত্তি ছিল, ৩০।৪০ বছর ধরিয়া, আজ তাহাতে আদিয়া বাহিরের লোক ভাগ বসিয়াছে। ট্রেনের আগে দুই মাইলই ওর দুটিচারটির আশায় ক্ষোভ প্রকাশ করিল। এর পর গ্রামে গিয়া চৈতনের আর দেখি নাই। বিহারী-বাহকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। তিনকাল পরে আঁধাকের পল্লীর বাজারেই বিহারী মুটেও দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের যৌবন কালেও আমাদের গ্রামে বিহারী মুটে দেখি নাই। আরো পরে পল্লীর হাটে বাজারে যথেষ্ট বিহারী আমিত দেখিয়াছি। এই অনুপ্রবেশ বড় বড় দোকান করেছে বটেই—পল্লীর ছোট বাজারেও দিন দিন বাড়িতেই দেখিয়াছি। কলিকাতা বা বড় ছোট সহরও সহরতলীর অবস্থা কি দেখা যায়। কেরীওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ফাতাওয়ালা, রিকসাওয়ালা, দুধওয়ালা, কত বলিব, খেয়াঘাটে ঈশ্বর পাটনি নাই, সেখানে হামেশাই পাওয়ারে। এমন কতগুলি বৃত্তি ও ব্যবসায়ে পাশ বিহার লেখাপড়ার লোকান হইতে ছোট খাট কত কর্মে লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক জীবিকার সংস্থান করিয়া লইতেছে।

একটা জাতির জনসাধারণ যদি জীবিকার্জনের সহজ পথ হইতে সরিয়া আসিয়া উকীল ডাক্তার শিক্ষক কেরানী, বা কারখানা অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হয় তাহাতেও একটা সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করা যায় না। যেমন ঠেকানো যায় নাই,—বাঙ্গালী জাতির অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়।

হিন্দু-মুসলমান

আমাদের পল্লীগ্রামে আমরা হিন্দু ও মুসলমান দেখিয়াছি,—কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদ দেখি নাই। বয়ঃ হিসাবে তাহারা স্বতন্ত্র রীতি নীতি আচার মানিয়া চলিত, ধর্ম বিশ্বাসে হিন্দু, ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান, এই চেতনা ও বিশ্বাসেই তাহারা পাশাপাশি বসবাস করিত, সাম্প্রদায়িক চেতনা লইয়া নহে। রাম রহিমের সঙ্গে ফতিন সেখের জমী লইয়া বা হাটে বাজারে বেচাকেনা লইয়া যদি কখনো কলহ হইয়াছে, তাহা রামের সঙ্গে ও বাড়ীর রহিমেরই কলহ—, হিন্দুরামের সঙ্গে ইসলাম ধর্মী রহিমের কলহ বলিয়া, একটা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলিয়া কেহ মনে করিত না। এমনটা মনে করিবার প্রবৃত্তি সমাজে দেখি নাই। বরং 'আমাদের গ্রাম' এই চেতনায় হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখিয়াছি। বয়সে ছোট ছিলাম, কিন্তু বেশ মনে আছে। আমাদের গ্রাম হইতে মাইল তিনেক দূরের আমতলা গ্রামে সংক্রান্তির মেলায় সার্কাসের খেলা দেখা লইয়া আমাদের গ্রামের একটি ছেলে মাখনের ও গ্রামের জনকয় ছেলে মুসলমান ছেলের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই ছিল। তাই লইয়া খেলাধূলোই দুই গ্রামের ছেলেদের মধ্যে মারামারি হয়, সংখ্যায় তখন বেশী ছিল বলিয়া আমাদের গ্রামের ছেলেরা বেশী-মার খায়। তখনো জহরকর্তা-কালদরের (আমরা জহরকর্তা কাকা বলে ডাকিতাম) ছেলের ডাক নাম মনে ছিল। মাখনের মাথা ফাটে। মনে ঠেকাইতে গিয়া হাত ভাঙে। এমনই আরো কম কত আহত হয়। সেকালে কথায় কথায় থানা পুলিসে কেউ যাইত না। গ্রামের মাথা বা কর্তা শ্রেণীর বাড়ীতেই সবখান হইত, বিচার হইত। এই ব্যাপার লইয়াও জাতি জ্যেঠামশাইর বৈঠক খানার মেলা প্রত্যাগত ও প্রহৃত ছেলেরা হাজির হইল। ছেলেদের অভিভাবকও আসিলেন। জ্যেঠামশাই ছেলেদের দেখলেন কথা শুনলেন,—এবার হাসিয়া বলিলেন—মার খেয়ে এসে নালিশ করলে আমি শুনি না। জহরকর্তাকে ডাকিয়া বলেন, ওরে জহর, আমতলী গিয়ে ছেলেগুলো মার খেয়ে এলো—গাঁয়ের মান বাড়লো? জহরকর্তা বলে উঠলেন,—জাইত কর্তামশাই কইলায়, যে-মাখনায় মাথায় লাঠি মারলো, দুই তার মাথাটা ফোঁপাক করে দিয়ে আসতে পারলি না—দুলালচাঁদ। গ্রামের এই অপমান মাথায় করে এলি! আবার বলে, মাখনদাকে বাঁচাতেই তো গেলাম,—হাতে তাই চোট, লাগলো। হারামজাদা নবীর পুতুল—,মান বড় না জান বড় রে! ০ ০ ০ শেষ পর্যন্ত স্থির হইল,—জ্যেঠামশাই আমতলীর গাঙ্গুলী কর্তাকে চিঠি দিবেন। মাখনকে প্রথম যে মেরেছে—তার বিচার চাই,—তাঁকে মাপ চাইতে হবে, এই ক্ষমা চাইবে। নইলে মেলা-সার্কাস সব ভেঙে দিবে, দাঙ্গা দিতে এলে মাথা ভেঙে তবে আসবে। জহর গাঁয়ের লোকজন ঠিক

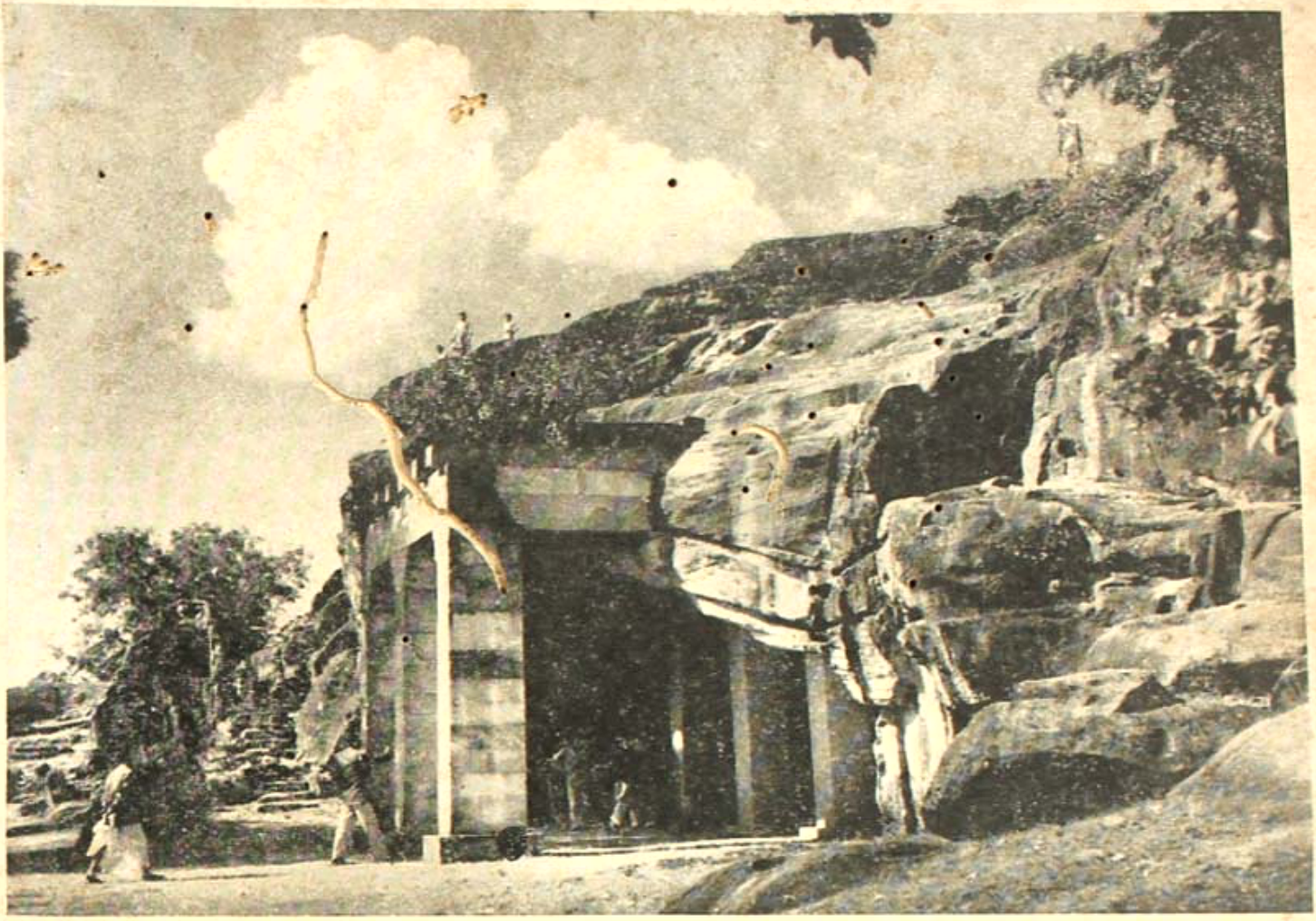

প্রস্তরের স্তব

আলোকচিত্র : অসিত মুখোপাধ্যায়

চরৈবতি, চরৈবতি

আলোকচিত্র : চঞ্চল মিত্র

কে তোমারে দিল প্রাণ,
হে পাষাণ

আলোকচিত্র : দ্বিজেন নাগ

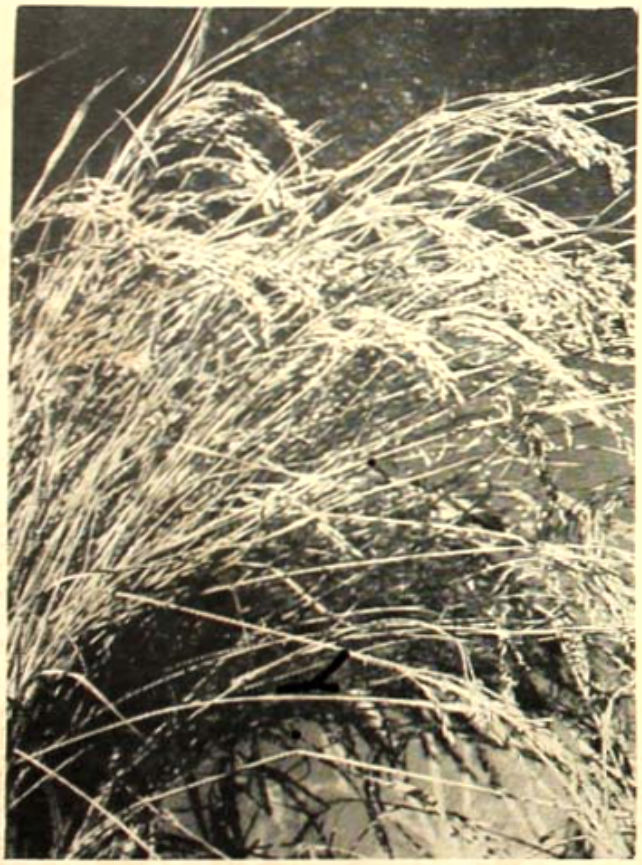

ধরার প্রণাম
আলোকচিত্র : অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

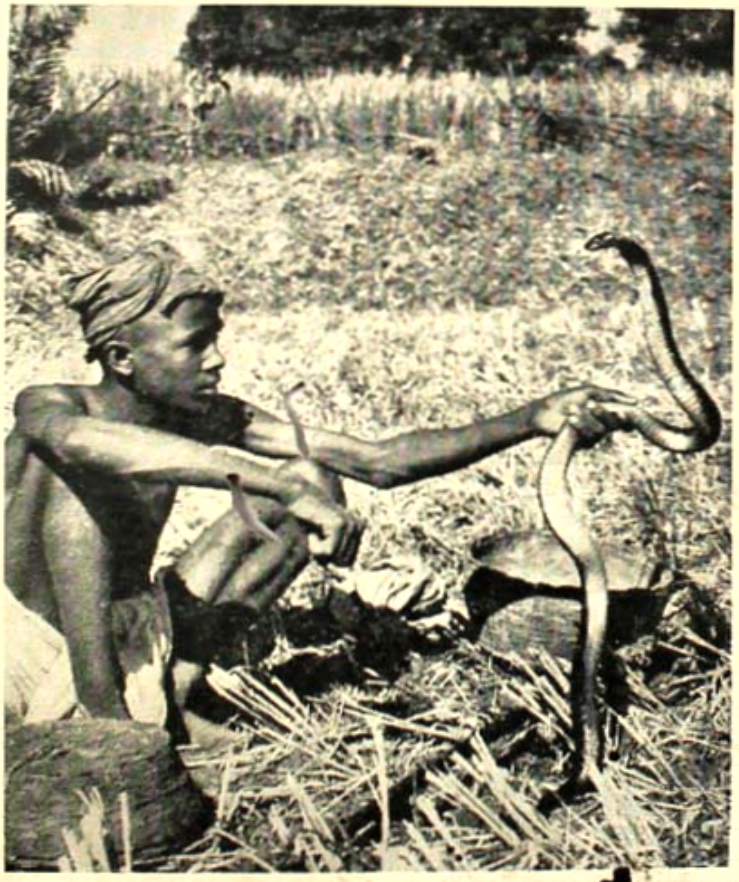

ভয়ের মৃত্যু
আলোকচিত্র : রামকিংকর সিংহ

-বিচার তবা যদি না করে—তোরা
ব করে আনবে—পারবে না?
ন্দী কাঁপা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,—
সো কর্তা—আল্লাই তো আছে।
টা জোয়ান ছেলে. আছে, তারা
মতো না। পাড়ার পাড়ায় খবর
—একশ লোক দেবো কর্তা, আপনি
যেন না। গাঙ্গুলী মশায় সুবিচার
ব ভাল.—নইলে আল্লা তখন
গাই সুবিচার করে ফিরবো। সভা
ছিল চললো। জাইবক অভিযান—
ব যান রাখতে—গ্রামের হিন্দু-
মানের অভিযান।...গাঙ্গুলী মশাই
চার করে ছিলেন।

• • •

আমাদের গাঁয়ের ৪ মাইল উত্তরে
মপুর বেকারী বাজারে মুসলমান
পাড়া ছিল-বড় মুখরাক। ওদের
ক খানি ছিল, এছাড়া নৌকা
তো। নৌকা নিয়ে, সবিনা
নো নিয়ে নিরীহ লোককে ওরা
তো. লাঞ্ছনার ভয়ও লোকের ছিল।
াত 'শ্যামাকান্ত' বন্দ্যোপাধ্যায়
ধে হম লোহংযামী) বাঘের সঙ্গেও
াই করতেন—গ্রামের শক্তির জোরে।
র গ্রাম আইচল হইতে বাড়ীর
ার ভেল জাজাইতে নিয়াছেন,
ুর পাড়ায়। ওজন করা সবিনা
র চাকর গিয়েছে জানাতে। কলুর
ল বলে, সবিনা কম। ইহাই ছিল ওদের
জানী। ফলে শ্যামাকান্তকে অগ্রসর
তে হয়। প্রথম হোলসাল পরে লাঠা
ঠ। শ্যামাকান্ত একাই একহাতে
ার লাঠি অপর হাতে বৈঠা
ে কলুদের সঙ্গে লড়াইতে ওদের
ন মার মারিলেন,—যে, বহুদিন
া শিক্ষা কলুরা ভোলে নাই।
াকান্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ, কলুরা মুসলমান,
ন লোকালে কেহ ইহাতে সাম্প্র-
ায়িক রং মাখায় নাই। বরং তোন
নে প্রবীণ ও পরম কলুই মন্তব্য
রছেন, এ হারামীদের ঠাণ্ডা করিবা
াছিল—শ্যামাকান্ত। যেমন কুকুর,
ন মুগুর। সাম্প্রদায়িক চেতনা
থায়?

সমাজ পরিচালনা করিয়া লইয়াছিল
ন্দু তার ধর্ম আচার নিয়ম পালন
রবে, মুসলমান তার ধর্ম আচার নিয়ম
লন করিবে। নিরাপদ দূরত্ব বজায়
ুকে মুসলমান এলাকা করিয়াছে।
নির্বাচনে দুই সম্প্রদায়কেও হিন্দু-
গণ এলাকা দেখাইয়াছে। নিজ নিজ
র্মের প্রতি এতো দৃঢ় ছিল বলিয়াই
বোধ হয় একটা সহজ সহনশীলতা
ছিল, ধার্মিক হইলেই হইল—ধর্মান্ধ নাই
হোক।

আমাদের বাড়ীতে লায়েকালী কামকর্ম
করিত আলি (আলি মুহম্মদ)। মনে
পড়ে মুন্সীর বাঁশের পাঁচা কিনিয়া
আনিয়াছে—আলি। পিসিমা বলেন,—
এবার পাঁচায় এতো দাম কেনরে আলি।
আলি বলে, সস্তা আইব না পিসিমা—
—আশ্বিন মাসে ইন্দু আর পাগল—দুইটের
ঢ. দিয়া ফেলে হাগল। আপনেরা
কাটে, আপনেরা খান, মাইট্টা বুহুত ভলে
ছুবায় ঠ' যা ভিতর হইতে বলেন,
পোড়া কপাইলার কথা শোন" বুড়ীমা
পিসিমা হাসিয়া খুন। বড় ছেলে
মনে করেন আলির ছেলেমানুষী,
অজ্ঞতা। ধর্মের অনুশাসন এ-কথা কারো
মনেও আনে না। তেমনি মুসলমানের
নিকা বা আর হিন্দু বিয়া হিন্দুরাও
বহুত মাছী করিত—আলিরাও তাহাতে
হাসিত—ক্ষুণ্ণ হইত না। আসলে কেহই
আঘাত দেওয়ার জন্য এসব
কথা বলিত না। আজকের আলি যা কে
মায়ের মতোই ভাবিত। আজকের
ওদের মায়ের সেকি মির্জন। যেন বড়
ছেলে। পরস্পর বিশ্বাসের কত না দৃষ্টান্ত।
তেমনি মুসলমান জমিদারের খাজাঞ্চী
হিন্দু দেখিয়াছি। ধর্মীয় রাজনীতি,
রাজনীতির জন্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের
অনাচার তখনো চোখে পড়ে নাই। মনে হয়
বহু বিস্তারের কালে এ-পাপ ধীরে ধীরে
প্রবেশ করে। তখন মার্থের ভিন্নির
উঠে। কারিত বলিত মুসলমান ছিল—
সেখানে ছিল হিন্দু। তাহা সম্প্রদায়ের
নয়।

গ্রামের কণ্ঠের গৌরব

আমাদের ছোট বেলায় গান
শুনিতাম। লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে গান।
কীর্তন বাউল, ভিখমাগের মেলার গান,
জারিগান। আমাদের বাবেলায় পিসিমা
মুন্সীলার প্রস্তাব বা কেচ্ছা শুনিতেন।
কথা অর গানই বেশী। গান করিত
মন্ত্রা মজুরনি)-দের দল। মহরকী
কণ্ঠে কি বহুত জোরই না ছিল। লালন,
গোপাল নাম করা গাইয়ে—তাহাদের
গলা আধমাইল দূর হইতে শোনা যাইত
—ঐ তাহারা আসে। শনিপুজা, নারায়ণ
পূজা রবিদুই লাগিয়া থাকিত—কীর্তন
মালাদের কত গান। লোক অবাক হইয়া
শুনিয়া যাইত।

গ্রামে একা বা একত্র চলিতে চলিতেও
গান গাইত। আর ছাড়া গীত নাই; যে
গানও গাইত, অন্য গানও গাইত সাধারণ
লোকেও গান গাইত ওস্তাদী শিক্ষার
ওস্তাদী গান নয়। কিন্তু গাইত। এমনই
সময় আমাদের এক কাকার গ্রামোফোন
গানে আসিল। রেকর্ডের গান সব।
গাড়ুর গ্রোক শুনিয়া, বিস্ময় হইত,
কেহ কেহ (গাইয়েরা) সংকুচিত হইত।
আমাদের শিক্ষক সুরেশবাবু একদিন
বলিলেন—"কেন কি, এরা গাঁয়ের
লোকের গান শেল লড়াই শেল।
লালচাঁদ বড়ালের রেকর্ডের গান "ছুঁয়
কাদের কুলের বৌ"; পারা বাইজীর
"মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব।"
ইত্যাদি কত সব গানই না পল্লীতে
পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। ফলে পল্লীর
গাইয়েদের মনে দেখা দিল একটা
কমপ্লেক্স হীনমন্যতা। সেই সহজ
আনন্দে উৎসাহে মনের সুখে হাটে মাঠে
আর গান শোনা গেল না। স্তব্ধ হইয়া
গেল।

আধুনিক শিক্ষার সভ্যতার দান

সমাজে ধনী দরিদ্র ছিল; উচ্চ শ্রেণী,
নিম্নশ্রেণী ছিল, অস্পৃশ্যতাও ছিল—কিন্তু
সেদিনের গোঁড়াদের মধ্যেও যে,
মানবিকতা বোধ ছিল তাহার ফলে
উচ্চ নীচের মধ্যেও একটা পরিচয়ের
প্রীতির সম্বন্ধ ছিল—বর্তমানের মতো
বিষয়—ঔপেক্ষার দুস্তর ব্যবধান ছিল
না। কবিত্বোহম মণ্ডল অলচল নয়
ঠিকই। ঠাকুরদা তাহা মানিতেন! কিন্তু
হরিব বাড়ীর সব খবর রাখিতেন।
কবিকে ডাকিয়া খোঁজ করেন, "হাঁরে
কবি, তোর বুলুর বৌ-এর অসুখ
ছিল। সেরে গেছে? মেয়ের সাধ
দিয়েছিস। কবি ও সুখ দুঃখের কথা
অকপটে বলিত—ঠাকুরদাও ওদের
খোঁজ লইতেন—সরকার হইলে বৃদ্ধি
পরামর্শ আর সাহায্যও করিতেন।
ক্রমে আধুনিক শিক্ষিত আমরা সমাজের
কবির সাধারণের সঙ্গে এমনই ব্যবধান
রচনা করিলাম, তবু না বোঝে

আমাদের কথা, আমরা না বুঝি ওদের কথা। আমাদের দুই উকিলবাবু হইল কথা বার্তা সোজাসুজি পরিষ্কার হওয়ার ব্যবধান সৃষ্টি করিল। ভালবাসার পরিবর্তে আসিল মতুয়াবোধ উপেক্ষা। অস্পৃশ্যতার পোড়ামী অপেক্ষা উহা আরো নির্মম। আমরা পুলকিত হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জিলাম—ধর্মান্তরিত হইয়া এলাম। দুইজন নেই। মহকুমার সাব-জেলের বারান্দাতে খাওয়ায় নিমন্ত্রণ। উকিলবাবুরাও নেবেন। মুসলমান সাব-জেলার। মুসলমান বাবুর্চি মুরগী রান্নাই করিয়াছে। একজন যোগী উকিল ছিলেন। হিন্দু উকীল বাবুরা সাবজেলারকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন—তুই যোগা বেটাকে আলগা দেবেন।

মুসলমানের ঘরে।—খাবেন— মুরগী —কিন্তু যোগা উকীলের সঙ্গে খেতে আপত্তি। এই আচরণ গোঁড়া ব্রাহ্মণরা (যিনি নিজেই অস্পৃশ্য মানেন) কখনো করিতে পারিবেন না। এই নতুন শিক্ষিতের যৌলিক সমাজের ভাঙনের আগে আগে জাগিয়া গিয়াছে। রবিমোহন ঠাকুরবাড়ি একেবারে পর মনে করিত না, কিন্তু নূতন বাবুদের কোন ডিফারেন্সই আপন মনে করিতে আর পারিল না। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক [illegible]—"গ্রামে ফেরা" বলিয়াছি—গণ-[illegible]যোগ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু [illegible]জনের কাটল বুঝি এখনো জোড়া লাগিতে বাকি।

বাংলার সমাজ-জীবন—পল্লী-প্রধান। নগর-সর্বস্ব জীবন ছিল না। সুখে দুঃখে সম্পদে সমাজ শক্ত-সাঁকড় ছিল,—দুর্বল ছিল না। পল্লী সমাজের মত মিলন ভূমি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই একমাত্র পল্লীর পরিচয় নহে—পল্লী সমাজের ভাল করার শক্তিও ছিল—বলিষ্ঠ আদর্শ চরিত্রের ন্যায়-নিষ্ঠা-উচিত বক্তা মানুষও ছিল,—ধনীর তাবেদারই সকলে ছিলনা। গোঁড়ামী ছিল কুসংস্কার ছিল—কিন্তু তখনো পল্লীতে শক্ত পিতা মাতা দেখিয়াছি—পুত্র ধর্মভ্রষ্ট বা নীতি ভ্রষ্ট হইলে—'ত্যাজ্যপুত্র' করিবার মতো শক্ত পিতা তখনো ছিল। আজ অনেক সংস্কার মুক্ত উদার বাপ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপার্জনশীল পুত্র অনাচারী (নিজের মতে) হইলে ত্যাজ্যপুত্র করার মতো শক্ত বাপ আর সমাজে নাই। সমাজের বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে—কিন্তু তাহা কল্যাণের পথে শক্তির পথে রূপান্তর না, বিপর্যয়ের ভাঙন।

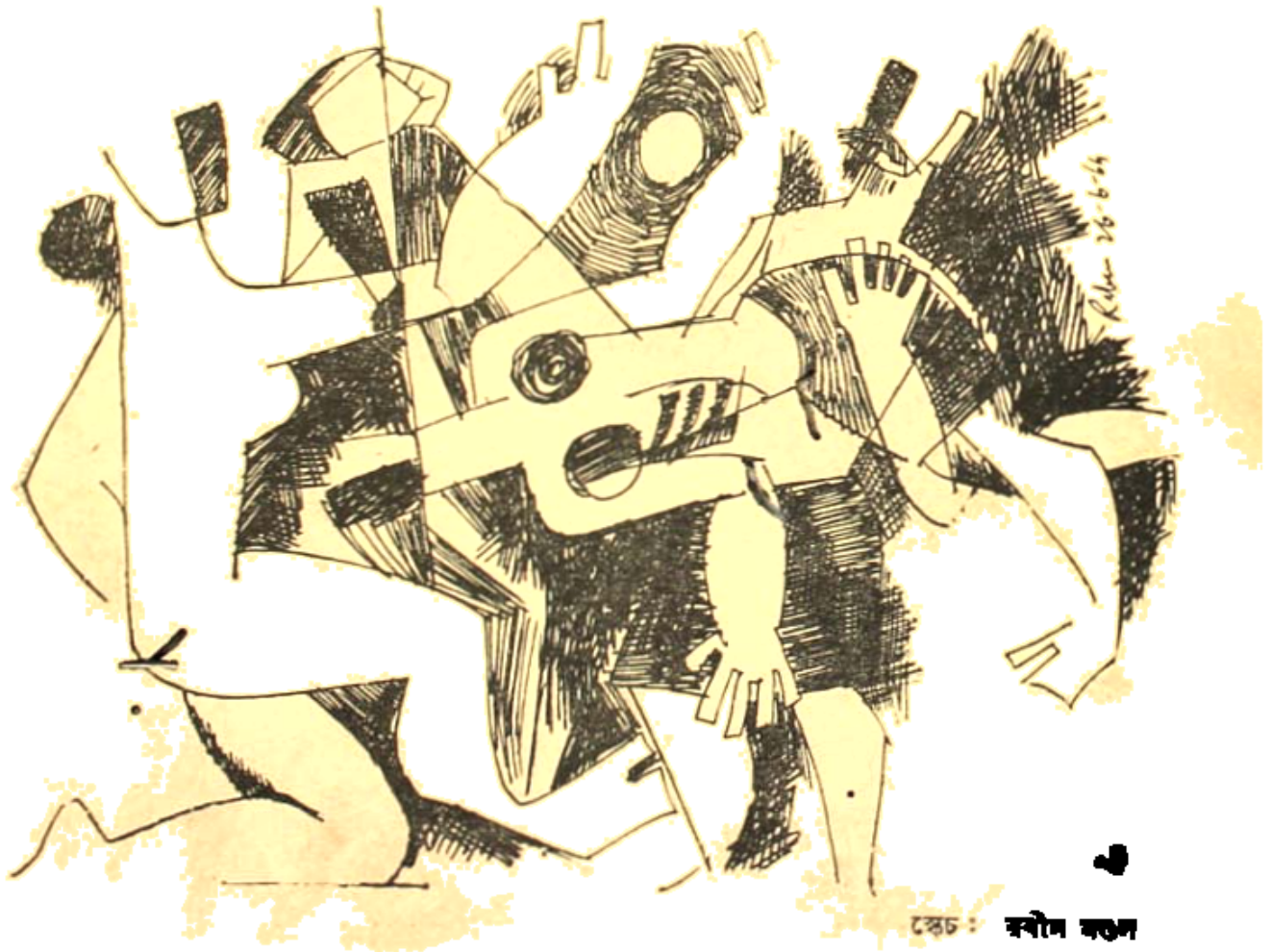

স্কেচ : নবীন মণ্ডল

জ্বলে তারা

সুমথ নাথ ঘোষ

সুব্রত বিশ্বাস

লা। কটাকে দেখলে বুকের ভেতরটা
ছ্ব চব করে ওঠে! কিন্তু
ন দুর্ভাগ্য সরমার! ও তার কাছে যেন
ছরে! তার পাশে যেন চাকা
ি। ঘুরছে ত ঘুরছেই। সকাল
সন্ধ্যা নেই। ক্লান্ত ক্লান্ত নেই। সে
ই চলেছে। কখন কোথায় তার সঙ্গে
দেখা হবে আরও কোন ঠিক ঠিকানা
। ওই পাহাড়ী অঞ্চলটায় যেন সে
ভাত 'চড়াইটা' দিচ্ছে। চোখে ঘুম
। বিশ্রাম কাকে বলে জানে না!
ত বুঝি এটুকু নেই ওর বুকে।
ও নিজেই জানত। সারে ৬'
দীর্ঘ একটা শালের খুঁটি যেন চলে
য়—নিঃসঙ্গে। ওর দেহেরও বুঝি
ন ওজন নেই। ভার নেই। কারু
ত চলে গেলে কেউ টের পাবনা
পলকে জোমাক্তির তবে ওঠে!

প্রথম যে দিন ওকে দেখেছিল সরমা, ওকে উঠে যাবের আঁচলটা টেনে ধরে
। অথচ ব্যস্ত নয়। তখনো
ষি শেষ আলো পাহাড়ের বুকে।
সমহুয়ার বনে ঝলমল করছে। বেলা
তে থাকতেই বাসায় ফিরবে বলে,
াহুকের মাথায় মা উঠেই বসে আসছিল
। সরমা আর তার মা। ঘাড়ি
যার ইচ্ছা ছিল না, আর দুটো পাক
া বাকী, তাহলেই একেবারে একাদশে
হবের যৌবন সে অর্জন করতে পারতো
তঃ ওইটুকু পাহাড়ে না চড়ার লজ্জা
তো। কিন্তু ওর মা কিছুতেই রাজী
নয় না। আবার একদিন এলেই
খন, এখানে ত সরমা দু'তিন মাস
করতে এসেছে। নতুন জায়গা। তবু
া আপত্তি করতে ছাড়ে নি। নতুন
য়গা ত ভয় কি? ওই ত কত মেয়ে-
ুরু পাহাড়ের মাথায় বসে গল্প করছে।
াও ত ফিরবে! সন্ধ্যা হতে এখন
নেক বাকী

ওরা কি করবে না করবে, আমাদের জেনে দরকার কি? এখন মেয়ে ত চল্। বলে শিউন ফিরে সবে করেক পা এগিয়েছেন, এমন সময় বোমাঞ্চিত হয়ে ওরা দু'জনেই থমকে দাঁড়ালো। মাই চার হাতের তফাতে একটা ভাঙ্গল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তিমান! অন্ধকারেও যেন একটা প্রেতমূর্তি! কালো ঝুলকালি মাখা লোকটা পরা উলঙ্গ দেহ, হাতের দুটোয় একটা লম্বা লাঠি, চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে যেন দু'টো জলন্ত বল্লম! তাড়া খরা গলায় সেই প্রথম কথা বলে উঠলো। কোন ভয় নেই, চলে যাও খুকি! ওর কাছে যেমন আমার!

সত্যি কথা বলতে কি, সরমার পায়েরও হাত পা সাঁতা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ওর মুখের কথা শুনে,তবে তিনি আশ্বস্ত হলেন!

লোকটা বোধহয় মুখ দেখেই তা অনুমান করতে পেরেছিল। সেই দু'পা এগিয়ে এসে বললে, আমার নাম তুলসী দর্গিয়ে! এখানকার সব লোক আমায় চেনে। সাঁওতাল পাড়ায় আমার ঘর! তুমের বাসা কোন দিকে মা?

সরমার মা উত্তর দিলেন, উতনবাবু কুরির শিয়ুনে রাম-ঠাকুরের আশ্রম, সেইখানে থাকি।

"উখানে কোন ঘর মা!

ওদের সঙ্গে আমি যাব! কোন বাসাটা বলছে?

সরমা এখন ওকবার থেকে পরিষ্কার জানতে পারলে বাঁচে! চাপাগলায়

বলে, লাস্তভাঙার কিসের এখন তোমার দিকে তবে না। চলে এলো ত মা?

সবমার কথাটা বোঝতে পেরেছিল। বললে, তাঁর ভর্তাছল কেনে! কুছ, ডর নেই। আমার পাহাড়তিহাতে সব আদমী আমার চেনে।

সবমার মা বললেন, আমরা বড়ম এসেছি বাবা, এখানে চৈত্রে। আজ পাঁচাদিন হলো। আমরা আর কাকে চিনি!

তা কোন্ বাংলায় তোরা আছিস মা!

ওই যে মোবালাপাড়ার ভেতরে ফুলবাংলো, তার ঠিক পিছনে বুড় একটা ফুলগাছ কটাকের পাশে। টালির ঘর, সামনের দিকের পাঁচালটা ভেঙে পড়ে গেছে সেই বাড়ীতে।

ও সেই খোলা বাংলোটা? হাঁ হাঁ চিনেছি স্যটক। ওটা ছিল গুজরাটিসমাজ বাবুর জামাইয়ের। সে বিক্রী করেছিল কলকাতার সুরেনবাবুকে। সেই বাবুটার কি হলো বলতো? একবার, দুবার এসেছিল এখানে, তারপর বাড়ি পড়ে থাকে চাবি দেওয়া। একটা মালী দেখেছিল, তাকেও মাইনে দিলে না। দুজন বছর পরে কাজ ছেড়ে চলে গেল। এখন ত বাড়িটা ভেঙে পড়ছে। ঘরের ভেতরও জল পড়ে। কম-বাজো সাপ আর কোন বাবুলোককে আসতে দেখিনি! ও বাবু কি তোমার জানাশুনা আদমী, মা? চেনা লোক।

সবমাদের পিছনে লোকটা বকবক করতে করতে আসছিল। প্রত্যেকবারই জবাব দেবার আগে সবমার মা ঘুরে তাকেন তার এই উজবুকটা থামবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা প্রশ্ন করে বসে।

ঘিরাজের সঙ্গে কিসি জবাব দেব! না, আমাদের সঙ্গে তাদের তোর আলাপ পরিচয় নেই। চিনিস্ না, জানিস না।

তাহলে এ বাড়িটার কে দিলে মা?

তা জানি না। আমার স্বামীর অফিসের এক বন্ধু তোমাকে করে দিয়েছেন। ভাড়াটাড়া কিছু দিতে হয় নি।

হাঁ তবে ঠিক আছে। পয়সা দিয়ে কে এ বাড়ি নিবেক মা?

সবমা এবার চটে উঠলো। আস্ত ছুরি এখন দরা করে নিজের হাত তোমার বকবকানি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ফিসফিস আমার ওপর গোসা হচ্ছো কেন?

না-না-গোসা হবে কেন? আমরা অন্য কথা বলছি। তুমি এখন তোমাদিকে যাবে! সবমার মা প্রশ্ন করেন।

যাবো বেলকলোনীতে, কেনে মা? কুলির সঙ্গে সঙ্গে সেইদিকে একজন দেশী লোককে আসতে দেখেছিলুম। সেই আমার কি বললে। লোকটার মাথায় বিরাট কাঠের বোঝা ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারিনি। এঁদের এলো এবং তাঁচাপাতার তৈরী লম্বা এক ধরনের ঝাঁড় টাঙ্গ থেকে বার করে তাদিকে একটা দিলে। আর নিজে একটু ঘুরিয়ে-আসছে কি সব আলোচনা করতে লাগল! ভয়োধা আমার।

সবমার ওর কথা থেকে মুক্তি পেয়ে যেন বাঁচল। কিন্তু চড়াই উৎরাই ভেঙে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যেমন লম্বা রেললাইনটার ধারে পৌঁছল দেখে অদূরে সিগ্‌ন্যালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুজন। একটা ট্রেন আসছিল। ইঞ্জিনটা যেমন কাছে এলো, ও হাত উঁচু করে নাড়তে লাগল ছোটছেলের মত। ট্রেনটা গেল। তবে চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল দূরান্তরে!

পরের দিন আবার সাক্ষাৎ! সবমা মাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আজ আর পাহাড়ের দিকে যায়নি। নদীটা কোথায় কেমন বলে বড় বাঁধটা পেরিয়ে, পাশবনের ভেতর দিয়ে সবে নেমেছে চালু বালির চরে যেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দুজন, হাতের লম্বা লাঠিটার উপর ভর দিয়ে। হঠাৎ চমক লাগে কি একটা জানোয়ার যেন পাড়া হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো তাড়ে। তারপর ঈষৎ হেসে কালো কালো, দাঁত বার করে বলে উঠলো, বেড়াতে যাচ্ছিস, দিদিমণি?

হাঁ, দেখতে ত পাচ্ছিস, নদীতে নাইতে যাচ্ছি না ত? বলে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সবমা পাহাড়ের দিকে তাকাল।

হাঁ, খুব ভাল, বড় নদীর হাওয়া খাবি, ভক তাকুত বাড়বে শরীরে। এখানে সব আদমী ত জলহাওয়া খেতেই আসে।

সবমার মা এবার খপ করে উত্তর দিলেন, তোমাদের এ পোড়া দেশে এছাড়া আর কি খাদ্যের আছে!

হেসে উঠলো বলাইদা: হাটে সব কিনা মিলে, মা!

হাই হোক, এ সবমার কথা থেকে যে একটা আবহাওয়া তিরি হয়ে পড়লো। তা মা ঘুচে আরো ঈষৎ ফোসিলেন তোমাদের এখানে সপ্তাহে একটা দিন ত হাট বসে থাকবারে। তা একটু দেখা হলে আর কিছু পাবার যো নেই। কতকগুলো নাকা বেঁড়স, পাকা বরবটি, আর শুকনো কচুরমুখি খেয়ে মরো। এমন পোড়া দেশে মানুষ আসে 'ঢেকে'! মেজো ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, এখানকার জল লাওয়া ভাল। মেয়েটার পেটের রোগ সারবে তাই এত ভরসা থাকতে এখানে এসেছি মরতে!

হাঁ, যাইছে। ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছে। এই খুঁকি ত খুব চুবলা—দুটি মাস দুটো মাস থাকো, তাহলে দেখবে কি রকম মোটা হবে!

কি খেয়ে মোটা হবে! শুধু জল আর লাওয়া? না আছে মাছ, না ডিম, না একটা ভাল তরিতরকারী। ভাগ্যিস মেজোলালের মরের ধারে থাকি, তা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মা একটু ভাল খেতে পায়। ওইটুকুই একমাত্র ভরসা।

না না, সব কিছু মিলবেক। এক জরুর ভলকি ভাই কে মাবি না!

হিরণ্ময় ঘরে ঢুকছিল সবমার মা। হাঁ, তোদের এই হাটটা যেন ঘরে আসে; পাকা ঢেড় মাইল পথ। তা যে আসে একটা সাইকেল নিয়া, না কিছু দেখানেই যাও, কেবল হাঁটো আর হাঁটো। তাও কি একটা পথ ঘাট আছে। হাঁ মাঈ, খালা খোলসে, কি জলের ছিরি কিছুটা পাথরের বালের ভেতর, কিছুটা এ ওর বাড়ীর আনাচ কানাচে। খানিকটা চড়াই। খানিকটা উৎরাই পাথুরে মাটিতে পা হড়কে যায়। পথ চলা- মানে রীতিমত কসরৎ করা! খুকীর বাবা একদিন লাঠি নিয়ে এমন হাঁটে ও তোমার মাথা, যে নড়তে পারে না। ঘরে বসে আছে! চলনা বলে, এখানে ত এ রকম আছে, মাঈজি। এটা ত সবে মা এখানে মা বাড়ি ঘর দেখছিস, সব এর পঁচিশ জঙ্গল ছিল। বড় বড় শাল সেগু বহুমার বাঘ কেটে কেটে মানুষ ঘ বসিয়েছে। কলকে বসিয়ে হঠাৎ চা নদীর ধারটার জলের উপর পড়লো এক ঝকঝকে শাল মনের মধ্যে অনুভূত হ হেল। যেন কোন জরুরী কাজে যাচ্ছে

সবাই 'হু—' শব্দে বন্দীর ছুটে বন্ধ, আকাশ বাতাস, পা ভেদ প্রকম্পিত করে একটা 'হেল ফ্রেম' সে গেল।

৮

যদিন ভোর বেলা 'অভিযানের' যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সবাই ঘুমন্ত দেখে তারা পাঁচালটার ভেতর সেই লোকটি সবা লোকটা এদিকে। আসবার সময় ফিরছিল সে— ভেতরে চলে গেল। এবং কাঁপতে বললে যা—যা দেখো সেই লোকটা সব বাড়ির ভেতরে চুকেছে।

সবার বাবা, তখনও ঘুমাচ্ছিলেন। ধড়মড় দিয়ে উঠলেন, চুকছে ও ঢুকেছে তোকে কি খেয়ে ফেলবে।

একটা মানুষ। ভয়ে বলে ফেলে।

মানুষ না হাই—সাক্ষাত যায়।

সবার ঘুম থেকে কথাটা শেষ করার সঙ্গে, ফুল্লরা ডাকলে, দিলদার্শি।

যমা কোন সাড়া দিলে না। ওর ফিরে এলেন। ফুল্লরা তখন ছোট পুটুলির মধ্যে থেকে দুটো মুর্গার দুটো বেরুল, একটা চিচিংফে, ধনবারো উঁচে যায় করে রাখলেন।

সবার মা বললেন, কি হবে ?

দিলদার্শির ঘরে আসলাম ! যাবি ?

ো বেশ ভাল করেছিস। কত দাম হবে ?

ম দিয়ে হবেকলা কিছু।

নাকি ! মা-মা-মা হয় না। তুমি কানুন, কোথায় পাবে ? তোমার যায় নিজের খাবারলা নেই !' বলে ছুটি প্রকাশ করেন সবার মা।

াকে কি। আমার আপনার দিনের আছে।

সবার যায় কণ্ঠ থেকে এবার যেন উদ্বেগ হয়। তোমার মেয়ের দিনের কথা আর ভুলোনা। ওদের ঢিলে কত কেন খারাপ হয়েছে।' পয়লা দিয়ে, মাথা ঘুটলেও কেউ দিনিষ কিনবে না। কিন্তু দিয়ে সৌদর দিনিষই হয়ত অনেক যে বেচে যাবে।

মুখে একটা সবল ভঙ্গী করে উত্তর দেয় ফুল্লরা, হাঁ, উঁহু সব ঠিক।

এতলোকে তুমি ঠিক বলছো ! বলে সবমা আঙিনাটিতে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় তার সামনে। দু-তিনজন দিন সবমা নিয়ে আমি সাধারণার কর্মোদ্যমের বাড়িতে গিয়ে, একটা চিঠি, কি দুটা বেতন উঠছে কেউ বিক্রী করবে বাড়ী চলছি ! কেন আমরা কি সবলা দেখে না, মা ভিক্ষে করতে গিয়েছি ?

উ কথা বলছিস কেনে ?

কেন বলবো না। ওরা এখানে মানুষের কেবলে না অথচ চাটে বিদ্রি কম দামেও তা কিনছেকরবে। তার মানে ওরা বাঙালীদের দেখা করে ! 'বেঙ্গলী-টেরর' উনেছি আমরা বাঙালদের কাছে ! আমে বিশ্বাস করিনি। এখন চাকে চাকে তার প্রমাণ পাচ্ছি ! বলে একটু থেমে সবমা আর এক পলা বলা চড়িয়ে দিলে। বাঙালীদের ওরা আজ তোমরা থেকে পাচ্ছো তুলে যেও না। যত ঘাঁটে আর পাথর আর বালির ব্যবসা, সবই ত বাঙালীদের আর এখানকার সব মেয়েমদ ত সেখানে মজুরী করে বেঁচে আছে। নইলে খেতো কি তুমি ?

সবমার বাবা এবার ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন এই সবো চুপ কর। ওকে ওসব লেকচার দিয়ে লাভ কি। ওকি বোঝে এসবের ?

তুমি জানোনা বাবা। সব বোঝে ওরা, এরা এক একটি বিটামিটে শয়তান। দেখো না আমরা যখন বেড়াতে যেবোই, কিরকমভাবে সব তাকিয়ে দেখে ফুলফুল করে। যেন কিছুই জানে না। নিরীহ গোবেচারী ভাব।

ফুল্লরা বলে, দিলদার্শি তুমি বড়চুট গোঁসা হচ্ছে আমার ওপর।

তোমার ওপর কেন রাগ করতে যাবো ! তোমাদের জাতভাইদের কথা বলছি। বলে সবমা নরম হয়ে যায় সবমা।

ওদের কি কিছু দোষ নেই দিলদার্শি। বাড়িথেকে কেউ কিছু বিক্রবে না ওকে এদের মান যায়। তুমি এমনি চাও খেতে তাহলে সবাই দিবেক। কিন্তুক বিক্রবে না।

ও জাতী ত মান—একেবারে মজুরার জন্যে মড়াকাড়ি যাচ্ছে। বলি যায় তোমাদের আছে, আর আমাদের বুঝি কিছু নেই—আমরা তাই তোমাদের কাছে মাগতে যাবো ! চাইতে যাবো ! কেন ?

সবমুখ, না বলের লাঞ্ছা তোদের মানের ছালা কেইসে বা জলে যায়। এদিকে ত পরনে নেংটি আর দু'টো মাত্র ভাত একবেলা কুকুর ছোটে, তাকর একটু পয়সার আমীন ! কিন্তু লেজগুলা মাটিতে আছে ঘোলাজলা ! তাতবে তবু মচকাবে না। এই বলে একটু নেমে তিনি ফুল্লরাকে বললেন, আজ সারাদিন ধরে এলোই একটা বসনযাত্রার লোক খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলুম ! কেউ দুটা টাকা বাড়ী নয়। বলে উঠায় করলে আমাদের ছাড়ে যাবেক্ ! কত মেয়েছেলের খোয়ারোজ করেছি ! তোর জানাশোনা কোন লোক, কি মেয়ে-ছেলে আছে একটা দেখে দে না ?

ফুল্লরা বলে ওঠে, উঠায় ত কেউ করবেক না যা।

কেন করবে না ? সবমার কণ্ঠ আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমরা কি তোদের চেয়ে নীচু জাত ? আমরা বাঙাল সব চেয়ে উঁচু জাত ?

উঃ ত-সব জানি। কিন্তুক—বলে গলায় একরকমের সুর টানে ফুল্লরা।

তোরা কি জাত যে তোদের এত গুমোর !

তা ও বলতে লাগল দিলদার্শি। একটু চিন্তা করে জবাব দেয় ফুল্লরা আমরা ও জংলী আদেবী ওসব জাতটাতের খবর জানি না !

পরক্ষণে প্রশ্ন করে সবমা, তোর দেশ কোথায় ?

এই ত দেশ আছে দিলদার্শি।

তোর মা-বাপ, তাহলে এখানকার-ই লোক ?

খানিকটা চুপ করে থেকে সে জবাব দেয় তা জানি না। আমি তাদের দেখিনি। একরকম চাপা বিদ্বেষের হাসি সবমার ঠোঁট ভেঙে ছিটকে পড়ে। সবমার বাবা পেছনের থেকে ধমক দেন। সবো কি শুরু করেন ওসব আজে-বাজে কথা তুলছিস। জানিস এরা কিরকম হিংস্র। সর্বনাশ তুমি বলে যাওতো তোমার কাছে। ও মেয়ের কথা তুমি কিছু মনে করো না। বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে আসেন।

আমি, ও তো ছোট খ ভী আছে। তুমি শিগগির একটা সরলমতী করতে

মুখে। তারপর কান থেকে আধপোড়া একটা লম্বা কাঠকয়লা বার করে মুখে গুঁজে বললে, একটু আগুন দেবে। দিদিমণি!

যা-না। রান্নাঘর থেকে দেশলাইটা এনে দে-না। দয়াময় মা চলুনী করেন। সরমা দেশলাইটা ছুঁড়ে দেয় তার দিকে। একটা কাঠি জেলে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, ভয় নেই, কিন্তু ভয় করিস না বুঝি! বলে বাইরে একশ্রেণীর কড়া দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিতে হয়।

ও-মাকু! ও

কি বিশ্রী গন্ধ। ওটা খাস কি করে ওরা মা. আমার বমি উঠে আসছে! বলে নাকে কাপড় চাপে সরমা।

নেক্স স্বাচ্ছন্দ্য

বিভিন্ন সেফটী, বক্-রুলস, কোর কাটিঙ, চলমন্তের ঘোলাটোপ এবং আরও নানাপ্রকারে অনুরক্ষার সৃষ্টি করে। অথারাইজড ডিলার-করা ডক্টরসেট সাসপেন্সর বা বেল্ট আপনার নানা-প্রকার দৈহিক অনুরক্ষার উপলব্ধ অথবা প্রতিরোধ করিতে পারে।

বিঃ দ্রঃ—অভিজ্ঞ মহিলা কর্তৃক আমাদের মহিলা বিভাগ পরিচালিত। ডক্টর শান্তিকার তত্ত্ব পর নিজস্ব ডিজাইন আমাদের ডিজাইন আসিয়া অনুসন্ধান করুন।

গ্রেট মুখার্জী এণ্ড ব্যানার্জী

সার্জিক্যাল প্রাইভেট লিঃ

অর্থোপেডিক ডিসার্টমেন্ট

৩৯।১, কলেজ ষ্ট্রীট (দোতলা)

কলিকাতা

ফোন : ৩৪-২১০১

ওরা যা বলেন, ওরা জানী, অনভ্য। ভাল-মন্দের জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। শুনেছি ওরা নো দাপ খায়, শোয়োর-ডিমের মাংস আগুনে ঝলসে খায়।

ও-মাকু! তুমি চুপ করো না! বলে নাক থেকে কাপড়টা সরিয়ে সরমা মন্তব্য করে, আমার বিশ্বাস ওরা মানুষ খেলেও হাগে না বু!

বাস্তবিক ওরা তাই খায়। সরমাদের বাড়ির আশেপাশে লালবাঁদরের মধ্যে ছোট ছোট কুঁড়েতে ওদের চোখে চোখ পড়লে, সরমা মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। ওদের সেই আদিম হিংস্র, বন্য মূর্তি যেন বীভৎস হতে পারে না। এড়িয়ে চলে যৌনকে ওদের বাসা. সে পথ মাড়ায় না। খাঁদ-চ ডিমের আলোয় ওদের ছিপ-মূর্তি, নিরীহ, সোবেচারী। কিন্তু রাতের অন্ধকারে যেন ওরা খাপদের মত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দিনের বেলা কুঁড়িগুলো থাকে চুপচাপ। মানুষের কণ্ঠস্বর কোথাও শোনা যায় না। পল্লীটা যেন থাকে ঘুমিয়ে। ভোর হবার সঙ্গে. সঙ্গে, মেয়ে-মদ্দে বেরিয়ে যায় শেটের ধান্দায়। কেউ যায় পাহাড়ে পাথর ভাঙতে. কেউ যায় নদী থেকে কুড়ি ভরে বালি বইতে কেউ বা যায় জঙ্গলে কাঠ কেটে ইজারা-দারের জোড় বুক দিতে। মেয়েরা কোলের শিশুকে পিঠে ঝুলিয়ে কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায়। পুরুষরা কাঁধের ওপর বসিয়ে নেয়. ছোট ছেলেটা আবার সূর্য যখন পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকোয় তখন একে একে ফিরে আসে কুঁড়িয়ে। তারপর অন্ধকার যত গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়, ওদের মধ্যের আদিম প্রবৃত্তিগুলো ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে থাকে। একসঙ্গে একটু হয়ে ওঠে নয়নুত্তি নিয়ে। চাঁড়িয়া খেয়ে, মাদল বাজিয়ে নাচ গান করতে করতে, মারামারি খুনোখুনি, চেঁচামেচি! কে কার মেয়ে বৌকে নিয়ে নেয়, তার ঠিক ঠিকানা নেই। সেদিন রাত্রির ঘোটে মারধোরে ঘুম ভেঙে যায় সরমার। লোকজন ছুটে যায় সেই জঙ্গলের দিকে। ভয় বৌ মাঝি স্বামীকে খুন করে পালিয়ে গেছে তার মনের মানুষের সঙ্গে।

পরের দিন তাঁরা পাশ পাড়ায় ঘুরে কয়েকটা চেলা পুঁটি ও ঘুটা মাছ নিয়ে এলো চলতা। সরমার মা বললেন, এর দাম কত?

দাম নিতে করছে না মা।

নইলা আকি কয়! মোর মোর ছাম এমান করে তিনিস নিবে খাবে, আর এর পয়সা দাম নেবে না? ছাম গরীব মানুষ পাবে কোথায়?

চলতা বলে, আমি ত কিনে আনিনাই! আমার লোকেরা নদীতে ধরেছিল. দুটো তোদের তরে নিয়ে এলুম। তোরা আমার দেশে এসেছিস মাছ পাইছস না খেতে তাই।

সরমার মা বৌমাকে এনে আট আনা পয়সা হাতে দিয়ে বললেন, এটা তুমি নিয়ে যাও সর্দার তোমার ছেলে মেয়েদের খাবার কিনে দিয়ো।

সর্দার একটু চুপ করে থেকে যেমন সরল ভাষিতে জবাব দিলে ছেলেমেয়ে আমার ত নেই মাঈ!

তা বৌ ত আছে, তাকে দিয়ো।

না, তাও নেই। বলে হঠাৎ যেন মৌন হয়ে গেল।

সরমার মা আবার দুখের কথাও যেন কে নিমেষে হরণ করে নিলে। কয়েকটা মুহূর্ত এইভাবে কেটে গেল - সরমার মা তারপর বললেন, তা তোমার ঘরে তাহলে কে আছে?

কেউ নেই মা।

সরমা ঘরের ভেতরে চা তৈরী করছিল। সব কথাই তার কানে যাচ্ছিল। তার মা এবার প্রশ্ন করলেন, বৌ কি মরে গেছে?

না মা উ আমার ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল!

আপন মনে খিল খিল করে ওঠে সরমা। পালাবে না. যা দুর্তি, এর সঙ্গে কেউ ঘর করে?

সরমার মা আবার জিজ্ঞাসা করেন, তা তুমি আর বিয়ে করোনি!

হ্যাঁ করেছিলুম ত। সেও পালিয়ে গেল মা।

সরমা এবার ঘাটরে এসে হাসতে হাসতে বললে, ঝাঁটা বিয়ে করেছিলে ঠিক করে বলো ত?

সর্দার একটু ভেবে বললে সাতটা আটটা হবে।

এ্যা সাত আট জনই পালালো? বলে মুখে আঁচল গুঁজে খিল খিল করে হেসে উঠলো। সরমার মা ঘরের ভেতরে চলে গেলেন।

সরমা এবার শুধালো, তোমার বয়েস সর্দার ?

একটু ভেবে সে উত্তর দিলে, তিনকুড়ি কুড়ি হবে দিলদার।

সরমা আবার হাসতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সর্দার বললে, হাসছিস যে। সত্যি বলছি।

সরমার মা এবার মেয়েকে ধমক দেয়। যা, ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা ভাল করবে না। আহা। বেচারী! বলে প্রসঙ্গটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। বললেন, তাহলে ছুটি দুটো দিন তোরা আমাদের এখানে থেকে যেয়ো সর্দার। কেমন ?

না। মা। তোমার ছুটী আমি নিচ্ছি না!

সরমা বললে, তাহলে একটু চা খেয়ে যাও। ওটা ত ছুটী নয়।

হাঁ তাই যে দিলদার।

সরমা চা দিতে দিতে বললে, এর আগে কখনো চা খেয়েছো ?

হাঁ।

কোথায় ?

সেই জনসন্ সাহেবের বাংলোয় ?

সেটা আবার কোথায় ?

উই যে পুলটা পেরিয়ে ওপারে উঁচু পাহাড়টা তার বুকের ওপর লাল রংয়ের বাংলো, ওই খানে। উৎসাহে তার চোখ যেন দীপ্ত হয়ে ওঠে।

কেন, সেখানে বুঝি তুমি চাকরী করতে ? সরমা জিজ্ঞেস করলে।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সর্দার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরমাকে জবাব দিলে, ক'টা বেজেছে তুমার ঘড়িতে মা জী ?

সরমা বললে, সাড়ে সাতটা !

সাড়ে সাতটা হয়ে গেল! আরে বাপরে ! বেলা ত এখুনি চলে যাবেক ! বলেই সে দ্রুত পা চালালেন লালবনটার দিকে।

এই সময় বোম্বাই মেলটা মোড় ঘুরে যায়। থামেনা ত ওই ষ্টেশনে! তবে সব জিনিষ জরুরী, বুঝতে পারে না কি।

সেদিন বেলা বলোনীতেই ছিল দীপুদের। সর্দার প্রায় সাড়ে সাতটা, সরমা, তার মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করে ফিরছিল। বেললাইনটা পার হয়ে যেমন এপারে এসেছে দেখে অন্ধকারে সেই পরিচিত মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

দিলদার ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল ?

হাঁ। কিন্তু তুই এখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছিস !

এখনো খাঁচাটা এক্সপ্রেসটা যায়নি কিনা, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

কেন, খাঁচা এক্সপ্রেসে কি ?

এমনি ! দেখবো !

সরমা হেসে ওঠে। গাড়ী বুঝি কখনো দেখিসনি ! আশ্চর্যকের চমৎ কি ! বইলে এই দুপুর রাতে কেউ গাড়ী দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে ? বিজনের হাসি হেসে ওঠে।

সরমার মা বলেন, ওরা বনে জঙ্গলেই থাকে। ওদের ভয় ডর নেই। ওদের কাছে দিন দুপুর ও রাত দুপুরে কোন প্রভেদ নেই। বরং রাত্রে, গাড়ীতে যখন আলো জ্বলে তখন আরো ভাল দেখায় !

রবিবার দিন পুলটা পেরিয়ে ওপারে বেড়াতে গিয়েছিল সরমারা। ওপারে শালগাছ জঙ্গল খুব বেশী, বাড়িঘরদোরও কম। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা খুব পুরনো বাংলোর ফটকের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। ফটকের একপাশে একটা পাথরের ফলকে লেখা ছিল ভিক্টর আর তার নীচে বাড়ির মালিকের নাম, ডব্লু, সি, জনসন। অক্ষরগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। সরমা বললে, এই বাড়িটার কথা সেদিন সর্দার বলেছিল। এইখানে সে নাকি চা খেয়েছিল।

বাড়িটার এখন জীর্ণ অবস্থা। ভাঙ্গাচোরা। লোকজনও কেউ কোথাও নেই। এককালে যে এটা খুব সৌখীন বাংলো ছিল, তার চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। এখনো বনচাঁপা, করবী, শঙ্খরাজ ফুলের গাছগুলোতে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে।

সরমার বাবা মা ফটকটার কাছে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। একটা পথ হেঁটে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সরমা বাংলোটার ভেতরে চুকে গিয়ে এপাশ ওপাশ থেকে অজস্রগুলো ফুল তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজে যেমন ফিরতে যাবে, দেখে বাংলোটার পিছন দিকে পাহাড়ের একটা ছোট গহ্বরে মন্ত, সেখানে শুয়ে আছে দুলুয়া।

সর্দার ? বলে চমকেই ধড়মড় করে সে উঠে বসলো। যেন কি চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে, এমনিভাবে। এখানে তুই কি করছিস ? প্রশ্ন করে সরমা।

কিছু না দিলদার। বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সরমার সামনে দাঁড়ালো। তারপর তেমনি সরল ভঙ্গীতে বললে, আজ ত রবিবার, সাপে তাই এসেছিলুম এখানে।

আরো দু'পা গহ্বরটার দিকে এগিয়ে যেতে সরমা দেখলে, ওটা একটা সমাধি। পাথরের গায়ে একটা ক্রশ চিহ্ন খোদাই করা রয়েছে কিন্তু নামের জায়গাটা এমনই বিবর্ণ যে কিছুই পড়া যায় না।

সরমা নামটা পড়ার বৃথা চেষ্টা করে ফিরে দাঁড়াল। সর্দার বললে, ওটা মেম সাহেবের ! মেমটা এইখানে মরলো কিনা !

তা তুই এখানে ওই মেম সাহেবের সমাধির ওপর কি করছিলি ?

একটু চুপ করে থেকে দুলুয়া জবাব দিলে, কিছু না। এমনি দিলদার একটু শুয়ে ছিলুম। এই বলে সে লম্বা লম্বা ঠ্যাংগুলো গুটিয়ে নিয়ে জঙ্গলটার ভিতর দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল

সরমা আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, তারপর বাবা মার কাছে এসে সব বললে।

এর ঠিক পরের দিন হঠাৎ ওভারসিয়ারবাবুর সঙ্গে সরমাদের আলাপ হয়ে গেল নদীর ধারে। তিনি আগেই বেড়াতে এসেছিলেন। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পাহাড়ের মাথার ওপর অস্তগামী সূর্যের রঙের খেলা দেখছিলেন বোধকরি। সরমাদের দেখে তিনিই প্রথম যেচে আলাপ করলেন। কবে—কোথায় কোন বাংলোতে এসেছে ইত্যাদি ও বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। তারপর।

কথায় কথায় জিমিনলজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার কথা উঠতে ওভারসিয়ার-বাবু বলেন, এখন চোরের রাজত্ব হয়েছে। অথচ এককালে এখানে দশটা মুরগী ও ষোল সের দুধ টাকায় কিনেছি, বললে বিশ্বাস করবেন না। তখন দু'আনা পিছনা দিলে দামাদিন কাজ করতো এখানকার লোকেরা আর আজ এমন হয়েছে, দু'টাকা মোজ দিয়ে গোসামোদ করলেও পাবেননা একটা লোক।

সমস্যান, হাবাগঙ্গারামগুলো. যত আক্রোশ ওদের এই বাঙালীদের ওপর।

সরমা বললে, অথচ এই বাঙালীদের কাছেই কাজকর্ম না করলে ওদের পেটের ভাত জোটেনা, অকৃতজ্ঞ! বুঝলে মা অকৃতজ্ঞ। এখন অবশ্য বাঙালীদের ওরা গ্রাহ্য করে না। বাড়োয়ারীরা ভাটিয়া পাঞ্জাবী আরো অনেক ছোকরা লোক নেমেছে ব্যবসায়। তাদের পায়ের তলায় পড়ে আছে।

সরমার মা বললে, যেমন না ওই ফুলুরা সর্দারটা ছিল বলেই কিছু খাবার জিনিষ পত্তর পাই। যেদিন একটু পায়, কোনদিন ছিদ, কোনদিন তরকারীটা সে এনে দেয়।

চোর। চোর। ও ব টাকে বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবেন না ওকি ভেবেছেন বিনে আনে, এর ওর বাগান থেকে চুরি-চামারি করে আনে।

তাই নাকি? বলে সরমা একবার জানলার ভাব বাবা ও মায়ের মুখের দিকে তাকালে।

এতক্ষণে মায়ের কথা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। বলেন, শুধু কি তাই বাটা, এক নম্বর লম্পট চরিত্রহীন। ওর জন্যেই জনসন সাহেবের এতবড় বিজনেসটা ছারখার হয়ে গেল।

কি রকম? সেতে বলতে সরমার বাবা সিগারেট ধরাই ভুলে যায় করে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন আর প্রশ্ন করলেন ওভারসিয়ারবাবুকে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, সে সব নোংরামি কেচ্ছার কথা মেয়েদের সামনে মুখে আনায় যায়।

আচ্ছা থাক। সরমার মা ও ভাইয়ের একসঙ্গে যেন চিৎকার করে উঠল।

সরমার বাবারও মনের সমর্থন লক্ষ্য করে তিনি তখন শুরু করলেন। ওই বাটা লম্পটটা তখন জনসনসাহেবকে খুশি রাখাই করতো। পাড়াড় পাড়ী অঞ্চল থেকে যুবতীদের মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে এসে পাখির জাঁকার কাছে লাগাতো। জনসন সাহেবের পাখিদের বিজনেস দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠলো। আমিও চাকরী করতুম এই জনসনের বাড়ে। তাঁর ব্যবসায়ের টাকাকড়ি হিসেবপত্র যা কিছু সব আমার হাতে। জনসাহেব আদর করে আমায় ডাকতেন, 'ওভারসিয়ার' বলে। সেই থেকেই এঞ্চলের সবাই আমায় ডাকে 'ওভারসিয়ার বাবু' বলে।

এই পর্যন্ত বলে ধনধন/ঘুঁয়ার সিগারেটে টান দিয়ে নিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন পূর্ব প্রসঙ্গে। তবে চাঁদু সাহেবটার মনটা ছিল খুব দরাজ, কাজ পেলেই সন্তুষ্ট, হু'হাতে টাকা ছড়িয়ে দিতেন। কিন্তু একটি দোষ ছিল সাহেবের, মদ্য পান খেতো আর এটার ক্রীশ্চানিবন্দের মেয়েদের ওপর লোভ ছিল।

এদিকে ভেতরে ভেতরে যে ওই ফুলুরা সর্দারের সঙ্গে মেমসাহেবের 'লটঘট' হয়েছে, তা কেউ জানতো না।

সাহেবের এখন ছেলে তবে! আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু পুত্রের মুখ প্রথম দেখতে গিয়ে সাহেব নিউরে উঠলেন। ওরাক বিসার! এঁকি ভালো কুচকুচে রং; তাঁর ছেলের হলো কোথা থেকে।

ছুটে গিয়ে সিরুক থেকে ডিভোর্স-পেপারটা এনে বললে, 'হোয়াট ডু ইউ থিংক অব আই শ্যাল সুট ইউ'। সিপ্রিয় সত্যি বলো, নইলে এখুনি তালাক করে দোবো।

থর থর করে সাহেবের সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

মেম সাহেব বললে, আই লাভ সর্দার।

হোয়াট! সাহেবের হাত এমন কাঁপতে লাগল যে ডিভোর্সপেপার যেন ধরে রাখতে পারছে না। পাশের ঘরে আমি ছিলুম মেমসাহেবের। চীৎকার শুনে ছুটে এলুম। অন্য চাকর বাকর বাবুর্চি আয়াও সব ছুটে এসেছিল। আমি সাহেবের হাতটা ধপ করে পেছন থেকে চেপে ধরলুম। সাহেব 'ডিড ইউ কোয়াইট' বলে ডিভোর্সপেপার কেড়ে নিয়ে তখনকার মত তাকে শান্ত করলুম কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে চাপা আগুনটা ছিল, তা যে জ্বলন্ত মুখাগ্নি হলিল, তা বুঝতে পারিনি।

সর্দার ফুলি সংবাদের জন্যে গিয়েছিল বাইরে। দিন চারেক পরে ফিরে যেতেই সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলো, সাহেব আবার ঘরে ছুটে এসে আলমারীর চাবী খুলে নিয়ে ডিভোর্সপেপার নিয়ে বেরিয়ে এলো।

মেমসাহেব শোবার ঘর থেকে আগেই সব লক্ষ্য করছিল। সর্দারের কাছে ছুটে গিয়ে যেমন সে তাকে পালিয়ে যাবার জন্যে বলতে গেল, অমনি সাহেবের গুলি গিয়ে সর্দারের কপালে না বিঁধে মেমসাহেবের বুকে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে মেমসাহেব খাটে পড়ে গেল। এবং মিনিট পাঁচেক ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল চিরদিনের মত।

ঘরে মেমসাহেবের দেহটা যেন ভাসতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে সাহেব বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলো। তার হাত থেকে ডিভোর্সপেপারটা কখন পড়ে গেছে কেউ জানতে পারে নি।

সর্দার ছুটতে ছুটতে থানায় গিয়ে খবর দিলে। পুলিশ ইনস্পেক্টর তৎক্ষণাৎ এসে সাহেবকে ধরে নিয়ে গেল। সাহেব নিজ হাতে স্বীকার করলে তার দোষ। বিচারে তার ফাঁসী না হয়ে আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড হলো। ওর এক ভাই থাকতো দেরাদুনে খবর পেয়ে এসে আমার কাছ থেকে হিসাব নিকাশ সব বুঝে নিয়ে, আর যা পাওনাগণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে চলে যায়।

তারপর থেকে পাঁচশ বছর কেটে গেছে, সে তালা কেউ আজও খুলছে। কেউ আর আসেনি ওকে খুলতে।

জনসন সাহেব বেঁচে আছে কি মরে

টেলিগ্রাম
কুইন, কলিকাতা
ফোন : অফিস : ২২-৪২২০ ও ৭১১৪
ভাইবাসা : ৩৭-২৭৬৩
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ
ষ্টেশনার এণ্ড প্রিন্টার্স
কাগজ, ষ্টেশনারী, সার্কে, ষ্টীল ও ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৩৩ই, হারিসন রোড, কলিকাতা-১

মেয়ে—তাও কেউ জানে না। পাঁচীল, ঘর, দোর সব ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ওটাকে সবাই ভানাবাড়ী বলে। ওমকলের জংলীদের বিশ্বাস সেই মেয়েটা পেত্নী হয়ে ওখানে আছে। কেউ কেউ বলে তারা নাকি দেখেছে গভীর রাতে ওই ভাঙাবাড়ির বারান্দায় বসে সে উল বুনছে।

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করলেন ডক্টার্সসন্যাবাবু।

সরমা, তার বাবা মা—সবাই যেন শুনতে শুনতে বোবা হয়ে গিয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন "ডক্টার্সসন্যাবাবু"। চাঁদ যেন সরমার স্বাস্থ্য ফিরে এলো। আস্তে আস্তে সে চোখটা তুলে বড়ার বুকের ওপর রাখলে। তারপরে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা সেই বাচ্চাটার কি হলো?

মেমসাহেবের আয়া ছিল যে জংলী মেয়েটা, সেই বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে, শুনেছি—সে নাকি 'ইঞ্জিন ড্রাইভার' হয়েছে। আমাদের এই-সাউথার্ন রেলের 'মেল ট্রেন' চালায়।

সরমা কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার প্রশ্ন করলে, আচ্ছা সে মেয়েটা কি এখানে এসেছিল জানতো যে ওর বাপ ওই কুলতা সর্দার।

তার মনে পড়ে এখানে আসবার আগে, তার ওই অসভ্য জানোয়ারটাকে মাস বলার কথা। বলে বুকে একটা ব্যাথা অনুভব করলেন। তারপর বললেন, সে এখন এখানে উঁচুতলার মেয়ে বিয়ে করে, দিব্যি আছে। টিনটে মেম কি পার্টিসর্কাস অঞ্চলে ফ্ল্যাট-বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে!

এই বলে সরমার বাবার হাত থেকে মেমসাহেবটা আবার চেয়ে নিয়ে নিজে খাওয়া সিগারেটটা আবার জ্বালিয়ে নিয়ে ঘনঘন টান দিতে লাগলেন।

সরমার বাবার সিগারেটও নিভে গিয়েছিল। তিনিও সেই একই জলন্ত কাঠিটা নিজের সিগারেটের মুখে ধরে একমুখ ধোঁয়া টেনে নিঃশব্দে ভাবতার স্বরে দিলেন। পাক খেতে খেতে যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা মুখ থেকে ঘুরে ঘিলানের বেশ তার চোখের সামনে থেকে। সরমার মা তখনো জেমসন নীরব হয়ে বুঝি ভাবছিলেন, সেই উলঙ্গ, জংলী, অসভ্য মানুষটার কথা। যাকে চোর, জানোয়ার, লম্পট বলে একজন আখ্যায়িত করলেন ডক্টার্সসন্যাবাবু! কিন্তু সরমার মন বুঝি তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন!

একে চুপ করে তাকিয়েছিল সরমা ওপাশে পাহাড়ের চেউখেলানো সবুজগুলোর দিকে। সবচেয়ে উঁচু সবুজটার মাথার ওপরে, অনেক ঘুরে মিটমিট করে যে তারাটা জ্বলছিল সে তারাটা বুঝি তার জন্য। প্রকৃতির বুকে এইখানে নিঃশব্দে এই যে প্রেম ও বাৎসল্যের অভিনয় হয়ে গেল এবং প্রতিদিন হচ্ছে, কেউ তা জানেনা এবং একদিন অন্ধকারের আবরণে সবকিছু যখন অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তখনো কি ওই তারাটা এমনিভাবে ওইখানেই থাকবে? ওই অনন্তের বুকে কি এক অসভ্য জংলীর প্রেম ও বাৎসল্যের স্মৃতি একটুও আলো হয়ে জ্বলবে ঠিক এমনিভাবে?

হঠাৎ যেন সরমার চোখের পল্লবগুলো ভিজে উঠলো। কেন যে জানে।

ছেড : উষা ছবার

পশ্চিমবঙ্গ খাদি কেন্দ্র

খাদি ও গ্রাম শিল্প উদ্যোগ

(খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত)

প্রধান কার্য্যালয়—১, রাজেন্দ্র দেব রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-৬৬৪২

চেয়ারম্যান

শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম পি

•	••	•••	••••	•••••	••••••
খাদি	সিল্ক	অতসী তৈল ও সাবান উদ্যোগ "উজ্জ্বলা"	চর্ম্মোদ্যোগ	ধান কুটাই উদ্যোগ	মৃৎশিল্প উদ্যোগ

বিক্রয় কেন্দ্র :

দার্জিলিং—মাল
শিলিগুড়ী—হিলকার্ট রোড
কৃষ্ণনগর—কলকোটের বিপরীত
আসানসোল—জি. টি. রোড
কুচবিহার—সুনীতি রোড
মালদহ—ইংলিশবাজার
চন্দননগর—জি. টি. রোড
আরামবাগ—আরামবাগ
বর্দ্ধমান—বড়বাজার, বর্দ্ধমান
গড়িয়াহাট—গোল পার্ক
হাওড়া—নেতাজী সুভাষ রোড
বাঁকুড়া—নূতনগঞ্জ
রায়গঞ্জ—রায়গঞ্জ
আলিপুরদুয়ার—আলিপুরদুয়ার
চুর্ণাপুর—বেনাচিটি বাজার
উত্তর কলিকাতা—৯নং ঠনঠনিয়া কলিকাতা
বাটানগর

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিমিটেড এর সৌজন্যে

২১, খিদিরপুর রোড, কলিকাতা

সেই সত্য যাহা কহিয়াছ তুমি

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর মহাকবি বলেছেন—

"আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের।
তোমার মৃত্তিকা-সনে আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অজ্ঞাত চরণে ফিরিছ একাকী
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য বন্ধনীহীন
বুদবুদাকার ধাঁয়।"

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে একজন সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানসাধককে পৃথিবীর এই সূর্য-প্রদক্ষিণের কথা প্রচার করার জন্যে চরম নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল তৎকালীন অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন রোমান ধর্মনিয়ন্ত্রকদের কাছে। সামান্যভাবে সত্যের কণ্ঠরোধ করা যেতে পারে, কিন্তু "সত্যের মরণে"—সত্যের জন্ম অবশ্যম্ভাবী। চারশো বছর আগে সত্যদ্রষ্টা গালিলিও যে "কথা প্রচার" করেছিলেন এবং যার জন্যে তাঁকে ধর্মযাজকদের হাতে চরম লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাদের কাছে পাথরে তা-ই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। অন্ধ সংস্কার থেকে এই সত্য উদ্ধারণই হলো বিজ্ঞানসাধনা এবং বিজ্ঞানসাধক গালিলিও এইভাবেই বিশ্বের সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটনের সন্ধান দিয়েছিলেন তিনিই সর্বপ্রথম পরীক্ষিত সত্যের মাধ্যমে বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন।

তাঁর আগে বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা জাতির মধ্যে নানা মতবাদ প্রচলিত ছিল। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল থেকে মানুষ দেখে এসেছে, মাথার উপরে সূর্যচন্দ্র নক্ষত্র চলছে, অথচ তার আবাসভূমি পৃথিবী স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই বিশ্বতত্ত্বের সম্বন্ধে সকল প্রাচীন মতবাদেই দেখা যায়, পৃথিবীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ ভাবা হয়েছে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের যাবতীয় গ্রহনক্ষত্র ঘুরছে। প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা ছিল, এই পৃথিবী চারটি অতিকায় চক্রাকার উপর নিচে এবং চক্রচতুষ্টয় আবার একটি সাবরাট

বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা।

কূর্মপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইডোক্সাস (Eudoxus) মনে করতেন, বিশ্বের কেন্দ্রে আছে স্থির নিশ্চল পৃথিবী এবং তারপর ক্রমান্বয়ে রয়েছে ৯টি জ্যোতিষ্কলোক—(১) চন্দ্রলোক, আবর্তনকাল একদিন; (২) বুধলোক, আবর্তনকাল ত্রিশদিন; (৩) শুক্রলোক, ৮ বছর; (৪) সূর্যলোক, একবছর; (৫) মঙ্গল লোক, ২ বছর; (৬) বৃহস্পতিলোক, ১২ বছর; (৭) শনিলোক, ২৯ বছর; (৮) নক্ষত্রলোক, একদিন এবং (৯) দৃশ্যলোক, অদৃশ্য ও নিশ্চল। শিষ্যদের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের (Tycho Brahe) মতবাদে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই পাঁচটি গ্রহ সূর্যের চারদিকে আপন আপন কক্ষপথে ঘোরে এবং সূর্য নিশ্চল পৃথিবীর চারদিকে এক বছর কালে প্রদক্ষিণ করে।

এরপর প্রায় দু হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagoras) প্রথম ঘোষণা করেন—সূর্য কেন্দ্রে বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং তারই চারদিকে পৃথিবী আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল (Aristotle) এসে পিথাগোরাসের মতবাদকে নস্যাৎ করে জানালেন—সূর্য নয়, পৃথিবীই কেন্দ্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র এবং পৃথিবী চিরকাল নিশ্চল। তাঁর মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে বিভক্ত—পৃথিবী এবং পৃথিবীর বহির্ভূত মহাকাশ। মহাকাশে (যা কেন্দ্রে জ্যোতিষ্কবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত) যাবতীয় বস্তুই কেন্দ্রে 'ঊর্ধ্বে' অর্থাৎ একেবারে ঊর্ধ্বপৃষ্ঠে, চিরন্তন ও নিশ্চলভাবে। সূর্য, এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্পূর্ণ গোলাকার কক্ষপথে পৃথিবীর চারিধারে আবর্তন করে। পৃথিবীর বহির্ভূত যাবতীয় বস্তুর মতো এগুলিও নিত্য ও চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। কেবল পৃথিবীই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে নিম্নগামী এবং সতত পরিবর্তনশীল। কারণ

চাঞ্চল্যকর। সকল গ্রহ-উপগ্রহ ও সূর্য গতি পরিবর্তন করে ছুটে চলেছে। তারা সব পৃথিবীর কেন্দ্রমুখে পতিত হয় এবং সমস্ত বস্তু ন্যে উঠে যায়। অ্যারিস্টটলীয় দোষে পৃথিবীতে যাবতীয় গতি না থাকিলে প্রত্যেক বস্তু এবং সেই শক্তি বিলুপ্ত হইত সঙ্গে বস্তুর গতিও বিনষ্ট হইত

মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে ইতিহাসের উষালগ্নে মহাকাশের দিকে তাকাই স্বভাবতই মনে হয়—মাথার উপরে ন্ত-তারা আবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু নিচে পৃথিবী স্থির নিশ্চল হয়ে রয়েছে। এরিস্টটলীয় ন্ত জগতে সহজেই সমর্থন লাভ করে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে টমাস-অ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas) অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের ভিত্তি করে বিজ্ঞানের সমক্ষে তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর মতে মহাজাগতের কেন্দ্রে পৃথিবী স্থির হয়ে ইাড়িয়ে আছে এবং তাকে ঘিরেই গ্রহদের সকল গ্রহ নক্ষত্রাদি ঘুরছে।

ড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব টলেমীয়বাদ তার অপ্রতিহত প্রভাব রেখেছিলেন। ব্যাখ্যানিক ধর্ম-র এই মতবাদে শুধু সমর্থনই নি, তাঁদের ধর্মের অনুশাসন ও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টাব্দে পোলিশ জ্যোতির্বিদ নাস কপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) এসে সিদ্ধান্তের-

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত
বিজ্ঞানাচার্য ব্রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
প্রণীত
কৃষির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক
কৃষি বিজ্ঞান
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ১০৲ টাকা মাত্র
—প্রাপ্তিস্থান—
বেঙ্গল কেমিক্যাল, ২১৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন—৩১-১৩৩৯

বাদের পুনরুত্থান করে বললেন, সূর্যই হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাকে ঘিরেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করে। ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কোপার্নিকাস তাঁর যুগান্তকারী মতবাদ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে টলেমীয়বাদীরা প্রতিবাদের ঝড় তুললেন এবং কোপার্নিকাসের প্রতি অবজ্ঞা-উপহাস প্রদর্শন করলেন। এর প্রায় ২০ বছর পরে গ্যালিলিওর আবির্ভাব না ঘটলে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব চির-অবজ্ঞাত হয়েই থাকে বেশ। কিন্তু যা সত্য তা একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং সত্য প্রচারের নিমিত্ত বিধাতানির্দিষ্ট ব্যক্তিরও আবির্ভাব যথাসময়ে ঘটে থাকে। গ্যালিলিওর আবির্ভাবও তাই ঘটেছিল।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী ইতালীর পিসা (Pisa) নগরীতে গ্যালিলিওর জন্ম হয়। ইতিহাসের পাতায় মানুষের জীবন ও ঘটনার এমন সব বিস্ময়কর যোগাযোগ দেখা যায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। গ্যালিলিওর জন্ম এবং মৃত্যুর সঙ্গে এমনি বিস্ময়কর যোগাযোগ ঘটেছিল। যে বছর গ্যালিলিও জন্মেছিলেন সেই বছরেই মাইকেল এঞ্জেলোর মৃত্যু হয় এবং সেই সঙ্গে ইতালীর রেনেসাঁসি যুগের অবসান ঘটে। আবার ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী গ্যালিলিওর মৃত্যু যখন হয়, সেই বছরেই জন্ম গ্রহণ করেন আধুনিক বিজ্ঞানের জনক আইজ্যাক নিউটন। এ দিক থেকে গ্যালিলিও সম্পর্কে এ কথা যথার্থই বলা যায় যে, তিনি শুধু একটি যুগান্তর ঘটান নি, এক নতুন সভ্যতার সূচনাও করেছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছিল।

১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও যখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়বার জন্য প্রবেশ করেন, তখন পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমীয়বাদের আধিপত্য। গ্যালিলিও ডাক্তারি পড়বার জন্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মন তাঁর ক্রমশ ঝুঁকলো গণিতের দিকে। ফলে ডাক্তার হওয়া আর হলো না। কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। পিসার গীর্জার একটি লণ্ঠনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দোলন দেখে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, যদিও দোলন ক্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দোলনের দূরত্বও কমে আসছে কিন্তু প্রত্যেক সম্পূর্ণ দোলনকালের সময় সর্বত্র একই। এই আবিষ্কারের মধ্যেই দেওয়াল ঘড়ি বা দোলকের সমকালবর্তিত সূত্রের জন্ম হয় এবং দোলক ঘড়িতে তা রূপ পায়। এই প্রথম প্রয়োগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ এই আবিষ্কারটি কারণ এর ফলে বিজ্ঞানের হাতে এমন এক হাতিয়ার আসে যার দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পরীক্ষামূলক বলবিদ্যার উপযোগী নির্ভুল পরিমাপক-যন্ত্র নির্মাণ সম্ভব হয়। গ্যালিলিও স্বয়ং ভারী-সূত্রের যাথার্থ্য প্রদর্শনের জন্য দোলক-রীতি প্রয়োগ করেছিলেন।

পিসা-তে তাঁর শিক্ষাকালের শেষদিকে গ্যালিলিও প্রাচ্য পণ্ডিত আর্কিমিডিসের কাজে। প্রচণ্ড বিশেষ মনোনিবেশ করেন এবং জলবিদ্যা ও বলবিদ্যায় পরিপক্কতা অর্জন করেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে এত পাণ্ডিত্য হয়ে ওঠেন যে পিসা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গণিতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করলেন।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী হিসাবে গ্যালিলিওর খ্যাতি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়াল ডিঙিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত অধ্যাপকের পদ খালি হলে তিনি পেলেন। ভেনিস সাধারণতন্ত্রের সেনেট তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করেন। পাদুয়ায় এসে গ্যালিলিও তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার অনুকূল পরিবেশ পেলেন। এখানেই শুরু হলো তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন।

তখন সর্বত্র টলেমির যুগ চলছে। কিন্তু গ্যালিলিও নিজে কোপার্নিকাসের বিশ্বতত্ত্বে গভীর বিশ্বাসী। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন মতবাদ প্রচারে তিনি মেতে ওঠেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোপার্নিকাসের মতবাদের সমর্থনে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বহু লোক তাঁর মনোজ্ঞ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা শুনতে আসতে লাগলো। এই সময় তাঁর যৌবনিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ তেমন আপত্তি জানায় নি।

কিন্তু ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘটলো এক অদ্ভুতপূর্ব ঘটনা। গ্যালিলিও খবর পেলেন—হল্যাণ্ডে একজন শিল্পী কাচের লেন্স দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি লেন্সের দু-পাশে রেখে দেখেছে, দূরের জিনিস এতে 'অনেক

দেখায় ও মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিও এই খবর পেয়ে কাগজে নক্সা এঁকে আলোর রেখাপথের বিচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই তাঁর সমস্যার সমাধান হলো। পাদুয়ায় যে ছোট কারুশালা (workshop) তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে নিজের হাতে তিনি তৈরি করলেন টেলিস্কোপ (Tele cope) বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। প্রথমে যে যন্ত্র তিনি নির্মাণ করেছিলেন তা বিশেষ শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু তাতে চোখ দিয়ে যা দেখলেন তা তাঁকে উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত করে তুললো! তিনি একাজেই মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন এবং ক্রমশ উন্নততর দূরবীক্ষণ নির্মাণ করলেন। ভেনিস সাধারণতন্ত্রের ডোজ (Doge) বা প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটকে দিলেন এরূপ একটি দূরবীক্ষণ। তাঁরাও দূরবীক্ষণে চোখ দিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন!

এরপর যেদিন গালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ নিয়ে মহাকাশের দিকে মেলে ধরেছিলেন, সেদিন চোখের সামনে অদ্ভুতপূর্ব দৃশ্য দেখে তাঁর মনে যেভাব জেগেছিল তা আজ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সুকঠিন। সেদিন তিনি যেন 'অর্জুনের বিশ্বরূপ' দর্শন করেছিলেন। অপার আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ভরে উঠেছিল সেদিন! তিনি চোখের সামনে যা দেখছেন তা এতদিনের প্রচলিত তত্ত্বকথার সম্পূর্ণ বিপরীত। দার্শনিক ও জ্যোতিবেত্তারা মহাকাশের অপরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে এতদিন যা বলে এসেছেন দূরবীক্ষণ দেখাচ্ছে তা ভুল—সম্পূর্ণই ভুল! ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে মহাকাশীয় বস্তুটির প্রতি গালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ মেলেছিলেন, সেটি হচ্ছে চন্দ্র। সুন্দরী নারীর মুখ বর্ণনায় কবিরা যার উপমা দেন 'চন্দ্রমুখী'—এ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই! এতদিন বহু দার্শনিক ও জ্যোতির্বেত্তা চন্দ্রদেহ সম্বন্ধে যা বলে এসেছেন, গালিলিও দেখলেন, তাঁদের উক্তির কোনো সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চন্দ্রদেহ মসৃণ গোলাকার নয়—অমসৃণ ও ছোট বড়ো নানা গহ্বর ও পর্বতে পরিপূর্ণ। তিনি আরও দেখলেন চন্দ্রপৃষ্ঠ অসমানভাবে আলোকিত।

প্রচলিত ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য দেখে গালিলিওর মনে প্রথমে একটু সংশয় জেগেছিল—যন্ত্রের কোনো ত্রুটিতে এরকম দেখাচ্ছে না তো! পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যন্ত্র পরীক্ষা করে এবং একাধিকবার পরীক্ষা চালিয়ে গালিলিও একইরকম দৃশ্য দেখতে পেলেন। গালিলিও তাঁর এবার নিজের সিদ্ধান্তে স্থিরনিশ্চিত হলেন।

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট গালিলিও তাঁর নির্মিত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ভেনিস সাধারণতন্ত্রের প্রধানকে উপহার দিচ্ছেন (লুইগী সাবেতেলী অঙ্কিত চিত্র)

এরপর একের পর এক তিনি বহু নতুন আবিষ্কার করলেন—চন্দ্রের পর্বতমালা, বৃহস্পতি ও শুক্রের উপগ্রহসমূহ, সূর্যের কলঙ্কবিন্দু, শনির বলয়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ ইত্যাদি। এভাবে নিজের চোখে যা দেখলেন তার সত্যতা যে কেউ দূরবীক্ষণের সাহায্যে যাচাই করে দেখতে পারেন বলে তিনি জানালেন। কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হলো। যুক্তিবাদী গালিলিও ভাবলেন, এসব কথা লিখে প্রকাশ করলে সকলকে তাঁর স্বপক্ষে আনতে পারবেন। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো কোপারনিকাসের মতবাদের সমর্থনে তাঁর Dialogueon the Great world Systems." এবং তিনি তাঁর নিজের গবেষণা সম্পর্কে 'Discourses'।

প্রচলিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে গালিলিও অতি শক্তিশালী যুক্তির হাতিয়ার তুলে ধরেছিলেন। তিনি আপেক্ষিকতাবাদের জাগতিক তত্ত্ব উত্থাপন করেছিলেন, পতনশীল বস্তুর সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন, জাড্যসূত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন এবং গতিসৃষ্টি পর্যালোচনা করেছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদের হাতিয়ার দিয়েই তিনি পৃথিবীর আবর্তনের বিপক্ষে সকল যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন। সাধারণ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকেই গালিলিও তাঁর এই তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন—যা তাঁর পূর্বসূরীদের কেউই ধারণা বা ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

গালিলিও তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বলেছিলেন, কোনো গ্রহমণ্ডলের মধ্যে থেকে যান্ত্রিক পরীক্ষার সাহায্যে এ-কথা কখনই বলা সম্ভব নয় যে, গ্রহমণ্ডলটি স্থিতিশীল না গতিশীল। এ-কারণেই পৃথিবীর মধ্যে থেকে পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা যায় না।

তাঁর প্রকল্পের সমর্থনে গালিলিও জাহাজের উদাহরণ দিয়েছিলেন। জাহাজের মধ্যে কোনো প্রাণী বা বস্তুর সঞ্চরণ থেকে এ-কথা কখনই বলা যায় না যে জাহাজটি গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে জাহাজের কোনো গতির দরুন এই প্রাণী বা বস্তুর কোনো আপেক্ষিক পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে না।

গালিলিও আরও বলেছিলেন, বিশ্বজগতে পরম গতি বলে কিছু নেই, কোনো স্থির বিন্দু ধরে নিয়েই তার সম্পর্কে সর্বপ্রকার গতি ব্যাখ্যা করতে হবে।

কোনো মহাজাগতিক বস্তু গতিশীল না স্থিতিশীল তা নির্ধারণ করার জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরমণ্ডলের মধ্যে

...ছটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (গালি-...ত্ত সম্মানার্থে এই অক্ষরগুলি ...লিও অঙ্ক নামে আখ্যায়িত হয়ে ...কে)।

কোপার্নিকাসের মতবাদের সমর্থনে ...লিওর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে ...সমাজনেতারা তাঁর বিরোধিতা ...তে লাগলেন। বিরুদ্ধপক্ষের একটি ...লেন ডোমিনিকান সন্ন্যাসসংঘের ...ধানকেন্দ্র অলরাঁদকে ছিলেন। বিশ্ব-...লয়ের নানা অধ্যাপক ও ছাত্রেরা যাঁরা ...লিওর মতবাদ মেনে নিতে পারছিলেন ...থবা তাঁর যুক্তিপ্রাহ্যতায় ঈর্ষান্বিত ...য়েছিলেন)। অবশ্য এই বিরুদ্ধবাদীরা ...কিলে চোখ রাঙিয়ে গলাবাজি করাই ...ত্র স্বীকৃত ছিল। তাই এঁদের ...কে গালিলিও তাঁর সুহৃদ জার্মান ...তবিজ্ঞানী কেপলার (Kepler) ...কৌতুকভরে লিখেছিলেন—

"dear Kepler, what would you ...of the learned there, who, ...ste with the pertinacity of ...asp, have steadfastly refused ...cast a glance through the ...cope? Shall we laugh, or ...we cry?"

...লিওর এই ধরনের ব্যঙ্গোক্তিতে ...বাদীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। ...কেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ...ন—গালিলিও যে সব কথা প্রচার ...ন তা বাইবেলের অনুশাসনের পরি-...ী। তিনি বাইবেলের উপর মানুষের ...ন্ত করার চেষ্টা করেছেন।

গালিলিওর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো।

ইতিপূর্বে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে গালিলিওকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রচার না করেন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কার্ডিনাল বেলার্মিন গোপের নির্দেশে গালিলিওকে বুঝিয়ে বলেছিলেন—কোপার্নিকাসের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্মযাজকদের সঙ্গে তর্ক না করেন। বন্ধুর অনুরোধে গালিলিও অবশ্য সরকারীভাবে পোপের নির্দেশ মেনে নিলেন। তিনি তখন গতির বিষয় ও জোয়ার-ভাটার কারণ নিয়ে বড় ইতালি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে বই লিখলেন।

কিন্তু তাঁর সুহৃদ বেলার্মিন ও পোপের মৃত্যুতে আবার ঘটনার পরিবর্তন হলো। পুরাতন পোপের জায়গায় যিনি নতুন পোপ হলেন তিনি নানা কারণে গালিলিওর প্রতি সদয় হলেন না। গালিলিও প্রথমে ভেবেছিলেন—নতুন পোপ বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তিনি হয়তো সাধীনভাবে মত প্রকাশের অনুমতি দেবেন। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমে গিয়ে নতুন পোপকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসার পর তিনি কথোপকথনের আকারে টলেমী ও কোপার্নিকাসের মতবাদ আলোচনা করে তাঁর "Dialogue" গ্রন্থ রচনা শেষ করলেন এবং ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সেটি প্রকাশিত হলো।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই ধর্মাধিকরণ বাহের অভিযোগে গালিলিওকে বিচারের সম্মুখীন হতে হলো। বিচারে গালিলিওর প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হলো এবং তাঁকে অনুশোচনা প্রকাশে বাধ্য করা হলো। পরে অনুকম্পা প্রদর্শন করে তাঁকে প্রথমে রোমে টাসকানির গ্রাণ্ড ডিউকের আবাসে, তারপর সিয়েনার আর্চ বিশপের গৃহে এবং সর্বশেষে ফ্লোরেন্সে নিজগৃহে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। বলা বাহুল্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিও এই সঙ্গে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

এতদিন নিগ্রহ ও অবমাননা সত্ত্বেও গালিলিও তাঁর বিজ্ঞানসাধনা থেকে কোনদিন বিরত হন নি। জীবনের শেষ দিকে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারালেন, তবু মৌখিকভাবে তাঁর শিষ্যদের কাছে বিজ্ঞান বিষয়ে ধারণাবলীর কথা বলে যেতেন। অবশেষে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী ৭৭ বছর বয়সে এই সত্যান্বেষক বিজ্ঞানী দেহত্যাগ করেন।

মোহান্ধ অন্ধবিশ্বাসী ধর্মাধিকরণ গালিলিওকে নিগ্রহ করে তাঁর প্রচারিত সত্যের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর বিচারে সত্যদ্রষ্টা গালিলিওর কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। গালিলিও যথার্থই বলেছিলেন—"In questions of science the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual" তাঁর উক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি 'সেই সত্য যারে ফলাবার তরি।'

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা

দক্ষিণারঞ্জন বসু

বলে বাঁচবো, জীবনটাকে নিয়ে আর এগিয়ে চলা যেন সম্ভব হয়ে উঠছে না। পদে পদে বাধা, সমস্ত ব্যাপারে সংশয়। আর পারছি না।—এই বলে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রমলা চুপ করে যায়। পাশের বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ে গা এলিয়ে দিয়ে।

যাই বলো রমলাদি, তোমার মতো আদর্শ গৃহিণীর মুখে এমন কথা মোটেই শোভা পায় না। তুমি যেভাবে এ সংসারকে বাঁচিয়ে রেখেছ সে তো আর আমার অজানা নয়।—রমলার দেওরা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ছোট্ট করে জবাব দেয় তার বাঁধবী তাই।

বাঁধবীকে ছোট তাই-এর মতোই ভালোবাসে রমলা। আর জানাও আছে, সে বাঁধবীর কাছ থেকে বড়ো বোনের মতোই।

রমলার একটি মাত্র ছোট ভাই-ই ছিল। খুবই আদুরে ভাই। কলেজে পড়তে পড়তে সে মারা যায়। তারই কিছুদিন আগে কলেজে পড়ুয়া এই বাঁধবীর সঙ্গে এক গানের আসরে ঘটনা-চক্রে তার পরিচয় ঘটে।

ছবাকর্ণী গায়িকা রমলা সেন। তার বিয়ের ছয়েক মাস পরেই পাড়ায় সরস্বতী পুজোর গানের আসর তাকে ধরে আনা হয়েছে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে দু'একখানা গান শোনাবার জন্যে। কিন্তু আয়োজন অসম্পূর্ণ। তবলা আছে, তবলাচি অনুপস্থিত। রমলা হারমনিয়ম ধরে বসে আছে, কিন্তু গান শুরু করতে পারছে না। তবলা ছাড়া সে গাইতে পারে না। লোকজন অধৈর্য হয়ে উঠছে। হঠাৎ শ্রোতাদের মাঝখান থেকে একটি যুবক উঠে এলো মঞ্চের দিকে। তবলা নিয়ে বসে গেল। অপূর্ব বাজালো সে। রমলার গান অমৃত মধে গেল। পর পর চারখানা গান গেয়ে সেদিন তাকে নিস্তার পেতে হয়েছিল। তার সৌজন্যের সাফল্যের জন্যে বাঁধবীর সমস্তের স্তুতির যে অবেকখানি দাবী সেদিন মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করেছিল রমলা।

সেই থেকেই রমলার সঙ্গে বাঁধবীর দিদি-ভাই সম্পর্ক। পাড়ার মেয়ে, তাই প্রায় নিত্যদিনই সেই থেকে রমলাদের বাড়িতে তার আসা-যাওয়া। প্রায় আট দশ বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে এখন ভালো চাকরি বাকরি করছে বাঁধবী। কিন্তু তবু সে তার পুরোনো অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি, দিনে অন্তত একটিবার তার রমলাদির হাতের চা না খেলে যেন চলে না।

এমনি বাড়াবাড়ির জন্যে পাড়ায় যে কিছুটা কথা ওঠেনি তা' নয়। কানাঘুষো এক আধটুকু রমলার নিজের কানেও এসেছে। কিন্তু সে দিন সে কোনো দিনই গায়ে মাখেনি, কেউ কিছু বলতে এলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তার স্বামী শুভময়ও সে সব ঘুণাক্ষরেও টের পাবার কখনো আয়োজন করেনি, বরং পাড়ার যে সব লোক এ ধরনের কথাবার্তায় প্রশ্রয় দিয়েছে তাদের সে সবদা এড়িয়েই চলেছে এবং সময় সময় তাদের দু'একটা কথার মুখের মতো জবাবও দিয়েছে।

এই দৃঢ়তার জন্যে ক্রমে সবাই ভয় পেয়েছে। কখনো আর বাড়ুযের ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার ধৈর্য থাকে। কেউ আর এ নিয়ে আজকাল বড়ো একটা কথা বলে না।

শুভময়ও খুবই ভালোবাসে বাঁধবীকে। ছোট্ট থেকেই ভালোবাসে। যেমনি নম্র-বিনয়ী, তেমনি পরোপকারী—এমন মেয়েকে কেউ না ভালবেসে পারে না। আজ তিন বছরের বেশী হলো সে শুভময়দের পাশের বাড়িতে ভাড়া এসে পড়ে আছে। প্রথম দিকে তাকে নিয়ে যত দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি সবই তো করেছে বাঁধবী। এখনো প্রতিদিন তার খোঁজ খবর সে নিয়ে যায়। কি করে তাকে সে ভুলবে।

কেরানীর সংসার। তবু চলে যেতো কোনোরকমে। স্বাচ্ছন্দ্য তেমন একটা না থাকলেও, কোনোরকম অভাববোধ ছিল না। তাতেই সন্তুষ্ট ছিল রমলা। সওদাগরী আফিসের কেরানীর বৌ-এর যেভাবে চলা উচিত কোনো বিষয়েই তার চেয়ে সে বাড়াবাড়ি করতো না। বাড়িতে ফিটফাটের আধিক্য দেখে

সম্পূর্ণই তার ক্রটির, গৃহিণীপনার তার তুলনা।

পক্ষাঘাতে শুক্রবার সন্ধ্যা বেলার পর বলরামটোলা এক নিমেষের পরিশ্রম করে এই সংসারকে কোলোকুলো চালিয়ে যাচ্ছে। পশু স্বামীর সেবা, ছেলেটাকে লেখা এবং সংসারের আর যাবতীয় কাজ-কর্ম করে স্ত্রীবিকার সন্ধানে ছুটে বেরোনো ও সহজ ব্যাপার। একটানা এ কয় বছর ধরে ঝাইয়ো করে চলেছে বলরাম। তা' সত্ত্বেও সে তার ঘরবাড়ির চাকচিক্য-টুকে অটুট রেখেছে, এ সত্যি প্রশংসার কথা।

ট্যুইশানি করে বলরাম। গানের ট্যুইশানি। গলাটি খুব মিষ্টি। সে বলরাম যখন বেশ খরচপত্র করেই নে শিখিয়েছিলেন তাকে। সেই শিক্ষা ও এই দুঃসময়ে তার সংসারে আশী-র্বাদের মতোই কাজ করছে। বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়েকে গান শেখায় সে। ছাড়া একটা গানের স্কুলে মাস্টারি করে কিছু রোজগার করে।

এমনিভাবেই সংসার চলে যাচ্ছে। সেটাও এখন একটু বড়ো হয়ে উঠেছে, ছ পাঁচেক বছর হলো। বুড়ি ঝি তাকে চোখে চোখে রাখে। তার সম্বন্ধে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু জীবনে যন্ত্রণা অনেক। অনেক যন্ত্রণা আবার অকারণেও। যেমন একটা কাহিনী বাইরেটাকে বলার জন্যেই উন্মুখ হয়ে উঠে-ছিল বলরাম। তাকে চা এনে দিয়েই সেই কাহিনী বলতে শুরু করেছিল সে। বলতে গিয়ে গলা আটকে আসছিল তার। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়েছিল।

সেই স্তব্ধতা ভাঙলো বলরাম এক বৈরাগীর গানে। বৈরাগী গান ধরেছে, হরিগুণ গাওরে মন আমার! কিন্তু অমন হরিগুণ গানও ভালো লাগছিল না বলরামের। সে ভেতর থেকে উঠে এসে আঁচলের গিঁট খুলে একটা তমলা পয়সা বার করে দিয়ে বিদায় করে দেয় বৈরাগীকে। তারপরে আবার আসর করে বসেছিল তার দুঃখের কথা বলতে।

ভেবে ভাখো ভাই, এই বাজারে মাস মাস ষাটটে করে টাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া কি চাট্টেখানি কথা! অবশ্য এ ছাড়া আর আমার কী-ই বা করার ছিল বলো। আমি পরিষ্কার মুখের ওপরই বলে দিয়ে এসেছি, এ ট্যুইশানি করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

বাবে, আসল ব্যাপারটাই কিছু জানতে পেলাম না, আগেই মন্তব্য শুনিয়ে দিলেম। বেশ মজার মানুষ দেখছি আপনি বলরাম।—বাইরেটা একটু খোঁচা দিয়েই কথাটা বলে আসল বক্তব্যটা বার করার জন্যে।

ব্যাপার যে কি হতে পারে তা' কি আর তুমি বুঝতে পারছো না, নিশ্চয়ই পারছো। তুমি তো আর এখন কাঁচ খোকাটি নেই। তোমাদের পুরুষজাতের মনোবৃত্তি যে কতো নোংরা হতে পারে তা' নিয়ে আলোচনা করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তার ফলে আমার মতো এক অসহায় মানুষকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হলো তা' কি করে আমি পূরণ করবো বলো।

সে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আমি করে দেবো কথা দিচ্ছি। মাট টাকা মাইনের আরেকটা ট্যুইশানি আমি আপনার জোগাড় করে দেবো। কিন্তু এ ট্যুইশানিটা আপনার ছাড়তে হলো কেন, তাই বলুন।

বেশ, শোনো তা হলে। বিধবা মায়ের একটি ছাত্রীকে আমি গান শেখা-

নেহরু ভহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

ভারত ওয়েল্ডিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোং

৮৯এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন ঃ—২৪-১৪৬৩

অক্সিজেন, এসিটিলিন, গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাস, ইলেকট্রোডস, ওয়েল্ডিং রডস প্রভৃতি ওয়েল্ডিং দ্রব্যের
নির্মাতকারক ও বিক্রেতা

হাম, তুমি জানো বোধ হয়। মোতা-বাজারে ওদের বাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন করে যেতে হতো এজন্যে। প্রত্যেক বুধবার ও শনিবার বেতাম। এক বছর ধরে ঝিন্টাকে গান শেখাচ্ছিলাম। বড়ো ভালো ছেলেটি। বড়োলোকের সংসার, বাড়ির আবহাওয়াটিও সুন্দর। কোনো-দিন কোনোরকম অসুবিধায় আমায় পড়তে হয়নি। কিন্তু সেদিন যে ঘটনাটি ঘটে গেল তা' যে কখনো ঘটতে পারে তাই আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি।

তা' অঘটন তো চিরকালই ঘটে রমলাদি এবং সে সব না ভাবতেই ঘটে। কিন্তু কী এমন ঘটলো যাতে এত বছরের ভালো কাজটা আপনি একেবারে এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলেন?

আজ সোমবার, গত শনিবারেই এই ব্যাপারটা ঘটেছে। ঝিন্টার বাবা পরিমল বলে শনিবার বলেই অফিস থেকে অনেক আগে বাড়ি ফিরেছেন। ঝিন্টাকে নিয়ে তার মা গিয়েছেন ডমডমপুরে বাপের বাড়িতে কি একটা উৎসব উপলক্ষে। পরিমলবাবুও যাবেন, তবে তিনি বাড়িতে যাবেন এবং স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে আসবেন। ঝিন্টাকে গান শেখাতে গিয়ে ওঁর কাছেই এ সব সংবাদ পেলাম। আমি ফিরে আসবার জন্যে পা বাড়িয়েছি অমনি বাধা দিলেন পরিমলবাবু। বারে, অফিস থেকে এলেছেন, অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যাবেন না, তা কি হয়? তিনি নিজেও তখন পায়জামা ও গাউন পরে বৈঠক-খানায় বসে চা খাচ্ছিলেন আর ইংরেজি বয়ের কাগজ পড়ছিলেন। বাবুর্চিকে আরেক কাপ চা দিতে আমার জন্যে হুকুম করলেন, আমাকেও বলতে, হলো। অনুরোধ এড়ানো গেল না—বড়ই ছোক ছাত্রীর বাবাতো!

তারপর কি হলো?—বোধ হয় পরি-বেশ পরিচয়ে আজ উৎসাহিত হয়েই একটু অধীরভাবে প্রশ্ন করলে ধরিত্রী।

আমি একটা চেয়ার টেনে বসতেই হাতের কাপখানা নামিয়ে রেখে আমার তপনলাল কথা শুরুলেন পরিমলবাবু। উত্তরে আমি বললাম, আপনি নিজে ভালো বলেই আর সকলকে ভালো বলে ভেবে থাকেন। আমি আজ সাধারণ একজন দুঃস্থ মহিলা। দৈব দুর্বিপাকে পড়ে রোজগার করতে বাইরে বেরুতে হয়েছে।

এরও একটা কিছু সুন্দর জবাব নিশ্চয়ই দিলেন পরিমলবাবু। কি বলেন তিনি আপনার এ কথার উত্তরে?

বলেন, কি যে বলেন আপনি রমলা দেবী, আপনার মতো মেয়ে আজকের দিনে খুব কমই দেখা যায়। সৌন্দর্য এবং গুণ, এ দু'এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে আপনার মধ্যে। গুরুময়বাবু সত্যি ভাগ্য-বান। তবে দুঃখের কথা, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন।

এ থেকে তো মনে হয় ভদ্রলোক বেশ সহানুভূতিশীল মানুষ।

না ভাই, ঠিক তা' নয়। এর পরেই তিনি যা বলেন তাতে আমি লজ্জায় মরে গিয়েছিলাম। নির্বিকারভাবে তিনি বলে ফেলেন, প্রথমে আপনাকে দেখে মনে হয় বর্ষায় মদীর জল যেন দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছে।

তখন কি করলেন আপনি রমলা দি?

একটু আগেই বাবুর্চি চা দিয়ে গিয়ে-ছিল। আমি সবেমাত্র চায়ের কাপটি হাতে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু ঐকথা শোনামাত্রই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম হাতের কাপ টিপয়ে রেখে।

তারপর?

আমি উঠে পড়তেই পরিমলবাবু পথরোধ করে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বলেন, এ কখনো হতে পারে না রমলা দেবী, চা না খেয়ে আপনি কিছুতেই এভাবে যেতে পারেন না আমার বাড়ি থেকে। তাছাড়া এতদিন পরে যে কথাটা আপনার বলার সুযোগ এসেছে তা না শুনিয়ে আমিই বা আপনাকে যেতে দেবো কি করে? বলেই আমার পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন ভদ্রলোক। আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। বাস্তার বাস্তার ডেকোরেশনের আলোগুলো সব জ্বলে উঠেছে। সহরের আকাশে অন্ধকার আর পাখা মেলে চলেছে। তবু পাখারই কথা। তবু আমি অনেক কষ্টে সাহসে বুকবেঁধে বলে বসলাম পরিমল বাবুকে, বলুন আপনার কী বলার আছে আমাকে। নির্লজ্জভাবে আমার দু-হাত খানা টেনে নিয়ে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন আমায় করলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন, জীবনে আমি সত্যি সত্যি কাউকে ভালো-বেসেছি কি না?

কি উত্তর দিলেন আপনি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমায় অবশ্য একটুও ভাবতে হয়নি। আমি তাঁকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি, নিশ্চয়ই আমি সত্যি সত্যি একজনকে ভালো-বেসেছি এবং তিনি আর কেউ নন, আমার স্বামী। তিনি আজ পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন। ওঁকে সুস্থ করে তোলার জন্যে, ওঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমি প্রাণ-পণ সংগ্রাম করে চলেছি।

বাঃ, চমৎকার উত্তর দিয়েছেন রমলাদি।

তাতে অবশ্যি কিন্তু নিরস্ত হলেন ভদ্রলোক। বরং নতুন যুক্তির অবতারণা করে বলেছেন, এমনি একঘেঁয়ে জীবনে তো ঝাঁকিয়ে ওঠবার কথা রমলাদেবী। আপনিও তো রক্তমাংসেই তৈরী মানুষ। সাধ-ইচ্ছে আপনারও তো আছে। সবারই থাকে। এই রকম আমারই কথা। আপনাকে প্রথম দেখবার পর থেকেই আপনাকে পাবার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। আমার দিকে তাকিয়ে আপনি একবার বলুন রমলাদেবী, আপনিও আমাকে তেমনিভাবেই ভালোবাসেন; বলুন, একটিবার মাত্র বলুন।

কী সর্বনাশ!—একটা অদ্ভুত আতঙ্কে ধরিত্রীর মুখখানি হঠাৎ কেমন যেন ফ্যাকাসে মলিন হয়ে গেল।

না, সর্বনাশ কিছু নয়। এবার সত্যি সত্যি আমি একটু কঠিন হয়ে উঠলাম, বুঝলে ভাই।

কি করলেন আপনি?

আর কোনো উপায় না দেখে আমি সোজা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা পরিমলবাবু, আপনি তো বলছেন আমাকে আপনি নাকি খুবই ভালো-বাসেন। আমাকে আপনি তা'হলে বিয়েও করতে পারেন? উত্তর হলো—না, না, তা কি করে হবে? হিন্দু কোড আইন মতে নেই? প্রথমা স্ত্রী মৃতা বা পরিত্যক্তা না হলে তো দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কোনো উপায় নেই।

খ্রীস্টমতে পাকাপাকি যাঁরা দেখছি এই ভদ্রলোক, বেশ কায়দা করে বেরিয়ে গেলেন আপনার জিজ্ঞাসার জাল থেকে।—ধরিত্রী একটু রহস্য করতে চাইলে এই বলে।

না, হিন্দু কোডের কথা তুলে ছাড়া পাবার চেষ্টা করলেও অতো সহজে আমি ছেড়ে দিইনি ওঁকে। পরিষ্কারভাবে ওঁকে বলেছি, আমার তখন আপনার ভালোবাসা যদি সত্যি হয়ে থাকে তা' হলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার আইনসঙ্গত পথও আপনাকেই খুঁজে বার করে নিতে

হবে। একবার উত্তর আসবার আগেই সেখানে ওঠার ঘরের আলোটা নিভে গেল আর পরিমল বাবুর কণ্ঠে ভেসে এলো, না বমলা তা' হয় না। তুমি আমার দাম্পত্যজীবনের বন্ধনীস্বরূপই হয়ে থাকবে, তাই ভালো।

আশ্চর্য! এ অবস্থায় তো মাথা খারাপ হয়ে যাবার কথা।

ঠিক তাই। আমারও প্রায় সেই অবস্থাই হয়েছিল। ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন, আলো জ্বালুন বলে পাগলের মতোই চিৎকার করতে করতে আমি কোনোরকমে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম তাঁর হাত-ছাড়া করে। বাইরে বেরিয়ে এসেই পরিমলবাবুকে জানিয়ে দিয়েছি যে, সিস্টারকে যান দেখানো আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বেশ করেছেন। এর পরে আর তাঁরা যায় সে-বাড়িতে যাবার কথা?

আর বলো না ভাই। সেই লাথাটা রাত আমার যে কিভাবে কেটেছে তা' বলতে পারিনে। সারাক্ষণ আমি কেবল আঁতকে আঁতকে উঠেছি। ভাগ্য তুমি ছিলে না, আজ বাইরে থেকে ফিরে এসেছ—এখন যেন মনে একটু জোর পাচ্ছি।

ঠিক আছে, এ নিয়ে আপনি আর একটুও ভাববেন না, কমলাদি। আমি যখন বলা দিয়েছি নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এর চেয়েও একটা ভালো টুইশানি আমাদের পাড়ায়ই কয়েকদিনের মধ্যে জোগাড় করে দেবো। আমাদের নতুনবাজার এলাকাতেই প্রিন্সিপাল ঘোষাল সুন্দর নতুন বাড়ি করেছেন। আমি তাঁর এক সময়ের ছাত্র। তবু দুই আগে তিনি আমার তাঁর মেয়ের জন্যে একজন ভালো গানের টীচার খুঁজতে বলেছিলেন। মাসে সত্তর পঁচাত্তর টাকা অবধি তিনি দেবেন, এও বলেছিলেন।

তাহলে ভাই, এটা যদি ঠিক করে দিতে পারো, তা' হলে এই দুর্দিনে রক্ষা পেয়ে যাই। তা নাহলে রোগীকেও বাঁচাতে পারবো না, মা-ছেলেও না থেকে মরবো।—বলতে বলতে বড়ো বড়ো দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার দু'চোখ থেকে।

কমলাদির চোখে জল দেখে স্থির থাকতে পারে না বাঁধরা। সে উঠে পড়ে। যাবার আগে দিদিকে আশ্বাস দেয় তার নেই—প্রিন্সিপাল ঘোষালের বাড়ির টুইশানিটা নিশ্চয়ই আপনার হয়ে যাবে। এর কথা পাকা করার জন্যে আমি এখুনি সে বাড়িতে যাচ্ছি।

বাইরে তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। বাঁধরা বেরিয়ে গেল। আশার বার্তা সে বয়ে নিয়ে আসবে। সেও কম আশার কথা নয়। তাই যতক্ষণ তাকে দেখা যায় ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে কমলা দরজার মাথা ধেসে।

ঠাকুর শুভময়ের কণ্ঠস্বর কানে আসে। কমলা ও কমলা, কোথায় গেলে তুমি? ঘরময় কর্কশভাবে শুভময় তো কখনো ডাকে না ডাকে! বিস্ময় এবং আশঙ্কায় চমকে উঠে কমলা এক লাফে উঠে আসে ঘাম দিয়ে ঘরে।

কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ, ডেকে ডেকে সারা পাড়া জানে? জানো না, তোমায় ছেড়ে আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারিনে? রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে শুভময়।

কমলা আমার মাথার কাছে বুলোচ্ছে বুলোচ্ছে উত্তর দিলে, বাঁধরা এসেছিল, বাইরের ঘরে বসেই তার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ঐ বাঁধরাই তোমার মাথাটা খেয়েছে। আমি দেখছি, ওর ছেলেটাই তোমার ধ্যান-জ্ঞান করে দাঁড়িয়েছে—ওকে ছাড়া তোমার মন কিনই কাটতে চায় না। বেশ তাই হোক।

এসব কি বলছো তুমি? আমার সম্পর্কে এমন ইঙ্গিত করতে পারলে? শেষে তুমিও আমায় অপমান করলে?—বলেই ধপাস করে শুভময়ের বুকের ওপর পড়ে গেল কমলা। প্রচণ্ড একটা আঘাতে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ঘোটা ঘাড়টা মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। কমলার ছেলেকে নিয়ে বুড়ীর ভবলো বাড়িয়ে।

বেনারসী, ডেক্রন, টেরিলিন, টিসুকল, ওয়াশ-এন-ওয়্যার, সিল্ক এবং তাঁতের শাড়ী, শাল, আলোয়ান, গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার, সার্টিং, স্যুটিং, সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র ও পোষাকের জন্য

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল

প্রাইভেট লিমিটেড

বড়বাজার, কলিকাতা—৭ ফোন ৩৩২৩০৩

পথই মাত্রেই বিচিত্র। কিন্তু পথের জগতেও বৈচিত্র্যের দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার কোন জুড়ি নেই। বিচিত্র বলে যে সিকিমবাসীরা একে দেবতাজ্ঞানে পূজো করে। দেবতাত্মা বলে এর থেকে পাথর খায়ে। দেবতার ছায়ার বলে ওদিকে বড় একটা পাখিকে যেঁষতে দেখা যায় না।

•

দার্জিলিং যেতেই অবশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাননি এমন দুর্ভাগা নিশ্চয়ই আছে। আমি অন্ততঃ একজনকে জানি, যিনি পাঁচ পাঁচ বার হাত থাকতে উঠে হাত ঘষে কাঁপতে কাঁপতে টাইগার হিলে গিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয় দেখবেন বলে। পাঁচ পাঁচবারই তিনি বিফল হয়েছেন। তিনি নিজে কবুল করেছেন যে তিনি দুর্ভাগা। কিন্তু এর দুর্ভাগ্যের বিস্তৃতিটা কেবল তিনিই জানেন টাইগার হিলের উপর গিয়ে যাঁরা কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখেছেন।

•

দুটি দেখেই একজনের কথা।

"ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ যাচ্ছিলাম। এক বাঙালির সঙ্গে। ভদ্রলোক

যেন টেনে আমাকে এইখানে নিয়ে আসে।—তার মানে কি নিয়তি?

"সামনে একের পর এক পর্বতশ্রেণী। অবশেষে পেয়ে লাদিঙ্গায়। সেখানে সামরিক সব ফুল ফুটে আছে; সেখানে সব বিচিত্র পাখীর কূজনী শুনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মনে হয় ছুঁয়ে ফেলতে পারি। বৈকুণ্ঠের মাঠে ওখানে প্রতিদিন সূর্যোদয় হয়, সূর্যাস্ত ঘটে বেহালের মুক্তাঙ্গনে।

"আর সব কিছু মেলে যাকে এক অপার্থিব নৈঃশব্দ। অজানা পাখীর কাকলীতে সে নৈঃশব্দ ভঙ্গুরতর হয়। পৌঁছ বছরে সভ্যতার হিমোলে অধিবক্তম তাৎপর্যময়।

"এই পাহাড় অতিক্রম করে যাত্রীরা তীর্থস্থানে যায়। সেখানে পূজারী পূজো করে। সাধক সাধনা। ভিক্ষুকটীরী ভেড়ার পিঠে দুধ নিয়ে আসে, পশমও নিয়ে যায়। এখানে চিরদিনের হিমালয়।

"সূর্যের ছটা ইতিমধ্যে বাড়তে থাকে অথবা কমতে সুরু করে। হঠাৎ যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার আগুন জ্বলে ওঠে লাল হয়ে ওঠে; অথবা পঞ্চমীর রাত্রিশেষে সামনে এসে দাঁড়ায় দীর্ঘমতী প্রশান্ত।

"কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ে আর সূর্যাস্তে সামান্যই পার্থক্য। কিন্তুরা বলে ভিন্নতর আবেগ থেকে দেখার উপ্রেক্ষা; কথাটা ঠিক তবে কথাটার চাইতে সত্যটা বড়। অনেক বড়।"

•

সরলতার প্রসাদে কথাগুলো সকলেরই হৃদয়ে পাবার। কিন্তু সে-প্রসাদ তেমন অকৃপণ নয় যে কথাগুলো মাইকের। অর্থাৎ—পর্বতারোহী ক্লাব মাইকের।

তবে জলপাইগুড়ি থেকেও একটা চিঠি পেয়েছি, আরেকটা পেয়েছি আমবাড়ি থেকে; আরেকটা গ্যাংটক থেকে।

জলপাইগুড়ির চিঠিটির বক্তব্য: কাছে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঐশ্বর্য হয়তো ভালো-ভাবে দেখা যায়। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভাবের দিকটা দেখতে হলে দূর থেকে দেখতে হবে। জলপাইগুড়ি থেকে।

আমবাড়ির দর্শকের বক্তব্য, সাদামাটা ভাষায়, কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রকৃত রূপ কেবল আমবাড়ি থেকেই বলতে পারে।—যেমন কাব্যের দিকটা তেমনি ঐশ্বর্যের দিকটাও। এদের পর এক সবুজ পাহাড়গুলো ক্রমে ধূসর হয়ে শেষে কালো হয়ে গেছে।—দিগন্তে একটি রুপোলী রেখা। কখনও চাঁদের মতো আকাশে, কখনও ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ। আমবাড়ি থেকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেনি প্রকৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা তার আজও অদেখা।

গ্যাংটকের দার্শনিকা অবশ্য একটু উঁচুতে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এখানে মূর্তিমৎ বাস্তব অবাস্তব। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলে মনে হয় একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে। সামনের পাহাড়টির উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ছে; দুবার ঘুম নামলে গ্যাংটককে নিয়ে নামবে। কিন্তু একটু বেলা বাড়ুক, সামান্য মেঘ জমুক—কাঞ্চনজঙ্ঘা হঠাৎ সুদূর।

•

দার্জিলিং, টাইগার হিল, জলপাইগুড়ি, আমবাড়ি অথবা গ্যাংটক।—কাঞ্চনজঙ্ঘার বৈচিত্র্যের দিকটার কোন উপমা নেই,—না বিশ্বে, না হিমালয়ে।

ভ্রাম্যকের অট্টহাসির এমন অকৃপণ প্রকাশ থেকে কবি কাব্য রচনা করবে, শিল্পী ছবি আঁকবে, বিশ্বাসী পূজো করবে।—সেই পর্যন্তই স্বাভাবিক, সেই পর্যন্তই যথেষ্ট।

কিন্তু জগতে এক ধরণের উদ্ভট লোক আছে। এরা না কবি, না শিল্পী, না বিশ্বাসী। সব মিলিয়ে এরা এক জগাখিচুড়ি। একদা এদের 'এক্সপ্লোরার' বলা হত; সাম্প্রতিক নামকরণ—'মাউন্টেনিয়ার'।

মানুষ যে কেন মরতে মাউন্টেনিয়ার হতে যায় তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবে হয়, গত একশত বছর ধরে হচ্ছে। আগে কেবল ইউরোপে হত, এখন বাংলাতেও তার অনুযোগের অবধি নেই।

এদের দোষ, অথবা বৈশিষ্ট্য, এরা জানতে চায়। অধিকতর অন্তরঙ্গভাবে ঘনিষ্ঠ হতে। লোকেরও এদের অন্য কোন নেই, কিংবদন্তী এদের মুক্ত নেহারেই কল্পনা। পাহাড়ী পথে না চললে, এদের হিসাবে, পাহাড় চেনা হয় না। ঝুমার কথার মুখোমুখি হয়ে জানতে হবে ঝুমার কাকে বলে। লোকের এরা মোটেও হয় না, জানতে চায় সৌন্দর্যের সুন্দরতাটা ঠিক কোথায়। বহুত এদের কাছে বহুরোম্যান্টিসিজমের আমন্ত্রণ। এরা উদ্ভট, এরা অদ্ভুত। দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে এরা তৃপ্ত নয়, এদের আরও—কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে দাঁড়িয়ে দার্জিলিং দেখবে।

•

ঘুমাতিঘুম থেকে সিকিমবাসীদের বিশ্বাস—কাঞ্চনজঙ্ঘার পাতকে শীর্ষে ঈশ্বরের মানস ঐশ্বর্য গচ্ছিত আছে। তাদেরও চাষি মোচা-লা-য়। সে ঐশ্বর্যে মানুষের অধিকার নেই। অতএব মানুষের সে পথে যাওয়া বারণ। সিকিমবাসীরা প্রতি বছর কাঞ্চনজঙ্ঘার উদ্দেশ্যে পূজো নিবেদন করে থাকে। সিকিমের উৎসবই তাদের উৎসব। আমাদের যেমন দুর্গাপূজা।

•

দূরত্ব কাঞ্চনজঙ্ঘার এমনটাই নাকি নিয়ম। অমন চরম দূরত্বে দূরে থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনই নিরাপদ।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নিরাপত্তাজ্ঞান-টান কিছু লোক এসে চাকির করে শুরু করলেন। দার্জিলিংয়ে অথবা গ্যাংটকে জানা যায় না। এদের নামও কোন ঘরাফেরখানায় পাওয়া যাবে না।

তবে এরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিকটতর ভাবে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। কালাপাথারী নিকটতরভাবে দেখেছিলেন।

তবে এদের কথা পরের এপিসোডে,—এদের কথা আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।

•

ভারতধর্ম

জগদীশ ভট্টাচার্য

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিংশশতাব্দী যে বিপ্লবাত্মক মোড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে এমনটি কখনো হয়নি। একদিকে জীবনের পুরনো মূল্যবোধ একে একে ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে মানুষের চিন্তা চেতনায় নব নব দিগন্ত প্রতিদিন বিস্তৃত হচ্ছে। একদিকে পৃথিবীতে যে প্রলয় ঘটানো যায় এমন সব বিধ্বংসী আয়োজন আবিষ্কৃত হচ্ছে। অন্যদিকে মানুষ পৃথিবীর মহাকর্ষ ভেদ করে নিঃসীম শূন্যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পৌঁছবার পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। জড় ও প্রাণের, জীবন ও মন, আশা ও নৈরাশ্যের এমন দেবাসুর দ্বন্দ্ব ইতিহাসে আর কখনো হয় নি।

এদিক দিয়ে এই যুগের সঙ্গে এমন কোনো যুগ আর কল্পনাও করা যায় না, অন্যদিক দিয়ে আতিশয্যপ্রাচুর্যে এমন বিচিত্র ও পৃথিবীর মানুষ আর কখনো হয়নি। বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে আজ সমস্ত পৃথিবী একটি পৃথিবী পরিবার। বাংলার কবি বলেছিলেন, 'মানুষের মাঝে একজাতি আছে, তাহার নাম মানুষ-জাতি।' ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যবধান ঘুচিয়ে এখনকার সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে একটি বিশ্বনীড়ে মিলিত করার যে বিংশ শতাব্দীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও প্রযুক্ত হতে দেখি। কিন্তু শুধু বিজ্ঞান, কারিগরি আর অর্থনীতির সাহায্যে মহামিলনের যে সত্য রূপ সেকালের মানুষ বুঝতে পেরেছে। তার চাই প্রাচীন এবং নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিভিন্ন সভ্যতার জীবনাদর্শ ও মনোচর্যার সমন্বয়সাধন। পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র জীবন। পঞ্চাশের অধিক শতাব্দীতে প্রসারিত পাঁচটি মহাদেশে কত সভ্যতা, কত সংস্কৃতি। কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে একটি ঐক্যসূত্র। সেই ঐক্যসূত্র রয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বের মধ্যে। পৃথিবীতে কত জাতি, কত ভাষা, কত ধর্ম, কত সভ্যতা। কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর অন্তরালে আছে মানুষের মানবিকতা। এই মানবিকতাবোধে পৃথিবীর সব মানুষ এক। ভারতের রাশীকৃত-বাঙ্ময়-মহীধর, বর্তমান কালে বিশ্বসভ্যতায় ভারতের যেই সংস্কারমুক্ত, সর্বগ্রাসী মানবরূপকে তাঁর অপূর্ব সুন্দর ভাষায় বলেছেন, পৃথিবীর বিচিত্র সংস্কৃতিগুলি মানবাত্মার একটিমাত্র ভাষার বিভিন্ন উপভাষামাত্র। "The varied cultures are but dialects of a single speech of the soul." পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে মানবাত্মার এই একটি মূলভাষার সন্ধানই এযুগের দার্শনিক মনুষ্যের মুখ্য কৃত্য।

পৃথিবীর আজ জীবনের যে মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে তার তিনটি প্রধান স্তম্ভ। বিজ্ঞান, মানবিকতা এবং ঐকান্তিকতা। এই তিনটি স্তম্ভের যে মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হল মানববুদ্ধি। কিন্তু বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে মানুষের বুদ্ধি যে-মানুষকে দেখতে পায় সেই কি পূর্ণ-মানুষ? এই জিজ্ঞাসাই আজ মানুষের প্রথম জিজ্ঞাসা। অতীতবাদী চিন্তা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানুষকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বলেছে এই দুটি সত্তার মিলনেই সামাজিক মানুষের উদ্ভব। এই সামাজিক মানুষের মুক্তিই মানবিক অনুশাসনের লক্ষ্য। কিন্তু নব-উন্মেষিত সভ্যতার এই চিন্তাধারা নবোন্মেষিত সভ্যতাকে পৌঁছে দেয় আত্ম-সংকটের মধ্যে। এযুগে সমস্যা নির্দেশে মনস্তাত্ত্বিকরা নব-মানবতার জন্ম-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিগত শতাব্দীতে মূলধন, প্রাণবাদের বিপরীত কোটিতে দেখা দিয়েছিল অনুবাদ। বর্তমান শতাব্দীতে অনুবাদের বিপরীত কোটিতে প্রাণবাদের পুনরুজ্জীবনে, উভয়ের মিলনে, যে নব-মানবতাবোধের জন্ম হতে চলেছে তার মধ্যে সমন্বয়ের বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ উৎকর্ণ প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষারত। এই নবমানবতা নৈতিক ও সামাজিক, সামাজিক ও আত্মিক মানুষের সার্থক মিলনেই পূর্ণরূপ গ্রহণ করবে। ভারতের প্রাচীন মনীষা মানুষের পঞ্চকোষাত্মক সত্তায় এই পূর্ণমানবতারই ধ্যান করেছিল। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষে পূর্ণমানুষের উত্তরণই ছিল ভারতীয় জীবনচর্যার মূলকথা। তাইতে অখণ্ড মূলের মানুষকে পূর্ণমানবতার সন্ধানে ভারতীয় জীবনচর্যার দিকেই মুখ ফেরাতে হবে। নৈতিক ও আত্মিক সত্তার মিলনে যে নবমানবতার জন্ম হচ্ছে, সেই পূর্ণমানুষের জন্মভূমি আমাদেরই মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। এই বিশ্বাস নিয়েই ভারতের ঋষিকবি তাঁর জীবনের সর্বশেষ মহাগ্রন্থকে ভাষা দিয়ে বলেছেন, "আজ আমি কবে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসন্ন আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের দ্বারে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী কে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। ● ● ● আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একবার

একদিকে মানুষ নিজের ভবিষ্যতের অভিমানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" এই মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথ হল পূর্ণমানবের আত্মোদ্ঘাটনের পথ।

(২)

ভারতের মাটীতে গত পাঁচ হাজার বছর ধরে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিচিত্র ভাবাভাষী মানুষের মিলনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য পৃথিবীর পূর্ণমানবের আত্মোদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে ও পথ প্রস্তুত হয়েছে। ভারতের তাই ভারতভূমিকে বলেছেন বিশ্বমানবের মিলনতীর্থ। মহেঞ্জোদড়ো, মহাস্থানগড়ের সাধকরাই। পশুপতি-অঙ্কিত-বক্ষ-পশুপাল কৃষ্ণবিভিন্ন মানবগোষ্ঠী যে এই সাধকতীরে এসে মিলিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নিগ্রোবটু, আদিম-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, আর্য্য, মোঙ্গোল বা ভোটচীনীয় মানুষের বিচিত্র সংস্কৃতিতে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ অনুরঞ্জিত হয়েছে। তারপরে, এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে, হিমালয়পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম দেখিয়ে এসেছেন আর্যগোষ্ঠীর মানুষ। ভারতের প্রাগ্-আর্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত সংঘর্ষ ও সম্মিলনের মধ্য দিয়ে তখন হয়েছে ভারতপুরুষের। ভারতের মাটীতে, প্রথমে আর্যাবর্তে পরে দাক্ষিণাত্যে, ধীরে ধীরে আর্য-সভ্যতার প্রসার বিস্তার করেছে। আর্যভাষা গ্রহণ করেছে ভারতের অনার্য নরনারীগণ। এই আর্য ও অনার্য ভাষা ধর্ম ও সভ্যতার সম্মিলনে গড়ে উঠেছে ভারতীয় মানুষ। তাদেরই ভাবনায় আদর্শ হল ভারতবর্ষ, তাদেরই ভাবনালোকের নাম ভারতধাম।

কিন্তু এই ভারতবর্ষ ও ভারতধাম রচনার আদিযুগে অনার্যদের দান নগণ্য ছিল না। আর্যরা ছিলেন শুক্লবর্ণের মানুষ। মোঙ্গোল গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন পীতবর্ণের। শুক্লবর্ণের সঙ্গে পীতবর্ণের মিলনে হয়েছে কাঁপলবর্ণের

Presenting

THE NEW FEATURES OF

Ambassador

Mark III

EXTERIOR

- New grille complete with side lamps
- New over-riders front and rear
- New body colours
- Addition of 'MARK III' flash on each front wing
- Tubeless tyres standard : tyres and tubes optional

INTERIOR

- Improved design front seat
- Addition of two-tone trim (except on Slate-Grey and Valley Green cars)
- Addition of ash trays in rear of front seat and centre of fascia panel
- New design door trim pads
- Provision of the HM emblem transfer in the bottom centre of rear glass

HM HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA-1

DEALERS ALL OVER INDIA

মানুষের জন্ম। অনার্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের মিলনে উদ্ভব হয়েছে শ্যামবর্ণের মানুষের। পীতবর্ণের মানুষদের নাম ছিল কিরাত। কৃষ্ণবর্ণের মানুষেরা ছিলেন নিষাদ। অবশ্য অনার্যকে বলা হত দাস বা দস্যু। তাছাড়া নাগ অসুর, পিশাচেরাও ছিলেন। সম্ভবত এঁরাই পরে শূদ্রশ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু সংস্কারগত ভিত্তিতে মানুষের কেবল দুটি প্রধানের ভিন্নটি—শুক্ল, কপিল এবং শ্যাম। উচ্চজাতির মধ্যেও শ্যামবর্ণের নর-নারীর অভাব ছিল না। রামচন্দ্রের বর্ণ ছিল নবীন-নীরদকান্তি। কৃষ্ণও ছিলেন নবজলধরশ্যাম। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদী ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা। ব্রাহ্মণ-সমাজেও কৃষ্ণবর্ণের মানুষ ছিলেন। বরং কৃষ্ণবর্ণের ব্রাহ্মণদেরই বৈদেশিক বলে বিশেষ সম্মান ছিল।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের যে-সব প্রধান জাতি প্রচুর করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও আর্য-অনার্য বর্ণানুবর্ণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতসাহিত্যের মহত্তম গ্রন্থ হল মহাভারত। মহাভারত একাধারে ইতিহাস, পুরাণ ও মহাকাব্য। অর্থাৎ তা আর্ষও বটে, ঋষিপ্রণীত বটে। এই মহাভারত যাঁর কীর্তিকথা বলে গিয়েছেন বর্ণসাঙ্কর্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁকে ত্রিনচতুর্থাংশে অনার্য বলা চলে। তাঁর পিতা পরাশরের জননী অযোনিজা ছিলেন চণ্ডালকন্যা। তাঁর মাতা সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধা ছিলেন দাসী অর্থাৎ কাসবোটির অনার্য দুহিতা।

প্রাচীন ভারতের তিনজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন—রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। রাম সূর্যবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয়। কিন্তু বর্ণে শ্যাম। কৃষ্ণের মধ্যে আর্য ও অনার্য রক্তের মিলন হয়েছে। তাঁর পিতা বসুদেব ছিলেন যদুবংশের দুগ্ধাশাখার ক্ষত্রিয়। আর মাতা দেবকী অসুর বা অনার্য রাজকন্যা। বুদ্ধ ছিলেন কপিলবাস্তুর রাজপুত্র। আর্য ও মোঙ্গোল রক্তের মিলনে অথবা মোঙ্গোল জাতীয় মানুষের আর্যীকরণের ফলে, কপিলবাস্তুর শাক্য রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের মহা-মেরুস্থানীয় এই পুরুষত্রয়ের উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারা যায়, ভারতবর্ষের বিবর্তনে আর্য অনার্য রক্ত ও ধর্মের মিলনের গুরুত্ব কী অপরিসীম।

প্রাচীন ভারতে অনুলোম এবং প্রতি-লোম—দুই শ্রেণীর বিবাহই প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নতর বর্ণের নারীর বিবাহই শুধু যে হত এমন নয়, নিম্নবর্ণের (অর্থাৎ অনার্য জাতিভুক্ত) পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের (অর্থাৎ আর্য গোষ্ঠীর) নারীর বিবাহও অসম্ভব ছিল না। অবশ্য সমাজে ক্রমশঃ আর্যপ্রাধান্যের ফলে প্রতিলোম বিবাহ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় সমর্থন ধীরে ধীরে হারাতে লাগল। তবে পশ্চিম ভারতে আর্য ভাষা ও আর্য ধর্মের প্রচুর প্রভাব সত্ত্বেও সেখানে দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষই চিরকাল প্রাধান্য লাভ করেছেন। এক্ষেত্রেও অর্থাৎ উত্তর ভারতে আর্যসভ্যতা এবং দাক্ষিণাত্যে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়সংস্কৃতির অনার্য সভ্যতা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও চিরকাল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে। ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাসে এই দুটি সমান্তরাল সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যকে বিস্মৃত হওয়া সমীচীন নয়।

খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর শেষার্ধ থেকে তুর্কী-পাঠান-মোগলের ভারত-অভি-যানের ফলে ইরান ও মধ্য-এশিয়ার ইসলামী সভ্যতার সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল। দ্বিতীয় সহস্রাব্দীতে পাঠান ও মোগল আমলে যাঁরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তো কথাই নেই, এমন কি যাঁরা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেন নি তাঁদের ওপরও ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ভারতে ইসলামী সম্পর্কের প্রধান ফল বেদান্তের সঙ্গে সুফী ধর্মের মিলন। মোগল আমলে বিজেতা ও বিজিতের ভাবসাধনার এবং সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যেও নানাভাবে হিন্দু-মুসলিম মিলনের শুভপ্রয়াস ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে মোগল সম্রাট আকবরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ উপনিষদ ও অন্যান্য হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। দারা শিকো অবশ্য বেদান্ত ও সুফী ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও ইসলামের মূলসাধনামূলক একখানি গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচনা করেন। তিনি বেদান্তের সঙ্গে সুফী ধর্মের মিলনকে বলেছেন 'মজমা-উল-বহরাইন' বা 'সঙ্গম-সাগর'। ভারতীয় আর্যসংস্কৃতিতে আরব-পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার ঐসলামিক ধর্মসংস্কৃতির প্রভাবে ভারতধর্ম ও ভারতমানস বিশেষ-ভাবে নূতন শক্তি অর্জন করেছে। সংস্কৃতের খোলাপ ভারতীয় সুপ্রাচীনতাকে দান করেছে নূতন যৌবন। বিদেশী ধ্যানধারণের অভিঘাতে বিলাসচর্যা চারুকলার অনুশীলনে সাহিত্যসংগীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে—ভারতপুরাতে নবাভিসন্ধের সন্ধান দিয়েছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর উত্তরার্ধে আর্য ভারতের সঙ্গে নবজন্মোদ্যত য়ুরোপের মিলন ঘটল। উনবিংশ শতাব্দীতে মুখ্যত ইংরেজ ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এসে পাশ্চাত্যের ভাবধারা। তারই সংস্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের যে নবজন্ম হল, জীবনচর্যায় তার ছিল দুটি লক্ষণ। প্রাচীনের নবীকরণ, আর পাশ্চাত্যের স্বকীয়করণ বা স্বীকরণ। মনীষী শুকদেব, মানবিকতাবিকাশের ভারতীয় অধ্যায়ক, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৩ সালে ইংরেজি ভাষায় যে কমলা বক্তৃতা প্রদান করেন তার বিষয় ছিল 'ভারতত্ত্ব ও ভারতীয় সমন্বয়'। [Indianism and the Indian synthesis]। ভারতবর্ষে পৃথিবীর প্রাচীন মহাজাতীয় এবং আধুনিক বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মসংস্কৃতি কিভাবে সমন্বিত হয়েছে তার সু-দীর্ঘ আলোচনা করতে এই বক্তৃতামালায় করেছেন। তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসপ্রবাহে য়ুরোপীয় সভ্যতার দান প্রসঙ্গে আচার্য চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

"This presents itself before the whole world, in the first instance, in the form of an active faith in the destiny of man as the ultimate controller of the forces of nature through science, harnessing Nature to the sevice of man for his physical intellectual and aesthetic well-being; and the spiritual is not excluded from this. • • • One of the other key-notes of Europeanism is the great sense of Humanity, which it has received ultimately from the ancient Greeks through the Romans."

[পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯]

বলাই বাহুল্য, আধুনিক য়ুরোপ থেকে আগত এই নবমানবতাবাদ ভারতীয় জীব-নব্যবহারের সমীকরণ বা নবরূপায়ণে

বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামের সঙ্গে আর্য ধর্মের মিলনকে বলা হয়েছিল দুই সমুদ্রের সংগম। আধুনিক যুগে য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিলনকে বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক মধ্যসংগম।

(৩)

কিন্তু এই মহাসমন্বয়ের মধ্যেও ভারতবর্ষ কোনোদিনই নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দেয় নি। আত্মদানের প্রাণশক্তির বলে ভারতীয় সভ্যতা যুগে যুগে যত বিচিত্র, এমন কি বিপরীতধর্মী চিন্তা ও চর্যাকে আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানই হয়েছে ভারতীয় সমন্বয়ের মূল সূত্র।

ভারতবর্ষে এই ঐক্যসূত্রটি কি, যাতে ভারতীয় চিন্তা ও চর্যার এত বাহুল্য সম্ভব হয়েছে, তা জেনে রাখা অত্যাবশ্যক। দার্শনিক ভিত্তিভূমিতে জীব জগৎ ও ব্রহ্ম—এই তিনের সমন্বয়ে যে অখণ্ড তত্ত্ব, তাকেই চিন্তা ও চর্যাই ভারত-ধর্মের শেষ কথা। ভারতের জাতি-স্মৃতি-পুরাণে এই অখণ্ডতত্ত্বই ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভারতের লোকায়ত ধর্মসাধনাতেও এই অখণ্ড তত্ত্বেরই প্রকাশ। আচার্য শঙ্কর শ্লোকার্ধে এই অখণ্ডতত্ত্বের সূত্র রচনা করে বলেছেন,

ব্রহ্মাবৈবেন প্রবক্ষ্যামি
যদুক্তং গ্রন্থকোটীভিঃ।
জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

ছায়াবাদী শঙ্কর নিত্য পরিবর্তমান এই জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেছেন ব্রহ্মই সত্য; তাঁর অদ্বৈতবাদের এটি দ্বিতীয় দিক। দ্বিতীয় দিকটি হল : জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। জীবই ব্রহ্ম। জীব এক ছাড়া আর কিছু নয়। এই জীবব্রহ্মবাদই ভারতীয় অদ্বৈতবাদের মর্মবাণী। ভারতীয় আর্যধর্মের প্রথম যুগ হল বৈদিক যুগ। তার শেষ কথা বলা হয়েছে বেদান্তে। এক অর্থে বেদান্ত হল বেদের শেষ কথা। অন্য অর্থে বেদান্ত জ্ঞানেরও শেষকথা। এই বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মকেই স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকে বিশ্বসভার কাছে প্রচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি এমন এক ভারতবর্ষের কথা বলতে এসেছি, যেখানে ধর্ম মানে বিদ্বেষী মতবাদ, এবং খ্রীষ্টধর্ম যার দুষ্কৃতী প্রতিদ্বন্দ্বী।

জীব জগৎ ও ব্রহ্মের সমন্বয়ে, ঋষিকল্প ভারতীয় অবতারকে আমরা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন -

ওঁ তৎ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

ভারতীয় দর্শনে একই তত্ত্বের নানা অর্থ, নানা নাম। জীব জগৎ ও ব্রহ্মের সম্পর্কচিন্তায় ভারতবর্ষে বিচিত্রভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। একটিমাত্র পথকেই ভারত চূড়ান্ত পথ বলে স্বীকার করেনি। এখানে যত মত তত পথ। প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে, নদী বিচিত্র পথে চলে, কিন্তু তার শেষ লক্ষ্য মহাসমুদ্র। তেমনি মানুষের চলার পথও বিভিন্ন; কিন্তু মানুষ যে পথেই চলুক না কেন, তার শেষ লক্ষ্য সেই পরমতত্ত্বরূপ মহাসিন্ধু।

পৃথিবীর সাধনতীর্থের মধ্যে এমন ভাবাদর্শ হল ভারতের মহত্তম। মহাভারতের মহাপর্বে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যক্ষরূপী ধর্ম যখন ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার শেষে চারটি চরম প্রশ্ন করেছিলেন : কা চ বার্তা, কিমাশ্চর্যম্, কঃ পন্থাঃ, কশ্চ মোদতে। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের তৃতীয়

জাতীয় প্রতিরক্ষার
জন্য
সঞ্চয় বাড়ান

দি ব্রিটানীয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিঃ
এর সৌজন্যে

ম্যানেজিং এজেন্টস :
ম্যাকনিয়ল এণ্ড কোং লিঃ
৩, নেতাজী সুভাষ রোড ঃ কলিকাতা—১

হয় তবে, মানুষের পথ কি। এর উত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের মহাকবি বলেছেন—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
ন্যায়ো ন ভিন্নো যদসৌ ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অর্থাৎ বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, যেন যুক্তি নেই যার মত ভিন্ন নয়; ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজনগত পথই মানুষের পথ। এই মহাজন শব্দের অর্থকে প্রায়ই মহাজন বলে ফল করা হয়। কিন্তু মহাভারতের বিদ্যাধর টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাজনকে বলেছেন, বহুজন। 'মহাজন, সম্মত-সবমার্গমিত্যর্থঃ।' বহুজনসম্মত পথই সত্যপথ। আধুনিক পরিভাষায় আমরা যাকে বলি সমাজমানস, নীলকণ্ঠ যেন সেই অর্থেই বহুজন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বহুজন অর্থ জনগণ। যেখানেই জয়ধ্বনি করা হয়েছে মানুষের। মানুষের সমবেত ও সমাগত প্রজ্ঞার।

বস্তুত, ভারতবর্ষে কোনোদিনই প্রজ্ঞার আলো নির্বাপিত করে দেওয়া হয়নি। ভারতীয় দৃষ্টিতে মানুষের গতানুগতিক জীবনের অর্থ হল মরণ। 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।' ভারতীয় প্রতিশব্দকে বলা হয় মনোজ্ঞবেদ্য। বেদবাদিগণ বেদবাক্যকে অলঙ্ঘনীয় মনে করতেন। কিন্তু মহাভারতকার বলেছেন, যুক্তিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের মত বেদবাক্যও বিচারিত। তাকেই স্মৃতিই হোক, আর শ্রুতিই হোক,' শাস্ত্রবাক্য অন্ধের মতো নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে প্রত্যেক মানুষের প্রজ্ঞাদৃষ্টিকেই বড়ো করে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, যার নিজের প্রজ্ঞাদৃষ্টি নেই শাস্ত্র তার কি করবে? বলা বাহুল্য তার প্রজ্ঞা শাস্ত্র বলা হয়েছে কিন্তু।' তাই ভারতবর্ষে শাস্ত্রানুশাসনই শেষ কথা নয়, প্রজ্ঞার আলোই জীবন-পথের অভ্রান্ত সন্ধান দেয়। কেননা প্রজ্ঞাদৃষ্টিই স্বয়ম্ভূ।

(৪)

এই প্রজ্ঞার আলোকে শ্রেণিবিভাগে প্রতিষ্ঠিত থেকে মানুষের ও বৃহত্তর জীবনচর্যায় ভারতবর্ষের জীবন-বৃদ্ধি। তারই নাম ভারতধর্ম। এই ভারতধর্মের তিনটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো: চাতুর্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম এবং চতুর্পুরুষার্থ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—ভারতীয় মানুষ এই চতুর্বর্ণের সমাহার। ঋগ্বেদের পুরুষ বলেছেন, ওপনিষদিকেরা এই চাতুর্বর্ণ্য কল্পিত হয়েছে। চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্মবিভাগশঃ। সমাজবিজ্ঞানের অবশ্য এর পক্ষপাতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মিলনে সংস্কৃতীকৃত এবং সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসকেই সন্ধান করবেন। কিন্তু শুধু স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রেই নয়, ওপনিষদেও সমাজের মানুষের এই শ্রেণী-বিভাগ প্রাচীন-ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক চিন্তারই সন্ধান। পরবর্তী কালে লোকাচার ও দেশাচারের ফলে, এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের উদয় আগমন ও সংস্পর্শের প্রেক্ষাপটে, বর্ণসাংকর্যের ভয়ে ভীত রক্ষণশীল মানুষের হাতে এই বর্ণবিভাগ দুঃখমার্গে পর্যবসিত হয়েছিল। তাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হয়ে ভারতীয় বর্ণ-ব্যবস্থা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতের অকল্যাণেরই কারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আদিতে গুণকর্মানুযায়ী এই বর্ণ বিন্যাস সমাজ-জীবনের পক্ষে শুধু অত্যাবশ্যকই ছিল না, তা মানুষমাত্রেরই পক্ষে হিতকরও ছিল। বৃদ্ধি ও জ্ঞান-চর্চায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের বলা হত ব্রাহ্মণ। জ্ঞানার্জন এবং সমাজে তার প্রতিফলনই ছিল ব্রাহ্মণের ধর্ম। বলাই বাহুল্য, আত্মজ্ঞান বা পরমার্থজ্ঞান অর্জন করে তদনুযায়ী জীবনযাপনই ছিল ব্রাহ্মণচর্যার অঙ্গ। "সঃ কাঙ্ক্ষিৎ আত্মানম্ অনবেক্ষ্যাকৃত্স্ন কৃতার্থতা বর্ততে স এব ব্রাহ্মণঃ।"

ব্রাহ্মণবর্ণকে যদি বলা যায় প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচক্ষু, তাহলে ক্ষত্রিয়বর্ণকে বলতে হবে তার বাহুবল। দুরন্তকালীর রক্ষণাবেক্ষণ, দুরন্তকালীর শান্তিবিধান এবং ধর্মানুশাসিত সমাজবিধানকে অব্যাহত-ধারায় ছিল ক্ষত্রিয়রক্ষা। বৈশ্যবর্ণ ছিল ধন-সম্পদ উৎপাদনের দ্বারা সমাজের সমৃদ্ধি সম্পাদন। মানুষ পরিশ্রম এবং সামাজিকগণের সেবাই ছিল শূদ্রধর্ম। বলাই বাহুল্য শূদ্রবর্ণ ছিলেন সমাজসোপানের নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ। উচ্চতর বর্ণত্রয়ের বিজয়প্রাপ্তির যে আধকার ছিল শূদ্রকে প্রাচীন ভারতে সে অধিকার দেওয়া হয়নি। তার হেতু বর্ণনা করে ধর্মশাস্ত্রকার মনোরঞ্জন বলেছেন—

Labour is the basis of all human relations. While the first three classes are said to be twice born, the fourth is said to be once born and so in-ferno. It only means that the activities of the members of the fourth class are instinctive and not governed by ideals of knowledge, strength, or mutual-service. While the seeker of wisdom works for the joy of the search, the hero of action works from a sense of honour, the artist and the skilled craftsman are impelled by a love of their art, and even the lowest worker has a sense of the dignity of labour.

[Eastern Religion and Western Thought, পৃঃ ৩৬৪]

তাছাড়া উপনয়ন সংস্কারের পরে উচ্চতর বর্ণত্রয়ের দ্বিজত্ব স্বীকৃত হলেও স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, জন্মকালে মানুষ মাত্রেই শূদ্র। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।" তাছাড়া প্রাচীন ভারতেও সাধনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করে প্রত্যেক মানুষই বর্ণশ্রেষ্ঠের অধিকার লাভ করতে পারত। বেদীসংহার নাটকে কর্ণ বলেছেন, আমি সূতই হই আর সূতপুত্রই হই, তাতে কি যায় আসে। জন্ম তো দৈবাধীন, মানুষের আসল আসে সৌরুষ অর্জন। সেখানে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না:

সূতো বা সূতপুত্রো বা
যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম
মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।

তৎসত্ত্বেও, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ভারতীয় সমাজের বর্ণ-বিন্যাস একদিন মানবধর্মবিরোধী জাতি-ভেদ প্রথায় সৃষ্টি করেছিল। মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু-মুসলমান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এই জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পেরেছিলেন, চণ্ডালও যদি বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ হয় তাহলে সেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো
হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

উৎকর্ষাকাঙ্ক্ষী মানুষের শ্রেণীবিভাগ চিরদিনই মানবসমাজে আছে। শোষণ-কারী সমাজে অবশ্যই আছে, কিন্তু শ্রেণীহীন-সমাজে কল্পনাতীত। তবে বর্ণবিভাগ প্রথাকে আশ্রয় করে একালের মুখ্যতের সংকীর্ণতরার্থে সুবিধাবাদী উচ্চবর্ণের মানুষেরা মানুষকে যে মহান ও হরিজন-শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন তা অতিক্রান্ত ঈশ্বরতত্ত্ববাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিশ্ব সভ্যতার বৃহৎ, মহান গান্ধীর, রবিজন আন্দোলনই ছিল তাঁর জীবনের শেষ উৎকণ্ঠা। স্বামী বিবেকানন্দও জীব-ব্রহ্মবাদের ভিত্তিতেই অসংশয়িত, সুস্পষ্ট মানুষকে বলেছিলেন শিবজ্ঞানে জীব।

চতুর্বর্গের মধ্যে চতুরাশ্রমও হিন্দুর জীবনচর্যার একটি সার্থক পরিকল্পনা। চতুরাশ্রম হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। মহাকবি কালিদাস যে রঘুবংশ মহাকাব্যে এই আশ্রমচতুষ্টয়ে মুখের ক্রম নির্দিষ্ট করে বলেছেন, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়ভোগ, বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি এবং যোগাভ্যাসে দেহত্যাগ। এই চতুরাশ্রমী জীবনচর্যার ক্রম হল চতুর্বর্গফললাভ। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ। ধর্ম হল সদাচারসম্মত জীবন। অর্থ হল বিত্ত বা ঐশ্বর্য। কাম হল কামনা বা বিষয়াভিলাষ। বিত্ত জীবনসম্ভোগ। আর মোক্ষ হল মুক্তি। ক্রমটি লক্ষ্য করবার মতো। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সদাচার-সম্মত সজীবনের অধিকার লাভ করে ন্যায়ক্রমে বিত্ত ও সম্পদ আহরণের মধ্য জীবনসম্ভোগ। তারপর বানপ্রস্থে সাংসারিক থেকে ক্রমে মনকে সরিয়ে নিয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে সর্ববন্ধনমুক্ত বা মোক্ষলাভই ভারতীয় জীবনচর্যার লক্ষ্য। ঈশ্বরনির্ভর প্রকারভেদ অনুসারে এই মোক্ষের নানা রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থ-যুগের শেষদিকে বৈষ্ণবরা অহৈতুকী ঈশ্বর-প্রেমকে বলেছেন মানুষের পরম পুরুষার্থ। বর্তমান পৃথিবীতে নবমানবতাবাদের উত্তরের যুগে ঈশ্বরপ্রেমের স্থান নিয়েছে বিশ্বমানবপ্রেম। এই বিশ্বমানবপ্রেমকেই বলা যেতে পারে মানুষের মহৎ পুরুষার্থ। ভারতীয় চিন্তায় এই মহৎপুরুষার্থ এক অপূর্ব-সুন্দরস্বরূপ লাভ করেছে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতবর্ষের এক নবরূপায়ণের কল্পনা করেছিলেন। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকীয় ইউরোপীয় মানবতাবাদী দার্শনিক চিন্তার দ্বারা তিনি নানাভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফরাসী দার্শনিক কোঁতের ত্রিবাদের সঙ্গে স্টুয়ার্ট মিলের নিষ্কাম কর্মবাদের সমন্বয় ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবজন্মের ভারতের যে নবধর্মের কল্পনা করেন তার নাম তিনি দিয়েছিলেন অনুশীলন-ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মানুষের বৃত্তিসমূহকে মুখ্যত চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি। এই বৃত্তিসমূহের অনুশীলন প্রস্ফুরণ ও সামঞ্জস্য সাধনের ফলেই পূর্ণ-মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়: এই পূর্ণ-মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। মানবিক বৃত্তিগুলি সমভাবে অনুশীলিত হলে ঈশ্বরমুখী হয়। সেই অবস্থাই নাম ঈশ্বরভক্তি: কিন্তু ঈশ্বর সংস্কৃতে বিশ্বজনীন। সুতরাং সংস্কৃতে খ্রীষ্ট বা তাঁর ঈশ্বরে ভক্তি নেই। মানুষের এই শ্রীতিধর্ম ক্রমপ্রসারণ-ধর্মী। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি এবং সর্বশেষে জাগতিক প্রীতি। বঙ্কিমকথিত এই জাগতিক প্রীতিই প্রীতিবৃত্তির শেষ সীমা। এই জাগতিক প্রীতিরই আধুনিক নাম বিশ্বমানবপ্রেম।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে নূতন অর্থে আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ তিন। মানুষের জন্মভূমি তিনটি। তিনটিই একত্র ভারত। মানুষের প্রথম জন্ম নিখিল পৃথিবীতে। দ্বিতীয় জন্ম নিখিল ইতিহাসে। মানুষের তৃতীয় জন্ম আত্মিক লোকে। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন মহা-মানবত্বের মহাদেশ। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে মানুষের এই ত্রিজন্মের স্বরূপ ও মহিমা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ আপন উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তি-সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক-মানব।" [মানুষের ধর্ম, পৃঃ ২]। সর্ব-মানবের মধ্যে এই এক মানবের উপ-লব্ধিরই অন্য নাম জীবব্রহ্মবাদ। প্রাচীন ভারতের ঋষি বলেছিলেন, যিনি আত্মার মধ্যে সকলকে দেখেন এবং আত্মাকে দেখেন সকলের মধ্যে, তিনি কাউকে ঘৃণা বা ভয় করে দূরে দেখেন না।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি
আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং
ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

এই আত্মোপলব্ধিপুত সম্পর্কের নিজের সঙ্গে সকলকে মিলিয়ে দেখারই নাম আত্মিক সাম্যবাদ। এই আত্মিক সাম্য-বাদই ভারতবর্ষকে বিশ্বমানবমুখী করেছে। আধুনিককালে ভারতবর্ষ যে নবমানবতা-বাদের বাণী বহন করেছে আত্মিক সাম্যবাদই তার মূলমন্ত্র।

রমেন্দ্রনারায়ণের বাঘ শিকার!

অর্ধেন্দু দত্ত

বন্য প্রাণী ও শিকার সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকবর্গ জানেন—আসামের বিভিন্ন জেলায়, যেমন তিনসুকিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে, বিশেষ করে গ্যাম, চন্দ্রী প্রভৃতির আক্রমণে প্রতি বছর বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে।

ভারতের অন্য যেকোন অপেক্ষা আসামের ভৌগলিক ও আর্কিটেক প্রাকৃতিক অবস্থা এমন বিশেষ ধরনের যে, তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য কারো কল্পনার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। কাছাড়-জেলার শিলচরের নিকটবর্তী উদারবন্দ থানার অধীনে একটি গ্রামে মানুষখেকো বাঘ কয়েকজন গ্রামবাসীকে আক্রমণ করার ফলে, সেই অঞ্চলে একপ্রকার ত্রাসের সঞ্চার হয়। তদানীন্তন শিলচরের ডেপুটি কমিশনার উদারবন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে বাঘটি হত্যা করার জন্য আদেশ দেন। বহু শিকারী চেষ্টা করে বিফল হয়।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের ঘাত্যাঘাত। একদিন অপরাহ্ণে ৬টি দুরন্তা কুলী মেয়ে গরুর জন্য পাহাড়ের ঢালু থাকে নিবিষ্ট মনে ঘাস সংগ্রহ করছে। নালার কূলে কূলে কাঁটাজোপের বন এবং একটু উপরে ডানার দিকে লুকোবার মত-খাসড়ার বন জোপ। মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে কিছুই দেখা যায় না। মাথা নীচু করে আর করে ডিঙ্গলের দিকে পিছনটা লক্ষ্য করা যায়। অনেক মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু শিমুল ও চাম গাছ আছে। বাঁশগাছের জোপ এবং কৃপণে আন্দাজি বয়সের পাথরের টুকরো ইতস্ততঃভাবে চারিদিকে ছড়ানো।

প্রথমত মেয়েটির অবস্থান বুঝে বাঘটি চুপি চুপি এসে মেয়েটির ঘাড় কামড় ধরে। মেয়েটি যখন প্রাণভয়ে চীৎকার করছিল, তখন বাঘ মেয়েটিকে নিয়ে লাফিয়ে নালার ওপর উঠে এবং ঘন জোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

অন্য মেয়েটির চোখের সামনেই এই ঘটনাটি ঘটে। বাঘ মেয়েটিকে মুখে করে যেই চোখের আড়াল হল, অমনি অন্য মেয়েটি ছোটে গাঁয়ের দিকে পালাল।

খবর পেয়ে গ্রামের পুরুষেরা দু'একজন শিকারীসহ মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য চলল। সেই নালায় পৌঁছে যখন সবাই ঘটনা জানছে, তখন দূরের ঝোপ থেকে বাঘের গর্জন শোনা গেল। বাঘের গর্জনে মাটি দুলছে, মনে হচ্ছে কালবৈশাখীর ঘন্টার মাদখোকাই কয়েকটি টান টান বেগে ছুটে চলেছে, আর গাঁয়ের বেগে লালমে কোঁয়াওাস জাগছে। তয় পেয়ে গ্রামের পুরুষদল পালিয়ে এসে জল্পনাকল্পনা আরম্ভ করল। গ্রামের মোড়ল সব কথা শুনেউদারবন্দ থানায় গিয়ে খবর জানাল।

সব কথা শোনে থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও সাবইন্সপেক্টার রমেন্দ্রনারায়ণ মত ঠিক করলে রোববারে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবেন। বাঘ ও নিহত মেয়েটিকে পাহারা দেবার জন্য তাঁরা মোড়লকে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার এতটানা লাগাতে আবহাওয়া ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

রবিবার সকালে আমি তখন শিলচরে। সন্ধ্যার পর আমার বোটানাই রমেন্দ্রনারায়ণের সাথে দেখা।

বললে: দাদা, আপনার তো শিকার দেখার সখ, যাবেন নাকি আমাদের সাথে?

শিকারের নেশায় হয়তো আমি আসামের জঙ্গলে ছাউনীর আশ ছাড়া সখের শিকারী। অভিজ্ঞ শিকারীকে সাথে রেখে কখনও জঙ্গলে প্রবেশ করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। ঠিক করলাম এ যাত্রা ওদের সঙ্গে যাব।

উদারবন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার রমেন্দ্রনারায়ণের শিকারের খ্যাতি এ অঞ্চলে সর্বজন বিদিত। ধৈর্য, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁকে বহু নরখাদক বাঘ ও চিতা হত্যায় সাহায্য করেছে।

শেষ রাতের দিকে আমরা রওনা হলাম। আগে-পিছে দুখানি জীপ গর্জন করে যাত্রা শুরু করল। প্রথম গাড়িতে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, রমেন্দ্রনারায়ণ ও দুজন সাহসী কনেস্টবল। শিলচরের গাড়িতে আমি ও স্থানীয় সুদক্ষ শিকারী হজারি মিয়া আমার সহযাত্রী। হজারির ৩০৩ বুলার রাইফেল আমাকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হল। ভাল শিকারীরা বলেন যে, অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব এড়াবার জন্যে বড় বাঘ ৩০০ বোরের কম ক্যালিবার রাইফেল দিয়ে মারা তখনই উচিত নয় এবং যারা, রাইফেল ও বুলেট সম্বন্ধে

এ... যোগের জন্য জোবলার মাইকেল যাত্রা বন্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। সিলন আফ্রিকাবাসের জোবলার মাইকেল রয়েছে দেখে নিশ্চয়ই তাদের অসুবিধা হবার।

ইধারে গভীর জঙ্গল, উঁচু পাহাড়ের মাঝে মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। কোথাও তখন পরিষ্কার। বর্ষা ছিনেক যে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘ কোলে আধা চাঁদ মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে। আবছায়া আবছায়া চারপাশের গভীর জঙ্গল। অজানা গাছ-পালা—শাল, আকন্দ, কুচিলা, বাঁশ ঝাড়ও আছে। জঙ্গলের চারধার থেকে ঝিঁঝিঁ পোকা চপ্‌চপ্ শব্দ। সকলের মনেই একটা চাপা উত্তেজনা—হাতের রাইফেল বন্দুক বার বার। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা চিন্তার সংকট ভাব।

পাহাড়ী রাস্তা। এঁকে বেঁকে মেঘ ঘুরে গিয়ে নীচে নেমেছে, আর উপরে উঠেছে। চারধারে ঘন পাথরের খাঁড় এলিক ওলিক থেকে ঝোপঝাড়ে পড়ছে এক এক ঝাড়। মাঝে মাঝে ছুটি খোঁচা ও একটি দাবস পেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় উঁচু পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠে গেল। গাড়ির তীব্র আলোকে চানাপিসের জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারের মত দুটি আলো আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ইলাহাবাদ হজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে, সে বললে: শেয়াল বা ভালুক হওয়া বিচিত্র নয়। অত্যাধিকতে হাতের মাইলেনটা তুলে নিশানা করতেই কি একটা আলোয়ার নিশানের মত জঙ্গলের দিকে ছোঁড়াছে আমার মনে হল। তৎক্ষণে জীপ আমাদের অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

হজার এ অঞ্চলের বন-জঙ্গল খুব ভালভাবে চেনে। দামনের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জঙ্গল দেখিয়ে হজার বললে: সাহেবরা, ঐ যে পাহাড়ী নালাটা দেখছেন, উহার উপরে বাঁশ ঝোপের পশ্চাতে চিতাবাঘের আনাগোনা প্রায়ই দেখা যায়। আমি এখানে বসি কয়েক চিতাবাঘ শিকার করেছি।

একটু থেমে হজার আবার বললে: সাহেবরা, আপনি কি কখনো চিতা দেখেছেন?

বললাম: দেখেছি। তবে চিতা আর আমাদের দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে। অনেকের কাছে চিতা আর চিতাবাঘের প্রভেদটি খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে চিতা আর চিতাবাঘ এক নয়। চিতার দেহের গড়ন অনেকটা গ্রে-হাউণ্ড কুকুরের মত। লম্বা লম্বা পা, মাথাটা চিতাবাঘের তুলনায় ছোট। চিতা বাঘ ও চিতাবাঘের মত দুর্জন করতে পারে না। বিড়ালের মত মিষ্টি মিষ্টি করে, তবে বিড়ালের চোখের চেয়ে জোড়াল ও ভয়ঙ্কর। প্রকৃতপক্ষে চিতা আর চিতাবাঘের মিল কেবল গায়ের হলুদ রঙের ওপর কালো কালো গোল গোল দাগে। অন্য কোথাও বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

গাছের ডালে পাখীদের ডানা-ঝাপটার শব্দ কানে ভেসে এলো। ঝাঁকুনে দেখি কতকগুলি বাদুড় চিঁ-চিঁ শব্দে বন্য অজানা গাছের ফল চুষে খাচ্ছে।

বললাম: হজার তলু জাদাবীর সিদুর কথা মনে আছে? প্রাক্ত যদুর সিদু বক্সার জন্য একটি ঘরে বাদুর ঢুকি নিধন করতে। বাদুড়ের ঐ ঝাঁক দেখে আজ আমার তলু জাদাবীর কথা মনে পড়ছে।.....রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই।

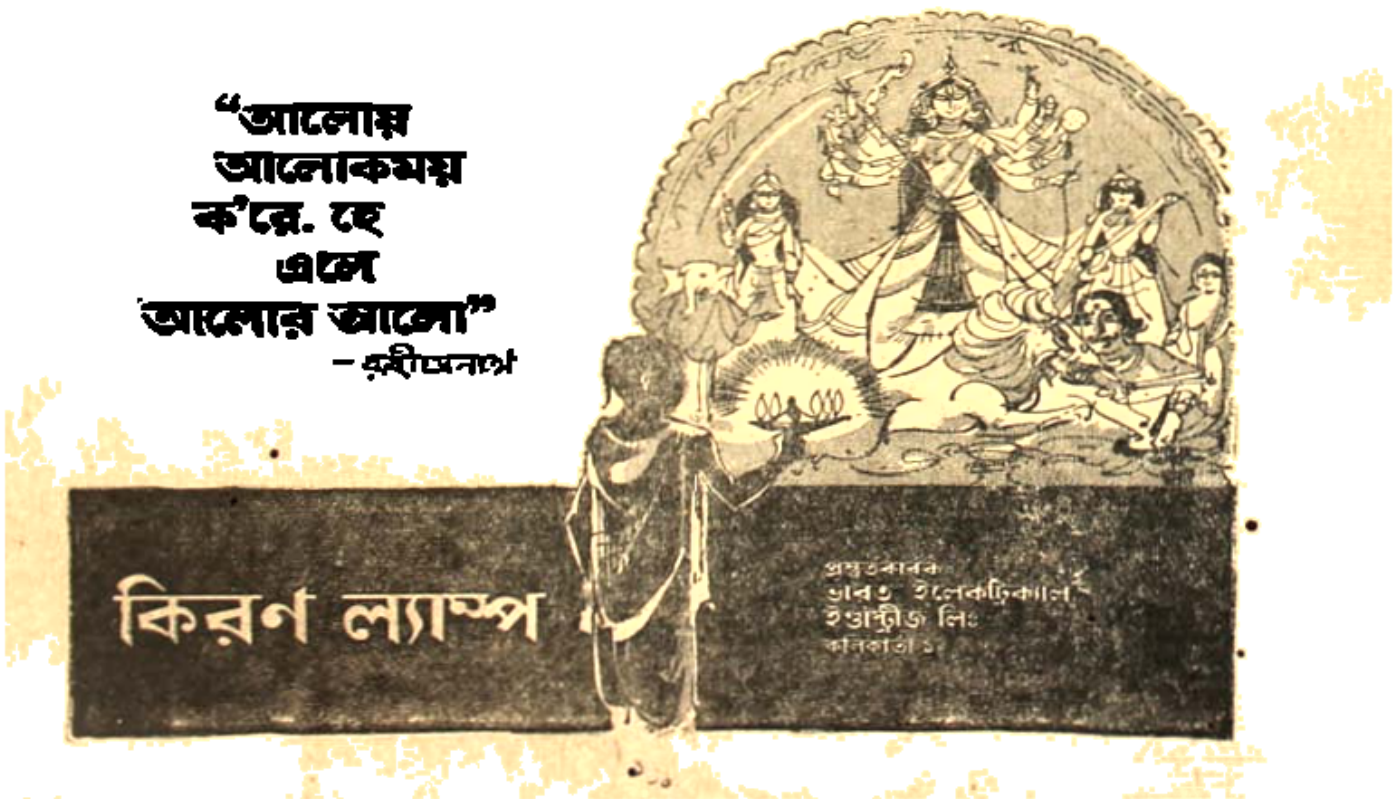

একটি বাচ্চা মেয়ে কিছু খাবার উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রাখলে সাধারণত অন্য বাচ্চারা সেই খাবার খায় না।

অনেকগুলি বাঁক ঘুরে আমাদের জীপ খাদের দিকে নামতে শুরু করল। দুটি মানব এ রাস্তা ছেড়ে-ওরাঙ্গে লাফিয়ে পালাল। * বললাম: চা, চিতা পৃথিবীর সবাপেক্ষা দ্রুতগামী প্রাণী, ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। তাদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হচ্ছে হরিণ। চিতা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির, ভীত না হলে কখনও মানুষের চোখের দিকে তাকায় না। এমন কি আহত হলেও মানুষকে আক্রমণ করে না। চিতার বুদ্ধি খুব প্রখর নয়, তবে দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বর্তমানে আফ্রিকায় আবল হদে (সোভিয়েট রাশিয়ায়) দক্ষিণে টার্কানার হ্রদের ও ইরানের উত্তরে ছোট ছোট পালকে কিছু দেখা যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করলাম: কিন্তু চিতাবাঘ এখনও আমাদের দেশে এখনও প্রচুর বিদ্যমান। পূর্বে উত্তরবঙ্গের দুয়ারের পরগণায় কয়েকটি ও চটানের পাদদেশে বহু চিতাবাঘ দৃষ্টিগোচর হত। শিকারীদের নিষ্ঠুর কৃপায় চিতাবাঘের সংখ্যাবেরা আজ অবলুপ্তির পথে। ফলে এ সব অঞ্চলে আজকাল সচরাচর চিতাবাঘ দেখা যায় না। বছর কয়েক পূর্বেও আমি ঐঅঞ্চল পরিভ্রমণ করেছি।

পাহাড়ের খাদ পিছনে ফেলে আমরা প্রায় চার মাইল পথ অতিক্রম করে এলাম। পুলিশ অফিসারের নির্দেশ মত আমরা জীপ হতে নামলাম।

উষার আলো তখনও ঠিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। তবে তখনই আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক পথ আমাদের কোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমরা সাবধানে খাঁচাটা সন্তর্পণে বহন করে এগিয়ে চললাম। চন্দ্রাবে এ অঞ্চলটা খুব ভাল চেনে। সে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। সেন ভালুকের ভাইকেল চালে "সুবার সতর্ক ও দৃঢ় পদক্ষেপ।

সৈনদের বাড়ির দলাই আমাকে "চাঁদু" বলে জানত। শিশুমনের সেই "আকৈশোর" আমার শিকারের নেশা। শিকারের ধাক্কায় আমি সতর্কতা শিকারীদের সাথে জঙ্গলে ঘোরাফেরা। তবুও যেন কিসের একটা অস্বস্তিভাব আজ আমার মনে দানা বেঁধে উঠল।

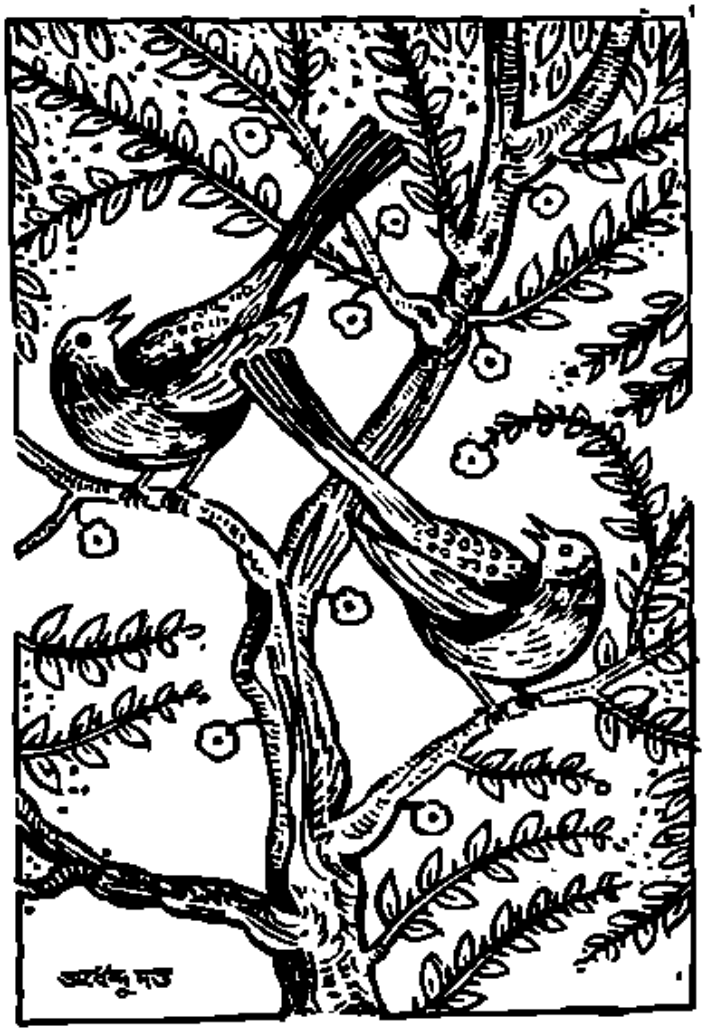

গভীর জঙ্গলে গাছের ছায়ায় সবই অন্ধকার দেখাচ্ছিল। উচ্চেনার পথ হাঁটছি। এক ঝাঁক পেয়ারা পক্ষী আমাদের সামনে। হঠাৎ "ফ্যাং" করে কেঁদে উঠল! খচ্‌মচ্‌ করে পাখির আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে খাদে নেমেই সে দৌড়।

প্রথমে আমরা কয়েক পা দ্রুত সাবধানে হাঁটবার করে চলছিল। কিন্তু চোখে পড়ল না। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কাঁটা-ঝোপের পাশ দিয়ে। এই রহস্যময়ী "বনচ্ছায়ার গভীরে কারা যেন নিঃশব্দে পদ সঞ্চারে বিচরণ করে মধ্য রাতের লোকে।

এক অজানার অজুহাতে আশঙ্কায় বন্ধ করে মনের চাঞ্চল্যকে ফেলে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু মন যেন আপনা থেকেই চঞ্চল হয়ে উঠছে। সেনায় বেঁচে কোন অঘটনাবিভ্রাট দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না তো? কিন্তু ভাবপ্রান্ত পুলিশ অফিসার ও রমেনবাবাবাবু বিষাদহীন। তাদের মুখমণ্ডলে তো ভয়। বা দুর্ভাবনার চিহ্ন লেশমাত্র নেই।

আমরা অনেকটা সন্তর্পণে আত্মগোপন করে এগোচ্ছি। সামনের বাঁকটা ঘুরতেই একদল লোককে জঙ্গলের অন্ধকারে ঘটনা করতে দেখলাম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি গ্রাম, আর ঢালু পাহাড়ের অনেক-খানি চোখে পড়ে। বুঝলাম আমরা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছেছি।

'শিকে' যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা আমাদের দেখতে পেয়েই আনন্দে চাপ আওয়াজ তুলল। গ্রামের মোড়লের গলা শোনা গেল: সর্বনাশ কি করলি তোরা চুপ চুপ। সবগোল করলে কি বাঘ স্থানে থাকবে রে, বোকারা?

সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল। কানে ভেসে এলো গুরু গুরু গর্জন। বাঘের গর্জন না শুনেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না সে ডাক। মনে হবে এই ভয়ন লাউড স্পীকারের সামনে গুরু গুরু ঢাকের বড় আওয়াজ। সে ডাক এমন অর্তকিত যে শুধু পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ফেরে।

বাঘটি নালার ধারে কাঁটা ঝোপের আড়ালে বড় পাথরের পিছনে ছিল। নালার মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ আমরা দেখলাম। গ্রামের লোকের সহযোগে

লাফ এক লাফে নালা পেরিয়ে ওপারের জঙ্গলে আত্মগোপন করল।

মনে হল যাবার পূর্বে শাপ্‌ন বাঘ গর্জন করে বলে গেল : ও বাবাজীবন, তোদের কি আশা? ফ্রেঞ্চকাটের সময় ঘনিয়েছে!

গ্রামের লোকদের রোমহর্ষণ করতে সাহস করে আসবে। কাঁচা কোপের ডাল-টিতে এসেছিল। দেখলাম, যেখানে যেখানে ঘাস ছিঁড়েছিল, সেখানটা রক্তে একেবারে মাখামাখি। আর সেই লাল রক্তের পাশে কাস্তেটা পড়ে রয়েছে।

বাঘ কোথা দিয়ে যেন পালাই যোজা গেল। প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে যেয়েটির শাড়ি ও একটু পরে পাহাড়ের ওপর তার ঘাগরাটাও পাওয়া গেল।

শেষে এসে নালার ওপারে। সমস্যা, এ পারে নালাটার ওপারে যাওয়া যায়। নালাটা খাঁড়া ঢালু, স্থানে স্থানে ঝোপ, কোথাও কোমর জল। তবে স্রোত। কয়েকদিন পূর্বে বৃষ্টির ফলে নালাটা এইরূপ।

ঠিক এল নালার ঢালুর দিকে গ্রামের দিকে নৌকার নালাটা নালা পার হয়ে যে : পুলিশ অফিসার, বনেন্দ্রনারায়ণ, কনেস্টবল দুজনে নিঃসঙ্গে ও সতর্কে গ্রামের দিকে যেতেন। আমি ও দুজন এপারের একটি বড় গাছের উপরে উঠে বসলাম।

পাহাড়ী হাল ও কোপকাজে পারদর্শীতা ভারতি। আমরা যে গাছে উঠে বসে ছিলাম তার খানিকটা দূরে রক্তের দাগ খুব সরু হয়ে নালার মধ্যে পড়েছে। বাঘ যেদিকে সোজা এইখানে এসে যেখেছিল। আমাদের আগমনে ও পাহারাদারদের গণ্ডগোলে তার খাওয়ায় ব্যাঘা পড়েছে।

পুলিশের প্রত্যেকের ওজন যোলর প্রায় আড়াই মণ করে হবে। চারজনের বিশালকায় দেহ—স্রোত নৌকায় ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে ডুবে গেল। ফলে জামাকাপড়, রাইফেল ভিজে একেবারে সবাই ওপারে উঠে ঠিক্ জামা জুতা খুলতে নিমগ্ন। এমন সময় একজন কনেস্টবল বাঘটিকে দেখতে পেয়ে, যোদ্ধের প্রশংসা কুড়াবার আশায় অপর সিপাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই রাইফেলের ট্রিগার টিপল।

গুলি বাঘের ডান পা বিদ্ধ করেছিল। বাঘ জোরে লম্বুদের মত অবস্থায় আমাদের থাকার ডানদিকে আফসারের ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশালকায় পুলিসের এতবড় জানোয়ার কাবু করা অসম্ভব বাঘের পক্ষেও একটু ভাইবর বৈ কি! উপরন্তু বাঘের ডান পাটি পূর্বেই জখম হয়েছে। ভাগ্যক্রমে পুলিস অফিসারটি গুলি করার কোন সুযোগই পেলেন না। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

নালার ধারে গাছের ঝোপা খুলে সবেমাত্র রাইফেলের নল থেকে জল বের করে ঠাঁড়িয়েছিল বলিষ্ঠদেহী বনেন্দ্র-নারায়ণ। চাঁকতে সেজা রাইফেলের ট্রিগার টিপল সে। রাইফেল গর্জন না করে শুধু শব্দ হল 'খটাস'। দ্বিতীয় ট্রিগার টিপবার পূর্বেই বাঘ প্রচণ্ডবেগে লম্বে এসে বনেন্দ্রনারায়ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার এক অলৌকিক প্রেরণায় যুবক পুলিশ অফিসার বনেন্দ্রনারায়ণ ধৈর্য, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহিত রাইফেলের নলটা বাঘের হাঁ-করা মুখে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে চাঁকতে বাঘের সম্মুখের পা দুটি ধরে ফেলল। রাইফেলের কুঁদা বুকে চাঁকতে হুড়াতে,

হাতের পা দুটি বন্দুকধারীর মতো ছেপে ধরে যা দিয়ে লাথি মারতে শুরু করল। কিন্তু ও দুবলা বলের সে কি বীভৎস চেহারা। ভাবলে এখনো গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

বাঘের মুখে বাইসেকেলের কল থাকায় তার পা দুটি কাঁটার মুটো আরও থাকায় লাথি বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। তবুও ৮ দুটি লম্বা নখের সামনে দাঁড়ানো কি সহজ!

এমন সময় অচৈতন্য ভাবগ্রস্ত পুলিশ অফিসারের জ্ঞান ফিরে এলো। তাঁর যা কাঁধের খানিকটা অংশ বসে মাখামাখি। বাঘে মানুষে যুদ্ধ দেখে তিনি আহত অবস্থায় কাত হয়েই তার হাতে বাঘের পেছনের অংশ লক্ষ্য করে বাইসেকেলের টিপার টিপলেন। আওয়াজ হল 'ফটাস'। দ্বিতীয় বার টিপতেই বাইসেকেল সবেগে গর্জে উঠল। পর পর আর দুটি চাপ দেয়ে বাঘ কাত হয়ে পড়ে গেল।

কনেস্টেবল দুজন বহুদূরেই ছিল। নালা পার হয়ে প্রাণে ছুটে এসে খবর দিল। আমি ও ছন্নার বহুদূরে নালার এপারে গাছের উপরে ছিলাম বলে ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে পারি নাই। তবুও একটা অঘটন ঘটেছে উপলব্ধি করে উপরেই চাঁদনির থাম থেকে নেমে নালা ধরে অকুস্থলে এলাম।

আমরা গিয়ে দেখি বাঘ আঁস্তাকুড় পাশে শায়িত আর সাহেব কাদামাখা বাঘেদের মাথার উপরে বন্দুকটি তাগ করে দণ্ডায়মান। আমি খুশি ও কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে বেরুচ্ছে বাম হাতে দিয়ে জামাটা চেপে ধরে আছে। আহতে ও ভয়ে আমি নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। এই পরিস্থিতিতে আমার অসহায় মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাড়াতাড়ি লোকজন ডেকে সিভিল হাসপাতালে আক্রান্তদ্বয়কে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে ছন্নাকে নির্দেশ দিলাম।

অতঃপর দেখলাম পাকাটী বস্তুটিতে রক্তের সব দেখে উঠে পড়েছে। দেখতে দেখতে আমাদের ঘিরে ছোটখাট এক ভিড় জমে গেল। সবারই মুখে এক কথা : শাবাশ, জোয়ান শাবাশ।

আমার ছোট ভাই বন্দেহকে আমি প্রশংসা করি। সাহসী পুরুষ বটে। বলল: দাদা, আমি হেঁটে বাড়িতে যেতে পারব, আপনি আমাকে ধরে নিয়ে চলুন।

সুদীর্ঘ প্রায় মাইল খানেক পথ সে আমার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে এসে বাসে উঠল। ভাবগ্রস্ত পুলিশ অফিসারকে লোকজনের সহায়তায় ধরে ধরে তুলতে হল।

সামান্য বন্দেহ। মাকে-ছেলেতে যান তুমি দেখেছো। সব পরিবারের সবাই খুব সাহসী ও বিচক্ষণ শিকারী। বৈশাখে আমীর কাকাকে (বন্দেহের পিতা) দেখেছি—বাঘ ভালে ঝিঁকে প্রায় অর্ধেক দেহ পেটে ভরে ফেলেছে। তবে সঙ্গের লোকজন মিলে শালিয়েছে। বাইসেকেলের টিপার টিপার সুযোগ না পেয়েই ঝিনাই বাইসেকেলের স্টিল দিয়ে বাঘের চোখে মুখে আঘাত হেনেছেন। বাঘ নির্ঘাৎ পুনরায় জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।

ফেরার পথে বার বার মনে হতে লাগল যে, তুলসীচন্দ্র লোকের হাতে যদি গুলিভরা বন্দুক থাকে, তাহলে তার সাথে জঙ্গলের পথে না যাওয়াই শ্রেয়।

কমে কমে উভয় পুলিশ অফিসার সুস্থ হয়ে উঠলেন। সরকার কি ভাবগ্রস্ত পুলিশ অফিসার ও বন্দেহনারায়ণকে পুরস্কৃত করে ছিলেন? মনে নাই। তবে স্থানীয় লোকেরা বন্দেহকে গ্রাম্য ভাষায় এখনো বলে: বাঘে-খাওয়া দারোগা।

এইটুকু মাত্র সাধনা।

অভিবাদন জানাচ্ছেন ঃ—

মেসার্স জেনিথ ষ্টীল পাইপস লিমিটেড

(ই, আর, ডব্লিউ ষ্টীল পাইপ প্রস্তুতকারক)

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ
ইণ্ডাষ্ট্রী হাউস
চার্চ গেট রিক্লামেশন;
বোম্বাই—১
ফোন নং ২৪-৬২৬১
টেলি ঠিকানা : জেন পাইপস বোম্বাই

ফ্যাক্টরী ঃ
খোপোলি
মহারাষ্ট্র
ফোন নং ঃ ৫
টেলি ঠিকানা : জেন পাইপস খোপোলি

কলিকাতা অফিস
ইষ্টার্ন হাউস
১৪, রাধাবাজার লেন
কলিকাতা—১
ফোন নং ২২-৫৪৩৭, ২২-৯৫২৬
টেলি ঠিকানা : জেনপাইপস কলিকাতা

আমার জীবন

বুদ্ধদেব রক্ষিত

গাঁয়ের-জীবন পল্লীজীবন কিন্তু মোহ: মুগ্ধ নয়,
যে জীবন ঘোর দেব দেবীদের অলীক কৃপায় চিহ্ন নয়।
অভাই থাকুক দুঃখ দৈন্য যত অযটন ঘাত্ ঘরে,
শান্ত-সমাপন এই গ্রামে মরণ কয়া ছাড়া যে।
শিখায়েছে, গ্রাম যে দিতে, সর্বধর্মে মর্যাদা।
জগৎ জোড়া মানব-জাতি এক ভাবিতে সর্বদা।
অহঙ্কারীর দান গ্রহণে হতাশ আমি শঙ্কিত,
সোহাগিই দুঃখ, আঘাত, সুখের চেয়ে কাঙ্ক্ষিত।

অর্থ কিম্বা যশ বিলোম পেলাম প্রচুর আশীর্বাদ,
বুক ভরেছে সে সম্পদে, মিটলো আমার সর্বসাধ।
ভক্ত ছাত্রগণ পেলাম, তুলনা যার নাইক যার,
তিন পুরুষের প্রণাম যে পাই, বল এমন ভাগ্য কার?
ব্যাঙ্কের অঙ্ক এসেছে বিপদ, কিনেছে অনেক খাদি,
দৃষ্টিশক্তি এলো কিনেছে সর্প, মাসিক নামারে মাসি।
আমিই আমার অন্ন জোগায় দুঃখ জোগায় থাকী,
এমন কাঁদিয়া হৃদে তাতে যাবা অমতা আমার আমি।

(৩)

ঠকেছি অনেক, ঠকায়েছে আমা সহে লোক যত।
চতুরতা আর কথা আমাদের দিয়েছে আনত।
কেবল কথায় চিঁড়ে ভেজেনাক তাই আমি লোকে বলে,
চাল চিঁড়া নয় কিন্তু তাতেই টাকা টানে কৌশলে।
কথাই অস্ত্র কথাই যে বস্ত্র, কথাই অমৃত—
মরণে আমাই মুখরিত করে, মরণে নমুত।
অপরাধী ও যাজিকর আমা হইতেও পারে ঠক।
আমি না প্রাণ বাক্য আমার দাঁড়া রসাত্মক।

আমার জীবন আত্মাভিমান যে আমিমাঝি আমি মনে,
বিশিষ্টা হয়েছে অমৃত এও, সব মনুষের সনে।
ভিক্ত মধুর দু আস্বাদেই এক রসময় হাস,
আর বাঁধায় একেই বন্ধ—কাঁদ আমি প্রতিপাদ।
দুঃখ ও সুখে কবিমাত্র আর অকারণ বাহাবাহি—
দুঃখ ও সুখে দোঁহাতে পাই সেই এক মৌমাছি।
বুঝা যে দেয় সাগর এবং সোনার' ভেলায় যে,
আমি অজরী সেই তো তোমায়, হাতর সেলায় যে।

(৪)

পাহাড়ে আমি জীবন কাটাই ঘর্ণি পর্বতে,
বিষনাথের পূজা করি তাই—বিষ সেখানে আসে।
গভীর মাঝে বাঁধিয়াছি ঘরে—ক্ষুদ্র সেই বাসি যে
এই ধূপারতি যায় তারাদের প্রতি দেব-মন্দিরে।
এ• পথ যত গভীর সুদূর উর্ধ্বে উঠে যায়—
আর সাথে সাথে মন যে আমার হরি-পদে পহঁ ধায়।
ছুট পল্লী কুটির আমার শান্তি সুখময়,
পুরবাসী সে ঘরের যে আমো? তিনি সুজনের।

(৫)

দেবতার পদ মাঝারে আমার যে দেখেছি উঠি,
হারা হয়ে সেই পদ দেবতার চরণ ধূলির মুটি।
ভক্ত তো নই, তাইতো ধরণীর ধূলিয়া তাপহর,
একলাই আমি বেড়া বাঁধি মোর আলো থাক তারা যা'তো।
দীর্ঘ দিবস কেটে পথ চেয়ে কেটে গেল দিন তো—
একটা ধ্বনি লিখে দিতে কই এলোনা মোবিল?
ধরি পাই বটে, অভাগার ধরা ভালো হোক হয়?
যত ভাল হোক সে "স্বাধীনবঙ্গ বাসীর" দাবি তো নয়।

পথে ফেরার দিন
সন্তোষ ভট্টাচার্য

যখন সমুদ্রে খোঁজ, দেখেছি সৈকতে
বাবলারা তোমার্ক বন্দরী,
পুলুল শরীরে যার সমুদ্র-স্তনন।
এখন সমুদ্রে আর যাবার বুঝিবা নেই বন্দ,
পথই সমুদ্রতীর—তার সঙ্গে দেখা হল গ্রাথবের পথে।
দেখা হল, চিনল আমি।

চিনল আমাকে, তার ঝাড়ুদারে প্রহরী ছিলাম।
কাবাবার খুলে কিছু আমিই দিলাম
তারপর ছুটল সে জলসমুদ্রের বহু তীরে!
বহুত অতীতই আসে ফিরে
আঁচলবেলা খুঁজে-খুঁজে!
সমস্ত সমুদ্রতীর এক ঠাঁই—একটি সমুদ্রে;
সব পথ এক পথে মিশে কলকাতা।

কী বিশাল কালো পথ পাতা!
অবারিত গৃহদ্বার, প্রহরী বেকার,
শূন্য ঘর, প্রত্যেকেই ক্রত পলাতক।
তাই তো সৌভাগ্য হল তাকেই দেখার
এ পথে। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হবেই কাল্লাকে
ফেলে আমি নদী থেকে নীতে হেঁটে আসি।
সমস্ত সমুদ্র পথ, তাকে বহু শ্রমে
পাড়ি নেই, মুক্তকেই ফাঁকি দিয়ে ফিরি।
খাবার শাসত শীত যেখানে সমস্ত অসহায়া—
শাস্তির কপোত প্রেম, বলে কানে: পথই আসল।

উঠোনে কী কাজ তবু, চলো এখানেই কলকলা
ভালোবাসি।

বন্দরী বন্দরী
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বন্দনা কার দুর্ভাগ্য জীবনের
যে দুর্ভাগ্যের ভয়োদ্যম পরীক্ষায়
বার বার ঘটে মরজীবনের অভ্যুদয়,
যেখানে মুক্ত আকাশের তলে
যুগে যুগে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে
সূর্য-নক্ষত্রের প্রসর প্রভাত।
আলোকের অবারিত দাক্ষিণ্য হতে
চিরবঞ্চিত যে অন্ধকারের সৃষ্টি
বন্দনা তার অন্তর্ভার্থ জীবনের
তার মৌন মনের অন্তর্থিত বেদনার।

বন্দনা কার দুর্নিরীক্ষ্য দারিদ্রের
অবজ্ঞাত দুঃখের আর অন্ধ্র চণ্ডালের।
উদ্যত আভিজাত্যের ঘায়ে—
মনুষ্যত্বের বিলুপ্ত অপলাপের কবি বন্দনা;
আর বন্দনা কার তাদের দুর্ধারায় ক্লেদ-বাহিত
যার অবিরল অশ্রুপাতে পরিশুদ্ধ হয় আত্মার কলঙ্ক।
হিংসার পরে মৈত্রী
বিদ্বেষের পরে প্রীতি মেঘ আসে
আত্মস্বীকার পরম মুহূর্তে।
তাই নিগৃহীত অনাত্মীয়ের কবি বন্দনা

বন্দনা কার আজ বন্দিনী নারীর
তার অপহৃত সম্ভ্রমের আর অনাদৃত সম্পদের
আর বন্দনা কার বিবাহ-বহিতা নারীদের
তার নিষ্ফল নিরুপায় বর্ষবেদনার
আর শূন্যহীন নয়নের সর্ব-আশা বাঁধ ভাঙার।
সম্ভোগ লালসায় কলঙ্কিত পথে
তার অসহায় আত্মবলির মধ্যে
বন্দনা কার আজ মহাকালের ভয়ঙ্কর জাগর।

বন্দনা কার আজ গৃহহারা পথবাসীর
মাতৃগোত্রহীন আবাবর অযযাবরীর,
তাদের চরম দুঃখের কবি বন্দনা,
আর আহ্বান তাঁর সংগ্রামের
সে সংগ্রামে আসুক
অনিষ্টের বিরুদ্ধে ইষ্টের সংঘাত
ভিতরে ও বাহিরে
অমলতর মানবাত্মার সঙ্গে
সর্বগ্রাসী—পশু মানবের।

বন্দরী সভা
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বোদ্বাই ছুটি, গুহহারার হয়রান
সবাই মাঠে জলসা করে।
সৌরাষ্ট্রীর মজল কাঁদে কালো মেঘ
অসময়ে, দেহের অমে।

এমনি করেই প্রতিটি রাত-প্রভাত হবে—
কেউ দেখে যা, আসমাকে-দুখ।
কেউ জানে না মুখোস খুঁজে ফেলতে ওরে:
সকলেরই কঠিন অসুখ।

কি করি বলুন তো

লক্ষে থানা খন্দ গর্ত
আমরা অসমর্থ—
ঢাকিয়ে দাঁয় হয়ত পাঁক নেই।
সবাইকে বলছি—এই, এই
যা ক'রে পার করে নাও।
কেউ না, সবাই বসে আছো।

যে থানা খন্দ গর্ত ডুবে গেল
নাম এল,
চারায় আর ধান বলা।
ওত বিপদ! পুত্র কন্যা
মা-বা ভাই-বোন
স্ত্রী, স্ত্রীর বোন বিন্দু
কে নিয়ে জলে দাঁড়িয়ে আছি
আমি বাঙালী বিন্দু।

এক হাত কপালে, আর এক হাতে
ছিকার ছুলি
সেটে কিনে, বুকে আলা, মুখে পুলি
নৌকা নেই, জানকর্তা নেই
কেউ কোথাও নেই!

সবাই বলছে পাঁক সংস্কার কর
ধৈর্য ধর।
আরে আমাদের পাঁক তো চামীদের ?
তাই পায় একটা দিতে ?

কেই পারে না—কি করব আমি—মুহ্যমান
উদাসীন
বাড়ছে বাজার দর, বাড়ছে ঋণ
কি করব! —রবীন্দ্র বিদ্যা হয় না
ভগবান কথা কয় না।
ওগো দেবি, ওগো পাঁক, ওগো অহেতুক
মল এমন কি তার!

প্রবুদ্ধ অন্ধের মত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

চলে যাব অন্ধ কোনো বীথির আড়ালে একদিন।
যে প্রতিশ্রুতি আমি, যদি তুমি ফিরেই না এলে
নির্জন বিকেলে কিংবা সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত পরিসরে
হৃদয়ের গুঞ্জরণে, আমি আর বিস্ময় বিস্ময়ে
সহজ প্রহরী হয়ে থাকব না অলিন্দে, প্রাচীরে।
কাঁপাবে সমস্ত অঙ্গ, আমি সত্য সত্যাকীর কারে
দায়বদ্ধ; বিগত স্মৃতির নানা রোমন্থন ঘরে
অন্ধকার আচরণে পরিক্রম; আমি, পুরুষের
নীল বা লোহিত রক্তে আজীবন আমার ধমনী
জন্মান্ধ দীর্ঘকাল; শোকস্তব্ধ অলিন্দে, প্রাচীরে
সংস্থ চিত্তার জালে পরিবিদ্ধ নায়কের মত
বিপন্ন বিস্ময় বোধে অভিভূত; প্রেমাস্পদা যার
মণিত স্বপনে জাগে, সংসদের বাক্যজাল আর
চারিদিকে আজ সুখ নৈপুণ্যের আয়োজিত ফাঁদ
পেতে রাখে, নিত্য তাই আমরা দুজনা ফেরে।

একটি আশ্বাসে আমি উদ্বেলিত হতে পারি ফিরে
ফিরে আসি নির্জন বিকেলে। অত্যাধিক সন্তোষণে
ক্লান্ত লিপির মত মুখে মুখে আঙুল বুলিয়ে
প্রবুদ্ধ অন্ধের মত ইন্দ্রিয়নির্ভর আচরণে
নিমজ্জিত হতে চাই, মৌমাছির পায়ে গুঞ্জরণে
সন্ধ্যা চমকে উঠি, এলো বুঝি ফাল্গুনী বিকেল।

কিন্তু না সমস্ত দৃশ্যে অনন্যায় উদ্যোগ বুঝি যা,
প্রবুদ্ধ অন্ধের মতো জ্ঞানহীন অন্তস্রাবে সবই এখোই
অন্তসন্ধ্যা আচরণে সংজ্ঞাহীন সর্বস্ব বহুধা।

দর্পণে মনের ছুটি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্পণে মনের ছবি পড়ে।

সমস্ত সকাল দু'বে
সমস্ত দুপুর ক'বে
সমস্ত বিকেল এল যবে।
কথা-কওয়া ছবি শুধু বড়ে
সমস্ত চিন্তায় ভুবে এবারে এবারে।
দর্পণে মনের ছায়া পড়ে।

মনে মেঘ, মনে আলো—
মনোময় ঝলমলালো।
অন্তরায় ঃ চমকালো
মতো বিদ্যুৎ—চিন্তার আকাশে ঘুরে
ছুটি-পুর উড়ে উড়ে
দর্পণে পেলো মেয়ে নীড়;
সকলের দ্বিধাবিন্দু পেলো যেন মনের আঁধুর।

কখনো দর্পণে মুখ ভরেছে মুহূর্ত।
কখনো জনের সঙ্গ কলরব সুখ।
কখনো বন্ধুর প্রায় দর্পণে এসে
ছায়াপথ ছুঁয়ে যায় দর্পণ যেঁষে
ছায়াহীন সহযোগ ভোলে অভাব
মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডবিষ
তা' দিয়ে ফোটায় ছিব
কোনো আজ হংসী করে কলম প্রেরণায়।
কাঁপায়ে আশীর্বাদমা
মনে দিয়ে-থেকে আসা
কখনো অনন্ত ভরে আশীষ-প্রভা অনুরাগ
কখনো ধরায় ঘুম ঘামের ভরাগ
কখন যে ঝড় ওঠে সমুদ্র গর্জায়
মনের দর্পণে সবই যেঁটা দিয়ে যায়।

দিবালোক উঠছে হেসে
বর্তমান আছ ভেসে
অতীত প্রমাণ করে—
ভবিষ্যৎ অনুভূত।
আশা-নেরাশ্যে মেয়া
ভাষা হয়ে খোলা-মেলা।
দর্পণে মনের ছবি পড়া প্রতত।
চিনি বা অনুও যেন চিনি ভাষা ওরা
দেখি নিত্য অন্তহীন বহুত্বের আশ্চর্য মহত্ত্ব।

দেখি বা না দেখি শুধু
দর্পণে মনের ছবি মরে না, মরে না—
মনের চোখের কই পলক পড়ে না।
যখন যা ছিনু আমি নিমিষে দেখি দর্পণ
চোখের সমুখ থেকে-কখনো জানে না যেন
অনন্তক্ষণ।

সেই অচেনা

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আমার ভিতরে বড় ব্যথা, বড় ব্যথা।
অনেক এই উৎস থেকে
আমিবার শুধু রক্ত ঝুঁইয়ে পড়ে, রক্ত ঝুঁইয়ে পড়ে।
শুধু রক্ত ঝরে আর রক্ত ঝরে।

দিন শুধু কাটে
ছোট-কাচারিতে, বাসের ভীড়ে—
কেরানীদের হাতে কি গন্ধের ফোয়ারা!
কিন্তু সন্ধ্যায় সিঁড়ি ভেঙে যত ওপরে উঠি
শূন্যতা আততায়ীর মত আমার আমাকে আক্রমণ করে।
এবং ফিনাকি-দিয়ে-ওঠা বুকে
শ্বাস ফেলতে থাকি, আবার শ্বাস ফেলতে থাকি।

কিন্তু রাতে, রাত রাতে, রাত অনেক গভীর রাতে—
অন্ধকার বারান্দায় যখন একাকী নির্জনে পায়চারি করছিলাম,
পঞ্চকোট পাহাড়ের মাথায় অপরিচিত চাঁদ
আমাকে সম্পূর্ণ এক অন্য, এক ভিন্ন কথা বলে গেল—গেল।

চন্দনে টীকা দিয়ে দেখলাম :
কোনোদিন যাকে চিনি না, যাকে জানিনা—সেই অচেনা
দুঃখের সুর বাঁধবে যেন উৎসুক করছে,
জেগে রয়েছে, হাঁ জেগে রয়েছে।

ঝলমলে ট্র্যাফ-লৈম্পের নীল-নগ্ন আলোগুলো
নিয়নের বিজ্ঞাপন, নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ হ'য়ে
একেবারে শেষ ঘুমে ঘুমে গেল।
শুধু জেগে নিস্পন্দ তৃষা—
অনন্ত মরুজ্বালাতে কায়াসহীন, ধ্যানাসীন।

চুম্বন পত্রন

গোপাল ভৌমিক

সংসারে ঘটনাগুলি এমনই ঘটে :
পেয়ালা পিরিচ ভাঙে,
ফেল-মুল-বিদ্যুৎ লক্ষটে
মাথাঘষা মেজাজের চুরমার টীকাদা।
জমে থাকে ভালবাসা
মুখ ফুটে বলি তাকে, না না
এসো না আমার কাছে
অন্তত যখন
বাইরের বিষ-বাষ্পে বিষাক্ত এখন
মাটির শিরের চুলে ঝরে বিন্দু ফুল।

কিভাবে সোমে করে কোন প্রিয়জন?
সে কালীন ভালবাসা সংহিতার জোরে
আলার বিহার বিচরণ
এবং প্রগল্ভ আলাপন
খুশিতে ঢালাতে গিয়ে
নিজেও বিপদে পড়ে
এবং যে ভালবাসে
তারও দোষ ঘটার পক্ষে।

তখন বৌবনে বুঝ যৌবনের মত
চুমায় করে যেই যে প্রেম উচ্চার,
পাশে-বসে-থাকা মুখ যে প্রিয়তমার
তার দিকে তাকাতে পারি না :
প্রতিদিন চল তবি অযোগ্য কলার।
সেতারের ঝেঁড়া তার জোড়া লাগে কল
কতবার?

উৎস মুখে ফিরে যাব

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আদিম উৎসের দিকে সভ্যতার যন্ত্ররোল বেজে ওঠে ক্রমে ক্রমে।
মৃদু উদাসীনতায় ঢেকে যায় নগরীর প্রাচীন জীবন যন্ত্রে,
আমি তার স্পর্শ পাই উদাসীন শূন্যতায় এই আলো, শুধু দিনে
দোষায় সেতারে বাজে করুণ রাগিণী এক; কার কান্না ওঠে জেগে?

এমন দিনের জন্যে সে প্রেমের জন্ম নয় আর কতো ব্যর্থ হবে,
কতোদিন এই রোদে এই উষ্ণ, উদাসীন পৃথিবীর বুকফাটে
জীবনের স্নেহমূল্য খুঁজে খুঁজে ফিরে যাব, ফিরে যাব অন্ধ গুহে
প্রতীক্ষায় সব কাম মুছে যাবে দিনান্তের শেষ ক্লান্ত কলরবে।

শুধু আজ সন্ধ্যা হোক্ সভ্যতার ঘোরে মৃত্যু যবে মৃদঙ্গের গানে
একটি আদিম মুখ যৌবনের তারুণ্যের কী গভীর প্রত্যাশিত।
সেখানে আবার সেই ভালোবাসা জন্ম নিল বিরহের দুঃখে শোকে
সেখানে দুঃসহ প্রেমে আমি আজ ফিরে যাব মৃদু প্রাণের সন্ধানে।

দূরে যাব
সুশীল রায়

তোমাকে দেখব ব'লে, ইচ্ছে—বড় দূরে সরে যাই।
বিদ্বেষ-বিকীর্ণ এই নিশিড়তা বিষম বালাই।
ও সান্নিধ্য, আজ অন্তে-অন্তে এত আকাঙ্ক্ষা
নেবে অসীম ক্লান্তি, এবেলে এ দূরত্ব শূন্যতা।

ই মাটি, এই তৃণ, এমন শ্যামল বনাঞ্চল,
নিজেকে বিগতের শেষ রেখা এত অবিকল।
ব জানি, সব জানি; এর বেশি জানি তা বলেই—
ন নেই এতটুকু, এতটুকু কৌতূহল নেই।

তোমার এমনই আমি, হে মৃত্তিকা, ঘনেছ আমায়।
তোমাকে স্মরণ করি হয়তো প্রত্যহ মনেমনে!
ালোবাসি জানি, কিন্তু সেই ভালোবাসারি ভিতর
'মে দেখি আলো নেই, আছে মাত্র নির্জীব নির্ভর।

যেহেতু তোমাকে চাই আরও কাছে, আরও ঘন-কাছে
াই ঘুরে চলে যাব—এ ইচ্ছা নিশ্চিড় হয়ে আছে।

াব স্বার্থচিত্র নয়, মনে-মনে নয় চিত্র-কাঙ্ক্ষা,
ব উৎসবের দিনে সাড়ম্বরে জাতীয় পতাকা
যেন উত্তোলন করা। পারি যদি, বাঁধন মিলায়
রতে উত্তোলন করে সেখানেই হব তাদাত্মান।

ুভবে যা বুঝেছি—প্রত্যক্ষ-প্রমাণ তার চাই—
ী বিপুল, কী বিরাট, কী মহৎ—তার সবটাই
নায় একল ইচ্ছা, সুতরাং, মাত্র, সুতরাং
ে নিয়ে বুঝতে চাই সত্যি ছুমি কতটা মহান্।

র্বতের পাদতলে করজোড়ে দাঁড়াই যখনি
পথালা নিয়ে তার পতনের অতলান্ত অগ্নি,
বু কি হয় না মনে এ-পর্বত পাষাণের চিবি?
ামায় জানার ইচ্ছা সত্যি কত বড় এ-পৃথিবী।

ভালবাসা ছাড়া
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অবশ্য আমি না। তবু এত্যেকের মনে
যত রূপ কবিই বলুন
গাঢ় মনে
বলতে হয়, জানাতে বলে বেঁচে রয়,
ভালবাসি ভালবাসি।
বলতে হয়, যেহেতু এখানে
ভালবাসা ছাড়া
দু দিকে বিমুক্ত কোনো রাস্তা নেই।
বলতে হয়, যেহেতু এখানে এই অন্ধকার ঘরে
অন্য কোনো আলো নেই।

তা ছাড়া দ্বিতীয় একটি হেতু ছিল। তাই
বলিও বলিনি, তবু বারান্দায়
বলেছি অনংখ্যবার,
ভালবাসি ভালবাসি।
চাতুকে মাত্রেই আমা রাখে তার একমাত্র ওষুধে।
ভালবাসা ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ওষুধ
ছিল না আমার।

নীল রেশমের প্রেম
উমা দেবী

অতলের ঘুম আর মন দেখা।
নিটোল নির্ভাজ নীল ঘুমের ভিতরে
নিশ্চিন্ত মধুর মতো কখন প্রমাদ হয়ে ওঠা।

মন তো জেগেও দেখা—
কিন্তু সে মনের
যন্ত্রণা অনেক।
প্রসারিত চালের ভূপে বীজবের মতো
সে আশা দাঁতে বেঁধে।
সবার কখন জাগে শিরায় শিরায়—
যেন সব ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু সে চৈতন্য আগে
ঘুম যাবো—
নির্ভাজ মসৃণ নীল রেশমের মতো
মনে রেখা।
গুটিপোকা ঘুমাবে তখন—
প্রজাপতি-মন শুধু ভাববে বিরলে
কখন ফেলবে পাখা মোহের মোহায়!

কবিতার বদলে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পুরোনো চৌকস...পুরোনো জল আমার মনে পড়ে? ধুলো এখন একটু পুরু হয়েছে, আয়ত চুকিয়ে গেছে মানুষের মুখ, ঈর্ষা দিয়ে ওঠার সময় আর সে-রকম গায়ের শব্দ হয় না। হাসি ও নমস্কার হয়। অন্তর্বাসের মতো খেয়াল ছুঁয়ে যাই, আমাকে চিনতে পারো?

এখন আশ্বিনেও কুয়াশ পড়ছে হাওয়া আলে না। খরখর করে রোদ, রাস্তায় ধুলো পিটে একটি মেয়ের মুখো আটকে যায়। নীল ফোক্সা বাস ছুটে আসে, আমি তাকে থামতে বলি। সে থামেনি, সে আমার ভাষা বুঝতে পারেনি? আমি সেই মানুষ, ছিলি যার, কতদিন তুমি তাড়া দাঁত দিয়ে আমাকে মানিকতলা দিয়ে দিয়েছিলে, আজ মনে পড়লো না। আমি সেই মানুষ, আমার দিকে চেয়ে দেখো।

'আমায় মনে পড়ে?'—এরকম মানুষকে জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়। সীমান্ত তাকে যাই নি। তাই খেয়াল ও পথের বাঁক ও সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি। একা হেঁটে যাই দুপুরবেলা। কি বিষণ্ণ মুখ মানুষের আজ। কেউ কারুর দিকে ফিরে তাকায় না। কোথায় গিয়ে যে সব বাঁধবো জানি না। বড় প্রত্যাশায় মুখ নিয়ে তাকাই। যে-কোনো লোক 'কেমন আছেন?' এর উত্তরে বলে 'বেঁচে আছি।' শুধু বেঁচে থাকা।

অনেকটা অনেক বদলে গেছে। আমিও বদলে গেছি। আমরা দুজনেই অনেক অবেলা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তবু, এতদিন পর আবার দেখা হলো।

বিস্মিত প্রত্যয়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা ভবঘুরে,
আসমুদ্র দুপের যে-দেশে যত কাঁদে
তা শিল্পী যোগাসি।
গম্ভীর। ভয়ংকর। নির্লিপ্ত।
বিবেক পুরিয়ে, অথবা,
দৃষ্টির সচ্ছতা, চকল।

দূরে আরেক আলোর রঙে
মন প্রাণ চোখের তারায় কাঁপে।
আবছা এই অন্তরঙ্গ পরিবেশে
প্রণামের অন্তর্বাহীন পরম্পরায়
চাওয়ালি সে। চাওয়ায়।
তবুও মা জ্যোতির্ময়ের।
জ্যোতি পাওয়ারে অমলিন
অচেনা দিগন্তে ঘুরে ঘুরে
পায় চর কঠিন মুক্তিকা।
নিজেকে যখের মতো ভেবে
কোন ঘর সে খোঁজে সহজে?

এ এক আজব বিস্ময়।—
আমি যাঁর নিজেকে না জানি
তবু কেন তোমাকে জানলাম।

জীবনের কথা

শান্তনীল দাশ

যা পাইনি পেতে চাই তাকে, আর মনে মনে তাকে ভাল লাগে
অজানা না-পাওয়া সেই তাকে অনুরাগে
নানা রঙ দিয়ে দিয়ে দিয়ে তাকে কত গানে গানে
সাজাই সে না-পাওয়াকে: সে কি আছে, আছে কোনখানে?

না থাকুক, তবু আছে, সে আছে আমার চোখে চোখে,
সে আছে গভীর রক্তে একান্ত আমার মনোলোকে।
তার কোন রূপ নেই, কোন রঙ; আমি তাকে রূপ দিই কত,
কত রঙ, কত সুর—তাতি আর গাঢ় খুশিমত।

সে-অজানা চিরদিন থাকবেই, আর তাকে পাওয়াই যাবে না।
পাওয়া গেলে, চেনা হলে, সব রঙ মুছে একাকার।
ধূসর ধূসর দিন; এ জীবন আর কোন রঙ তো পরবে না।
চেনে-চেনে চলা দিন, অবসাদ-ঘেরা চারিধার

সে-জীবন চুপসে: এই ভালো, এই থাক,
সে না-পাওয়া থাক ঘুরে ঘুরে
আমার খেয়াল খুশি দিয়ে তাকে মনে মনে
সাজাই, সাজাই নানা সুরে।

হাউই

আলোক সরকার

রূপান্তর ঘটতে সময়েই হয়। আমলাইটার
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তে, তামসী নির্জন
হয়ে ওঠে। যতো বেলা বাড়ে ততো তূর্ণ পার্থিবতার
নীলাভ তাপের কারকাজে তোর অলৌকিক উদ্বেগের
আশীর্বাদ নামে। আমাদের ব্যবহার
শুধু অভ্যাসের শুধু নির্ধারিত দৃষ্টির বিস্ময়ে
একটি হাঁস-ই দেখে, একটি দৃষ্টির উচ্চারণ।

আমি নিশিদিন ভাবি আগুন। কীর্ণ পরিশ্রমে
প্রতিটি মুহূর্ত দেখা, প্রতিমুহূর্তের
পরিবর্তিত ছাপ। একটি চূড়ায়
বিকাশিত জাগ্রত নিঃসীম পল, অন্য চূড়ায়
সমুদ্রের সংকেত উল্লাস—যেন তোমার
আকাশ দেখেছি একদিন প্রতিমুহূর্তের রূপান্তরে
একটি সমগ্র আর তারপর বিস্তৃত বিকাশ।

বিকাশ চলেছে মুক দিকে-দিকে। একটি সমগ্র তারপর
সব বর্ণ গন্ধের ভিতরে এক জাগ্রত বিকাশ।
দৃশ্যের ভিতরে কোনো প্রত্যাবর্তনের রেখা নেই,
সব বর্ণ কেবল একটি বর্ণ, মুহূর্ত উল্লাস—
পৃথিবীতে কত যে নামের বর্ণ আছে, আমি মনে-মনে
ভাবি কতো গন্ধ, কতো রেখা। আমি একাগ্র নিবেশ
দেখবো সমগ্র নয়, শাশ্বত হাউই—সেই গতিময়,
বর্ণমালা ক্ষণিক স্ফুরণে।

তোমার চোখের পলকে

অরবিন্দ গুহ

কিন্তু তুমি কোনদিকে চলে গেলে তোমার পলকে
কোনদিকে কোন ট্রেনে কোন মেঘে কোন নীলিমায়।
তোমার মুখের মতো মুখ দেখে চমকে উঠি—এ কে?
এ কি তুমি? তুমি নও। এক মুহূর্তেই চেনা যায়।

যদি দিন মেঘে-মেঘে অন্ধকার উৎকণ্ঠিত. ভালো
হয়, ঠিক চেনা যেত তুমি নও, তুমি নও, তুমি
নেই, কিন্তু, তুমি বলো, নিষ্ঠুরের ধুলো, ঘাস, আলো,
ভালোবাসা তোমাদের ষড়যন্ত্র, শুধু মরুভূমি

মনের বিপুল ঝড় নিজে আসে, কেউ চিনতে পারে?
আগে চেনা গিয়েছিল, ষড়যন্ত্র কোথাও ছিল না।
তখন তোমার মুখ ভালোবাসা ছিল অন্ধকারে
আর অন্ধকারে ছিল মরুদের অমল প্রেরণা।

অন্ধকার রূপান্তর করছে বাস্তবিক লোকে।
কিন্তু তুমি কোনদিকে চলে গেলে তোমার পলকে?

আত্মার উপমা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেহাবের ঝাঁকা সেই ভালো ঘাড়;
যে-ঘাড়ের হাড় নেই শুধু আছা আছে,
আমি সেই ঘাড় চাই দেহ পরিহার
আত্মার নিরলঙ্কার কারুকাজে।

দেহাবের ঝাঁকা সেই ভালো ঘাড়টির
মনোভাঙ নিবিষ্ট সতত,
সমস্তকে ধরে আছে স্থির
আপেলের মতো।

আমিও তেমনি যদি বোলোই অজাগ
হিরাতলে রেখে দিতে পারি,
যেমন লুকিয়ে রাখে তীব্র বেদনায় যাজিদান
ছিন্নবাস শাড়ি;

কিংবা পালা-পার্বণের পরেই যেমন
কৃষাণীকে আগলে ধরে চাষী;
সোনার সাধনবাটি ঘিরে তেমন
যেমন উজাড় করে মায়ুরা-মাঝিরে বেদেনী।

আপনি এলেন

অনুবাদ: দিলীপ দত্ত

সন্ধ্যা হয়ে আসে
বিশাল সমুদ্রের ওপর ছড়িয়ে পড়ে
বসন্তের ফুরাশা
কানে আসে উড়ে যাওয়া বুনো
হাঁসের ডাক

বাড়ীর সবাই কত দূরে রয়েছে
তাদের কথা মনে পড়ে।

বাড়ীর কথা আমি
ঘুম আর আলেয়া, ধরে ধরে ওঠা
পাহাড়ের গায়ে
বসন্তের কুয়াশায় মতো ছাড়িয়ে যাওয়া
বুনো হাঁসের দিশেহারা ডাক।

(অটোমো ইকাবোচি)

হঠাৎ নিমন্ত্রণ

শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

হোটেলঘরে একলা শুয়ে থাকা,
নিক তোমার লাগে বাঁধন-দাঁধা।
বাতায়ন খুব দূরে চলাচলে—

নিক তোমার মোট খেরেটেরে
আরেকবার দেখতে পেলে কিনু
বিজয় ওর-হুকাত ভরে; পিনু

টাকা কেন? সময় নেই নিক
একদাঁড়ির ওরে গেলাম ভীষণ।

তবে হঠাৎ নিমন্ত্রণ পেয়ে
অন্তরে উঠেছে পিঠ চেয়ে,
তোমার সুখ দেখে আমার খুশী,—
আমায় কেবে কাঁদ না রাঙ্গুসী।

বেশ, তা হলে তোমার সঙ্গে আড়ি।
দ্রুতগামিনীর দুল কোটাতে পারি
ইচ্ছে হলে একলা বসে বসে।

করে গেলাম জানাবাই চিঠি খবে।
সময় নেই সময় নেই, নিক
তা' বলে তুমি বলতে চাও, ভীরু?

হলুদপর্ণা

প্রমথনাথ রায়

ঘর সাজানোর আগে জানতে চাই, তোমায় কি মানি
তুমি কি শুধু পর্ণা মানি করো, গোলাপি চাদর?
কারুর গোলাপি দেখলে তোমার কি মোট বয়সের
কোনো স্মৃতি মনে পড়ে? মোট বড় দব বয়সের
সমস্ত স্মৃতির মূল্য খুঁজে পাবো এমন আশায়,
মনে করো ভালো মেহগনি খাট পছন্দসই তাই,
দুরন্ত চেয়ার, ঝাড় লাইটের আলো: অন্তরঙ্গতরে
একবার ঘুরে এলেছিলে তুমি রাজার বাড়িতে।

রাজার বাড়ির ঘর দেয়ালে কি চৈনচিত্র ছিলো,
ঝকঝকানো কোনো পূর্বপুরুষের উন্নত ললাট?
অথচ আমার পূর্বপুরুষেরা বিষম বিনীত,
তাদের কোথাও কোনো ছাপ নেই, অপূর্ব পুরুষ
আমি শুধু ঘরে গেঁথে। তাদের মমতা, ভালবাসা—
সে যা হোক যাকে কথা, ঘর সাজানোর আগে তুমি,
ঘর সাজানোর আগে জানতে চাই তোমায় কি মানি
তুমি কি হলুদ পর্ণা ভালোবাসো, গোলাপি চাদর?

খেয়ার লণ্ঠন

সুবেন্দু অধিক

কেবেছো অনেক দূরে গেলে সুখ পাবো
তোমার প্রেমের আশ্বাসে
মৃত্যুহীন পুনর্জন্ম বুকে বাঁধবো এবার
তোমার মর্মর বুকে ঘরে।

দরোজায় কাকে যেন ডাকি
পাশে আসাযাওয়া নেই সমুদ্র চটির বন্ধুরা।
সব কেমন জল কেমন যে এক-শতাব্দীকাল
চিঠি তুমি দিলেনা আমাকে;

মহাযান আসনিক হতে, দেয়াল হতেছে ফোকর, মাতামাতি,
কাচ ধাক্কা, মুহূর্মুহু কিছু বাকি নেই।
তুমি গেলে ঘুরে।

তুমি কি আলাও চর্চ অন্ধকারে অন্ধকারে পথে।
তুমি কি আমাকে ভেবে রাজার দুলের ঘরে একাকার
জ্যোৎস্নালোকে সময় কাটাবে বিরলে।
এখন উত্তাপে আর প্রাচীনের প্রতিদান নেই
প্রতীক্ষার ভেঙে যায়
খেয়ার নিশির ঘুমে ঘেরা নাম।

ভগ্নাংশে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

তুমি যখন নও, বুঝি তাই যৌবনাবসান
পাখিপ্রতিমা ভেঙে তুলেছ নির্বাস খুঁজে, কবে
বলেছি সেকথা ? মনে পড়ে, নও, বিয়ে প্রকৃত জরুরি
কতটা সত্যিকে হিংসা—জেনে নিতে তবে দেখা যেন
অভ্যাসের প্রতিটি হত্যায় থাকে নিসর্গের ক্ষমা ;
যাকে তুলতে পারোনা তাকে স্পর্শের দোদুল দোলায়ে
স্থিরাসনে বসে কেন ব্যর্থ টেনে আনো ?

আমি পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি সব দেনা,
সীতার প্রত্যাপথের সব চিহ্ন, সৌম্য অলংকার
সব ঘর থেকে তুলে এনে সিংহাসনে নাবিনের
বসিয়ে দুঃখের মত আমার ভেবেছি ।
তুমি কেন যজ্ঞে কেন অগ্নিপরীক্ষায়
ধূপহীন আলাপন পাবে—তুমনের বাঁচি আলাপে না, আমি

পথ থেকে সরিয়ে নিয়েছি শেষ হাই ।

সার্কাস

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়

মাঠের ভিতর এক বিশাল তাঁবুতে । প্রতিদিন
সাঁঝ ঘোরানোর নিচে জমে উঠছে সার্কাসের খেলা,
মুহুর্মুহু করতালির ঘরে খেলা দিচ্ছে পড়ছে ঝাঁপ ।

প্রথমে সমুদ্র, বড়ী মেয়ে, মেয়ে ঝাঁসির ঝি, তেমন
সমুদ্রে পেয়েই তবু খেলে দিল, খাঁচার দরোজা
খুলে হিংসাহীন বাঘ অনায়াসে মঞ্চের উপর
আফ্রিকাদেশের ভাঁজ খুলে বসল, সিংহ ও ভালুক
পরস্পর পাশাপাশি বিষাদহীন তাদের উপর
চাবুকের বিদ্যুতের মেঘ ছিন্ন করে চকিত ঝলক,
দর্শকমণ্ডলী খুব সংখ্যাহীন নির্নিমেষে হাসিমুখে ।

বুকের ভিতর এক বিশাল তাঁবুতে । সেখানেও
একই সার্কাসের খেলা প্রতিদিন, সারাদিন ধরে ।
বিষম হিংসার বাঘ যদি তার উদ্যত নখর
কোনোদিন খুলে ধরে, কোনোদিন মেঘের বিবরে
মধুর না বাজে বাঁশি, সার্কাস জমবে না, সুতরাং
মধুরহীন বাঘ, ইচ্ছাহীন মধুর সারাদিন
বিষেরে, হাতজালি দেবে সবাকে কর্তৃপক্ষরাই ।

ইচ্ছে হলে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছে করে মধুর নীল ভাবনা দিয়ে তোমায় ভরি
ইচ্ছে করে চিরটাকাল তোমার কাছে বসেই থাকি
ইচ্ছে করে মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াই ভেসে বেড়াই
যাকে পেলাম তাকে ধরাই

শুধু তোমায় কথা বলো — শুধু তোমায় কথা বলো
তুমি আকাশকন্যা আকাশ — তুমি জলের ঝলোঝলো
তুমি কেবল কথাবিহীন — যেন সুরেই প্রকাশিনী
তুমি কি চাই বলো আমায় — আমি তোমায় মতো চিনি ।

অজগত হওয়ায়

আনন্দ বাগচী

স্মৃতির দেওয়ালে কাঁপছে ছায়াটা ছায়াটা শুধু
তবুও আছে কার কি তৃষ্ণা কেউ তা জানে না
গহনের গন্ধে ভরে ভুলে আছে আজও নিশাস,
অন্ধকার থেকে আসো অন্ধকারে মনে মুক্তাবলী
তবে তার সব ছল, সব ভালোবাসা ওই ভুল ।

দেওয়ালে আলাপ রেখে, মুছে দীপ চমকে ওঠে যেন
বিরহের চিহ্নগুলি কখন যে ক্ষত চিহ্ন হয় ।

শিবেনের আসু

সাধনকুমার হক

শিবেন, ওখানে নয়, ওইখানে পরিপূর্ণ ফসলি এখনো,
আয়ুর অতল যৌন ওর নীচে রবেনা সঞ্চিত ধারাপাত ।
শিবেন আমার ক্রমাগত
চৌদিকে ভাবালো ইতিহাস ।
শিবেন, ওখানে নয়, ওই ক্লান্ত পতাকার্ণ ভীষণ শিহরিল
ওখানে পাবেনা তুমি গভবহ আয়ুর মুকুর মহানীল ।
শিবেন আমার শীত ঘরে
নেমে এলো আয়ুর চত্বরে ।
শিবেন, ওখানে নয়, ওই নয়া পুরাতন, পরিচয় নয়,
ওখানে পাবেনা তুমি চমৎকৃতিচিত্ত স্থির নক্ষত্র বিস্ময় ।

শিবেন, ওখানে নয়, শিবেন, ওখানে নয়, শিবেন, ওখানে...।
শিবেনের আয়ু কাল ফিরে গেছে মহাজন আলোয় সন্ধানে ।

করবেখা
সোমিত চট্টোপাধ্যায়

ওভোহনায় সেকালিকার চরণধ্বনি।
করবেখায় বৃদ্ধা লেখা, ছিলাম ভুলে…
বুকের মধ্যে অনায়াসে প্রভাত হত।
হাওয়া বইত, চমৎকৃত ঠোঁট যত
খেলাধুলোয় শেষে আমায় কিসত বুকে—
আকাশ ছুঁয়ে, বাতাস ছুঁয়ে মেলবন্ধন হত।

সে সব কোন জলের তলে ডুবে আছে?
করবেখায় বৃদ্ধা ছিল, বুকের কাছে
বহুপাতে হঠাৎ সেই খবর এল।
ফুলগুলি সব ঝুরিয়ে গেল সকল গাছে…
চেনাশুনো চলা দুটি নেই ত কাছে।

কোথায় গেল খেলাধুলো, জোৎস্না আমার!
কোথায় গেল কৌতুকনা, খেলা আদর!
অন্ধকারে জ্বলছে শুধু করবেখা,
বহুপাতে জ্বলছে শুধু করবেখা,
এখন শুধু বেঁচে থাকার নিয়ম লেখা।

বাইরে দাঁড়িয়ে
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

টেলিফোন কিওস্কের ভেতরে তোমার গোপনতা
কিছুকাল মনে থাকবে, তোমার চোখেই ছিল কিশোর কৌতুক।
বোবা-কালা ছাত্রের মতন সব মুখ-নাড়া চোখ-নাড়া দেখে
বলে দিতে পারি ঠিক এইমাত্র বিচ্ছেদের পার্থক্যটি কার্যে
তাচ্ছব দুপুরের লালকাটা ঘর, যেন ব্যালকেনিতেই
সীমান্ত সোনার দাঁত খুলে পড়লো, দুরিনের চোখের পলাতী
কোলে অথা টেবিলের উল্টোদিকে বারান্দরে…বাবুচি যাদুর
দিচ্যতার সংকট অনায়াসপ্রবচের কন্তে নাকি ঘাস মহত্তর,
তোমার কণ্ঠের তাল তাল, সকলোভনায় খুব বড় খিদেস নম্বর,
কাকা বুকে কাকা উচ্চারণ শুধু নিবন্ধ কৌতুক ভয়াবহ…
বর্তমানে বেঁচে আছি, আছি একপায়া কোন ঘাসের পাকেতে,
নীচে বহে যায় নদী, যাহাদিকালের ভয়ে প্রায়া বালিকারা
ঘর বয়ে সাজিত মেখানে—কত গভীর সব প্রয়োজনে লজ্জা ভুলতে হয়
হয়ত জীবন, প্রেম, কাব্য, শিল্প সমস্ত কিছুকে
শুধু লজ্জার কোন স্থান নেই ঘোটে—
তুমি কিওস্কের মধ্যে, আমি বাইরে চলমান আইসক্রিমওয়ালা
ঠাণ্ডার ভিতর ডুবে যাই, জমে যাই ভীষণ ঠাণ্ডায়,
তুমি বিচ্ছেদের পর কেন মুখভার কের বেঁধেছো নিজেকে…
আমি বাইরে দাঁড়িয়ে
আমি চিরকাল আছি বাইরে দাঁড়িয়ে।

অরন্যেও মেতে চাই
সন্তোষ কুমার অধিকারী

বিস্তৃত অঙ্গনা ঘুরে ঝাপসেরা ঘোরে ফেরে, হিংস্রনখরের
নিপুণ প্রয়োগে তারা অবিচল। তাঁতুতে প্রসন্ন অবয়ব,
তৃষ্ণির প্রতীক্ষা নিয়ে সর্বক্ষণ জাগেনা সভাগ: অরণ্যের
নিবিড় ছায়াঙ্কারে শুধু পাতে দুর্ভাচক্র। তৃপ্তির নিষ্ঠুর।
এ'শহর ছেড়ে তবু অরণ্যেই ফেরত চাই। শহরে মানুষ
নিষ্ঠুরে প্রজায় ধীর কৃত্তাসক্ত শুধু অজাগর; তুলাদিত
বিশ্বাসের পথ ধ'রে ছদ্মবে গোপন নখে অহেতু আঘাত
দিতে জানে। জানে এক বিষেষে বিষাক্ত নীল বৃদ্ধাকে
হত্যাতে।

মানুষ অরণ্য নয়, অথচ দেখেছে তারা জানব হিংস্রতা,
ঘৃণা ও ভয়ের টান অন্ধকারে চেতনায় ঝাপসা ছলনা।
মানুষের মুখে আর জানোয়ার এতটুকু নেই। মাংস বৃদ্ধির
পাথরে শাণিত ছেরে, অকারণ রক্ত পানে বিকৃত উল্লাস।
শুধু ভয়ঙ্করে ছোঁয়ে আমি তাই অরণ্যেই মোর এ'ঘর ছেড়ে
মানুষের সঙ্গ নয়, অনন্তর অরণ্যেরে ফিরে যেতে চাই।

মরু সাধনা
সংবর চট্টোপাধ্যায়

নির্বাক, নির্বাক বলে ডাকে
অবিরল জলধারা, অবিরাম ঘটিকা কেবল
পালগুলি ঝরে যায় তবী

সকল নদীর কাছে চলে যায়, কেননা নদীর
পিপাসার ধরনা দিয়ে আছে
কেননা প্রপাতে ঝরে যায়।

ধনি প্রতিধ্বনি সব, শিল্প, চাষি, বাদ্যযন্ত্র, গোলাপ
কাচের শহর, বাড়ি, রাস্তা
এরগুলি সুখদুঃখ, ক্লান্ত

দাড়ানো বৃদ্ধিরা, সবে যায়
তবী যা জলের শব্দে একাকার লঘুর সৌরভ
নির্বাক, নির্বাক বলে ডাকে।

পরিপূরক

আশাপূর্ণা দেবী

পায়ের পাশে মোটা একটা ঢেউ খেলে গেল। তারপর সেই ঢেউয়ের দোলায় খাঁজ থেকে চকচকে কয়ে উঠলো একটা চোখের একটু কোণ।

'বাস্ আর বলতে হবেনা।

'আর কিছুই নয়, গীতা।

গীতাছাড়া এই ভর দুপুরে কে আর বিছের বিশ্রাম নষ্ট করে অন্যের বিশ্রাম হানি করতে আসবে?

ঘরে পা দিলে গেল সাবণা সেনের। তবু—ঝি বয় চাকর নয়, একটা ভদ্রবাড়ির মেয়ে, তাকে তো আর 'দূর হ বেরো' করা যায় না! তাই শিথিল শাড়িটাকে একটু গায়ে টেনে সাবণা অবাক ভাব দেখিয়ে বলে, 'আ গীতা! এমন সময় যে?'

'এই এলাম সাবণা দি!' গীতা আস্তে আস্তে প্রথমে পুরো চোখটা, তারপর পুরো মুখটা, অতঃপর পুরো দেহটাকে ঢুকিয়ে দেয়, 'সেই সেলাইয়ের প্যাটার্নটা—'

'সেলাইয়ের প্যাটার্ন!'

সাবণা বিরক্তি গোপন করেনা।

'এমন অদ্ভুত সময়ে সেলাই শিখতে এলে!'

গীতা অবশ্য বিরক্তি বোঝে, কিন্তু তাতে কি? জেনে বুঝেই তো এসেছে গীতা। জানে বড় বিরক্তই হোক, তবু দুপুরবেলা একমাত্র সাবণার কাছেই আসা যায়। তের নম্বর ফ্ল্যাটের অম্লান সেনের স্ত্রী সাবণা সেনের কাছে।

বারো নম্বরের মিসেস চ্যাটার্জি, এগারোর মিসেস দে, দশের মিসেস মল্লিক, কারো কাছেই দুপুর বেলা আসা চলেনা। আট নয়, সাত ছয়,—ষোলোটা ফ্ল্যাটের প্রায় সবগুলোতেই পনেরো নম্বরের মিসেস হালদারের ভাবী গীতার গতিবিধি।...কোন সময়টা কার কাছে যে নিতান্ত অবাঞ্ছিত, তা' জেনে নিয়েছে গীতা!

কিন্তু কোনো সময়েই কি বাঞ্ছিত?

না, এই কালো কোঁকা ফুটফুটে মেয়েটার বাঞ্ছিত অতিথি হবার গুণ কোনো খানে নেই, তবু সবসময়ই তার অতিথি হ'বার সাধ!

উজ্জ্বল খুশিতে ঐই হৈ করতে করতে বেড়াতে আসা নয়। বেড়ালের মত নিঃ পদক্ষেপে এসে চোরের মত পর্দার ফাঁক থেকে মুখ বাড়ানো!

তা এই লোভিল পাড়ার এই ফ্ল্যাট-বাড়ির চাকর বাকরা টেনিস! তারা মেমসাহেবদের বিশ্রামের সময় কাউকে ঢুকতে দেয় না। সাবণা সেনের বাড়িতেই শুধু চাকর নেই, আছে একটা ঝি। পুরনো বুড়ো ঝি। বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই বলেই চাকর রাখা নিরাপদ মনে করেন না অম্লান সেন। ওই বুড়িই যা আছে!

তা' বুড়ি এদিকে যতই যা থাকুক, আড়চোখ আটকাতে পারে না। ঘাড় বলে 'বৌদিদিতো ঘুমোচ্ছে গো—'

গীতা বলে, 'তা হোক। আমায় আসতে বলেছিলেন।'

সে অতএব ছেড়ে দেয়। নিজে পাশ ফিরে শোয়।

অবশ্য এই তারা বিদ্যার মধ্যেও কিছু সত্যের ভেজাল আছে। সেলাই সেলাই করে জালাতন করলে সাবণা কোনো সময় বলেছে, এতদিন ধরে দুপুরে এলো, এখন সময় কোথা বল;'

অতএব প্রায়ই সাবণার সংসারের দুপুরের ঘুমটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু সেলাই যে শেখায় না।

উৎসাহ বোধ করে না বলেও শুধু নয়।

গীতা কিছু জানে না বলে। সেলাই কি শুরে শেখাবে?

গীতা বলে, 'আপনি না হয় সাবণা দি, ব্লাউজ একটু টুকরো কাপড়ে শুধু চাঁচটা বুকিয়ে দিন—'

সাবণা বিরস মুখে বলে, 'সে ব্লাউজের কাপড় কোথা?'

অতএব চলনা।

কিন্তু উঠে চলে যায় না। গীতা সাবণার খাটের বাজুর কোণটা ধরে দাঁড়িয়েই থাকে। আস্তে আস্তে বলে। 'দুপুর বেলা এলে আপনার অসুবিধে হয় সে কথা বুঝি সাবণা দি, কিন্তু কি করবো বলুন! সময় তো একেবারেই পাইনা।'

সাবণা নিরুৎসাহ গলায় বলে 'কেন,

তোমার মামার তো ছিমটে চাকর ঠাকুর এত কি কাজ!'

গীতার গলার স্বর ক্রমশঃ নেই হয়।

'আর বলবেন না! ওদের ছিমটে লোক নাড়া; কিন্তু আমার মামীর বন্ধুনির ছোট ননদ এক সঙ্গে তিনটি খাবে। উঃ মাসে দু'মাস লোক ছাড়ছে।'

এই ফ্ল্যাট বাড়িগুলির বাসিন্দাদের আর যাই দোষ, 'মিতুক' বলে অখ্যাতি নেই। কাজেই কেউ কারুর চাঁচাছোলা মন্তব্যে টের পায় না। এখানে গীতাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

সাবণ্যর গলায় এবার কিঞ্চিৎ উৎসাহের স্বর ফোটে, 'তাই বুঝি? তঃ হলে বলবার কি আছে?"

'কী আছে? কিছু না। অকারণ! একজন বলা উচিত নয়। আপনার পায়েই তাই বলছি—চুপচাপ মেজাজ! মানুষের মামাকে তো প্রায় মারতে গিয়েছিল!'

সাবণ্যর মুখ হাসে, লাজুক খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'কী সাংঘাতিক! ম্যাঃ—ই বাবাঃ!'

'তুই' সম্বোধনের পর গীতার গলার স্বর আর একটু উঁচু হয়, ধমকাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে। এই তো গত কালই তো টাকা চুরি করে কী কাণ্ড! সে প্রায় আর্তনাদ।

'টাকা? টাকা কিসের?'

সাবণ্য সোজা হয়ে বসে। বলে দাঁড়িয়ে ঘটনা কেন বোস!' বিছানাটাই একটা পাশ দেখিয়ে দেয়।

গীতা আদতোতাবে একটু বসে। তারপর বলে, 'মামা নাকি একশো টাকার একটা নোট রেখেছিলেন পকেটে, পাচ্ছেন না। মামী বললেন, 'তুমি বাজারে হারিয়েছে।' 'মামা বললেন কখখনো না।'...উঃ কী তর্কাতর্কি! শুনতে পারবি?'

সাবণ্য মাথা নাড়ে।

'শোনা যায় না! ঝগড়াটের বাড়ি তো।'

সাবণ্য বলে, 'তা তোদের চাকর বাকর তো সবই নতুন, তাদের সন্দেহ না করে কর্তাকে বকুনি দে!'

গীতা চোখে ভ্রূতে একটু ঘরল খেলায়, 'বুঝতে পাচ্ছেন না? সে টাকা তো উড়েছে মামীর বাক্সে!'

'ধ্যা!'

'তবে আর বলছি কি! মামীর কে ছেলেবেলার বন্ধু আছে, প্রায়ই দুপুরে-টুপুরে আসে, তাকে তো গোছা গোছা টাকা দিচ্ছেন।'

'ধ্যাৎ! সাবণ্যর মুখে সহসের আলো খেলে যায়।

'বন্ধু? না বান্ধবী-রে?'

'বান্ধবী নয়'। বলে গীতাও মুচকি হাসে।

সাবণ্য বলে, 'হুঁ'। তোর মামীর ভাবলে বেশ একটু ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে। বয়েস তো কম্তি নয় মামু?'

'সে বন্ধুও প্রেক বুড়ো!'

'তারমানে বাদ্য প্রেমের ব্যাপার!'

গীতা এবার চঞ্চল হয় যেন। বলে, 'এতথা যেন ফাঁস হয় না সাবণ্য দি। মামী জানলে আমাকে—'

'আরে মামা কে তোর মামীকে বলতে যাচ্ছে? তা সেই বুড়ো এলে খুব আড্ডা দেয় বুঝি?'

গীতা লজ্জিত হাসি হেসে, মাথা নীচু করে বলে, 'সে কথা আর বলবেন না—' তারপর উঠে পড়ে বলে, 'আমি যাই সাবণ্য দি—'

সাবণ্য ওর আঁচলটা ধরে ফেলে বলে, 'বোসনা। চা হোক, খেয়ে যাস। আ কপালের মা, চায়ের জলটা চাপাওনা, একটু খাই। দু পেয়ালার মত জল দিও।'

এক এক দিন এক এক প্রসঙ্গ ওঠে।

স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহারের নতুন কিছুদের খেতে না দেওয়া, পরতে না দেওয়া, ঘোরে শুধু না দেওয়া, ইত্যাদি প্রসঙ্গ অনেকদিন আগে পুরনো হয়ে গেছে। ঠাকুর চাকর ঝোঁয়া ওয়লা ইত্যাদিকে গালমন্দ দেও ঝোলো হয়ে গেছে, এখন এসেছে টাকাচুরি, বাদ্য প্রেম!.....

তারপর কি সব ফুরিয়ে যাবে গীতার? না না, স্বামীর পর আমাদের একটা নেই! পনেরো বছর বয়সেই যে নাকি সিঁড়িতে খেতে আসতে যারো সবয়সের চ্যাটাচ্যাটি দাড়িওয়ালা ছেলের সঙ্গে চোখ ঠারাঠারি করে, রুমালের ঝাপট দিয়ে যায়।

'ও মেয়ে যা হবে—'

সাবণ্য বলে, 'ওমা ওটা তো বাচ্চা'—

'বাচ্চা! হুঁঃ। ওর থেকে অনেক বাচ্চা আছেন আপনি।'

সাবণ্যর কাছে চা খেয়ে গীতা ঠিক করে দিয়ে এসারো নম্বরে ফোনে। ওরা তখন চা খাচ্ছে।

বলা বাহুল্য গীতাকে দেখে প্রীত হন না—বিরক্তি হে। নীরস মুখে বলেন, 'বোসো। চা খাবে?'

'চা? তা' দেবেন তো একটু দিন মাসীমা! সাবণ্য বৌদির বাড়ীর চা খেয়ে পর্যন্ত মুখটা ফ্রেস, ফেকাসে হয়ে গেছে। কী খাচ্ছে চা মাসী!'

বিরক্তি হে বিরক্তি মেয়ের বাড়ির চায়ের ডিসক্রিপশন সংবাদে নিজের ডিসক্রিপশন কিঞ্চিৎ ত্যাগ করেন। এক পেয়ালা চা ঢেলে গীতার দিকে ঠেলে দিয়ে ঈষৎ স্নেহের সুরে বলেন, এদের? খাচ্ছে চা যেন? এদিকে তো অ্যাবসরপ্তাতার কিনলেন বলুন।'

এঁ্যা ওই বাইরের পার্সোন—গীতা

শারদীয় অভিনন্দন
দাস মার্কা তুড়াই
ও
লক্ষ্মী (Lakhmi) মার্কা মেটাল বাটখারা
এবং
ঢালাই লোহের সর্বপ্রকার মাল প্রস্তুতকারী
প্রতিষ্ঠান
লক্ষ্মী কাউণ্ডী ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ
D. G. S & D এবং S. S. I. U. বিভাগের তালিকাভুক্ত সরবরাহক
৬৭, বেনারস রোড হাওড়া ফোন: ৬৬-২৮-২৩

হাসিমুখে বলে, 'ভেতরে যা কুলপড়া, সে যদি দেখেন! উঃ ওয়াস পাইস ভালার মালার!

বিমলেন্দু বাঁকা চোখে বলেন, 'খুব খাও বুঝি?'

'আর বলবেন না! কেবল ডাকবেন। 'পীতা আমায় এটা করে দিয়ে যাও, পীতা আমায় ওটা করে দিয়ে যেও!' 'চাকর থাকতে তো নেই—'

'চাকর নেই!'

বিমলেন্দু কে আঁধারে পুরো বুঝা যায় না। গেলে নির্ঘাৎ চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়তেন।

'চাকর নেই!'

'আঃ! মাধবেন্দুদা তা বলেই বুঝুন!'

'তা তুমি যে এত কাজকরে দিয়ে যাও তোমার মাসী মাস করেন কি?'

পীতা সোৎসাহে বলে, মাস করবেন কি? অজানবাবুর কাছে যে মাসীর টিকি বাঁধা!...যেন খেলেন তো দুজনেই—'

'যেন খেলেন?'

বিমলেন্দু আঁতকে ওঠেন।

যেন এই মাত্র সাপ দেখেছেন বিমলেন্দু! অথবা মানুষ মানুষ জীব যে 'যেন' নামক খেলাটা খেলে, এ যেন তিনি জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

পীতা এবার হাসে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'যেন খেলা শুনে মাসীমা যে আঁতকে উঠলেন! যেন এখানকার এই ফ্ল্যাটের যে না খেলে? খেয়ে যায় একবার আপনাই যায়! সবাই সবাই!...মামার মুখে তো শুনি! বিমলেন্দু শুধু বাদ যেননা!'

বিমলেন্দু বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বলেন, 'বিমলেন্দু? মানে মহিলারা?'

'তবে মাত্তো বলছি কি! আপনি যে মাসীমা এই ফ্ল্যাটে থেকে এত সরল আছেন কি করে, ভেবে ভাবি। আই মাসিমা, যেন্দা যেখানে তো আমার মামী—'

'হচ্ছে। খেলেই তো কাজ করতে হবে? যেতে যাও ন একটু। আর একটু চা খাবে?'

'না মাসিমা। খুব ভালো খেয়েছি। মুখটা হাড়লো। আচ্ছা মাসীমা, সাত নম্বরের আর ৪ নম্বরের ব্যাপার শুনেছেন?'

বিমলেন্দু ভুরু কুঁচকে বলেন, 'সাত? ছয়? কী ব্যাপার?'

'ওদের ছেলের সঙ্গে ওদের মেয়ের বিয়ে তো! জানেন না?'

বিমলেন্দু থেকে অবশ্য স্বীকার করতেই হয় জানেন না। জানলেও জানতে হয়। কারুর অজ্ঞতার জ্ঞানে কিছু বিস্তারিত কথা জানতে পারা যেতে পারে।

পীতা সোৎসাহে বলে, 'জানেন না? জানবেন কি, আপনি যে থাকো কথায় থাকেন না। আমিও জানতুম না। সেদিন হল নম্বরের বৌদি ডেকে নিয়ে সব শোনালেন।...বিয়ে-টিয়ে হচ্ছে বাধা হয়েই!'

পীতা থামলো।

হঠাৎ বলে উঠলো, 'এই তুলসীমাটা বুঝি নতুন বিসেয়েন মাসীমা!'

বিমলেন্দু বলেন, 'না তো! ছিল তো অনেক দিন। তা' মাধা করে বিয়ে দেওয়ার কথা কি বলছিলে পীতা?'

পীতা কালোমুখ লজ্জায় লালবরে বলে, 'সে আপনার কাছে বলা যাবেনা মাসীমা,—একদিন নাকি রাতিরে সাত নম্বরের মেয়ে ৮ নম্বরের ছেলের ঘরে এসে—নাঃ সে বলতে পারবো না বাবা।...মোটকথা বিয়ে দিয়েই হচ্ছে।...যাক চলেই বা কি? আমাদের তো আর নেমন্তন্ন করবেনা।'

সরল শিশুর হাসি হেসে ওঠে পীতা।

অনেকটা পরে আরো ৩'বাড়ি ঘুরে নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরতে সিঁড়ি উঠতে শুরু করে, হঠাৎ পাশের ন' নম্বরের দরজাটা খুলে যায়। ন নম্বরের—বি, এন ঘোষের স্ত্রী শীলা ঘোষ ডেকে ওঠেন, 'কে পীতা? ক'দিন যে আসোনি?'

'সময় পাইনা বৌদি, যা-কাজ!'

'আহা! এই তো, আমায় ডিঙিয়ে তো নীচে নেমে গিয়েছিলে বাবা?'

'আর বলবেন না—বৌদি,' পীতা কাছে এসে ফিস ফিস করে বলে, 'বিসেস দের ঝামেলায়!...তাস খেলার সঙ্গী পাননা তত্ত্ব মহিলা, আমাকে পেয়েছেন। নি-কামাইয়ের দরজী! এঁদিকে মন হটলই করছে, ওঁদিকে উনি জোর করে খাসে বসাচ্ছেন। যাই বৌ দি।'

'যেওরে বাবা! শোনোনা, তাস খেলতে সময় পাও আর—কি খেলো বিবি না কি?'

'বিবি!'

'তা' দুজনে আর কি খেলা হবে?'

দুজন কেন, চার জনই—তা'হলে বলি শুনুন বৌদি, পীতা খিলখিল করে বলে, 'মাসীর মেয়ে কানে না যায়, আর দুই সতীন চকের আর কি।'

'চাকর আর কি!'

'মা নম্বর পাকর হয়ে যায়।

'সেই তো—আমার তো লাজের মাথা কাটা যায়! কিন্তু উনি যখন খেলবেন! তাই কি শুধু খেলা? আজ তো ছেলে দিয়ে বিয়ের সঙ্গে ঘুষোঘুষি—!'

বিমলেন্দু বাঁ হাত ঘড়ি বাড়িয়ে পীতার একটা হাত ধরে ফেলে বলে, 'আরে এলো এলো ভাল লক্ষণ। বেশ একখানা জীবন্ত খবর! এ দিকে তো এত লম্বা চওড়া কাণ্ড—'

'ওই পর্যন্ত'। পীতা খিলখিল করে বলে, 'মামার চাইট ব্রাইড এঁটে, আর কত সুধা সিগাইরের ব্রাহ্মবরে লম্বা হওয়া!...ভেতরে!'

ঢুকে পড়তে হয়।

অনেক পরে যখন নিজেকে ছাড়িয়ে ছেড়ে, মামীর মেয়ে একটা তীব্র দৃষ্টি ফেলে চলে যায়, এবং মামী তীব্র স্বরে—বলেন, 'পাড়া বেড়ানো হল?'

পীতা চৌকীতে বসে পড়ে চাপা হাসি মুখে বলে, 'বোসো মামী, আগে একটু জিরতে দাও। বাবা: যে কষ্টে ওখান থেকে হাসি চেপে উঠে এসেছি? কত রকম কাণ্ডই ঘটে জগতে!'

এ বাক্‌চাতুরী চলবে কিছুক্ষণ।

এই বাক্‌চাতুরীর অবকাশে আর একটা গল্প বানানো যাবে!...

মামী সঙ্গেহ স্বরে—বাজে কথা, বানানো কথা, শুধু শুনবেও। উনিশ-বিশ তার কথাও শুনবে, আর প্রতিবেশী সম্পর্কে কোনো প্রতিকূল মন্তব্য শুনলেই এক আধটা মন্তব্যও করে বসবে।

তা' এই ষোলোটা ফ্ল্যাটের ষোলোটা গিন্নী। কুড়ি থেকে ষাট অবধি বয়সের, সবলেই কি বোকা? কেউ তারা পীতার ওই বানানো কথাগুলোয় সন্দেহ করেনা।

ঘুরে।

পীতা চলে গেলে ওরা হেসে হেসে বলে, 'পীতার কথাগুলো! এইটি সালের' যদি যাও, তাহলেও শুনো!'

যে তরুণী বৌরা পাড়া প্রতিবেশীর কথা সংগ্রহ করতে পীতাকে বাসবে বলে 'বোসোনা বাবা, ডিবের বড়া ভাজছি খেয়ে যাও একখানা,' তারাও পীতা পরিবেষ্টিত ওই কথা প্রসঙ্গে বলে 'দল ন্যাড়ে শোনা!'

শুধু শোনে, বিস্ময় প্রকাশ করে, পীতাকে

হেসে বলে, 'বোকোনা ভাই! এত বাদ্যিতেও পারে!'

'বাদ্যিই?' গীতা বলে 'বেশ এই দুপ করলাম।'

ওরা বলে, 'আরে বাবা—রাগ করছ কেন? বলছি এত কথা ছুটি পাও কোথায়?'

গীতা বলে 'আমি যাই তাই পাই। আপনারা তো কেউ কারুর চৌহদ্দি মাড়াবেন না।'

হাঁ কেউ কারুর চৌহদ্দি মাড়াই না। ফ্ল্যাটে বাস করতে এসে, ফ্ল্যাট বাড়ির নীতি এরা নিখুঁত রপ্ত করে ফেলেছে।

আর তাই ফেলেছে বলেই এত শান্তি গীতার।

কিন্তু শান্তি কতদিন? দুবেলাতে।

এইটুকু পরিবর্তনের মধ্যে আর নতুন কিছু ঘটানো যাচ্ছে না। তাই গীতাকে দুপুরে খেতে দেখলে সাবধা মেসের মত এখনো কিছুক্ষণ বেজার হচ্ছে।...

শুধু গীতা আজকাল চেহারা আবার একটু আগের সংগ্রহ করে নিচ্ছে। রস ফিরে পাচ্ছে খাবার পর লোকের চৈতন্য হচ্ছে, গীতা দাঁড়িয়ে আছে। তখন এক-আধটি ভিক্ষা চেয়ে বসতেই হচ্ছে। 'দিদির দাঁড়িয়ে রইলি কেন বোস। চা খেয়ে যা।'

কিন্তু শুধু ওই এক পেয়ালা চা, দু'খানা বিস্কুট, এতটুকুতে চিঁড়ে ভিজা, এর জন্যেই কি গীতার এই আয়োজন পরিশ্রম!

নাঃ। তা মোটেই নয়।

লোকের কাছে 'প্রণাম' পাবার জন্যই নিজে থেকে বেড়াতে গীতা, মাথা মাথীর সংসারে থাকবার অভ্যাস তার নেই। ঘাড়েপড়া ভাবীর জন্যে 'সেবাশ্রম' খোলো ব্যবস্থা করে যায় মাসী। এমন কি নিজের মেয়ের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে পর্যন্ত দেয়।

সবচুর ও খুব খারাপ মেয়েনা।

নিজের ভালো ভালো শাড়িগুলো আবদুরুমো হয়ে গেলেই 'পরিমল এটা' বলে দিয়ে দেয়। অসুখ করলে ওষুধও দেয়।

দেয়না শুধু বিয়ে।

এখি থেকে, হয়ত এসে পড়া তোমা ভালো দুধ। ওই মেয়েটার বিয়ের কথা ভাবেও না আত্মা।.....

এদেরছলই তো দুটি বছর পার করে, বিয়ে দেবার জন্যে আগেই এতো। অতএব মাথা-খারাপ সংসারে অবাস্তব একটা প্রশ্নোত্তরে হয়ে দুটিও ওদের আরও বাড়ে আটটা বছর কাটলো গীতার।

মাথা বলে, 'বাড়ীতে পাড়া বেড়াবে বেড়াবে, ওকে কিছু কাজ দাওনা কেন? ধারা জানেনা?

মাথী বলে 'জানবেনা কেন? মায়ের কাছে কি আর সিংহাসনে বসে থাকতো? আমি ওকাজে চাই না বাবা! কী দরকার! তোমারই আত্মীয়রা এসে দেখবে, আর বলবে, 'ভাইটিকে দু মুঠো খেতে দেয় বলে দাসত্ববৃত্তি করিয়ে নিচ্ছে! চিনি তো সবাইকে!'

পৃথিবীকে চিনে ফেলা এই মাথীর সংসারে অভ্রান্ত অবাস্তবের পোষ্য ছাড়া আর কোনো পোষ্য নেই গীতার।

সেই মূল্যহীন জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে গীতাকে। কিন্তু সেই বেড়াবেড়াটাই কি সহজ? সহজ নয়।

তাই নিজেকে 'মূল্যবান' করে তোলার এই এক বিচিত্র কৌশল গীতার। এ কৌশল সার্থক হলে মূল্য আছে, আদর আছে, মূল্যর পুরস্কার রক্তমাংসে খানিকটা রং রস, বৈচিত্র্য জাগে।

সেই খাওয়াটাই কি কম?

অন্য আর কোনো নতুন সংসারের রস কি কোনোদিন অনুভব করতে পারে গীতা? দেখতে পারে নতুন মুখ, নতুন চরিত্র?

সে আশা আর করেনা গীতা।

তার জীবনের রস আহরণে এই উপ-মূল্য তার।

কিন্তু তার বদলে বলের জোরানও তো দিতে হবে? নইলেই তো গীতার মুখের সামনে ওদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা বলবে, 'ওই এলেন! জ্বালা জ্বালা করেছে!' বলবে, সেকথা জানে গীতা। জানে গীতার কথা ওরা কেউই বিশ্বাস করে না। তবু এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও তো জানেনা গীতা।

কিন্তু এই বন্ধ গীতার মধ্যে আর গল্প সৃষ্টি করার জায়গা কোথায়? তাই অনেক ভিড়া বাড়িয়ে গীতা লোকের চাঁদায় হাত দিয়েছে। জানে এটা ভাঁড়ারে অনেক দিন খাওয়া যাবে।

ভবিষ্যৎ? ওটাও যখন পুরনো হয়ে যাবে? মিথ্যায় রং ঘুচে যাবে? তখন? সেটা জানে না গীতা।

সেই মূলহীন পুরস্কার দিয়ে তাকাতে সাহস হয় না তাঁর।

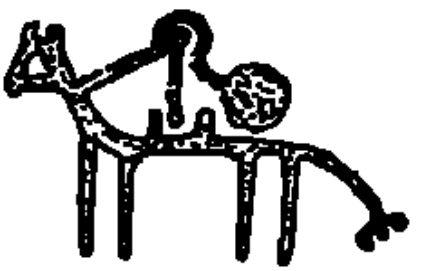

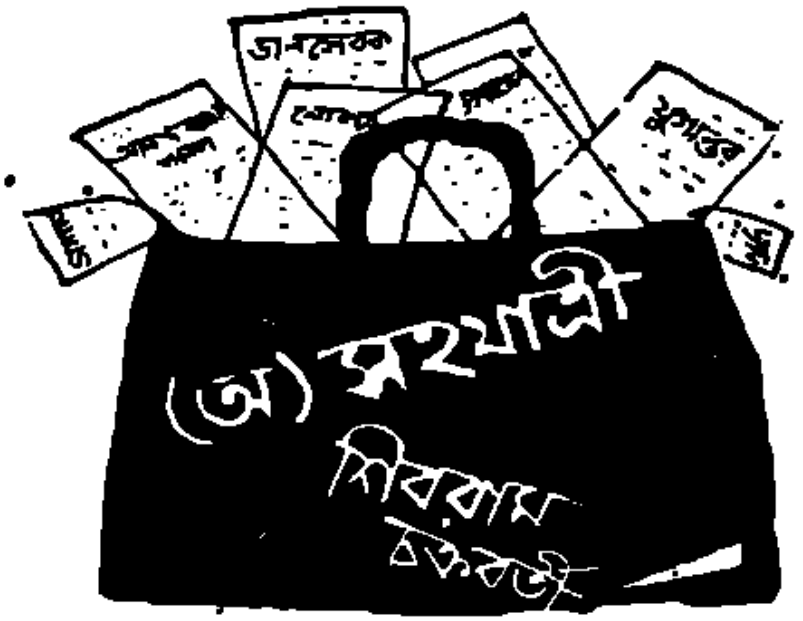

ঘাটশিলা স্টেশনেই প্ল্যাটফর্মেই দেখেছিলাম ভদ্রলোককে, কিন্তু তাঁর মধ্যে তখন অবাঞ্ছিতত্বের কোন লক্ষণ দেখিনি।

লক্ষ্য করলুম পরে। ট্রেনে উঠবার পর।

তারী একটা হাতব্যাগ আর টাঁকন-কোঁয়ায় টেনে নিয়ে উঠলেন তিনি আমাদের কামরাতেই। জানা গেল তাঁর তা ও না। আমাদের সহযাত্রী।

গাড়ি ছাড়বার পর তিনি ব্যাগের থেকে একটা খবর কাগজ বার করলেন। শুরু করলেন পড়তে ভদ্রলোককে—পড়বেন?

অর্থাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে ভদ্রলোক হয়ত একটু হত চকিতই! 'না না, আপনি পড়ুন।'

'আমি পড়ব যে তার মো কি! পড়তে শুরু করলেই যে আপনি আমার কাগজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এ পাশের ইনিও উঁকিঝুঁকি লাগাবেন। তাড়াতাড়ি খবরটার পড়ে যাবে অসুবিধা হত। সবাই মিলে কাগজের এক একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বসে যাবেন পড়তে। তার চেয়ে আপনারাই আগে পুরো নিন কাগজ।'

বাধ্য হয়ে নিতে হোলো ভদ্রলোককে কাগজখানা। বিরস বদনে কাগজের পাতায় চোখ বুলোতে লাগলেন তিনি।

তারপর ব্যাগের থেকে আরেকখানা কাগজ বার করে কটাক্ষ করলেন আমার দিকে—'আপনিও নিন একখানা।'

'আজ্ঞে না, মাপ করতে হবে।' সবিনয়ে আমি জানালাম: 'খবরের কাগজে আমি কাজ করি। ও জিনিস আমার কাছে বিভীষিকা। রোজ সাত-খানা করে কাগজ পড়তে হয় আমায়। আর, সব কাগজেই একই, সেই এক খবর। প্রাণের দায়েই পড়ি, করব কি! এখন ছুটিতে আছি। কাগজের ত্রিসীমা দিয়ে যাব না।'

তা, আমি না গেলেও কাগজ সীমানায় এলো। আমার পাশের লোকটিকে খাঁছরে দিলেন তিনি কাগজখানা।

'সবার জন্যেই আছে কাগজ।' সভয় মুখে জানালেন তিনি: 'কার কোনটা চাই বলুন? আনন্দ বাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বসুমতী, জনসেবক, লোকসেবক—কার কোনটা পছন্দ? সব কাগজই আছে আমার ব্যাগে। সবার জন্যেই এনেছি।'

ব্যাগের থেকে একে একে বেরুতে লাগলো নানা কাগজ—ঠিক ম্যাজিকের মতই। অত্যন্তরে সবাইকেই তিনি দিলেন একখানা করে। অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলো।

'বাস, এইবার নিশ্চিন্তি!' বলে ব্যাগ থেকে শেষ কাগজখানা বার করলেন তিনি বার করে—'নিন ভাই পড়া যাবে এইবার।'

কাগজখানা সোদরের স্টেটসম্যান থেকে তখন আমি একটু উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকব, তৎক্ষণাৎ তাঁর বিকল দৃষ্টি লাভ করলাম—'কী! পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি!'

'না মশাই! মোটে করুন!' বললাম আমি।

'যা বলেছেন! এসব বিজাতীয় পত্র ছোঁয়া স্পর্শ করাও উচিত নয়।' বলেই অখণ্ড মনোযোগে কাগজটার-গর্ভে তলিয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু কামরায় আর এক অবাঞ্ছিত সহযাত্রীও ছিলেন। খড়গপুর আসতেই প্ল্যাটফর্মের চা-বিক্রেতার কাছ থেকে তিনি এক কাপ চা নিলেন। তারপর কী ভেবে জানি না, হয়ত পূর্বোক্ত কাগজ-গুলার দুষ্টান্ত অনুসরণ করেই কিংবা জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বা তাঁর হাতে জনসেবক হয়েছে ছোকরার

চা খিলোতে শুরু করলেন গল্পটিকে। আমিও এক কাপ নেমুম।

কিন্তু বিপদ হোলো অবাঙালি ভদ্রলোককে নিয়ে। অবাঙালি অবাঙালিকে খুব পরিষ্কার হয়ে বোঝে।

'না না, চা আমার চাইনে।' হাত দিলেন তিনি। তারপর—'কী? আমার ঠীকন কেরীয়ারের দিকে নজর পড়েছে বুঝি?' চেঁচিয়ে উঠলেন ধমকে।

আমরা চা-ট্যালো হাত গুটিয়ে এনেছি ভদ্রলোকের—চায়ের পেয়ালা সমেত। —এ কথা কেন বলছেন?'

'বলব না কেন? ঠীকন কেরীয়ারে আমার পাঁচখানা পথোটা আছে, পাঁচশ ভাড়া আছে, আমুর দশ আছে, বাসুদা আছে, মাংস আছে। দামান্য এক কাপ চায়ের বদলে যে এঁদের অপমান নিয়ে অব্যাহতি পাঁচবেন তাও করে খেতে যাব—সেটি হচ্ছে না। ভদ্রতার অভধানি আমিয়োগ্য বরদাস্ত করতে আমি প্রস্তুত নই।'

কথাটা অবাঙালি ভদ্রলোকের লাগল একটা রসিকতা মনে করে। আমরা শুদ্ধ হেসে উঠল সবাই।

আমার কিন্তু কথাগুলো কানে বাজলো। ভালো লাগল না কথাগুলো। ভিনি ট্রাঁক খরচের কাগজের ছাপ তাঁর কেরীয়ারের খাতাখাতগুলিও সবাইকে সমভাবে বিতরণ করলেন সেটাই যেন তাঁর অবাঙালিত্বের পরাকাষ্ঠা হোলো বলে মনে হোলো আমার। আমি অবশ্য:.. খবরের কাগজের কেনার বিষয় বলেও, তাঁর মনে সন্দেহটার অবসান যাক পেতে নিয়ে খবরটি ছিলাম না।

'ঠাকুর পানের ভদ্রলোকের হাতের কাগজে চোখ পড়তে খবরের বড় বড় হরফগুলো নজরে লাগল আমার।

'সব পুরনো খবর দেখছি যে।'

'হাঁ, পুরনো খবর সব।' বলে নিলেন তিনি: 'নতুন আর কিছুই ঘটেছে না পৃথিবীতে। তাও যা- খবর আছে তাও আছে।,

না, সে কথা নয়। এসব খবর তো ছমাস আগেকার খবর।'

'যা বলেছেন'। ছমাস আগের কাগজে আপনি যা পড়েছেন আজকের কাগজেও ঠিক তাই পাবেন। সেই বক্তা, ভূমিকম্প, রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ঘটনা, কালোবাজার, আমাদের দাবী মানতে হবে, ঘুষ জখম, দাবীদিবস লেগেই আছে নিত্য। নতুন খবর কিছু নেই। তখন যদি আপনি কাগজ না পড়ে থাকতে পারেন, আসলে, হাঁচাৎ একদিন পড়ে দেখুন তাহলে—দেখবেন সেই একই খবর। আগেকার খবরই খবর নয়। এবং আমিও যে আপনি খবর কাগজ পড়েনি তার জন্য তোমাই কাঁচ বোধ হয়ে না আপনার!'

'কাগজের তারিখটা দেখুন তো একবার। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।' না বলে আমি পারলুম না।

তারিখ দেখে ভিনি বললেন—'তাইত। ছমাস আগেকার কাগজই তো বটে।'

'যা বলেছিলাম।' বললাম আমি: 'সাংবাদিকের তিরিক বর্ণনে কি ফল হয়।'

'ঠীক বলেছ। একটা ভয়ানক কাজ দিয়েছেন আমাকে।' আমার পাশে প্রতিবাদের ঝড় সোজায় হোলো।

'আজে কি হয়েছে।' আমাবদনে জবাব দিলেন অবাঙালি: 'একটা ভুল হয়েই হোল। কাগজ পড়া নিয়ে কথা। তবে কিনা, সেটা পরের কাগজ হওয়া চাই কিন্তু।'

'তাই বলে আপনি আমাদের পুজোর কাগজ দিয়ে ঠকাবেন?'

আছে ছিল কলকাতার পুজোর অঙ্গ ছেলে। পুজোর দিন পর্যন্ত এসেই ছুটি আর বাজনাদারের ভিড়। লোকে লোকারণ্য রাস্তা। ইচ্ছিক পথ, ঠাকুরদালা, বিভিন্নরঙ্গ আর ফুলেফুলে। ছেলেরা ঘনু ছেলেদের দালানে, সবুজে লোকার আলপোনা, জানিয়ে পাতাকালানো ছুরিনি, ঘরে একটা ঘিরেপুতলো ঠোপদার ওজনদারি। ছেলেদের লোভা পাছে ঠিনির বিয়ারী, পুরিকরা গুড় আর মুলপর্ক। বাজনোলে দুর্গাদলা আর আগমনেরা সবেদন।

এখন ছেলা অন্য। এখন অনুর বাড়ির পুজো নয়—সারোয়ারি পুজো। সেই সবে ঠাকির আলাদা। এখন পুজোর চাই বাঁচি হাজার ডলুবাজা আর সবেদন।

ছেলেভোলা ঠিনিতে দুর্গাবিসর্জন আজকাল ছেলে পুজো।

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিমিটেড
ছলোবাজার-এর প্রতী
কলিকাতা

পাঁচজনের তোষামোদ। সবার মাঝখানে বসে থাকা। সেইজন্যই তো যাই বাসরে যাই। তা, এতজন সবার তো বেশ ভাই বোন, আপনাদের। তাদের না যাই তো তাদের, আমাদের উপরোধ ছিলেন খবরগুলো। তাঁর কিছু হয়ে কারো?'

সকলেই অন্তরঙ্গে নিজের নিজের মনের তাদের দেখে সচেতন হয়েছেন। খরচের সবাই সমান দলা। সবচেয়ে বেশি আমন্ত্রণকারীদের তব।

'দেখুন সাঁতা বলতে কি—' বলতে বলেন তিনি - বেশ আন্তরিকভাবেই—তাই আপনাদের খবর আমরা পড়ার তত নেই। সে অন্যেরা যার করেছে ও কাগজের মেলা করে খেয়ে। সকালে উঠে তার প্রথম কাজ সৌজন্যের তালিকা দেখা। সে আমরা জেনে। না না আছে তাই তার। আপনার মনের প্রত্যাশায় থাকতে পারে না সে। ও আপনাদের কথা আলাদা। খবরের খবর পড়ার কোনো ঝোঁক নেই সেদের। কেবল পরের হাতে কোনো খবর দেখলেই পড়বার লব হয়। ট্রেনে যে যাবার সময়ই যাইটা চাপে বোঁক। এন সকালে বেরিয়ে যেতে খবর কাগজ। তা সাঁতাই যদি আপনারা কাগজ চুহা হতেন তাহলে আজকের খবর তখন আপনাদের আজানা থাকত না। যাং ট্রেনে আমার সঙ্গে লাকাতের দেখার মনে থাকতেন না আপনারা। মিতো! কিরকম সহযাত্রী সব ট্রেনে চিনে অজানা তো নয় আমার। ট্রেনে সেই জীবনটা ভালো। তাই আমার যে যে কথাগুলি কাগজ হাতের কাছে পলায় নিয়ে এলাম আপনাদের জন্য। আজকের আমিদের কাগজ এখানে শুধু কথাগুলিই রয়েছে—সেটা আমার নিজের চোখে।'

'যা, এটা আগে উচিত ছিল আপনার। এইভাবে অপরিচিত আমাদের কাছে...' শুধু তাঁরা বলতে পারলেন না।

আবহাওয়া তখনই উচ্ছল হয়ে দেখে আমি পুরুষের সহযাত্রীকে বললাম—'চিন তো কাগজখানা দেখি একবারটি।'

'আপনি পড়বেন এই কাগজ? খুবটো পড়া খবর আছে?'

'কাগজ কি কেবল পড়বার জন্যই। তবে আছে-নাই আছে। সেতে বলছে, এন খবর তবছে, এবারটা, তাহলে দেতে হলেও কাগজের দরকার হয়।'

কাগজখানা হাতে নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে এলো। কাগজের থেকে মুখ তোলাতে দেখে খুশি হয়ে উঠলো সবাই। কাগজখানা লাভয়াড়ি করবার কেবল পাশের ভদ্রলোক একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রইলেন।

কেউই গেল অনেকক্ষণ। তখনো পার হোলো বাড়ি।

নদীর স্রোতা দেখতে দেখতে বেয়াল হোলো ওটা বেজেছে জানা যেতে যাঁদ। তখনো পৌঁছতে দেরি কত আর।

বলার পরে আমারিও ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেছলেন। জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে—

'আপনার হাতঘড়িতে কটা বেজেছে দয়াই? বলবেন কটা হয়ে?

'কেন বলুন তো?' তেড়ে উঠলেন তিনি: 'আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার মতলব বুঝি? মেয়েকে দেখতে চাও আমার?'

বাড়ি দেখার সঙ্গে মেয়ে দেখার কিন তোমার, তাঁর বাঁড় আমার মোদের আসতার আসে না।

অবাক তাঁদের দেখলে কিন একটা ছেলে বোমহয়। কিন্তু তখন তলাবার সময় ছিল না তো।

[এখন ভেবে দেখছি, সময় স্রোত আর মেয়েরা প্রায় একইরকম। বলতে গেলে, একে তিন, তিনে এক। তিনিই অবাতরে বয়ে চলেন—তাদের জন্যই দাঁড়ায় না। তুমি তার তীরে গিয়ে দাঁড়াতে পারো, ঢেউ গুনতে পারো বসে বসে। নাকার সহযাত্রীদের বদলও হয়ে যেতে পারো। আর যাঁর তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তোমের টানে ভেসে যাবে কোথায়, পাত্তা মিলবে না। পড়তে অনেককে দেখেছি কিন্তু সাঁতরে আসার উদাহরণ প্রায় আইনেই লেখানি।

মেয়ে এলেই বুঝতে পারি আমার মতলব খাঁদো। এটাই আছিল কাল, এর পরে পুরুষ। তখনি আমি নিজেকে তাঁর করি। আসলাবলার ধারে গিয়ে দাঁড়াই।

'কিন্তু আমার সেই বয়স এই তো সেদিন আমার কথা বলু।

'কেন, সময় বাঁদরে কি হয়েছে? এই সঙ্গে মেয়ের—'আমি আমরা আমরা করে বলছে যাই।

'যা, বলবে না সময়।'

'কেন বলবেন না তাই তো আমি আসতে চাইছি।'

'এর মধ্যে কোনো 'কেন কিন্তু' নেই। কী বলবে তুমি কথা পাড়তে এসে। তা কি আমি টের পাইনি? এই সময়ের ঘুরো ঘরে কলকাতা পরের বাকী সময়টা তুমি আলাপ করে জমাবে আমার সঙ্গে। তারপর স্টেশনে নেমে রিক্সেওয়ালাকে কমে নিয়ে গিয়ে আমাকে বৈকালিক চা পান করাবে। চ-এর সঙ্গে টোস্ট থাকবে। তখন যাত্রা শুরু আমাকেও জানতে হবে তোমার আমার বাড়ী প্রাতঃকালীন চালানের জন্য। সেখানে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে তোমার। আমার মেয়ে দেখতে সুন্দর। সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে তুমি। তারপর শুভৌদনে আমি তোর সময়ে বাড়ি থাকি আর নাই থাকি। তখনই তুমি আমার খোঁজে আসবে। এমনি করে আমার মেয়ের সঙ্গে তার হবে তোমার। তারপর যা হবার তাই হবে। আমার মেয়ের সাথে তোমার পরিচয় পাকবে তুমি।'

'কিন্তু...আমি তো...'

'এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই। তুমি কি ভেবেছো আর একটা আমার বাঁড় তোমার খুঁজবার দেই আর সঙ্গে আমার মেয়েকে ছিনে নেবে।

জাতীয় পতাকার
মতদৃঢ়
গৌরবদীপ্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

প্রাচীনতম এই চিকিৎসাকেন্দ্রে ধবল-কুষ্ঠ, বেতলাগ, ফোলা, অসাড়তা, সোরাইসিস, একজিমা, দূষিত ক্ষত ও নানাপ্রকার কঠিন চর্মরোগাদি নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা নিরোগ ও নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে রোগ লক্ষণ পাঠাইয়া বিবরণ জানুন।

প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২০৫১)

শাখা : ৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

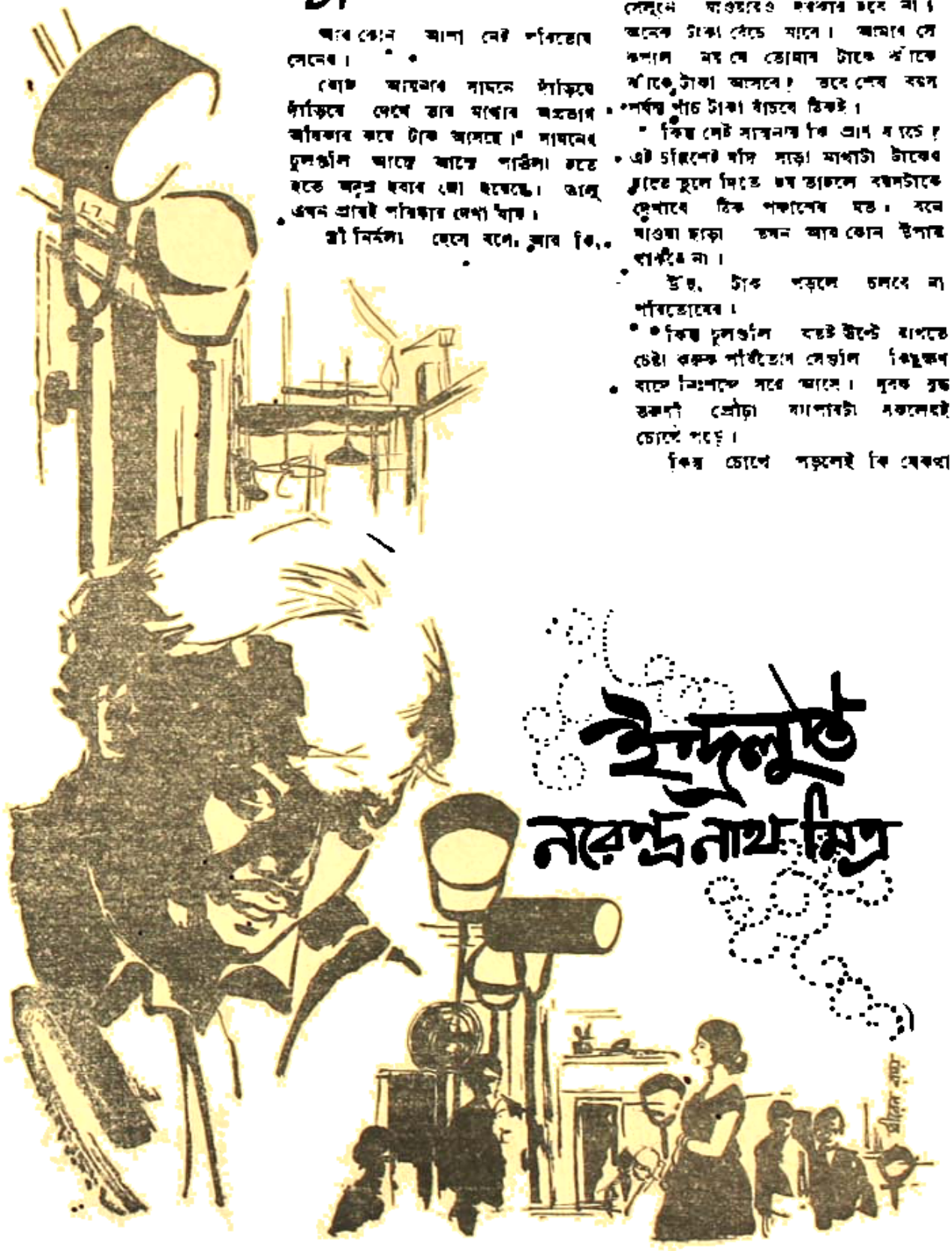

ইন্দ্রলুপ্ত

নরেন্দ্র নাথ মিত্র

টাকটা নির্ঘাৎ পড়বে।

আর কোন আশা নেই পরিতোষের মনের।

মোড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার মাথার অগ্রভাগ ক্রমশঃ ক্ষয়ে টাকে আসছে। সামনের চুলগুলি আস্তে আস্তে পাতলা হতে হতে অদৃশ্য হবার জো হয়েছে। তালু এখন প্রায়ই পরিষ্কার দেখা যায়।

স্ত্রী নির্মলা হেসে বলে, আর কি, তোমার চিরুনীরও দরকার হবে না, সেলুনে যাওয়ারও দরকার হবে না। অনেক টাকা বেঁচে যাবে। আমার সে কপাল নয় যে তোমার টাকে খাঁকে খাঁকে টাকা আসবে। তবে শেষ বয়স পর্যন্ত পাঁচ টাকা বাঁচবে ঠিকই।

কিন্তু সেই সান্ত্বনায় কি প্রাণ ধরে? এই চল্লিশেই যদি সাড়ে মাথাটা টাকের ছাতে ছেয়ে দিতে হয় তাহলে বয়সটাকে দেখাবে ঠিক পঞ্চাশের মত। মনে যাওয়া ছাড়া তখন আর কোন উপায় থাকবে না।

উঁহু, টাক পড়লে চলবে না পরিতোষের।

কিন্তু চুলগুলি বড়ই উল্টে যাবতে চেষ্টা করুক পরিতোষ সেগুলি কিছুক্ষণ বাদে নিঃশব্দে সরে আসে। নবীন যুবক তরুণী প্রৌঢ়া যাপারটা সকলেরই চোখে পড়ে।

কিন্তু চোখে পড়লেই কি সেবারা

বলতে হয়? এ যুগের মানুষের চক্ষুলজ্জা নেই, ভিতের দংকোচও নেই। কথাটা সবাই বলে। বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। পাড়ার তরুণী মেয়েরা কিছু না বললেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। পাবিত্র বেশ বুঝতে পারে তারা মুখ ফিরিয়ে হাসে। আর ভিতরে ভিতরে বুকটা দুমড়ে যায় পাবিত্রোষের।

আট বছরের ভাইপো নন্টু বলে, 'জেঠামশাই, তোমার টাকটা আরও বেড়েছে।'

বোন জেদে উঠে মোটাগলাটার মত এই কথাটি মনু শোনায়নে শোনাবে।

বাড়ী যেন তার জোয়ানমুদ্দ মাথায় টাক দেখে ভিতরে ভিতরে মনে মনে মেপে মেপে দেখে।

নতুন কথা শুনে বাড়ীর সবাই মুখ টিপে হাসে। কিন্তু পাবিত্রোষ মন খুলে হাসতে পারে না। মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে যায়। ভাইপোর কথাকে অন্তঃ বালভাবিতঃ বলে মনে হয় না মোটেই। এমন কি কোন কোন দিন ইচ্ছা করে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলে, 'ও কথা তোকে বলতে বলেছে কেরে?'

কিন্তু পাবিত্রোষ নিজের বোকে ও কথা ওকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ও যা দেখে তাই বলে। আগতের বিপোর্টারেরা যেমন যা দেখে তাই লেখে।

পাবিত্রোষের বুড়ো মাও বলেন, 'তাই তো বাপু, এ ব্যাধি তুই কোত্থেকে আনলি তুইই জানিস। টাক তো আমাদের বংশে ছিল না। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ওর কত ঘন চুল ছিল। শ্বশুরকে দেখেছি, দাদা-শ্বশুরকে দেখেছি, সবারই বুড়ো বয়স অবধি ঝাঁকড়া মাথায় চুল ছিল মাথায়। তোর যে অকালে কেন এমন করে চুলগুলি যেন কিছু বুঝতে পারিনে বাপু।'

পাবিত্রোষ মৃদুস্বরে বলে, 'তাহলে আমার আমল থেকেই বংশের একটা ধারা শুরু হল।'

মা বলেন, 'আলাই, কি যে মাথামুণ্ডু বলিস আর কিছু ঠিক নেই। টাক পড়লে কি মানুষ মরে যায়?'

নির্মলা আড়ালে এসে বলে, 'মরে যায় না তবে টনক নড়ে। বোকা হাবা বনল বেড়েছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে 'হায়ে নির্মলা, জল পড়ে, পাতা নড়ে, টাক পড়ে টনক নড়ে।' নির্মলা কেমন হসি মসকরা।'

পাবিত্রোষ বলে, 'চমৎকার, এর পরের লিমটা কি জানো? স্ত্রীর পিছে কিল পড়ে, দাম্পত্যে কিল নড়ে।'

কথাটা ঠিক মাইকের মত শোনায় না, একটু যেন ঝাঁজ ছুটে ওঠে।

এবার নির্মলা গম্ভীর হয়। স্বামীর টাকের জন্যে ভিতরে ভিতরে তার দুঃখও কম হয় নি। টাক সে দু'চোখেও দেখতে পারে না, অথচ এখন থেকে নিজে সতর্ক দেখতে হবে, এখন থেকে সেই ব্যবস্থাই করেছে। কিন্তু উপায় যখন নেই, নিরুপায়ের হাহাকার তুলেই বা কি হবে। তার চেয়ে ব্যাপারটাকে হাসি তামাসায় চলে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু পাবিত্রোষ তার টাক নিয়ে তামাসা সহ্য করতে পারে না। এ প্রসঙ্গ উঠলেই চটে যায়।

পাবিত্রোষের ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে। তারাও বাবার চটা মেজাজের জন্যে আড়ালে আবডালে যাকে যাকে হাসে। আবার কখনও বা বিরক্তও হয় এ টাক তো সহজে আজকাল আকছারই পড়ে, কিন্তু বাবার মত মাথামিয়া কারো হয় না।'

মাথামিয়াই বটে। যখন চুল ছিল, পাবিত্রোষ তখনও দিনে একবার মাথা আঁচড়াত কি আঁচড়াত না। কিন্তু এখন দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার আঁচড়ায়। এ হল বাড়ীর হিসাব। পথে ট্রামে বাসে ট্রেনে ভিতরে ভিতরে কতবার যে আঁচড়ায় তা আর কে দেখতে যায়। ছোট একখানা চিরুনী সবসময় পকেটে রাখে পাবিত্রোষ। যখন সময় পায় তখনই পাতলা চুল ক'গাছিকে সিঁথিমের দিকে টেনে টেনে রাখে। কিন্তু তারা তা থাকবে কেন? আজ কাল এই অগ্রগতির যুগে পিছনে পড়ে থাকতে চায় কে?

চিরুনী ছাড়াও পাড়ার ডাক্তার বন্ধুর পরামর্শ নেয় পাবিত্রোষ। তিনি বিশেষ কোন ভরসা দিতে পারেন তা নয়। তিনি বলেন, 'আরে মশাই টাকের যদি কোন অষুধই থাকবে তা হলে আমেরিকার ওষুধ প্রোসেসেন্ট আইসেনহাওয়ার থেকে রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ কারোরই ও বস্তু থাকত না। তাঁরা কি গোপনে গোপনে দু'চার ডিসপেনসারি ওষুধ সেবন করেননি ভেবেছেন? টাক একবার পড়তে শুরু করলে চুলে তা আর ঢাকা যায় না। আসলে টাক একমাত্র টাকায় চাকে আর চাকে মশের মুছুটে।

কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে ও দুই বস্তুই দুর্লভ। যাকি থাকে সোনার ছাট আর গান্ধী টুপি। কিন্তু সেগুলি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে পাবিত্রোষ তাতে তাকে আরও বিশ্রী দেখায়। স্ত্রীও মুখ নাড়া দিয়ে বলে, 'ও আবার কি ঢং!'

টাকের জন্য অতটা চিন্তাগ্রস্ত হ'ত না পাবিত্রোষ যদি সে ডাক্তার উকিল প্রফেসর কি লেখকশ্রেণীর কিছু একটা হত। মাথার মাথায় ভিতরের কাজটাই লোকে দেখে বাইরের দিকে বড় একটা তাকায় না। কিন্তু পাবিত্রোষের মা হাঁড়ি তাকে দেহটাকে অত তুচ্ছ করা চলে না। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুশ্রীতা বজায় রাখতে হয়। পাবিত্রোষ অভিনেতা। চিত্রে নয়ে দু'আনাখানেই সে অবতরণ করে। নায়কের পার্ট সে এ পর্যন্ত পায়নি বটে কিন্তু তাই বলে এই বয়সে জোটা-বুড়ো, পিসেমশাই কি চরিত্র থাকবে পাটও তাকে করতে হয়। চেহারাটা

জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান

৬৪, মহাত্মা রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন—৪৬-১৬৬১

প্রত্যেক গ্রহের কবচ এবং তন্ত্রসাধনসিদ্ধ ফলাফল প্রাপ্তির একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান। ইহা ভিন্ন পরামর্শ অনুযায়ী কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত, প্রশ্নগণনা এবং যথাযথ কবচ প্রস্তুত ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করা হইয়া থাকে।

আয়ুবৃদ্ধিকর কবচ—৭১৲ ও ২৫৲। সমরুদ্ধা কবচ—১৫৲ ও ১০৲
ধনবিত্ত কবচ—১১০৲ অর্থ আনুলাভে নবগ্রহ কবচ—১৫৲ ও ১০৲
ঐ —৪১৲ রৌপ্য আনুলাভে সর্বেশ্বরী কবচ—১০৲

পরিচালক : পণ্ডিত বিমলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী

মোটামুটি দর্শনীয় বলে সে নায়িকার উপপতি কি ইক্ষুপ্রোলেতের বেলটাই পায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকেই হারতে হয়। নায়কের হাতে লাঞ্ছনা সৈরাচারিক কি ঐতিহাসিক নাটক ছুঁয়ে ছুঁয়ে কি নায়িকার প্রত্যাখ্যান তাকে সহ্য করতে হয়। নাটকার আর ডিরেক্টার যদি উদার হলয় হন কখনো কখনো তার ভাগ্যে একটি কনসোলেশন প্রাইজ জুটে যায়। নায়িকার বোন কি বান্ধবীর সঙ্গে তারও মিলনের আভাস থাকে।

তাই ভেলারা নিয়ে—নিজের এই টাক নিয়ে চিন্তা করেছে পরিত্রোবের। অবশ্য টাকে কিছুই আটকায় না। মেক আপ করে মিয়ে এই টাকের ওপরই সে বেশ বাবরি চুল পড়তে পারে। তখন তাঁর কেশ কলাপ দেখে দর্শক আর প্রিয় ভূমিকারা সবাই মুগ্ধ—কিন্তু মেকআপ করবে আগে আগে ডিরেক্টরের ঘর। দর্শকদের আগে আগে তাঁর পারিত্র চোখ। পরিত্রোবকে তার পছন্দসই রোল দেওয়ার আগে তিনি সেই চোখ একবার বুলিয়ে নেন। দৃষ্টিটা টাকেই আটকা পড়ে যায়। মাথার নীচে যে তার প্রশস্ত কপাল আছে চোখ, আর উন্নত নাসিকা রয়েছে তরুণ ডিরেক্টর তা যেন দেখেও দেখতে চান না। তিনি হেসে বলেন, 'ওই রোলে কি আপনাকে মানাবে? রোলটার পক্ষে আপনাকে যেন একটু বেশি এলডারলি দেখায়।'

যে টাককে ঢাকবার জন্যে পরিত্রোব সদাই ব্যস্ত তাকে ডিরেক্টরের সামনে সবলের আগে সে নিজেই উদ্ঘাটিত করে। হেসে বলে—'সে ভার আমার এই টাকের ওপর। ওটা আমি মেকআপে ঢেকে নেব।'

কোন ডিরেক্টর কনটিনুয়েন্স হন, কেউ বা হন না। আর তার ফলে মনঃপূত পার্টটি চান্সটা হয় পরিত্রোবকে। আজো আশা করেছে।

আজকাল হাওয়াটাই তথা। তরুণী অভিনেত্রীরা আসে যেন যত বাসন্তী রঙের। আসে এসে কলকল, হাসেন, গল্প করেন। মানা ছলে সর্বাঙ্গীন যে না হয়ন তা নয়। পরিত্রোবও কথায় কথায় তাদের কাঁধে হাতের চাপায় কলিগুলি নিয়ে খেলা করেছে কি বাসন্তী অকাল ফুলে যেওয়ার আগে মুঠির মধ্যে খানিক-ক্ষণ ছেপে রেখেছে। অবশ্য এইটুকুই, তার একবারেই করে। 'কিন্তু সাবি সর্ব আগে দু'চার ভলের না করলে এই ফ্লিচিওর জগতে প্রাণ বাঁচে কি করে? বোধহয় মানুষ বাঁচে না। এখানে বিয়ে ব্যাপারটা এ ব্যাপারটা ও লাইসেন্সটুকু নিয়েও হয়, দিয়েও হয়।

কিন্তু তরুণীরা উদাসিনী হতে শুরু করেছে। আজকাল প্রৌঢ়া গৃহিণী সন্ধ্যা পরিত্রোবের মা একটু খোঁজ খবর নিতে আসেন। কিন্তু যখন এসে তার অভিনয় মনোযোগ হয়—তারা আর আসতে চায় কৈ। আসতে যদি সে নাবাবর অভিনেত্রী না হয়ে স্বয়ং ডিরেক্টর হত কি অন্তত সহকারিণী অভিনেত্রী হত। কি প্রডিউসার ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে পারত। পরিত্রোব জানে তার টাকেই সব আটকায়। তার মনের মুকুটও নেই, অর্থের পাদপীঠও নেই। তার টাক আর চাকে না।

কর্ণফুল বাসির ছেলে, সুবাসিত তিল আর নাবকেলের ছেলে, গর্ভবিহীন আবর্জনা খুঁটি ছেলে কত যে মেখে ফেলল পরিত্রোব, কিছুতেই কিছু হল না। বিনা ছেলে থেকে ফেলল তারে মাথা ধরল। মাইল দাঁত দুখ ছেলে। ছেলে না মাখলে মাথার খুলি ফুটা পড়ে যেত কি আজো। টেকো বলেছে ছেলে সে বাকি জীবন না হয় ফটাদের হয়েই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় ফটা? ফটা শুধু জীবনে আছে, মাথায় নেই। বিনা ছেলেও চুল ওঠা বন্ধ হল না পরিত্রোবের।

সেদিন ইন্ডিওতে বিহারেল ছিল। কিন্তু ডিরেক্টর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সব পণ্ড হল। অবশ্য অভিনেত্রী অভিনেত্রীরা যে যার কাছে কি আজ্ঞায় চলে গেল। পরিত্রোবেরই চোখের সামনে দিয়ে সব জোড়ায় জোড়ায় বেরোলেন। বিরোড় পরিত্রোব ডিরেক্টরদের পানের প্রশস্ত বরখানায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ড্রাইভারকে ডেকে বলল চা আনতে।

সাত পাঁচ ভাবছে। অভিনেত্রী যশোমতী এসে ঢুকল। অল্পবয়েসে পাশে এসে বসল। হেসে বলল,—'একা একা কি করছেন পরিত্রোববাবু'।

পরিত্রোব বলল—'ঘরের বাইরে রোজা থাকবার দিন তো ফুরিয়ে এল, এখানে আছি। আপনি যে এখানে? দু'মাসের জোরে আর দুটি আছে না আপনার?'

যশোমতী বলল,—'আছে, কিন্তু আমার নামটা চার্টের আগে হবে না। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে এলাম।'

পরিত্রোব বলল—'বলুন। চা আনাই।'

যশোমতী হেসে বলল,—'চা আপনাকে চায়, আমায়।'

হাসলে যশোমতীকে বেশ সুন্দর দেখায়।

সুগঠিত ঝকঝকে দাঁত। মুখখানি ভরাট। ঠোঁটের লাল, রক্ত যে পানের চিবায় তত নয়। বং শ্যামলা। এই পঁচিশে চব্বিশ বছর বয়সে বেশ একটু পুষ্টিকর হয়েছে অবশ্য। কিন্তু তাতে শরীরের গড়ন একেবারে নষ্ট হয়নি। লাভাবের নয়, কো-আকটরের নয়, ডিরেক্টরের চোখেই পরিত্রোব একটু দেখে নিল এই বিরহদহনা অভিনেত্রীকে। যদিও জানে ঐ চোখটুকুই শুধু চিরকালের এই মাঝির সন্ধানির সবটি সে কোনদিনই পাবে না।

মেকআপটা মোটামুটি ভালো। তবু লম্বের যশোমতী অভিনয় জীবনে বিশেষ উন্নতি করতে পারেননি। পরিত্রোবের মতই বিরাট নায়ক নীচের ধাপে রয়ে গেছে। একবার বুঝি ডিরেক্টরের চোখে চান্স পেয়েছিল, তারপর ধাক্কায় ধাক্কায় আবার নীচে পড়েছে। এখন মাসী আর পাশের ঝুমিকায় বয়স এল। দু'জনের একই দশা।

চা খেতে খেতে পরিত্রোব বলল, 'তা, কি বলবেন বলছিলেন।'

মনে মনে জানল যদিও যশোমতীর বয়স হয়েছে, যদিও যশোমতীর খ্যাতি নেই তার সঙ্গে খানিকটা কোন যৌবন সুষমার আশা নেই, তবু এই নির্জন নিঃসঙ্গ ক্লান্তিকর দুপুরে যশোমতী যদি একটু ফাইনাই করতে চায় পরিত্রোব আপত্তি করবে না, বরং সে তাতে সায় দেবে, সে ওকে এড়াই দেবে। তাতে দুজনে ওজনে আরেক এই খরদুপুরটা হয়তো ভালোই কাটবে।

কিন্তু যশোমতী মোটেই সেদিক দিয়েই গেল না। আর একটু কাছে এঁষিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনি তো টাকের জন্যে মানা রকম ক্রেম আর বহুত টনিক ব্যবহার করে দেখেছেন—।'

আহত টাক। যশোমতীর মুখেও টাক।

পরিতোষ আঙুল দিয়ে চুল ক'গাছিকে স্পর্শের নিচে কেন ঢাকতে রাখবার বৃথা চেষ্টা করে অন্যদিকে বলল, 'তা' করেছি। তাই কি?'

যশোমতী লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল 'কিছু বলে গেলেন?'

নিজের হার আর কে স্বীকার করে?

পরিতোষ বলল, 'কিছু কিছু গেলেই কি! তাই কি?'

যশোমতী বলল, 'আমি বড় বিপদে পড়েছি।'

পরিতোষ মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে দেখল যশোমতীর মাথায় এখনো বিপুল চুল। এখনো ওকে অবলাকুন্তলা বলা যায়। আর যাই হোক বিপদ ওর কুন্তলদের নয়। তবু এখনো ওর চুলের মুঠি ধরে নি।

পরিতোষ বলল, 'হয়েছে আপনার?'

যশোমতী বলল, 'আর বলবেন না, আমার বড় মেয়েটির মাথার চুল সব উঠে যাচ্ছে। টাকই পড়বে বোধ হয়।'

পরিতোষ বলল, 'সে কি, কত বয়স সে আপনার মেয়ের।'

যশোমতী বলল, 'এই তো মাসের উপরে সবে আষাঢ়ে উনিশে পড়েছে। তারপর থেকেই পাশ করেছে। দেখতে-টেখতে ভালোই। চালাক চতুরও বেশ। মাইনে মেয়ে পর্যন্ত শিখিয়েছিলাম। কিন্তু কিসে যেন ধরেছে চুলের। মাথার সামনের সিঁথের চুল সব উঠে শেষ হয়ে গেল। এরপরে পরে পাড়ি না। যে দেখে সে আর ঠাওর না।'

পরিতোষ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, কেন এমন হল বলুন তো?'

যশোমতী বলল, 'কি করে বলব বলুন। কত ডাক্তার কবরেজ করলুম। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না! মেয়ে তো কেঁদে কেটে আকুল। লজ্জায় কোথাও বেরোবে না, কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করবে না। আজ্ঞা বিপদ হয়েছে। আমি রাতদিন ভগবানকে ডাকছি ভগবান আমার মাথার চুলের দরকার যেটুকু আমার সব চুল দিয়ে, ওই মেয়েটিকে দাও। ও ভালো হোক—তা আপনি কোন ওষুধে উপকার পেয়েছিলেন বলুন তো?'

পরিতোষ আস্তে আস্তে একটু ভেবে বলল যে, সে কোন তেল কি ওষুধেই উপকার পায় নি। কিন্তু পরিতোষ না পেলে কি হবে যশোমতীর মেয়ে সুরবালা নিশ্চয়ই পাবে। আর অল্পবয়সে টাক পড়ে না। এ নিশ্চয়ই সাময়িক কোন ব্যাধি। চিকিৎসা করলে সেরে যাবে।

পরিতোষ যশোমতীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'সারবে, সারবে, নিশ্চয়ই সারবে। আচ্ছা এই ভরে বেড়াবার বিয়ে হচ্ছে না। অত সুন্দরী শিক্ষিতা গুণবতী মেয়ে—।'

গভীর দরদ আর সহানুভূতি নিয়ে যশোমতীর সঙ্গে তার মেয়ের চুল ওঠা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল পরিতোষ। টাক কথাটা মুখে আর অপরা বলে সেই শব্দটা উচ্চারণ পর্যন্ত করল না। দু একটা তেলের নাম করল ওষুধের নাম করল, দু'একজন ভালো ডাক্তার দেখবার পরামর্শ দিল।

দস্যু, দুর্বৃত্ত সৌন্দর্য-হন্তা টাকের হাত থেকে পরিতোষেরই মেয়ের বয়সী একটি সুন্দরী তরুণীকে কী করে রক্ষা করা যায় তার উপায় বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরিতোষ।

নিজের কথা তার আর মনেই রইল না।

এতক্ষণে তার টাক চাকা পড়ল।

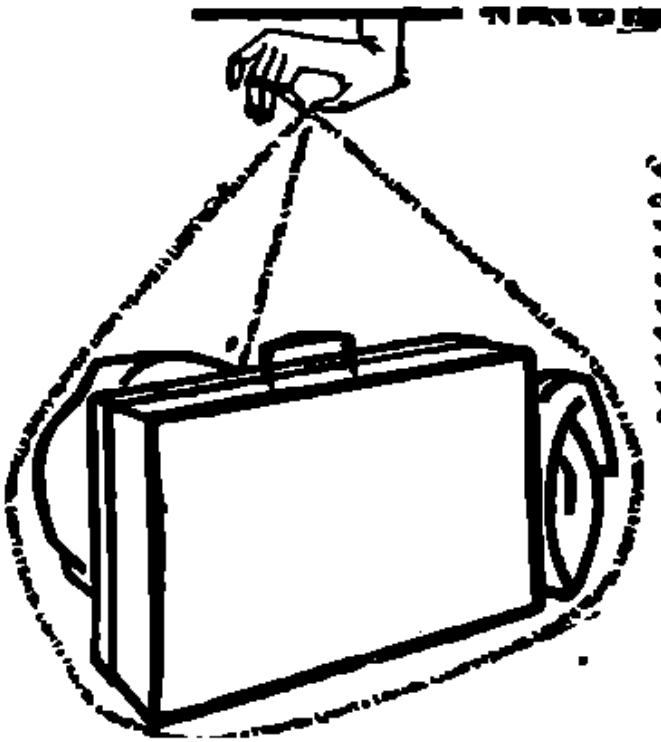

যে কোন ধরনের ব্যাগ
আমাদের এখানে পাবেন
আমাদের এখানে সব রকম ব্যাগ পাবেন
ব্যাগ
ব্যাগ
ব্যাগ

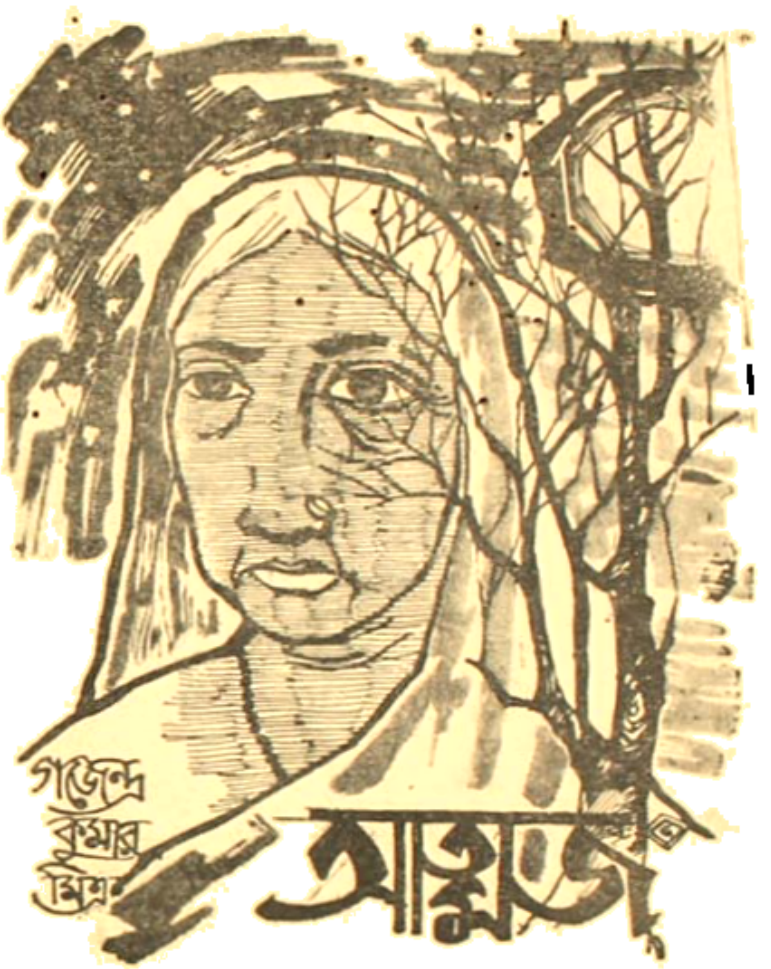

অনেকদিন পরে দেখে ফিরেছি, স্টেশনের বাইরের সেই বর্ষার-ওপর লাল-পাতা, তাদের ঝাঁসগুলো থেকে ঝুলে ঝুলে পাকা আমগুলি পর্যন্ত তাল লাগছে। শুধু চোখটা খুঁজে বেড়াচ্ছে বিচিত্র মানুষের মুখও। কিন্তু বহুদিন আগে সন্ধ্যাবেলার কল্যাণে স্টেশন থেকে বেরিয়ে চারু ডাক্তারের ডিসপেনসারী পর্যন্ত চওড়া রাস্তাটা বরাবর-জোড়ে দেখে গেলেও, আমাকে কেউ চিনে বা আমি যাদের চিনি—এমন একজনকেও দেখতে পেলুম না।

একেবারে দেখা মিলল ডিসপেনসারী বাড়িয়ে এসে লাইব্রেরীর ধারে পড়তে, সেখি মুরারি হাতে কী একটা ঝোঁ গলের বাক্স নিয়ে হন্‌হন্ ক'রে চলেছে।

প্রাণপণে চিৎকার ক'রে ডাকলুম। মনে খুশী হলুম যে আমাকে দেখে ওও খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একবারও সেই কাছে এল—কিন্তু আমার কোন কুশল জিজ্ঞাসা করল না বা নিজের খবরও দিল না, ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কবে ফিরে?.....যাক্—পরে দেখা হবে, আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি—এইটে হয়ে গেলে তবে ইঞ্জেকশন হবে—'

সে গতি থামার কি একবারও, শুধু মিনে এগোতে লাগল, এখন আমার মনের মতোই হন্‌হন্ ক'রে চলতে শুরু করল।

ব্যাপার যে গুরুতর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং আমি ওকে যাবার চেষ্টা করলুম না, নিজের বাড়ির রাস্তা ধরে তার সঙ্গেই চলতে লাগলুম।

'হাসপাতাল কেন রে?' তবে তবেই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কার অসুখ?'

'ও, তুই জানিস না বুঝি? কী ক'রেই বা জানবি, তুই তো দেশে এলি এতদিন পরে—বিমলদা যে আমাদের—বিমল মুখুয্যে—মনে নেই তোর?—বিমলদার খুব অসুখ!'

'বিমলদা! মানে দাঁকণ পাকার বিমলদা। সেকি! কী হয়েছে তাঁর।'

'হয়েছে অনেক রকম। হেপাটাইটিস—তা থেকে কিডনি কেল করেছে—ডায়াবেটিস তো ছিলই। নানানখানা

তা এখানে কেন? এখানের হাসপাতালে এসব রোগের চিকিৎসা হবে?

'যা হয় তাই হবে। উপায় কি বলো? কে অত টাকা ক'রে কলকাতায় নিয়ে যায়, তাছাড়া কলকাতার হাসপাতালে ঢোকানো তো আর আজকাল চাট্টিখানি কথা নয়—বিস্তর তাঁবেদার ধরতে হয়।'

'তা বলে এই হাসপাতালে! নিদেন কলকাতা থেকে একটা বড় ডাক্তার এনে—'

মুরারি বেশ কমাল না—তবে এবার আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'খরচা কে দেবে? এদের পাটি থেকে তো যা দেয় তাতে দুনম্বরীই জোটে না। এই যা চিকিৎসা—তাও সবই তো চলছে চ্যারিটিতে। পাঁচজনের দয়ায়—পাঁচজনের চাঁদায়। এই তো বলতে গেলে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে ক'রে টাকা তুলে এই ইঞ্জেকশন নিয়ে

'সে কী? কী বলছিস যে তুই? বিমলদা—? মানে আমাদের কংগ্রেস ন্যাঠাইবাবু ছেলে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ।' সেই বিমল রা।'

হাঁউমাউ হাসপাতালে এসে গিয়েছিলুম। মুরারি আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে গেল, আমি আর ওখনই ঢুকলুম না। সংবাদটার ধাক্কা সামলাতে বেশ একটু সময় লাগল।

অনেকদিন ঘুরছাড়া সত্যি কথা—তাই বলে দেশের যারা পুরনো বাসিন্দা, আমার যাদের দেখে আসছি, তাদের তাউকেই ভুলে যাই নি। বিমলদাকে যা চাট্টিখানি গিন্নিকে লোকে টাকার কুমীর বলত। জমি-জমা টাকা-কড়ি সবই অবশ্য ন্যাঠাইবাবু—বিমলদার নিজস্ব নয়। কথাটা শোনায় অদ্ভুত—কিন্তু সত্য। ওঁর বাবা যেসব বিঘে দিয়েছিলেন দয়ালাল ন্যাবিদ পাত্রে। তাঁরও অবশ্য অধুনা ঐরকমই, কী সব

ছিল চলত এই মাত্র। পরে অবশ্য কিনিয়ে ফেলেন অনেকেরই, প্রচুর টাকা রোজগার করেন এবং মৃত্যুর সময়ই নগদ একলাখ টাকা দিয়ে যান তাঁর আদরিণী বড় মেয়েটিকে।

চাটুয্যে জ্যাঠাইমা তখন বিধবা, বিধবার হাতে টাকা এসে পড়লে টিকটিকি মাকড়সা পর্যন্ত তা খাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু উনি একটি পয়সাও বাজে খরচ হতে দেন নি। প্রথম বৈধব্যের বুদ্ধিমত্তা পরিচয় দিয়েছিলেন যখন। ভাল ভাল জমি বাগান কিনেছেন, বন্ধকী কারবার করেছেন কিছু কিছু জমি বেনা-বেচাও করেছেন। যা করেছেন তাতেই লাভ হয়েছে। ফলে সে একলাখ টাকা দু'লাখ আড়াই লাখে পরিণত হতে দেরি হয়নি। বেশ শক্ত মেয়েমানুষ ছিলেন জ্যাঠাইমা, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিসেই সব টাকা রাখতেন। দরকার মতো তাঁরাই দিতেন বা জমা দিতেন নিজেই, হিসেব-নিকেশও বেশ বুঝতেন।

কিন্তু তাই বলে কৃপণ ছিলেন না একেবারেই। বহু লোককে সাহায্য করেছেন, বহু লোককে গোপনে মাসোহারা পাঠিয়েছেন। আর সবচেয়ে মুক্ত হস্ত ছিলেন তিনি একটি ব্যাপারে—স্বদেশী আন্দোলনে। তবে স্বদেশী বলতে সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষপাতী করতেন না জ্যাঠা, তাঁর অচলা ভক্তি ছিল গান্ধীজীর ওপর—সেই কারণেই কংগ্রেসীদের ওপরও। তাঁরই আনুকূল্যে এখানে কংগ্রেসের অফিস হয়েছে সেই ত্রিশ সাল থেকে, যতবার এই আন্দোলনে টাকা ঘুষিয়েছেন তিনি। বরাবরই অহিংসবাদী, চিরকাল, অন্তত আমি যতদিন পর্যন্ত দেখেছি—চরকা কেটেছেন, খদ্দর পরেছেন। কিন্তু 'ইন্ডিয়ান' বিপ্লবিদের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় কিছু কিছু সন্ত্রাস-বাদীদেরও সাহায্য করেছেন—এ আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছি। এই জন্যেই এক সময় যখন চাটুয্যে গিন্নী বা চাটুয্যে-জ্যাঠাইমা গোপনে সকলের আড়ালে 'কংগ্রেসজ্যাঠাইমা' নামে অভিহিত হতে শুরু করেছিলেন তা কেউই জানতে পারেনি। সকলে যখন অবহিত হল এ বিষয়ে—তখন নামটা বেশ চালুও হয়ে গেছে। জ্যাঠাইমা নিজেও তা শুনেছিলেন, জানতেন কিন্তু রাগ করেন নি, বরং যেন একটু গর্বই অনুভব করতেন। বলতেন এক এক সময়, 'তোরা আমাকে তার চেয়ে কংগ্রেসের মা বলে ডাকিস। বিপ্লবের মা শোনায় চাইতে ঐ ডাক আমার মিষ্টি লাগবে।'

এ হেন জ্যাঠাইমার একমাত্র ছেলের পয়সা অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না—এ কথা কি বিশ্বাস যোগ্য? না, উনিশশো জ্যাঠাইমাই কোন স্কুলেকলেজে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে গেছেন। বিমলদা যে এক ছেলে, ওঁকে কোলে নিয়েই তো বিধবা হয়েছিলেন। সেই ছেলের চিকিৎসা হবে না, ওঁর হাতে টাকা থাকতেও—কেমন ক'রে বিশ্বাস করা যায় এ কথা!

কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল একটু পরেই অবশ্য, দুর্গাপুর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যখন আমার বাড়ির পথ ধরল। সে-ই খুলে বলল কথাটা।

বিমলদা চিরদিনই মা'র আদর্শে—বিদ্রোহী ছিলেন, প্রায় অল্প বয়সে জেল খেটেছেন মার খেয়েছেন—তিন সালের আইন অমান্য আন্দোলনে। দলের লোকদের পিকেটিং করতে গিয়ে, মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন—পুলিশ ওর বয়স দেখে হাসপাতালে সাময়িক দিয়ে যায়, থানা পর্যন্ত নিয়ে যায় নি। ভারত ছাড় আন্দোলনেও গ্রেপ্তার হয়ে তিনবছর জেলে বন্ধ ছিলেন। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল বিয়ে করার পর। জামাইষষ্ঠীর বিয়ে—মস্ত লোক বলে ওদের পার্টি থেকে মেয়েটিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—বুঝলি কেনা বলে, 'ওটাকে বলে push and pull. আরে ঠেলে ঢোক, বেশ মাথামাখি হয়ে যখন জড়িয়ে যায়, মানে বঁড়শি গভীরে গেঁথে যায়, তখন টেনে তোলো—সেই প্রোসেস আর কি।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'তাতে লাভ? বিমলদা এখন কি ভাল পাত্র? ডলারে টলারে তো বিশেষ পড়ে নি।' 'যাঃ, ভাল পাত্র নয়? একমাত্র উত্তরাধিকার টু দি মিলিয়নস্!'

'সে তো ঘোর ক্যাপিটালিস্টএর ব্যাপার, অমি-জমা তেজারতি। সে টাকায় তো ওদের ঘৃণা করা উচিত!'

'উঁহু, ঘৃণা করে ওরা ক্যাপিটালিস্টকে তাই বলে ক্যাপিটালকে ঘৃণা করবে কেন? বিশেষ ক'রে যদি সে ক্যাপিটালকে সৎ-কাজে বা ওদের পার্টির কাজে লাগানো যায়। তাছাড়া—ওদের দলের দিকে তাকিয়ে দেখিস না, সব বড় বড় চাই, সব জমিদারের ছেলে!'

'তারপর—ওদের কী হ'ল তাই বল।' প্রশ্ন করি।

'হ'ল আর কী। ওর পাগলামি যে ঐ দলের চাই—জ্যাঠাইমা জানতেন না অত। তাহলে বিয়ের সময়ই রোক দাঁড়াতেন। জানলেন যখন তখন ছেলেটি পুরোপুরি ওদলে চলে গিয়েছে—কোমর বেঁধে কাজে লেগে গিয়েছে পার্টির। কিন্তু জ্যাঠাইমাও এমন মানুষ নন, যে এক ছেলের মায়ায় নিজের এতদিনের আদর্শকে বিসর্জন দেবেন। তিনি বিমলদাকে আল্টিমেটাম দিলেন যে হয় ঐ দল ছাড়ো, নয় তো বাড়ি ছাড়ো। বিমলদা এতদিনের এত পরিচয় সত্ত্বেও মাকে চিনতে পারেন নি। তিনি ভাবলেন যে ঘটাই হোক মায়ের প্রাণ, এক ছেলে তার ওপর—তাঁকে আর ছেড়ে

বেবী অয়েল লিমিটেড

জবার টিন্চার
মনটুর জর্দা
হিন্দুস্থান মার্ট নং ২, কলিকাতা-২৯.

থাকবে! কিন্তু ওরাই ফল বুঝিয়েছিল—মানে ওর শ্বশুরবাড়ি। তিনি যেখানে সেখানে চৌধুরীদের একখানা ঘর ভাড়া ক'রে এসে উঠলেন। ব্যস, সম্পর্ক টুটবিনেই টুটল যেন ভিক্টোরিয়ার মতো। আজ আর দি একটা পয়সা আসছে ওর কাছ থেকে। শাশুড়ী পর্যন্ত লিখেছিল মার মানে কেস করো—কিন্তু উকীলরা সবাই মারণ করলে, একমাত্র রহস্যনটা ছাড়া আর কিছুর বিরুদ্ধের পৈতৃক নয়—জ্যাঠাইমারই পৈতৃক। মকদ্দমা করলে বড় জোর সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে পারবেন—কিন্তু বাড়ি ফিরবে সেই ভরবে না, নিরিবিলি কেলেঙ্কারীর শেষ! তা অবশ্য মামলা করতেও চ'ল না। জ্যাঠাইমা নিজেই মল্লিকদের বাড়ি কিনে নিয়ে উঠে চলে গেলেন, চাকরকে দিয়ে নিজেদের বাড়ির চাবিটা পাঠিয়ে দিলেন ছেলের কাছে।'

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে বোধহয় দম নেবার জন্যই থামল মুরারি। কিন্তু আমার তখন কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠেছে, আমি বেশীক্ষণ থামতে দিলাম না।

অবশ্য বেশী-কিছু আর বলবার ছিলও না।

বাড়িতে ফিরে যায় নি বিমলা আর। কিছু কিছু টাকা আসবাব কিনে বিক্রী ক'রে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছেন। উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে আজকাল এসব অঞ্চলেও বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে লোকে, ট্রেনে দেড়ঘণ্টা দুঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পৌঁছানো যায় বলে তখন নেবে না-ই বা কেন। কিন্তু পুরনো বাড়ি লেকেন্ডে ধরনের, ভাড়া খুব বেশী পান নি উনি, চল্লিশটি টাকা মাত্র। এছাড়া পাটি থেকেও কিছু দেয়—কিন্তু সব জড়িয়ে একশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ। তাতে দুটো লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ হওয়া খুবই শক্ত আজকালকার দিনে। তার ওপর আবার সম্প্রতি বছর দুই আগে একটি বাচ্চাও হয়েছিল। তবে সে বাঁচে নি বেশীদিন—ব্রেফ অপুষ্টিতেই মারা গেল—ব্যস তিনেকের মধ্যে।'

'তা ভালই হোক নিজের মাতৃ তো, তাও জ্যাঠাইমা তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না?'

'ঠিক তাই। আমরা সবাই মিলে বলেছিলাম—আমাদেরও আমরণ সঙ্গে মতের সঙ্গে মেলে না—তবু গ্রামেই ছেলে তো, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, দাদা বলি—এ গ্রামে যত ঘর ব্রাহ্মণ আছে সকলকার সঙ্গেই কোন-না-কোন সূত্রে আত্মীয়তা বেরোবে—চুল ক'রে থাকিই না কী ক'রে! আমরা বলেছিলাম, ও মা করবে করেছে—ওর বৌ ছেলের মুখ চেয়ে কিছু একটা করুন ব্যবস্থা বলে কি জানিস? বলে, ছেলে যদি মরে তাহলে বৌ আর নাতিকে দেখব বৈকি, নিশ্চয়ই দেখব কিন্তু ও বেঁচে থাকতে এক আধলাও দেব না। তাতে প্রকারান্তরে ওদেরই সাহায্য করা হবে।...তবু আমরা বোঝাতে চেষ্টা করলুম, বলুন, আপনি মারা গেলে ওরাই তো সব, তখন আর ঠেকাবেন কী করে? তা বলে- কে বললে ওরাই সব! সে তো আমি সেই দিনই উইল করে রেজেস্ট্রী ক'রে আমার অ্যাটর্নীর আপিসে রেখে দিয়েছি। এক পয়সা পাবে না ও। তবে যদি আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ও মরে তখন উইল পালটে বৌটাকে কিছু দিয়ে যাব—যাতে আবজীবন খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে তার বেশী নয় অবিশ্যি।'

বিশ্বাস করার কথা নয়, বিশ্বাস হ'লও না। অথচ মুরারির কথাবার্তা এবং যেটুকু দেখলুম নিজের চোখে—অবিশ্বাস করাও শক্ত। বিলেবক্স বাঁকুড়ায় পৌঁছে ভাকীমার দুখেও যেটুকু শুনলুম তাতে মুরারির কথাই সমর্থিত হ'ল।

তবু খাওয়া দাওয়া ক'রে ঘুমিয়ে উঠে বেলা চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম জ্যাঠাইমার বাড়ির দিকেই। মল্লিকদের বাড়িটা কোন দিকে সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কিছুটা সেই দিকের ওপর নির্ভর ক'রে এবং কিছুটা লোককে জিজ্ঞাসা করে করে—এক সময় গিয়ে পৌঁছলুমও।

মাঝারি সাইজের বাড়ি—একা বাস করার পক্ষে অনেক বড়। অবশ্য দেখলুম একা বাস করছেনও না খুব। দুটি তিনটি আশ্রিতা বিধবা এসে জুটেছে, তারাই বোধ হয় রান্নাবান্না করে। চাকর কিংবা [illegible]

জ্যাঠাইমা দেখলুম আমাকে চিনতে পারিলেন, আমার মার খবর নিলেন, বিয়ে করেছি কিনা সে খবর জিজ্ঞাসা করলেন। পরের দুবে তৈরী মিষ্টি খেতে দিলেন, আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার কিছু অভাব ঘটল না।

তবু,এসব সত্ত্বেও—কেমন যেন অন্যমনস্ক কেমন যেন চিন্তাক্লিষ্ট মনে হ'ল জ্যাঠাইমাকে। যেন একটু ভেঙেই পড়েছেন যেন। এমন কি, এতদিনে এত বড় ঝঞ্ঝাতেও ওঁর চেহারার যৌবনশ্রী নষ্ট হ'তে বসেছিল—এবার দেখলুম তাও টলমলে। বয়সের চিহ্ন সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে!

এর কারণটাও অনুমান করা কঠিন হ'ল না। জমি প্রসঙ্গ দেখে আমি কথাটা পাড়লুম একটু ঘোরা পেতেই, 'এটা কি করছেন জ্যাঠাই মা, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি? গ্রামের লোকে যে যা তা বলছে।'

হাসলেন জ্যাঠাইমা। নিষ্প্রাণ শীতল হাসি। বললেন, 'কত যেন বুঝবার, ন্যাওড়া গাছে চক্রবর্তী! দুই বুদ্ধি ভাবলি এতদিন পরে কিরোছিস বলেই তোর দাম বেড়ে গেছে! গ্রাম সুদ্ধ লোক ঠেকাতে পারলে না আমাকে—তুই ঠেকাবি?

'কিন্তু আপনারই বা এত জেদ কেন? হাজার হোক সে আপনার ছেলে তো?' বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে ফেললুম।

'হাজার হোক সে আমার ছেলে তো? আমার চেয়ে তার ঐ দলই বড় হল!' সে যদি আমার কথা বিবেচনা না করে, আমি কেন করব। যেদিন সে আমার আশ্রয় ছেড়ে চলে গেছে সেদিনই জেনেছি আমার ছেলে আর নেই, সে মরে গেছে!'

নারী হৃদয়ে বোঝাতে বা জ্যাঠাইমার নিজের ভাষায় জেনাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু জ্যাঠাইমা অচল অটল! দেখলাম স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলো কেমন ক'রে যেন ওঁর নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে।

শেষে আর কোন যুক্তি না পেয়ে বললুম, আপনি তো কত দান ধ্যানও করেন—মনে করুন না ভিক্ষে দিচ্ছেন। গ্রাম সুদ্ধ লোক আপনার ছেলেকে সাহায্য করছে তবে তার চিকিৎসে চলছে এও তো আপনার একটা অবদান।'

'কিছু না কিছু না। অবদান কিসের

রাতে কথা যোজনার ঘরে যাওয়ার কথা। সে যদি নিজের কর্তব্য পালন না করেছে, চুরি না হত—আমারই বা কী এমন দায় পড়ল তার প্রতি কর্তব্য করতে! আমার কর্তব্যটাই বা কি। দুঃস্থ বিধবা মায়ের টাকায় বসে খাওয়ার যে প্রেমের লোকের কাছে ভিক্ষে করে পাওয়া যায়। তাকে যদি তার অপরাধ না হয় আমার হবে কেন। আর ভিক্ষে?' ভিক্ষেও পায় বুকে লিখে হয়, এইজন্যে লক্ষ্মী বলে করেন।'...

কিছুতেই কিছু হ'ল না। যেমন শূন্য হাতে গিয়েছিলাম তেমনি শূন্য হাতেই ফিরতে হ'ল। তাও চল একটু জ্যোৎস্না-মাখা ওপর। এমন রাতটা যা তো কোথাও কোথাও—তাতে পড়লা হ'লে কি এমনি পাষাণ হয়ে যায় মেয়ে মানুষও?

তখনকার মতো প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে এ মাড়িতে আর আসব না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখা গেল না। হাসপাতালে এসে বিমলদাকে দেখে চমকে উঠলুম। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ওর যাই হোক না কেন—মানুষটা তো সেই একই আছে। একসময় আমাদের চলের প্রাণপুরুষ ছিলেন, সেবার যত্নেই মাত্র করেছেন চিরকাল, হয়তো কিছুটা ভালও বেসেছি, যারা একটা থাকবে বৈকি! বিমলদার দিকে তাকিয়ে যেন চোখে জল এসে গেল, অমন দীপ্তি কান্তিমান মানুষটার এই হাল হয়েছে! এ যেন সেই একদিনের কোন রাক্ষসী এসে ওর স্নেহের সেই কিছু কিছু শুষে নিয়েছে—

তারাদা যতদূর যা দেখলুম: বাঁচবার কোন আশা তো নেই-ই, দেখেও বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। মনে হ'ল আজ রাতটা কাটবে কিনা সন্দেহ।

আবার ছুটলুম জ্যোৎস্নাময় রাতে। দুর্যোগের নিবেধ না শুনেই। দুর্যোগ বললে, ওরে পাগল, মিছিমিছি ছুটছিস, সে চাঁদ সে নয়।'

'তবু, চুপ ক'রেই বা থাকি কী ক'রে। আমার কাছ তো আমি করি!' জবাব দিলুম তাকে।

জ্যোৎস্নাময়ীকে গিয়ে বললুম, 'জোৎস্নাময়ী জ্যোৎস্নাময়ী, এই শেষ মুহূর্তে ক্ষমা করুন তাকে। একবারটি চলুন। একেবারেই শেষ হয়ে এসেছে, আজকের রাত কাটে কিনা সন্দেহ।'

মনে হ'ল—জ্যোৎস্নাময়ীর আলোতে যতটুকু না নরম পড়ল—মুহূর্তের জন্য একটা কালো ছায়া পড়ল জ্যোৎস্নাময়ীর মুখে, একটা আকুলতাও ফুটল দৃষ্টিতে, কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে শুধু বললেন, 'তেমন যদি কিছু হয়, বৌটাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাস।'

ঠিক এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না একটুও। যেন দারুণ একটা আঘাত পেলাম। কঠিন হয়ে উঠল আমার কণ্ঠস্বরটাও। একটু ব্যঙ্গের সুরেই জবাব দিলুম: 'সেও তো ঐদলের মেয়ে, ঐ ঝাড়েরই বাঁশ, তাকে এনে তোলাবেন কি করে তাহলে?'

'যে দলের মেয়ে সে দলের সঙ্গে সে তো মেইমানি করে নি, যে ঝাড়ের বাঁশ সেই ঝাড়ের আছে। তাকে আমার ঘেন্নাও নেই, ভয়ও নেই।'

'আপনার না থাক, তার ঘেন্না থাকতে পারে। যে আর কণামাত্র পেলে তার স্বামীর জীবনটা রক্ষা হ'ত—সে আর যদি তার মুখে না মোচে?'

'সে তার কাজকাচ!...হাঁবরোল, হাঁবরোল।'

Cementation

International Civil, Mining & Specialised Engineers

SERVING INDIA

Exploratory Drilling ● Soil Mechanics ● Vibroflotation
Cementation ● Soil Stabilization ● Piling ● Guniting
Shaft Sinking ● Tunnelling
Hydro-Electric Project ● Harbour Works
Geophysical prospecting For Oil, Water & Minerals

Cementation

THE CEMENTATION COMPANY LIMITED

Standard House, Dinshaw Vacha road,
BOMBAY-1
3, Esplanade East,
CALCUTTA-1.

একবার ঝিম্ ধরতে [illegible] কথাগুলো [illegible] ঘরে চলে

[illegible] মা মারা গেলেন পরের দিন [illegible] আটটার সময়।

[illegible] কেউ নেই। [illegible] শালাবাও [illegible] বাড়ে এদিক ওদিকে হাঁড়ায়ে [illegible]। দুর্গাদিদি আমার বেলাতেও [illegible] মা-চাকা দিয়েছে। বিমলদার [illegible] অবশ্য এবার পর থেকেই—যখন [illegible] ওকে দিয়ে বুড়ির কাছ থেকে এক [illegible] আদায়ের সম্ভাবনা নেই, তখন [illegible] নাকি তারা এড়িয়ে চলে। বৌদিও [illegible] বুঝেছে, পাদাদের কথা উঠলেই [illegible] ওঠে একেবারে, বলে ওরা আমার [illegible] টা নষ্ট ক'রে দিলে। ওকে এদিকে [illegible] না আনলে তো আর এমনভাবে [illegible] টা যেত না!'

[illegible] বলল্ম, 'তা দিমলদাও তো [illegible] ছাড়তে পারতেন!'

তবেই তুমি ও কাজ চিনেছ! ঐ [illegible] তো ছেলে। ওরই কি ভেদ [illegible] ছাড়তে চেয়েছিলেন বরং বৌদিই, [illegible] তাকে ভরসাই পারেন নি। তবুও তো [illegible] দিয়ে কৈদে পড়েছিলেন এক দিন [illegible] নে—বলতে গিয়েছিলেন আপনার [illegible] আপনি ক্ষমা না করলে কে [illegible]? বুড়ি জবাব দিয়েছিল সন্তান [illegible] পর তার তখন আর থেকে পর [illegible] কেউ বুঝ না যা। আর তা—

ছেলে দেশের ছেলে, তাদের পক্ষ, তাকে নিয়ে আমি করব কি, তাকে বাঁচানো মানে তো কালসাপ পোষা, এ সব তাড়াতাড়ি যায় তত ভাল। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিলেন বৌদি।

তারপর—অনাবশ্যক বোধেই আর জোঠাইমাকে খবর দিইনি কেউ।

বেরোবার টাকা তুলে ফিরছে ক'রে চৌধুরীরা বাঁচাল সেই ভারেই সমস্যার বাঁধনটা তবু ঢিল একটা।

কিন্তু টাকা জোগাড় ক'রে সব তুলতে তুলতে বেলা দশটা বেজে গেল।

সবে আমরা মড়া নিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছি—কোথা থেকে হাহাকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে জোঠাইমা এসে পড়লেন, 'ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে, ওরে—একবার দেখা দেখা—। কতকাল দেখিনি ও মুখ!'

অবস্থা: নামাতে হ'ল।

জোঠাইমা একেবারে আছড়ে পড়লেন। মৃত সন্তানকে বুকে তুলে নিয়ে ঘুমো খেয়ে আদর ক'রে পাগলের মতো মাথা কুটতে লাগলেন। আত্মীয়দের মধ্যে দুচারে জন সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরা বললেন, খবর শুনেই নাকি জোঠাইমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন—এই একটু আগে অতিকষ্টে জ্ঞান হয়েছে।

একজন তার মধ্যে—আমিও চিনি ওঁকে—মন্তব্য করলেন, 'আর অজ্ঞান হবেন না! ওরই যা শরীরে কি আছে! বোধ হয় শুকে ছেলে ছেড়ে যাবার পর থেকে কোন দিন ভাল ক'রে খেয়ে শোননি।

শ্মশানে গিয়ে মুখে আগুন—তাও যা খেলে [illegible] অজ্ঞান হয়ে বসেই পড়ে। আমার মনে হচ্ছে শুনেছে ছেলে খেতে পাচ্ছে না—ছেলে যে একবেলা খাচ্ছে তো দুবেলা খাচ্ছে না, তখন থেকে সে শুধু সাধীর আহার ধরেছিল। 'খুমোক না—বলতে ছেলে সারারাত ধরে মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলত আর কাঁদত!'

শ্মশানঘাটের প্রায় আমাদের সেই রাস্তাটুকু হেঁটে গেল। মা সাধি জোঠাইমার কোল থেকে মড়া যার করতে মা সাধন-বাই কাঁধে তুলতে। শেষ পর্যন্ত বৌদিই বাঁচালেন, আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে 'মা' বলে ডাকাতেই জোঠাইমা ছেলে ছেড়ে দিয়ে 'মা মাগো এ তোর কী মূর্তি আমি দেখলুম না।' বলে বৌদির গলা জড়িয়ে আবারও অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ মাথায়ো জোঠাইমাকে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি খাট তুলে নিয়ে রওনা দিলুম।

তারপর থেকে শুনছি ঐ একটা রোগই দাঁড়িয়ে গেছে জোঠাইমার, অনবরত মূর্ছা হচ্ছে। তাগো শুধু বৌদির সেবাটা পাচ্ছেন। তবে বেশী দিন আর বাঁচবেন বলে মনে হচ্ছে না।

একটা সুবাহা: শুনছি এরই মধ্যে ঠাকুরটা পালটে বৌদির নামে নতুন কেনা বাড়িটা আর কিছু জমিজমা লিখে দিয়েছেন। নতুন ঠাকুর বলেছেন, 'তাহলে ওর ভাগেরা সবাই ঠকবে যাবে।'

পূজার অভিনন্দন জানাই

সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলস (প্রাঃ), লিমিটেড
অনন্তপুর টেক্সটাইল লিমিটেড

মিলস—অনন্তপুর, শ্যামপুর থানা, হাওড়া

হেড অফিস—১৬১, নেতাজী সুভাষ রোড, (পুরাতন ৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট)
কালকাতা - ৭

ফোন : ৩৩-৩৭৫১
৩৩-৩৪২৩

ছুটিতে বেড়ানোর এই তো সময়!
ভাবনা চিন্তাহীন অনাবিল
আনন্দে আর খুশীর আমেজে
আকাশ বাতাস ভরে উঠছে...
আর আই এ সি বিমান
আপনাকে নিয়ে আকাশের
নীলিমায় ডানা মেলার জন্যে
প্রতীক্ষা করছে। আমরাই তো
এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল
ও মানুষের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি
যোগসূত্র রচনা করছি।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

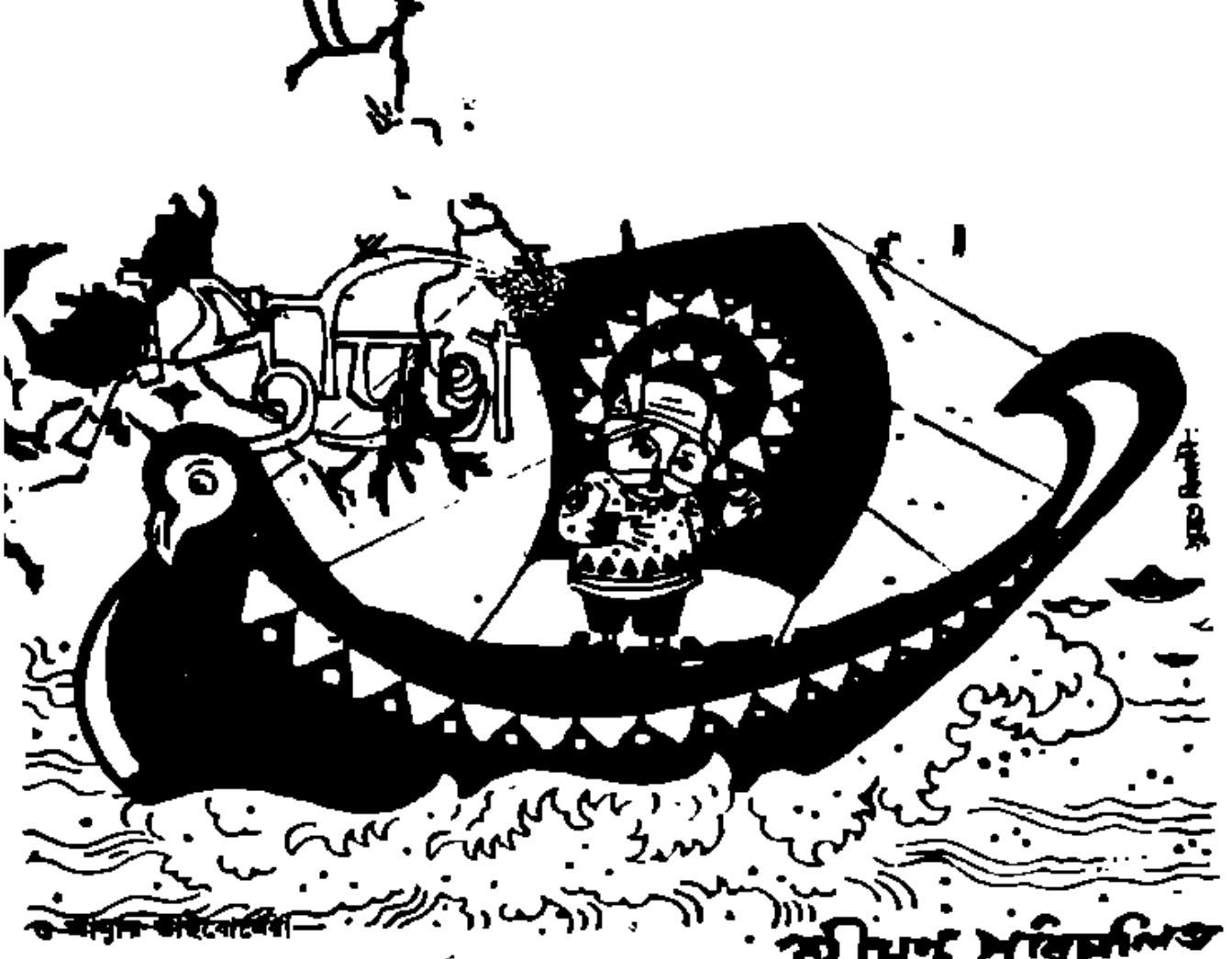

শ্রীমন্ত সাহিত্যিক

দেখতে-দেখতে কেটে গেল পুরো একটি বছর—
আনন্দে-শোকে যেখানো ক্ষমা ও খরচের ঘর।
দুঃখ-অভাব-ব্যর্থতা আছে জানি, আগমনী
শরতের মেঘে ছড়ালো তবুও আনন্দধ্বনি।
অশ্রু-ভোলানো ছলনা-দোলানো এমন প্রহরে
উদাসীন হয়ে ঘরের কোনায় থাকবে কে ওরে?

আয় তোরা আয়, নাচ-গান-হুল্লোড়ে ভরে তুলি
এই দামিনে হাল্কা হাসের মতো দিনগুলি।
সপ্তডিঙার বোঝাই পণ্য উজাড় করে দি'
দু হাতে তোদের, প্রীতিতে সাজাই হৃদয়ের বেদী।

মানিক জোড়

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

—"আরে, তুই এখানে যে!"—বলে শঙ্কর মোতির কাছে এগিয়ে গেল। মোতি শঙ্করের ছেলেবেলার দোস্ত। দুজনের ছিল গলাগলিভাব। লোকে বলত হ'লোই বা শঙ্কর কায়েতের ছেলে, আর মোতি গঞ্জুর মিঞার ব্যাটা, দুটিতে যেন মাণিকজোড়!

সড়কে দেখে পাকিস্তানের হালাত সেই মাণিকজোড়েরই হ'লো ছাড়াছাড়ি, আর বাস্তুগতিও আলাদা।

মোতি কি করে, কখন কোথায় আসে-যায়, অনেকদিন হ'লেই শঙ্কর খোঁজ খবর পায় না। একদিন হঠাৎ দুজনের পথে দেখা। দেখাও হ'লো একেবারে সামনা-সামনি, নইলে মোতিকে হয়তো চেনাই যেতো না। মোতির মাথায় তুর্কী টুপি, গায়ে আচকান, পরনে চুস্ত পা-জামা, তার উপর গাল-তর্হাই দাড়ি,—এক নতুন মূর্তি! সঙ্গীসাথী নিয়েই সে যাচ্ছিল। সঙ্গীদেরও একই সাজসজ্জা, মুখেও দাড়ি। নাকের ডগার নীচে গোঁফটীও সকলেরই একই ধাঁচে কামানো।

শঙ্কর মোতিকে জিজ্ঞেস করল—'কোথাকে এলি? এদিকে যাচ্ছিস কোথায়! তোর সঙ্গের এরাই কারা?'

মোতি চোখদুটো কুঁচকে শঙ্করের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সে অদ্ভুত প্রশ্ন করেছে। পরে বলল—'ছুপিয়ার কোনো খবরই তুমি রাখিস না, বরাবরই বুদ্ধুরাম হ'য়ে রইলি।' আরো হ'সে সে বলল—'আজ্ঞা-গজ্ঞায়, এখন ধরেছে মোতিলাই বুদ্ধি—বুঝবাক!

ছাদিয়ার চালচালী সত্যিই শঙ্করের জানা নেই বুঝতে পেরে শেষে মোতি বলল—'যা নিয়ে কাদিন ধরে মারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে, কিছুই তুই জানিস না! আচ্ছা, বল তো দেখি—সেই যে একবার তুই আর আমি জীবনগঞ্জের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম আর ফেরার পথে কামরাঙ্গা পাড়তে গিয়ে সাপের মুখে পড়েছিলাম—সে-ব্যাপারটা মনে আছে তোর?'

—'তা আর মনে নেই! একটা ছাড়া-ভিটের তো ছিল সেই কামরাঙ্গা গাছটা, আর তার খোড়ায় ছিল একটা মাটির ঢিপি। কামরাঙ্গা পাড়তে গিয়ে সেই ঢিপিটার উপরে যাই না পা দিয়েছি, অমনি চারদিক থেকে ছুটো সাপ বেরিয়ে এসে ফণা তুলে দাঁড়ালো। তাই দেখেই চুপ্ সাপ ক'রে নীচে লাফিয়ে পড়ে দুজনে দৌ-দৌড়।—এই ব্যাপারটা তো?'

—'হাঁ-হাঁ, সেই ব্যাপারই, আর সেই ছাড়া-ভিটের কথাই বলছি। সেখানে সেই যে মাটির ঢিপিটা দেখেছিলাম-না, তার ভেতরে কি আছে এতদিনে তার হদিস পাওয়া গিয়েছে। কাশীর থেকে একজন উলেমা এসেছেন, তিনি বলেছেন—সেখানে আছে জীবন আলির কবর, জায়গাটার নাম জীবনগঞ্জ সেই সম্পর্কেই। বাঙালীরা জীবনকে বলে কিনা জীবন, তাই জীবনগঞ্জ হ'য়ে গিয়েছে জীবনগঞ্জ।'

জীবন আলির নাম শঙ্করের জানা ছিল না। সে জানতে চাইলো—সে-লোকটি কে?

মোতি বলল—'উলেমা-সাবের কাছে সে পরিচয়ও পাওয়া গিয়েছে! বাদশা আলমগীরের এক বন্ধুস্থানীয়ের নাম ছিল জীবন। বাদশা আদর ক'রে তাকে ডাকতেন জীবন-চাচা। সেই জীবন আলির নাম থেকেই তিনি যে দেখেছিলেন তাঁর বড় ভাইয়ের কাটানো এটা অতিরিক্ত জীবন আলির ছোট বয়সের ঘটনা। শেষ বয়সে কাশী নিবে জীবন ঘুরতে ঘুরতে নয়া মুলুকে এসে হাজির আর যে ভরেটে মন হারা হ'লো সেখানে মধ্যেই থেকে দরবার। পরে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল সেই চাপা পড়ে আছে জীবন চাচার ঢিপিটার নীচে।'

শঙ্কর বলল—'ঢিপিটা খুঁড়ে এখন বের ক'রে ফেললেই তো হয়। ফকির-সাহেবের দরগাটি আরো জমজমাট হ'য়ে উঠতে পারে।'

মোতি বলল—'সে-কাজেই তো চলেছি জীবনগঞ্জে। সঙ্গেও আছে এই মোলবী-সাবরা, যাতে মাটি খুঁড়ে কঙ্কালটা দেখা গেলেই মিলাদ-সাবি পড়া সুরু হ'তে পারে।'

—'তীর্থক্ষেত্রে এর চেয়ে পুণ্যের আর কি হ'তে পারে!'—শঙ্করের মুখে একথা শুনে মোতি বলল—'এদিকে যে গোলমাল বাধিয়েছে বোষ্টম বাবাজীরা, নবদ্বীপের কোন্ মোহন্ত-মহারাজ নাকি জীবনগঞ্জে এসে তাদের বলেছেন—আরে সে-জায়গাটা ছিল একটা চর। সেখানে পরে একটা গঞ্জ হয় ব'লে তার নাম হ'লো নয়াগঞ্জ। সেই নয়াগঞ্জে আখড়া ছিল এক গোঁসাই বাবাজীর। বাবাজী নাম জীবচন্দ্র। বিষ্টুপুরের মতন এখানে বাবা বোষ্টমদের কি একখানা ক্ষেত্র! তাই ক'রে নিয়েছিল জীবচন্দ্র নাকি তাদেরই দলের একজন। কালে কালে জীবচন্দ্রকে ঠেক নিয়ে এই নয়াগঞ্জের আখড়া করতে হয়েছিল সেই সম্পর্কেই গঞ্জটির নাম হয় জী নয়াগঞ্জ। চলতি কথায় নয়াগঞ্জ হ'য়ে পড়ে নাগঞ্জ। তাই জায়গাটিকে ফ হয় জীবনগঞ্জ।' মোহন্ত-মহারাজ নাকি বলেন—পশ্চিমারা জীবনকে জীবন ব ব'লেই কি মানতে হবে তখানে ছি জিওন-ফকিরের দরগাহ? আর-গোঁসা আখড়ার তুলসি-বকুলটিই চাপা প'ে আছে ঐ ঢিবির। ঢিপিটাকে খুঁড়লে তা দেখাও যাবে। বোষ্টমরাও তার ব বেঁধে ঘোল করতাল নিয়ে সেখানে গি

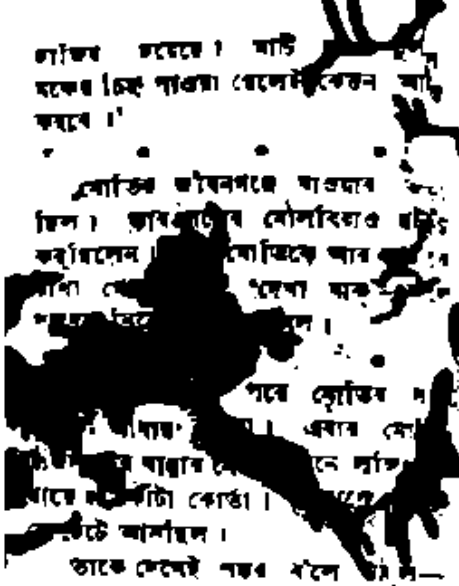

...ছাড়িয়ে ধরেছে। মাটি ...
...বকের চিহ্ন পাওয়া যেলেই কেতন আঁ...
...করবে।'

• • •

...মোক্তির জীবনগরে আজ...
...ছিল। ভাবনেতার মৌলবিরাও ...
...করছিলেন। ...মোক্তিকে আর ...
...বাধা ...দেখা অক...
...হয়ে ...ল।

• • •

...পরে মোক্তির ...
...। এবার মো...
...যাবার ...নে লাঠি...
...যাবে একটা কোর্ত্তা।
...ছুটে আসছিল।

তাকে দেখেই শঙ্কর ব'লে উঠল—'তোর কথাই ভাবছিলাম রে! বল্ দেখি জীবনগরের খবর কি? মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল কঙ্কাল, না, ডুলাল-যন্ত্র?

মোক্তি দু-হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে বাতিয়ে বল্‌ল—'তাঁচকলা।'

—'মানে?'

মোক্তি হাত-দুখানা পাখীর ডানার মত ডানে-বাঁয়ে বাড়িয়ে দিয়ে দোলাতে দোলাতে বল্‌ল—'লো-লক্ষ্মীছাড়ই উড়াল দিয়া।'

শঙ্কর বল্‌লে—'হেঁয়ালি রাখ্। ব্যাপারটা কি খুলেই বল্ না।'

মোক্তি বল্‌ল—'শোন্ তবে, জীবন-গঞ্জের সেই ঢিপি-ভঞ্জন পালাটির আবে সেব করি। আমাদের দল আর রোয়ম-দের দল দুজনই সেই ঢিপিটার কাছে উপস্থিত। মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা ক'লো পর্যদিন ভোরে। আমাদের দলে যারা মাটি খুঁড়বে তারা এলো শব্বা নিয়ে, আর রোয়মদের লোক এলো কোদাল হাতে।

...মোহন্ত সাঁইরা চাঁচাতেন এসে একসঙ্গে, সোইয়দের মেজবের দল আর একদিকে। ...ঢ়ীদের উলেমা-সাঁই আর রবঘাঁদের মোহন্ত মহারাজ পাশাপাশি বসলেন ...আনা চৌকিতে।' ঢিপির উপর খন্তা ...কোদালের কোপ পড়তেই আমাদের দলে ...ল কেওয়া ক'লো আল্লা হো আকবর ...লে, রোইয়দের কেন্দ্রাজারা খোলে ...দড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল—হর বিস্তার!

কিছুটা মাটি খোঁড়া হ'তেই ডুল্ ক'রে ...আওয়াজ পাওয়া গেল। সকলেই ...উঠে পড়ল যন্ত্রের দিকে। কিন্তু ...বস্তা ছিনিসটা টেনে তুলতেই দেখা গেল সেটা একখানা শিলি। শিলের ...টাও প'ড়ে ছিল তার কাছে। আশেপাশে ছড়ানোও ছিল তাকা ঠাঁড়-মুড়ি, কাচা-কাচ্চা হেড়েল, ঘরোয়া ভাঙাচুরি। সকলেই বুঝতে পারল কাকর বন্ধুই হবে ভিনিষগুলোর সেগুলো, তবের সঙ্গে তা-ও মাটির তলায় চাপা প'ড়ে আছে। কিন্তু আসো মাটি খুঁড়লেই আসল জিনিষটা বেরুবে পড়বে, এই আশায় ঠাঁড়িকুঁড়িগুলো নীচের জোর কাজ আরম্ভ হতেই কোন্ কোঁস্ শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ফণা তুলে চারিদিক থেকে ঠাঁড়িয়ে পড়ল চারটে প্রকাণ্ড কেউটে সাপ। সাপ দেখেই লোকজনেরা হাতের খন্তা-কোদাল ফেলে এক-এক লাফে গর্তের বাইরে উঠে পড়ল। সকলের মুখেই তখন মা-রে—বাবা-রে শব্দ। নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এ ওকে ঠেলেই পালাচ্ছে।

...ঢ়ীদের উলেমা-সাঁই আর রবঘাঁদের মোহন্ত-মহারাজ ছাড়া একজন আর একজনকে সাপটে ধরতে গেলেন। তখন ...হাতের আরে মোহন্ত-মহারাজ পেলেন উলেমা সাঁইয়ের দাড়ি, তাই তিনি ...ছেড়ে ধরলেন। আর, উলেমা-সাঁই মোহন্ত-মহারাজকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে টেনে ধরলেন তাঁর টিকি। আমি ঘোড়াকে চাঁচাতে দূরে সরে ...ছিলাম। উঁকি মেরে সেখান থেকে তাঁদের দুজনের কাণ্ডকারখানা দেখতে পেলাম। খানিক পরে আমার ...ঠি মেরে হো-হো—দুজনেই উঠবে!'

• • •

ঢিপি-ভঞ্জন পালা সঙ্গে ক'রে মোক্তি ...মনেই ব'লে উঠল—'আরে, হো: হো:! সবের কথায় মেতে ...সবাইকেই ব'লে ব'লে আজগা-গজগাম!'

মোক্তিকে আজগা-গজগাম বল্‌তে শুনে শঙ্কর বুঝল মোগলাই দুলিতে তার অরুচি হয়েছে, নইলে দুরমাক্ ছেড়ে সে বলে আজগা-গজগাম! তার ভাবনাও চলে এবার হয়তো মাটিকাটোর পালাও শুরু হবে। সে-আশায় তখুনি ক'লেও গেল।

মোক্তি বল্‌ল—'যাক্ এ-সব কথা। আমি তোর খেলতেই যাচ্ছিলাম এখন। ভালোই হ'লো পথেই দেখা পেলাম। চল্ দেখি একবার আমার সঙ্গে এক ...ড়ো বাড়ীতে গেলে এলোই একটা বিলাতি আমড়ার গাছ। গাছে পেকের ...হয়ে এরো এরো বড়ো আমড়া। চল্ দুটি দুজনে গিয়ে তা পেড়ে আনি।'

কামরাঙার মত বিলাতি আমড়ার নামেও শঙ্কর আর মোক্তির এ-বয়সের ...লোভ হবে। তাই মাটিকাটোর ...ড় দলাদলি ক'রে দু-জোড় তখুনি আলগা পাকতে চলল।

এখানে পুতুল হলো

সলিল ...

শিউলি ঘাসে শারদকালে সবুজ-আভোর আড়ে আড়ে—
শাদা কাশের গুচ্ছ নাচে হাওয়ার দোলার বারে বারে।
লাল টুকটুক পথ ধরে কাজল কালো দীঘির জলে—
বকের পাঁতি উধাও হয়ে যাচ্ছে উড়ে আকাশ-কোলে।
ছিপ-সুতো মেঘেরা সব মাছে কোথা কোন্ সে দেশে,
চাঁদিয়ে সোনা-রোদের হাসি বাতাস বাঁশ উঠল হেসে।
হাসছে পেয়ারা-পাসছে খুকী, আসন্ন পূজা ক'দিন পরে
ভচি-কাঁচা মনগুলো সব বাঁধা আছে আনন্দে উঠবে ভরে।

আজগুবি

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুড়ো-খোকা রাগ ক'রেছে
তুমি সবার বাবলা,
পেটটি ফুলে ঢাকের তোরঙ্গ
আমার বাবি খাব-না।

খাব-না আমি খাব-না
সব ফেলে যাব খাব-না
আমাইবাবুর চাঁদ কেরেছে
দেখাব তোরা আব-না।

কী দারুণ চাঁদ মামা

শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়

মামা, তোমায় পায়ে ধরি,
খোকায় তোমার আদর করি
তুলেও যেন আর ঘোলোনা চাঁদ।
খোকার মুখের হাসি দেখে
আর ঘোলোনা কারেও ডেকে
চাঁদের হাসি আজ ভেঙেছে বাঁধ।

কী দারুণ ছিপি চাঁদা মামার!
পেলেই পালায় রস দেখে তার,
কাগজে তার দেখো নি কি ছবি।
ওপরটা তার গিল্টী করা,
ভেতর খানা ভয়ঙ্করা,
তাইই আবার বড়াই করে কবি!

চাঁদনিক আর মরেট হাড়ি
হাটের মাঝে ভাঙলো হাঁড়ি,
আমি ছুঁয়ি চলবে না আর টাদা,
ইচ্ছে করে ভেঙে বেড়ে
দি পাখিয়ে কাপড় বেড়ে,
কি বলবো, মায়ের দুমি দাদা।

ছুলে পাক্কাতে পারে

লক্ষ্মীকান্ত রায়

বয়সে কারো টাক পড়েনি, দূরদর্শন তাকে—
এই বয়সে টাক লুকোতে পালিয়ে কোথায় যাবে।
কোথায় যেন চুলের বাহার ওরলো মাথা টাকে,
মানুষ কি আর বুঝবে যদি তাদের দেখা থাকে।
বাজার নেয়া ছেলে মেয়েরে চশমালোচন, তবু—
চুলগুলোকে রাখতে ধরে পারলোনা সে কভু।
কেমন করে চুল গজাবে, ভুবুরে মাথা চুলে,
এই কথাটাই ভেবেছে সে গভের কথা ভুলে।
পাড়ার লোকে, তাই ডেকে, বললো—"শুনো শোনো,
টাকে তোমার চুল গজাবেই, সেই ভাবনা কোনো।"
"চুলের কথা ভেবে যদি পড়বো মাথায় টাক—
কাজ কি ভেবে এখন থেকে, তখন কথা থাক।"
এটাকের কথাই এখন থেকে ভাবলে যারে বারে—
হয়তো এবার টাকের মাঝে চুল গজাতে পারে।"

খেলা ঘরের ছড়া

শঙ্কর গুপ্ত

খেলাঘরে দুই লাগে ঝগড়া দুই দুই,
পুতুলবউ কপালে টিপ দিয়েছে দুই দুই।
গান্ধারীদা গান ধরেছে সা-রে-গা-রে-গা,
সবাই শুনে বললো, আহা, বাঃ রে-বাঃ রে-বাঃ!
আকাশেতে মেঘ জমালো উঠল বুঝি ঝড়,
ছাতা মাথা লক্ষা বেড়ে বললে, আমার ঘর।
বাড়ীর ভেতর ঘনুদা বাজল কাঁসর ঘণ্টা,
উঠল হেঁকে ঘর দেখে চৌধুরীদের পণ্টা।
তাই না শুনে ছাতনা তলায় বাপ্ রে কি হৈ-চৈ,
ঘাটের পুতুল বরের দিনে চাইছে খেতে বৈ।
বৈ না পেয়ে পুতুলমণির কান্না ওঠে নৌকে,
খেলাঘরের হাটবাজার অবাক বাও দেখে।

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে।

আলোকচিত্র : ডাঃ অনিল দত্ত

আলোকচিত্র
ব্রজেন বসাক

আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত
আলোকচিত্র : রমাকান্ত দাঁ

চিরন্তনী
আলোকচিত্র : মোনা চৌধুরী

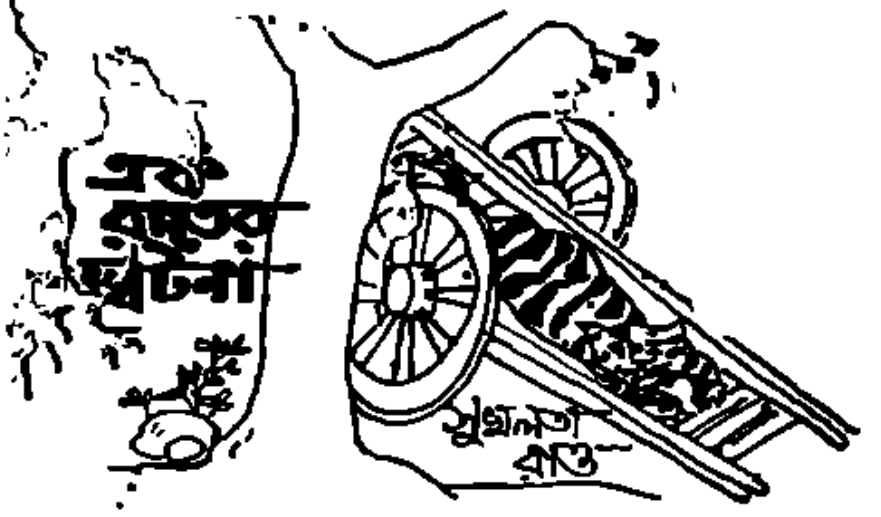

...রকের বড় হাসপাতালের ভিতরে. একটি বাড়িতে থাকেন ...হাসপাতালের ডাক্তার। ...খানায় ... খাই। সেই ...উৎসব। ...ইলাম। ...ওই সাহেব ...ছেন। খাওয়া ...হচ্ছে। একটা খেলার ...একটি ছেলে. ...ঘরের একটি ঘড়ি ...একটা পার্সেল দিয়ে গেল ...টি পার্সেল খুলে দেখতে দেখলেন ...রে কি আছে। উপরের মোড়ক দেখলেন. ভিতরে আর একটা ...ল : তার গায়ে লাল কাগজ সাঁটানো দেখা যাচ্ছে—ওই ঘরে সকলের বয়স বেশী যাঁর, তাঁকে পার্সেল দিন।' সব চেয়ে বেশী বয়স সেই ভদ্রলোকের। তিনি খুলে দেখতে চাইলেন ...কি আছে। ভিতরে ছিল একটা। পার্সেল তার গায়ে আগাগোড়া লেখা—'ঘরের মধ্যে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, তাঁকে এই পার্সেল দিন।' এবার, যাঁর হাতেই পার্সেল যাক, তিনি খুলে দেখবেন, আর পার্সেল, গায়ে লেখা—'যাঁর সকলের চেয়ে মুশকিল, তাঁকে দিন।' যিনি সকলের চেয়ে মুশকিলে, তাঁকে দিন।' এমনি চলেছে। খুব হাসাহাসি হচ্ছে।

এমন সময়ে হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ডাক পড়ল বাথরুমে। বাথরুমে মানুষ যায়, তাই মানুষেরা বাঘ মারে। তখন কাছাকাছি গ্রামগুলোতে বাঘের উৎপাত হচ্ছিল। সেইজন্য এক একটা বাঘ যে মারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে ব'লে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। নিয়ম হয়েছিল, বাঘ মেরে সেটা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখাতে হবে। তিনি দেখে, লিখে দেবেন এরা সত্যিই বাঘ মেরেছে, তবে পুরস্কার দেওয়া হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাড়ির সামনের রাস্তায় বেরোলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরোলাম। সেখি কি, কয়েকজন লোক, গরুরগাড়িতে চাপিয়ে, প্রকাণ্ড এক চোপ-কাটা মরা বাঘ নিয়ে এসেছে। গল্পটা এতক্ষণে যে, গাড়ির পাটাতন ছাড়িয়ে বাঘ লাঙ্গুল আর মাথা দুদিকে ঝুলে পড়েছে। আর কি দুর্গন্ধ। পাঁচ ঢোল!

ফিরে এসে, ঘরের ভিতর ছাড়িয়ে দিলাম শিশি ভরা সুগন্ধ।

শরৎ

অমিতাভ বসু

ঘোলাটে আলো গায়ে
দোয়েল পাখী নাচে
শিস দিয়ে সে যায়—
প্রাণ ছড়িয়ে যায়।

শালুক কোটা বিল
আকাশ ভরা নীল :
বকপাতি যায় উড়ে
দিগন্তে ঐ ঘুরে।

শাদা মেঘের ভেলা
উদাস করে মন :
পালে তুলে ঐ যায়—
যত্রাত্রি সব নায়।

শিউলি ঝরা পথে
একলা বাটি হাতে :
বাউল মেয়ে যায়
ছালকা মনের পায়।

সবাই খুশী আজ
নেই যেন আর কাজ।
শরৎ এল ঐ

দিল্লীর ফকির

ধীরেন্দ্রলাল ধর

দিল্লী নগরী পদানত।

আহমদ শা আবদালি পাঞ্জাব পার হয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে এসে ডাঁবু ফেলেছে। যত নাগরিক সুলতানের ভয়ে পালিয়েছে। যাদের যাইবে যাবার সুবিধা নেই তারাই শুধু বসে আছে চূড়ান্তের প্রতীক্ষায়।

বাদশাহের সভায় আর জৌলুষ নেই। সামান্য কজন ওমরাহ এসে জোটেন, আসল কথা আলোচনা হয় খুব কম।

একদিন বাদশা কথা তুললেন আবদালির সৈন্য সংখ্যা কত।

এক একজন ওমরাহ এক একরকম কথা বললেন—পঞ্চাশ হাজার...আশী হাজার...লাখ। সবই শোনা কথা।

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—সঠিক সংখ্যা কেউ জানেন?

প্রধান উজির ইমাদ খাঁ বললেন—জানি। বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে আবদালি পাঞ্জাবে এসেছিল এখানে আরো পনেরো হাজার পাঠানকে সে দলে ভর্তি করেছে, মোট পঁয়ত্রিশ হাজার।

ওমরাহ ঈশ্বরদাস খাঁ বললেন—মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার? তবে যে আমি শুনেছি সত্তর আশি থেকে বেশী।

ইমাদ বললেন—ভুল শুনেছেন।

বাদশা বললেন—মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সে দিল্লীর দরজায় এসে পড়লো, আমরা রুখতে পারলাম না?

সেনাপতি সাজিদ খাঁ বললেন—সৈন্যরা যাইনে পায়নি তারা লড়বে না।

বাদশা বললেন—কিন্তু যাইনে দেওয়া যায় না?

উজির বললেন—কিন্তু মানে দুকোটি টাকা।

—দুকোটি টাকা—বাদশাহ বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

ইমাদ খাঁ বললেন—হ্যাঁ, সাজিদ খাঁ আমার কাছ থেকে সেই টাকাই চেয়েছেন। এদিকে রাজকোষ তো শূন্য।

ঈশ্বরদাস খাঁ বললেন—ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু টাকা তোলা যায় না?

ইমাদ বললেন—সে চেষ্টা করেছিলাম। পয়সাওয়ালা মানুষ সব তো সভয় ছেড়ে চলে গেছে, এখন টাকা দেবে কে?

—শুধু একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত ছিল।

—তাতে বড়জোর দু-চার লাখ উঠতো। দু-কোটি টাকা উঠতো না।

ইশ্বরদাস বললেন—এখন আহমদ শা যা বলবে তাই মাথা হেঁট করে শুনতে হবে।

—তবে, ইমাদ বললেন—উপায় কি? আমি তাই মনে মনে স্থির করেছি নিজেই একবার আবদালির সঙ্গে দেখা করবো।

বাদশা বল[illegible] তুমি যাবে? তোমার টাকা দাবী [illegible] হয় নাকি?

উজির [illegible] দেখতে [illegible]

—যা করতে হবে [illegible]

—[illegible] বহুত পেয়ার পাবি।

—তাই যাও!

বাদশাহের হুকুম নিয়ে [illegible] সকালে প্রধান উজির ইমাদ খাঁ গেলেন আবদালির শিবিরে সঙ্গে চারজন মাত্র দেহরক্ষী।

আহমদ শা আবদালি উজির সাহেবকে দেখে খুশি হতে পারলেন না, সোজাসুজি বলে বসলেন—আশা করেছিলাম আপনারা লড়বেন, দেখলাম আপনাদের সে সাহস নেই।

ইমাদ বললেন—সৈন্যরা মাইনে পায়নি, তারা লড়বে না।

—মাইনে পায়নি কেন?

—রাজকোষে টাকা নেই।

—রাজস্বের টাকা কি হয়?

—আদায় আর তেমন নেই, খরচ কুলায় না।

আবদালি হাসলেন, বললেন—রাজস্ব ভাল আদায় হয় না, সেজন্য দায়ী কে? আপনি। আপনি বাদশাহের প্রধান উজির, বাদশাহীর যা কিছু দুর্বলতা সবের জন্য আপনিই দায়ী।

ইমাদ খাঁ চুপ করে রইলেন।

আবদালি বললেন—আপনার অনেক দিন আগেই উজির ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আপনাদের মত উজির আছে বলেই বাদশাহ এতো দুর্বল। সামান্য একটা লড়াই করতে যে ভয় পায় সে উজির করবে কি?

—সৈন্যরা লড়বে না, আমি কি করতে পারি?

—তাই বলে করতে এসেছেন? সৈন্যদের কত টাকা মাইনে বাকি পড়েছে?

—দু'কোটি টাকা।

—আমাকে সেই দুকোটি টাকাই দিতে হবে।

—বাদশাহের এখন দু'লাখ টাকা নেই।

—আপনি উঠিবি ছেড়ে দিন, আমি উঠিবিতে থাকতে উঠব করবো। সে কথা ভুলে যেবে, না হলে আমি দিল্লী নগরে মুখ দেখাবো।

[illegible] থামল, আবদালি [illegible] —আর কেন কথা [illegible] এবং [illegible] আর দিল্লীর [illegible] তীর উঠিব [illegible]।

[illegible] কুর্নিশ করে বেরিয়ে [illegible] আবদালি আরও [illegible] —না ওস্তাদ খাঁ, [illegible] এখন আটক করো, [illegible] খেলে খোলসাল যাবাবেন। আর আমার ফরোয়া দিয়ে দাও—আজ থেকে দিল্লীর উঠিব হলো ওমরাও উঠিবিতে খাঁ।

আবদালি বন্দীরা উমাদ খাঁকে বন্দী করলো।

পরদিন সকালে সাজপুড়ে আজমল খাঁ আবদালি দিল্লী নগরে প্রবেশ করলেন। কেল্লাদারী খাসের সভায় বাদশাহের সঙ্গে পাগড়ী বদল করে মধুর প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—আমার টাকা চাই, দু'কোটি টাকা।

বাদশাহ নতুন উঠির উঠিবিতে খাঁকে হুকুম দিলেন—নাগরিকদের কাছ থেকে টাকা তোলো।

উঠিবিতে কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন—টাকা তোলো।

নগর মধ্যে হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেল।

এদিকে খবর এসে পড়লো—মুঘোমুখি লড়াইয়ের জন্য মারাঠারা তৈরী হচ্ছে।

মারাঠারা তখন প্রচণ্ড শক্তিমান। পর্যাপ্ত হাজার মাত্র সৈন্য নিয়ে তাদের সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। তাড়াতাড়ি টাকাটা তুলে নিয়ে ফেরে ফিরে যাবার জন্য তিনি উৎপ্রীব হয়ে উঠলেন। দিল্লীর আমীর ওমরাহদের ডেকে আবদালি বললেন তোমরা তো অনেককাল দিল্লী দরবারে আমিরী করছো, সোনাদানা জমিয়েছো অনেক, আগে তোমাদের সোনা-দানা বের করে দাও তারপর বাইরের লোকদের উপর হুলুস্থুল করবে।

উঠিবিতকে আবদালি বললো আপনাকে সবার আগে টাকা দেবেন।

উঠিবিত বললেন—আমার ঘরে টাকা পয়সা কিছুই নেই।

—তোমার বাবা উঠির করেছেন, তোমার চাচা উঠির করেছেন আর তোমার ঘরে টাকা নেই।

—আপনি লোক পাঠান, সব দেখে আসুক।

—এখন নীচে পোতা থাকলে আমার লোক কি দেখবে।

—মাটির নীচে পোতা আছে? এ আপনি কি বলছেন?

—তুমি আমার লোক নিয়ে যাও, কোথায় কি আছে কোথায় দাও তো। আমার লোক মাটি খুঁড়ে বের করে নেবে।

—আমি কিছুই জানি না।

—সোজা কথায় জানবে না। চাবুক পড়লেই সব জানবে। জাহান খাঁ, ঘোড়া নিয়ে আসতে বল।

আবদালির বিশ্বস্ত অনুচর সর্দার জাহান খাঁ পাশেই ছিল। বাদশাকে ইশারা করলো। বান্দা ছুটে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একটা চাবুক এনে দিল, চাবুকটার পানে তাকিয়ে একটু হেসে আবদালি বললো—হাঁ, এতেই হবে।

উঠিবিত থর থর করে কেঁপে উঠলো। দিল্লীর দরবারে উঠিবের পিঠে চাবুক পড়বে, এত বড় অপমানের কথা তো জানাও যায় না। উঠিবিত তাড়াতাড়ি বললো—খোদাবন্দ, যদি কিছু লুকানো থাকে তো সে কথা আমার মা জানে আমি জানি না।

উঠিবিতের মা লোলাপুরী বেগমকে আনার জন্য তখনই পালকী ছুটলো। চাওনা চকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল্কী ফিরে এলো। পাল্কী থেকে নামলেন বৃদ্ধা লোলাপুরী বেগম। কালো বেনারসী ঘোমটায় সর্বাঙ্গ ঢাকা। কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন আবদালির সামনে।

আবদালি বললেন—আপনার কষ্ট হলো। আপনাকে এই কষ্ট দিল আপনারই ছেলে উঠির উঠিবিত-উদ্দৌলা। সে আমাকে বললো তার মা অনেক কিছু আছে যা সে জানে।

—চাবুক মারবেন?

—হাঁ, আপনার তিন পুরুষ বাদশাহের উঠির করেছেন, আপনার ঘরে অনেক হীরে জহরৎ আছে।

—উঠিবিত বলেছে এই কথা?

আবদালি সেকথার জবাব দিলেন না। বললেন আমি জানি সোনা মাটিতে পোতা আছে, সেসব আমার চাই, কোথায় আছে দেখিয়ে দিন।

—সেই তো মারাঠারা লুটে নিয়ে গেছে।

—আরো অনেক আছে। কোথায় আছে বলুন। আমার চাবে জহরতের জন্য আপনার মত প্রবীণ সন্তানী মহিলা লজ্জার ভয়ে অপমানিতা হন সে আমি চাই না।

লোলাপুরী বেগম ফুঁপিয়ে উঠলেন। কেঁদে বললেন—আমার মত দুঃখিনী সন্তান দুঃখে অপমান করলে আল্লাহ বা আবদালির পৌরুষ বাদুরে বলে মনে হয় না।

আবদালি হাসলেন, বললেন—আপনি না আবদালি এসেছে দিল্লী লুট করতে, এখানে সম্মান মাতৃত্বের আসেনি। যা আছে বের করে দিন, নাহলে আমার বান্দা আপনার আব্রুহরণ [illegible]। সে যাতনা এই বয়সে আপনি সইতে পারবেন না।

—কুঁড় কোথায়?

—হাঁ, এইটেই আমি সবচে উপায় বলে মনে করি। পুরুষ হলে চাবুক মারতাম। জাহান খাঁ—

জাহান খাঁ আবদালির ইঙ্গিত বুঝলেন। হাতের ইশারা করলেন, চারজন বান্দা ছুঁচের তাড়া নিয়ে এগিয়ে এলো। লোলাপুরী বেগম কেঁপে উঠলেন, আর্তনাদ করে উঠলেন—উঠিবিত!

আবদালি বললেন—উঠিবিত এখন বাদশাহের উঠির, আর আমি বাদশাহের বান্দা।

বান্দারা লোলাপুরীকে ঘিরে দাঁড়ালো। লোলাপুরী সেইখানেই বসে পড়লেন, বললেন—আমার কাছে কিছু নাই, আল্লার যা আছে সব দিচ্ছি।

লোলাপুরী বেগমের পাল্কী নিয়ে জাহান খাঁ তখনই দরবার থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

লোলাপুরী বেগম বাড়ীর মধ্যে একখানি ঘর দেখিয়ে দিলেন। মহুয়ার ঘর, সেই ঘরে মেঝের নীচেই নাকি সব কিছু আছে। জাহান খাঁ তখনই একদল জন মজুর লাগিয়ে দিলেন, সেই ঘরে খুঁড়ে দেখার জন্য।

একদল জন মজুর খুঁড়ে চললো। মেঝেতে লাগলো বড় বড় লোহার সিন্দুক, আর সিন্দুকের কলসী।

শিক্ষদের কলমীতে যত মোহর ছিল তা গুণে শেষ করা যায় না। মোট ষোল লক্ষ মোহর পাওয়া গেল। অন্য সিন্দুকগুলির মধ্যে পাওয়া গেল বহু লক্ষ টাকার হীরা জহরতের অলঙ্কার। তিনপুরুষ ধরে বাদশাহের উজির থেকে ইস্তিজামের বাপ-ঠাকুর্দা যা-কিছু সঞ্চয় করেছিল, তাই গোপনে, ভাঁড়ারে রেখেছিল এখানে যে সবই আহমদ পা আবদালির হাতে পড়লো। প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার সম্পদ হাতে পড়তেই আবদালি খুশি হলেন, বললেন—ইস্তিজাম-উজোলা, আপনি বলে-ছিলেন টাকা নেই, আপনার বাড়ী থেকেই তো পঞ্চাশ লাখ টাকা বেরিয়ে এলো।

ইস্তিজামের মুখ কালো হয়ে গেল, সে কোন জবাব দিতে পারলো না।

আবদালি তিন খাঁকে বললেন—উজির সাহেবের হারেমে তল্লাস করেছ?

—না, হুজুর।

—তল্লাস করবে, সেখানে মেয়েদের গা থেকে আরো পাঁচ লাখ টাকার গহনা তুমি পেয়ে যাবে।

ইস্তিজাম আপত্তি তুললো—হুজুর আমার হারেমে—

আবদালি ধমক দিলেন—চুপ রও, পঞ্চাশ লাখ টাকা খুঁজে বেরেছ আর বললে টাকার অভাবে সৈন্যদের মাইনে দেওয়া যায়নি, তারা লড়াই করবে না। তাহলে দিল্লীর বাদশাহী যায় তো যাক্, তোমার টাকা থাক্। আর তিন পুরুষ ধরে এই বাদশাহীর নিমক খাচ্ছ।

জাহান খাঁ আবার ইস্তিজামের বাড়ীতে গেল। মেয়েদের গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে নিয়ে এলো। একটা ছোট সোনার আংটি আবদালি কারও হাতে আর রইল না। এবার আবদালি হেসে বললেন—উজির সাহেব, এবার আপনি বলতে পারেন যে আপনার কারো আর টাকা নেই। এখন কথাটা সত্যি হবে। যাক্। এখন যান, বাড়ীর মেয়েরা গয়নার শোকে আত্মহত্যা করছে, তাদের গিয়ে বোঝান গে—

ইস্তিজাম মুখ কালো করে বাড়ী ফিরলো।

বড় ছেলে সুলেমান বাড়ীতেই ছিল, বললো—বাবাজান, আমাদের এতো টাকা ছিল, অথচ আমরা সৈন্যদের মাইনে দিতে পারিনি, একটা লড়াই অবধি হলো না?

—এসব কথা শুনতে চাই না, তুমি আমার সামনে থেকে যাও—ইস্তিজাম চেঁচিয়ে উঠলো।

সুলেমান চিন্তিতভাবে বললো—পঞ্চাশ লাখ টাকা আবদালি উজিরকে দিয়ে গেল, এটা আমরা আগেই ভুলে দিয়ে সৈন্যদের মাইনে দিতে পারতাম। আমাদের যা সৈন্য ছিল আবদালির তিন হাজার ঘোড়-সওয়ার ভোঁয়ার ভাসিয়ে দেয়!

—আমার কাণের কাছে বকবক্ করো না—

সুলেমান বাড়ীর ভিতর চলে গেল সেখানে তখন সোলাপুরী বেগম আবদালিকে গালি দিচ্ছে।

সুলেমান বললো—দাদী, তুমি জানতে এতো টাকা লুকানো আছে, অথচ টাকার জন্য বাদশাহী চলে গেল! আবদালি একটা লড়াই অবধি না করে আজ দিল্লীর মসনদে বসলো।

সোলাপুরী বললেন—আর টাকা নেই, আমরা এখন পথের ভিখারি!

সুলেমান বললো—আমরা নিমক হারাম করেছি তারই সাজা পেলাম।

দাদী বললেন—যমকথা শুনতে চাই না। যমকথা বলতে হয় তো ফকিরি নিয়ে যা—

—তাই যাব।

সুলেমান ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে আবদালির সৈন্যরা চারিদিকে আমীর-ওমরাহদের বাড়ী বাড়ী সোনা-মোহরের সন্ধানে তল্লাসী শুরু করে দিয়েছে। বাড়ীর বাসন ও বাঁদীরা তাদের হাতে মার খাচ্ছে। পর্দানশীন মেয়েদেরও টেনে আনা হচ্ছে বাড়ীর বাইরে।

সন্ধ্যা অবধি সুলেমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব দেখলো তারপর নগর ছেড়ে বললো আল্লার পথ।

বরাবর ক্রোশ দুয়েক গিয়ে দেখা পাওয়া গেল একটি দরগা। দরগার চত্বরে এক ফকির বসে আকাশে দৃষ্টিকে মেলে ধ্যান করছিলেন। সুলেমান তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললো—ফকির সাহেব, আমি এসেছি!

ফকির সাহেব [illegible] একবার তাকালেন। তারপর বললেন—[illegible] খবর?

—আপনি [illegible] হবে?

—কাল প্রত্যুষে।

—আমিও সেখানে আপনার সঙ্গে [illegible] আমি তা যাবো সবার, কবীর [illegible]

—আমিও সেইখানে যাবো।

—সেখানে হয়তো যাবে কেন?

—সেইখানেই থাকবো।

—উজিরের ছেলে তুমি, সেখানে কি থাকতে পারবে? বরং কষ্ট হবে।

—তোমার কষ্ট হবে না, আমি আজ থেকে ফকিরি নিলাম আপনার শিষ্য হবো।

ফকির হাসলেন, বললেন—কেউ আজও শিষ্য হয় না বেটা, সবাই খোদার বান্দা! তিনি যখন যাকে যা করেন, সে তাই হয়, সবই সেই মালিকের ইচ্ছে।

সুলেমান বললে—এই সাজগোছাকটা আমি বদলে ফেলতে চাই।

ফকির বললেন—এখনই কোন দরকার নেই হয় বদলে দেবে পোষাকও একদিন বদলে যাবে। দুই একদিন বাদশাহের উজির হয়ে আমীর হতে পারতিস তুই ফকির হতে চাইছিস, শেষ অবধি টিকতে পারবি কি?

—আমিরী, আর চাই না, ফকিরীই ভাল।

ফকির হাসলেন, বললেন—বেশ তবে চল।

[illegible]

খানিকক্ষণ পরে দরবেশের ছদ্ম কবরের সমাধিস্থল কবীর চৌয়ার সুলেমানকে দেখা গেল, দাঁড়িগোঁফ কামানো আলখাল্লা পরনে এক তরুণ দরবেশ। তরুণ ফকিরটি ইনি দিল্লীর কোন এক উজিরের ছেলে। কিন্তু সত্যকারের পরিচয় কেউ জানলো না। তরুণ দরবেশ সেইখানেই ঘর নিলেন।

সুলেমান ফকিরি নিয়েছিল, দিল্লীতে আর কোনদিন ফিরে যাবে। সারা জীবন কবীর চৌয়ার সাধারণ লোক সেই ভাবে জেনে যায়।

'অন্য অঙ্কের আসরে ছেড়ে'—
আসরে কাকে ধরছে?
কেমন ক'রে জানবো তুমি
ওযোগ তো দাও নি!
'আমটি আমিও খাব ঠিক'—বলে
আম এনে দে দাদা—
দিন বাকির খাই খাই তোর—
পড়না বসে টাল।
'ইচ্ছে ডানা ভরে মনে'—
যায় না কেন বলো?
উদাস পাখী ধরবে কিনা
সাধ হয়েছে মরতে—।
'ঘুড়ি চলেছে সুখটি তুলে'
আমায় না দুখ জানতে—!
গলায় যে তার ভীষণ ব্যথা
খাসা জানের জ্যান্ত যে।
'দীর্ঘশ্বাসটি আছে ঝুলে'—
কোথায় সেটা ঝুলছে—?
অসুখ গায়ে দোলনা বেঁধে
মনের সাধে দুলছে।
'আমি মলাম বলেন পূজায়'
কিসের পূজো করছে?
বকর-বকর থামা খোকা
আমার মেজাজ চড়ছে।
'দিল-কার কেন ভিখারিণী যায়'?
দেখবি সেটা তবে?
কিসের ছোটে এখন কেন
পালাদ ভাঁা—ভাঁ হবে?

দাদুর লাঠি

শুভ্রা ঘোষ

দাদুর লাঠি, কাঁপরে মাটি চললো,
দাদুর খড়ম, মেজাজ গরম করলো।
চলনা বুড়ি, কী জরুরী যাবার,
এগুটা যেন, কাপটা যেন টানছে।
দাদুর কলম, নিবটি নরম নয়তো,
কোথায় খুঁজে, খুতোর আগে লাগতো।
চেয়ার থালা, টেবিল টানা কটা,
তারেরী কালো পাতাগুলোও মোটা।
ভাবছে পালে, কিছুর টানেই যাইনা,
দাদুর মেজাজ, গরম যে আর চাইনা।

বিশু মুখোপাধ্যায়

কেমন ক'রে এমন ক'সে কে জানে ভাই, কে জানে।
ওলের জন্ত হিসেব সাথে
ভাবার জন্ত কেরা খাঁ'র
যার যে ক'সে কসাকসায়
সব ছাড়েতেই কেমন কসায়
তুচ্ছ করে আর যা আছে প্রাণী জলে-স্থলে ;
বলে, বেবাক টাঁকে দাওনা কষে ছলে-বলে !

কিন্তু হিসেব কা-এর মনের বেজায় ছিল বড়
যা পেয়ে সব বিলুতো বিজেই-পেটে-পুজোয়ে লড়।
কেরা খাঁ-এর পেটে যখন লাগতো ভীষণ কুধা,
পেট ফুলিয়ে হিসো তখন বলতো-বন্ধু, ও খাঁ :
খাওনা খুঁটে লুটেপুটে যেখানে যা পাও,
তারেও যদি না ভরে পেট, আমার সাথে যাও।
এই না ব'লে একদিন সে
কংসে জানো কি ?
কেরা খাঁকে বললে, তোমার
নেইকো মাথাও কি !
তার চে' এসো আমার সাথে, এসো আমার পুষ,
খেলাই ক'রে দেব মাথাও, ভ'রে নবীন সুখ।
বুদ্ধি তো নেই কেরা খোকা
চললো হিসোর সাথে,
আপন ভবে ফেলে তারায়
নামলো জল-পথে।
দুর-জলেতে নামিয়ে ভরে মারলো হিসো ধাক্কা,
খাঁর খেতে খেতে খাঁ-এর কেবাই ছাঁদ অকা।

আসল-মেকী ঠিক না বুঝে বিজলী যে তবে,
এমন ক'রে বেখোরে সে মরণ আখেই মরে।

মারাঠা-বীর শিবাজী মহারাজ দাক্ষিণাত্যে আক্রমণে বাহির হইয়া নানা দেশ দখল করিয়া বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ একদিন কাবেরী নদীর উত্তর তীরে তিরুমল নামক স্থানে শিবির ফেলিলেন। আসন্ন সন্ধ্যা। রণক্লান্ত। মন বার বার সঙ্গে নদীর দুকূল ভাসিয়ে উঠিতেছিল। পরপারই হইতেছিল তাঁর মাতৃভূমি। সেইজন্যই তখনকার মত ঐ জায়গায় তাঁবু খাটানো যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। স্বচ্ছ-সলিলা কাবেরীর পা ঘেঁসিয়া তিরুমল বাড়ী শহরটি অবস্থিত। এখান হইতে তাহার সহর মাত্র দশ মাইল দূরে। শিবাজীর অভিযানে চুপচাপ বসিয়া থাকিবার স্থান ছিল না। তিনি শিবিরে বসিয়া ভাবেন---তাঁহার পরবর্তী কাজের কথা। প্রথমে তিনি মাদুরার রাজার নিকট আক্রমণ বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। পরে বিশেষ এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সবিনয়ে জানাইল যে তাঁহাদের মহারাজকে এক কোটি টাকা দিতে হইবে। তাহা অবাক হইলেন। দূতের মারফত তাঁহার অসম্মতি পত্র পাঠাইলেন।

শিবাজী এই খবরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পুনরায় দূতের জবানিতে তাঁকে জানাইলেন যে যদি অবিলম্বে উক্ত টাকা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি মাদুরা রাজ্য আক্রমণ করিবেন। মাদুরা রাজ চিন্তিত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কী সহজ কথা। এই ভেবে তিনি তিন লক্ষ টাকার চুক্তিতে রফা করিয়া নিলেন রণ-ক্ষেত্রী আর বাকিল না।

তাঞ্জোরে দূত পাঠাইলেন। সেখানকার রাজা ব্যাঙ্কোজীকে সবিনয় অনুরোধ জানাইলেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য।

ব্যাঙ্কোজী ছিলেন হরপতির বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি তাঁহাকে দাদাকে খুব ভালভাবেই জানিতেন। চতুরে চতুর, সবতায় ও দূর্তবুদ্ধিতে চূড়ামণি সে-কথাও তাঁর অজানা ছিল না। সে-জন্য ব্যাঙ্কোজী ইতঃস্তত করিতেছিলেন, পাছে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়া পড়েন। মন্ত্রীদের কাছে পরামর্শ চাহিলেন—এ অবস্থায় কী করা যায়! তাহারা কেহই দেখা করিবার পক্ষে মত দিলেন না।

শিবাজীর বাহাদুরী—ঘন ঘন লোক আসিতে লাগিল। তখন ব্যাঙ্কোজী উপায়ন্তর না দেখিয়া সাক্ষাৎ আয়োজন করিলেন।

সঙ্গে দুইজন বিশ্বস্ত বিচক্ষণ রক্ষী এবং দুই সহস্র সৈন্য নিয়া তোঞ্জ রাজার কাছে রওয়ানা হইলেন।

নগর প্রান্তে শিবির স্থাপন করিয়া লাদাকে তাঁহার আগমন বার্তা জানাইলেন।

শিবাজী এই খবরে অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন।

॥ দুই ॥

ব্যাঙ্কোজী বীর ভাইকে নিজের শিবিরে দেখা করিবার জন্য দাদার আমন্ত্রণ জানাইলেন। বড় ভাইয়ের [illegible] ব্যাঙ্কোজী তাঁহার শিবিরে আসিলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে [illegible] হইল। বিনিময় হইল। বিবিধ খাদ্য [illegible] আহারাদি পর্ব চলিতে লাগিল। এইভাবে [illegible] হাসি, হৈচৈ করিয়া কাটিল।

শিবাজী তাঁহার মনের আন্তপ্রায় বাক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পিতা সুরজী মৃত্যুকালে যে-সব ধন-সম্পত্তি জায়গা-জমি ও জায়গীর রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার ভোগ তাহা পাইয়াছিলেন ছোট ভাই ব্যাঙ্কোজী। তা ছাড়া কর্ণাট প্রদেশে তাহার বেশও মালিকানা লাভ করিয়াছিলেন।

শিবাজীর মনে স্বভাবতই ক্ষোভ ছিল। বড় ভাই হইয়া তিনি কেন বাবার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন! তেরো পুরুষেরটুকো বারো আনা পাওয়া উচিত—সিকি ভাগ ন্যায্য প্রাপ্য।

ব্যাঙ্কোজী বুঝিয়াছিলেন দাদা তাঁহাকে বিনা উদ্দেশ্যে ডাকিয়া পাঠান নাই। সম্পত্তির বিষয়ও যে দাদা তুলিতে পারেন একথাও তাঁহার মনে হইয়াছিল। একদিন সকালে দুই ভাই মিলিত হইলেন। তখন শিবাজী গম্ভীর অথচ আদরের সুরে বলিলেন : ভাই ব্যাঙ্কোজী আমি তোমার বড়দা। একটা কথা বলতে চাই---মন দিয়ে শোন।

ছোটভাই বলিলেন : বলুন দাদা।

হরপতি শুরু করিলেন : তুমি পিতৃ-সম্পত্তির সিকি অংশ ভোগদখল কর--- আমাকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য বারো আনা ত্যাগ ছেড়ে দাও।

ব্যাঙ্কোজী বলিলেন : সে হয় না দাদা। বাবা আমাকে যা দিয়েছেন তাতে তুমি কেন ভাগ বসাতে চাও।

শিবাজী ভাইয়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন : তোমাকে বিষয়টি ভাববার জন্য একদিনের সময় দিলুম। এর মধ্যে তুমি ভেবে চিন্তে আমাকে তোমার মতামত জানাবে। ব্যাঙ্কোজী মাথা নাড়িলেন। তারপর দরবার ভাঙ্গ করিয়া নিজের শিবিরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

শিবিরে আসিয়া ভেবিলেন: সমস্ত ব্যাপারটা চারদিকে ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে। ব্যাঙ্কোজী বুঝিলেন দাদার হাত হইতে আর বাঁচিবার পথ নাই। তবে এই

যোদ্ধৃত প্রহরীদের চোখে ধুলা দিয়াই তাকে যে কোনো প্রকারে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। বিস্তৃত চত্বরের চারিদিকে তোপসহ জানাইয়া দিলেন তাঁহার অভিপ্রায়। তবে সকলের মধ্যে একটি সংশয় দেখা দিল। এদিকে ধরাচূড়া আলো আলো অন্ধকারের মধ্যে প্রহরীদের চোখে একটু ধাঁধা লাগিয়াছিল, এই সুযোগে যাদোজী চুপি চুপি ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া তখনি তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঘোড়া ছুটিয়া চলিল যাদোজী পরবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন।

প্রভাতে যখন শিবাজী জানিলেন ভাইয়ের যাওয়ার খবর তখন তাঁহার মনে বেদনা জাগিল। তিনি তাঁহার একান্ত সহচরকে ডাকিয়া বলিলেন: আমার ভাইয়ের ত এ-ভাবে পালিয়ে যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি আমাকে সহজ সরলভাবেই বললেই পারতেন। শত হলেও তো আমার বৈমাত্রেয়। সেখানে তার দৃষ্টি এখনও পাকা হয়নি...ছেলেমানুষির জন্য দুঃখ মাত্র করেছে।

শিবাজীর আদেশে যাদোজীর স্ত্রী ও অনুচরদের ধরিয়া আনা হইল। তাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কোনো ক্ষতি করিলেন না... প্রত্যেককে যথোচিত উপহার দিয়া তাহাদের ভাইয়ের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

যাদোজী কোনোকালের উত্তরে কিছু বলিতে পারেন নাই। শিবাজী তাঁহা নিজ শক্তি বলে ভাঙিয়া লইলেন। ছোট-ভাই কোনো বাধা দিলেন না। বড় ভাইয়ের দাক্ষিণ্য টুকু মাথা পাতিয়া নিলেন।

আয়-না টুটুন সোনা

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

টুটুন সোনা, আয় না সোনা, আয়-না সোনা, আয়-না আমার কাছে।

টুই, বেয়ে, লক্ষ্মী বেয়ে, আয়-না দাদুর কাছে।
সবাই লক্ষ্মী, খেলতে যাবি, বায়না কাঁদল কেন?
সোনার পরী, রূপের পরী আকাশ গায়ের যেন।
মিষ্টি ভোরে, কাল যে ভোরে বকেই ছিলাম তাই।
মাফোও দাদা? চাইচি ক্ষমা, আয়-না টুটুন ভাই!
দুষ্টু খোকা, আপন ভোলা বায়না সকল ফেলে
ছুটে টুটে, আয়-না ছুটে, আয়-না দু'চোখ মেলে।
ঘুমভোলানো, কইয়ে কথা দোলায় দুলি
আয়-না পরে, এমনি ভাবে, সকল বিকেল দুলি:
রূপের পরী, সোনার পরী, বাঁধন ছুঁয়োয় সোনা।
এমনি করে ডাকচি ভোরে, আয়-না টুটুন সোনা।
আসবে ভালো উষার আলো সবুজ বনের পরে,—
হাঁকিয়ে পড়ে আয়-না ওরে, ডাকচি দেশের ঘরে।
আয়-না সোনা, চাঁদের কণা গড়ার এ দেশ আয়
রাইতো ভোরে ডাকচি ভোরে আয়-না টুটুন আয়।
রূপের পরী, সোনার পরী বাঁধন ছুঁয়োয় সোনা,—
এমনি করে প্রতিটি ভোরে আয়-না টুটুন সোনা।

প্রজাপতি

অশোক সা

প্রজাপতি, প্রজাপতি ফুলের পাশে পাশে
ঘোর বিকৃমিক সকাল বেলায় পাখনা মেলে হাসে।
চালকা হাওয়ায় দোদুল দোলে
ঘোড়ায়ে বেড়ায় বাগান ফুলে,
কি অপরূপ সাতখানি রং পাখনা দু'টির 'পরে
ঠিক যেন সে রামধনু রং আকাশ বেয়ে ঘরে।

প্রজাপতি, প্রজাপতি ফুলের কথা জানে
ফুল-ফুঁড়ি তাই যত শোনায় প্রজাপতির কানে,
কোন সাগরের কোন সে' তলে
লাজায় মুক্তো-মাণিক জ্বলে,
সীমা-সকালের আকাশে কৈ রং মাখাতে আসে,
তার আঁখি জল শিশির হয়ে পাতায়ে শোভা আসে।

প্রজাপতি, প্রজাপতি তুমিই ফুলের পরী
ফুলে ফুলে বেড়াও তুমি ঔখন কি রূপ ধরি'—
কেউ জানেনা—অবাক মানে,
কেবল খোকা-খুকুই অনুমানে
ঘুমুচ্ছে যখন নিয়ুম নিয়ুম ভরা চুপ্‌টু ঘরে
প্রজাপতি তখন এসে রূপ কাহিনী বলে।

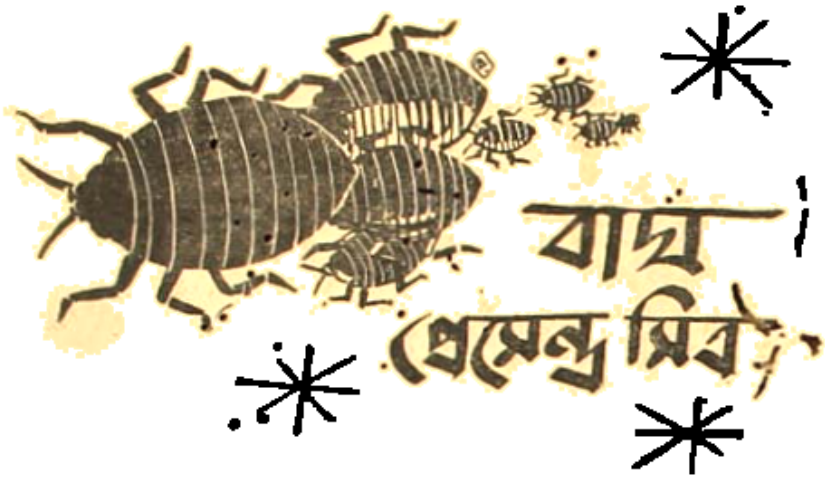

বাঘ

ধেমেন্দ্র মিত্র

বাঘটা। ও বাঘ, বাঘ।
অনেক বাঁচ দেখি তোমায়
হ'বে কি খুব রাগ।

বন্দুকটা তুলে ধরে'
মারতে গেলে গুড়ুম করে',
তোমা-কাটা বাহার দেখে-ই
কমে যাবে ভাগ।

দাঁতে তোমার ধার নাকি খুব
চামটে খাবার নখ।
কিন্তু কিসের দাতা-বলায়
নেইক তবু সখ।

মিটিমিটি আখোর বলে
ঘোরো কেরো আপন মনে,
হালুম হাঁকো শালিয়ে দিকে,
নও শয়তান ঠক্।

বাঘের বাড়া-ও জন্তু আছে
চিনতে পারা ভার।
মানুষ সেজে ঘুরে বেড়ায়
রক্ত-বাঁজের ঝাড়।

দাতা বজায় সঙ্গে মেশে,
আলাপ করে মিষ্টি বেশে,
তোমা দাঁতে রক্ত-তোমা
হাবোশোবো—পাষাড়।

জাবলাকাত বললে আমায়, হাত পাকল সৈনিক?
কামড়াও। আর খুড়ি দেব, চলন থানেক সৈনিক।
আমি বললাম তোদের মত, নয়তো আমি জাবা
দুশমনকেই তাকিয়ে দেব, বাকিয়ে শক্ত থাবা।

ফটো : বৈদ্যনাথ ভক্ত

ফুল ফুটবে

গোবিন্দ গোস্বামী

ওই যে ঘুরে যাচ্ছে উড়ে রঙ-বেরঙের পাখি
হারা মেঘের খেয়ায় ভেসে ভাবছি তাদের ডাকি।
ওই যে ছাড়া দিচ্ছে সাড়া নীল আকাশের গায়ে
ভাবছি যদি যাওয়া যেতো ওদের আভিনায়।
ওই যে ছেলে ভাবনার ভেলে গন্ধ ছড়ায় ফুল
অবাক আমায় ভাবছে নাকি এই পৃথিবীর ফুল।
অন্ধকারের বন্ধ ঘরে হইলো যারা শিকে
ভাবছো তাদের আলোর আলোয় জীবন তো নয় মিছে!
মিলে মিশে সবাই হবে সবার ভাবনা ভাবি
সবার আগেই দইবে এ ভাই সবার আধিকার।
না-ই বা হলাম, মেঘ ভাসা আর দূর আকাশের পাখি
মানুষ হয়েই মিলে যাবার গল্প তো নয় বাঁকি।

খুকুর পুতুল

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

খুকুমণির কোলে
মেম পুতুল দোলে।
খুকু পাড়ায় ঘুম।
থায় রে মুখে চুম।
সাহেব পুতুল কাঁদে।
বাঁধা আছে কাঁদে।
পায়ে গলায় দাঁড়।
সঙ্গে সে গড়াগড়ি।
সাহেব কাঁদে ভেউ।
দেখে না হায় কেউ।
মেমের মুখে হাসি
যেমন বুড়ী বাসি।

স্টেনসিল

পরিচয়ের কুশলী ছন্দ

ধার্ই, সেলুলয়েড বা প্লাস্টিকের পাতলা পাতে অথবা কাগজে একেবারে ওফোঁড় করে কাটা নক্সা বা হরফের ওপর বুরুশে রঙ বসিয়ে ছাপ তোলাকে 'স্টেনসিল' (Stencil) বলে। স্টেনসিলের বিশেষ সুবিধা হলো এই যে, একটি নক্সা বা হরফের স্টেনসিল থেকে অনেকগুলি প্রতিলিপি পাওয়া যায়। কাপড়ের ওপর সোজাসুজি ছবি আঁকা বেশ কঠিন কাজ, তার ওপরে যদি একই ডিজাইন অনেকগুলি আঁকতে হয়, তবে সে কাজটা আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্র ২

স্টেনসিলের সাহায্যে এই কাজটি খুবই সহজসাধ্য হয়, অর্থাৎ ঐ একটি স্টেনসিলের সাহায্যে পদা, টেবিলক্লথ প্রভৃতি অনেক জিনিসেই অনেকগুলি এবং অনেকবার ইচ্ছা ছাপ তোলা যায়।

শিক্ষানবীসদের পক্ষে কাগজে স্টেনসিল কাটা অভ্যাস করা ভালো। তাছাড়া অন্য কোনো জিনিসের চেয়ে কাগজে স্টেনসিল কাটাই সহজ। স্টেনসিল কাটার জন্য এক রকম তেলা কাগজ কিনতে পাওয়া যায়। একে 'স্টেনসিল-পেপার' বলে। দোকান থেকে এই কাগজ না কিনে বাড়ীতেই কাজ চলার মতো তেলাকাগজ তৈরী করে নেওয়া যায় এবং সেটাই করা উচিত। হরফের

দোকান থেকে সাদা কিংবা তিসির তেল কিনে এনে তাতে ব্লটিং কাগজ ভিজিয়ে যে কোনো মজবুত পাতলা কাগজের দু'পিঠেই ঘষে ঘষে লাগিয়ে শুকিয়ে নিলেই স্টেনসিল কাটার উপযোগী তেলা কাগজ তৈরী হবে। তিসির তেল যা লাগাবার তাড়াতাড়ি যদি না করতে চাও, তবে সাদা তেল কাগজেই নক্সা করা যেতে পারে, কারণ তাতে পেন্সিলের দাগ সহজে মুছে যাবে।

প্রথমে মনে হবে স্টেনসিল কাটার কাজটা বেশ কঠিন, কিন্তু কাটবার কায়দাটা যদি ঠিক বুঝে নিতে পারো তাহলে খুব কঠিন বলে মনে হবে না। কঠিন কাজ হলো উপযুক্ত নক্সা আঁকা। যাদের ড্রয়িং করার অভ্যাস আছে তারা একটু চেষ্টা করলেই স্টেনসিলের উপযোগী নক্সা এঁকে নিতে পারবে। যাদের সে অভ্যাস নেই তারা টুইং বুকের নক্সার সাহায্য নেবে বা অন্য কাউকে দিয়ে আঁকিয়ে নেবে।

প্রথমে পাতলা সাদা কাগজে নক্সাটি এঁকে কঠিন পেন্সিলের সাহায্যে স্টেনসিল কাগজের ওপর তার ছাপ তোলো। তারপর ধারালো নরুন অথবা ব্লেড দিয়ে নক্সার লাইন বরে স্টেনসিল কাটো। স্টেনসিল কাটার সময় নক্সা বা হরফের যে সব অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়, কালি লাগাবার সময় কেবল সেগুলিরই ছাপ উঠবে, আর না-কাটা অংশ সাদা থাকবে। স্টেনসিল কাটবার সময় এই কথাটি মনে রাখবে।

স্টেনসিল কাটবার সময় আর একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হতে হয়। এই বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম, তা না হলে সহজে বুঝতে পারবে না। ধরো তুমি ইংরেজী হরফ 'O' বা অনুরূপ অন্য কোনো ইংরেজী বা বাংলা হরফের স্টেনসিল কাটবে। এখন যদি এই রকম হরফের বাইরের লাইন বরে কেটে ফেলো, তবে ভেতরের অংশটুকু কেটে পড়ে যাবে। তখন সেই হরফের স্টেনসিলে কালি লাগালে হরফটা আর হরফ বলে চেনা যাবে না, একটা কালো ছোপের মতো দেখাবে। স্টেনসিল কাটবার সময় এই রকম হরফ বা নক্সার ভেতরের অংশ যাতে পড়ে না যায় তার জন্য মূল কাগজের সঙ্গে ভেতরের অংশটুকুর সংযোগ রাখতে

হবে। যার সাহায্যে এই সংযোগ রাখা হয় তাকে ইংরেজীতে 'টাই' (tie) বলে। এই কথাটির বাংলা কি হবে জানিনা, তাই আমি একে 'যোজক' নাম দিলাম। ১নং ছবিটা দেখলে, যোজকের তাৎপর্য বুঝতে পারবে। ছবিতে যে চারটি অংশ তীর দিয়ে দেখানো আছে সেগুলিই ছোটো যোজক। এরই ভেতরের গোল অংশটি মূল কাগজের সঙ্গে আটকে রেখেছে। আর একটি কথা। নক্সা বা হরফের কোনো অংশ কেটে পড়ে যাবার সম্ভাবনা না থাকলেও অনেক সময় যোজক রাখতে হয়। উদাহরণ হিসাবে ২নং ছবিতে 'ন' হরফটি দেখ। এর ভীষাচুক্ত দেওয়া অংশটি যদি দু'পাশের যোজক দুটি দিয়ে আটকানো না হয়

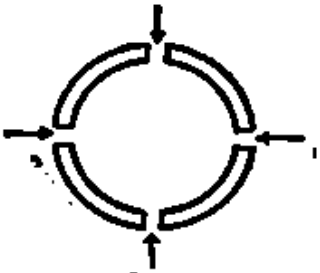

চিত্র ১

তবে বুরুশ ঘষে কালি লাগাবার সময় সেটি মুছে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

এবারে স্টেনসিলে লাগাবার কালি সম্বন্ধে কিছু বলে এই প্রবন্ধ শেষ

(১৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাগান করার খেলা

স্বপনবুড়ো

শ্যামল আর তরুণ একই ইস্কুলের একই ক্লাসে পড়ে।

কিন্তু ওদের আসল প্রতিযোগিতা কিন্তু বাগান করা নিয়ে।

যে কোথা থেকে কোন গাছের চারা এনে বাগানে লাগাবে সেই খবর একেবারে গোপন রাখবে।

তারপর সেই গাছে যখন ফুল ফুটবে তখন একে অন্যকে ডেকে এনে দেখিয়ে বাহাদুরী নেবে।

শ্যামল পড়াশোনাতেও বেশ ভালো কিন্তু তরুণ একেবারে ডানপিটে। ও খেলাধুলাতেও যেমন ওস্তাদ আবার যে কোন কাজে এগিয়ে যেতে ওর জুড়ি মোটা ইস্কুলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেই জন্য সারা ইস্কুলে সে ডানপিটে তরুণ নামে সবাইকার জানা।

ওরা যে অঞ্চলে থাকে সেখানে বেশ বড়ো সড়ো একটা নদী আছে। প্রতি বছর মাঘের সময় এই নদীর ধারে একটি মাঘের মেলা হয়। হাজার হাজার লোক এসে ভিড় জমায়। এই মাঘের মেলাতে বহু ফুলগাছের চারা বিক্রী হয়। শ্যামল আর তরুণ আগে এই মাঘের মেলা থেকেই নানা জাতীয় ফুল গাছ কিনে নিজের নিজের বাগানে পুঁতে দিত। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, দুর গ্রাম অঞ্চল থেকে এইসব চারা বিক্রী করতে যারা আসে—সব সময় তারা সত্যি কথা বলে না! ওরা ভালো করেই জানে যে একবার কোনো রকমে গছিয়ে দিতে পারলে আর তাদের ধরবে কে?

সেইজন্যে অনেক ক্ষেত্রে তারা মিথ্যে গাছের নাম করে আজে বাজে চারা গছিয়ে দিয়ে যায়। পরে দেখা যায় ওটা মোটেই সে গাছ নয়।

বাগানে গাছ পুঁতে পরে দু'জনেই হতাশ হ'য়ে পড়ে।

প্রথমে ডানপিটে তরুণের মাথাতেই বুদ্ধিটা আসে। ওরকম অজানা লোকের কাছ থেকে গাছের চারা না কিনে—খোঁজ খবর নিয়ে নানা জায়গা থেকে গাছ জোগাড় করতে হ'বে। তাতে খানিকটা ছোটা-ছুটির হবে বটে, কিন্তু মেলার লোকদের মতো কেউ ঠকাতে পারবে না।

এই মতলব নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে তরুণই কাজ শুরু করল।

নদীর ধারে বহুদূরে একটা পোড়ো বাগান বাড়ী ছিল। বাড়ীটা ছিল এক জমিদারের। কিন্তু তিনি আর ভুলেও দেশে আসেন না। গোটা বাড়ীটার যেন জঙ্গল হ'য়ে গেছে। কিন্তু জঙ্গল হ'লে কি হ'বে ওই বাড়ীর বাগানে নানা রকম দামী দামী'কল আর ফুলের গাছ আছে। তার সন্ধান জানে ওই পোড়ো বাড়ীর পুরোনো মালি।

মালিরও ত্রিভুবনে কেউ নেই। বাড়ীর একধারে একটা খোড়ো ঘরে সে থাকে। অনেক বয়েস তার। চুলগুলো সনের মোড়া হ'য়ে গেছে। চোখে জোর নেই, আর চোখেও ভালো করে দেখতে পায় না। কিন্তু সেই জানে সব দামী গাছের সন্ধান।

ডানপিটে তরুণ সেই বুড়ো মালির মনে ভাব জমিয়ে ফেলে।

সবকথা শুনে মালী বলে, এই পোড়ো বাড়ীতে কেউ থাকে না বটে, তবে জমিদারের এক বুড়ো মুড়ো ঠিক যমের মতো চিলে কোঠায় হাতে বাঁশ নিয়ে বসে আছে। বুড়োর আবার হাঁফানী রোগ আছে। তার ধারণা, এই বাড়ীতে কোথাও লুকানো টাকাকড়ি আছে। তাই লোভে বুড়ো বাড়ী ছেড়ে যেতে পারছে না। সে সারারাত খক্ খক্ করে কাশে আর ওপর থেকে নজর রাখে। আর ঐ বুড়োর আছে এক কুকুর। একবার দেখতে পেলে হয়। ঘা-বা করে কামড়াতে ছুটে আসবে।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলে, তা হ'লে উপায়? বুড়োমালি জবাব দিলে, তুমি যদি আমার কাছে এসো খোকাবাবু, তখন আমি দামী দামী গাছগুলোর

ধরা ক'রে ফেলেছি। আমাদের
কোনো কর্তা বহু দিন ধরে ওকালতি
করেছিলেন। তুচ্ছ না নিয়ে তখনো
মক্কেল হয়ে একেবারে ফাঁকিয়ে যাবে।
: তোমার বাগানে খেলে যাচ্ছে
কুবে।০

তরুণ উৎসাহিত হ'য়ে বলে, এমন সব
ফের চাষা আর কলম আমাকে দেবে
এ অঞ্চলের কারো বাড়ীতে নেই।

মাথা নেড়ে বুড়ো মালি বলে, দেবো
দাদাবু দেবো। সবজের চারা দেবো,
লঙ্কের কমলালেবুর কলম দেবো,
কাবলী লঙ্কা দেবো, ফিলেনথিমাস
বো, ডালিয়ার বীজ দেবো, ক্যাকটাস
ছ দেবো। আর এমন সব বাজা বাজা
নিস দেবো যে চুপিচু লোকে হাঁকিয়ে
খবে।

তারপর সেইদিন থেকে চললো
চলের গোপন আনাগোনা।

শ্যামল আর ওর ভালো করে সন্ধানই
ন না। শ্যামল দুই একদিন তরুণের
ড়ীতে গেছে। কিন্তু তার ছোট বোন
ল দিয়েছে, দাদা ত' বাড়ীতে নেই।
খান যেন বেড়াতে গেছে।

এরপর বহুদিন শ্যামলকে তরুণ দেখা
য় নি। শ্যামলের খুব ভাবনা হোল,
জানি কি সব দামী গাছের চারা তরুণ
পেলে জোগাড় করছে!

শ্যামল চারাগুলির খবর নিতে লাগ্‌লো
দ কোন্‌দিকে যায়, ইস্কুলের ছুটির পর
ন মাঠে খেলাধূলা করে।

কিন্তু ইস্কুল ছুটীর পর ও যেন একে-
ে হাওয়া হ'য়ে যায়।

ভাসে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু, বলে না
ছু কি কুছ কি জানে।

একদিন বলে, আজ।, দেখাবো তোকে
খিয়ে।

অবশেষে সেই একদিন এলে ছাত্রির
।। সোমন কিসের পর্ব বলে ইস্কুল
ছিল। তরুণ খুব সকালেই শ্যামল-
। বাড়ী এসে হাজির। বল্লে, চল্—
ন তোকে আমার তপুবন দেখা-
াবো—

শ্যামল বুঝতে পারে না—কি সে
খেন। তবু ওর সঙ্গে এক-পা দু-পা
। তরুণদের বাগানে গিয়ে হাজির হয়।

পাতা,—ঐদিকের বাগানটা যেন
াদলোর মোহে হারায়ে। শ্যামল
দকে তাকায় আর অবাক হয়। এর ভেতর
গাছ জোগাড় করে ফেলেছে ও।

দাঁড়া ওই দার্জিলিঙে নাম একদিনে সফল
হল।

তরুণ শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বলে,
শোন, সব গাছ দুই তিনদিনের পরিবে।
আমি সব চিঠিপত্রে লিখে—

এই হচ্ছে বীকানীর,—এই লম্বা ঐ
হচ্ছে সিমলের কমলালেবু—এ হচ্ছে
চুন্তাপা ধনকমল; একেবারে বাগান
মতো ছুঁচ বড় ধনকমল ফুটবে। এ
ফিলেনথিমাস এর নাম চাঁদমণি, এই
মকটাপার কলম,—এখানে রয়েছে
ই ইয়োলের চারা। নতুন ধরনের কলমের
চারা দেখ্‌বি ত' এখানে আয়—। আর
ঐ যে একরকম ঝোপ দেখ্‌ছিস,—ওটা
'ছে চুড়চড়কা গাছ। এ অঞ্চলে
কোথাও পাবিনে তুই। আরো সব আছে
মতে মজার জিনিস দেখাব আয়—

কিন্তু শ্যামলের আর দেখবার ইচ্ছে
নেই! তার দুকান ঝাঁ ঝাঁ করতে
লাগলো। কেবলি মনে হতে লাগলো,
সে হেরে গেছে – হেরে গেছে।

তরুণ হঠাৎকে শ্যামলের মনের
অবস্থাটা যেন বুঝতে পেরেছে।

একটুখানি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে
মুচকি হেসে বল্লে, দেখে আমি ভাবলি
লিয়ে যাবি যেখানে গাছের অফুরন্ত
ভাণ্ডার। কিন্তু তুই যে ভীতু—কিছুতেই
সেখান থেকে গাছ জোগাড় করে আনতে
পারবি নে! তুই ত' আর আমার মতো
ডার্জিলিঙে লোস্!

ওর কথা শুনে শ্যামল ছেলেবেলাকে
ভুলে উঠ্‌লো!

—কী! আমি ভীতু! আমি আনতে
পারবো না? তুই বল দেখি—কোথায়
আছে এই সব দামী গাছ? আমি আজ
রাত্তিরেই নিয়ে আসবো।

তরুণ বল্লে, সেই নদীর ধারে পোড়ো
জমিদার বাড়ীর বাগানে। যত চাস তুই
তার চাইতেও বেশী আছে। শ্যামল বল্লে
বেশ। দেখাস আমি ভীতু কিনা।
সেইদিন রাত্রেই একটা টর্চ আর একটা
ধারালো ছুরি নিয়ে শ্যামল পা টিপে টিপে
সেই পোড়ো জমিদার বাড়ীর বাগানে
হাজির হল।

চারদিকে জঙ্গল হ'য়ে আছে। কোন
জোয়ার কেউর একদল ব্যাং গাঙেরে
গাঙেরে করে ডাকছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার
দল একটানা ডেকে চলেছে। জোনা-
কাকে জোনাকী পোকারা বাতি জ্বালাচ্ছে।
শ্যামলের মনে একটু গা ছম্‌ছমে এল।

সে এক পা-দু-পা করে এগুতে
লাগলো, আর টর্চ ফেলে গাছ চেনবার
চেষ্টা করতে লাগ্‌লো।

হঠাৎ ওপাশ থেকে কাসির শব্দ শোনা
গেল। শ্যামলই চেঁচিয়ে গলার চীৎকার—

—কেরে, বাগানের ভেতর আলো
জ্বালাচ্ছে? বাবা—বাবা—চুরি বা—
পেয়েছে—!০

পরক্ষণে একটা কুকুরের ডাক শোনা
গেল। কুকুরটা বোধকরি এতক্ষণ বাঁধা
ছিল। এইবার ছাড়া পেয়ে চীৎকার
করতে করতে ঝোপ জঙ্গল ঠেলে এদিকে
আসছে—

শ্যামল বুঝলে, প্রাণ বাঁচাতে হলে—
প্রাণপণে ছোটা ছাড়া আর কোন পথ
নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে ভোঁচো দৌড়
লাগালো। তারপর একটা গাছের ডালে
পা আটকে—সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

তারপর তার আর কিছু মনে নেই।
চুরিদের দল যখন দেখবার জন্য আশে
পাশেই লুকিয়েছিল।

শ্যামলকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখে
ওরা টর্চ নিয়ে ছুটে এলো—তারপর
ধরাধরি করে ওকে অজ্ঞান অবস্থায়
শ্যামলদের বাড়ী এনে হাজির করলে।

তরুণ বল্লে, আমি ভাবতেই পারিনি
তুই আবার সাহস করে রাত্তিরের অন্ধকারে
ওই বাগানে গিয়ে হাজির হবি।

গ্রামে একজন হাতুড়ে ডাক্তার
ছিলেন। তিনি এসে শ্যামলের পা
পরীক্ষা করে বল্লেন, একটা হাড় বে
সচকে গেছে।

তরুণ শুনতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে বল্লে,
তাহলকে তোর ভাবনা নেই। আমার
বাগানে হড়িমচকা গাছ লাগিয়েছি।
তার পাতা বেটে লাগিয়ে দিলে
শ্যামলের পা নিশ্চয়ই ভালো হবে।

সেই বুড়ো মালিটা কাছেই দাঁড়িয়ে-
ছিল। সে এগিয়ে এসে বল্লে, কিন্তু
দাদাবাবু, এ গাছটে ওই একটি হাড়-
মচকা গাছই ছিল। আর কিন্তু খুঁজে
পাওয়া যাবে না।

তারপর তরুণ ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে,
তা হোক। আমার বাগানের ওই গাছের
চাইতে আমার বন্ধুর পায়ের দাম অনেক
বেশী।

শ্যামল তখন তরুণের হাত দুখানা
জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় কথা বল্লে,
এবারও তুই আমাকে হারিয়ে দিলে
তরুণ।

ভুটে-ভেড়া ও রামু ছাগল

"সোঁ সোঁ করবনে বাঘ-ভালুকে ভোরা বাঘ। উরা গোঁফ আর লেজ বাপদের ভীষণ ভেজ।" বলতে বলতে—আমার আজনী ভুতুল বিভিষণ লচাতে আচতে ঘরে ঢুকলো। ঘরে তখন আমরা সেবাসিল মিরে বসেছি—তোমাদের জন্য নতুন গল্পটা লিখবো বলে।

ঘরে ঢুকেই ভুতুল বলল—দাদাভাই! সুন্দরবনের বাঘেদের মত লেজ? আর খুব তেজ? বাঘেদের তেজের একটা গল্প বল না? জানো দাদাভাই, সুন্দরবনে খুব তেজপাতা হয়? আর তেজপাতা খেয়ে খেয়েই বাঘেদের ভীষণ তেজ হয়।"

"এত সব খবর তোমায় দিলে কে বিভিষণ?" জিগ্যেস করলুম—নাকের ডগা থেকে চশমাটা নামিয়ে।

"বলবো কেন তোমাকে? আগে বলো তেজপাতা খেয়ে বাঘেদের তেজ হয় কিনা? আমিও তেজপাতা খাবো। তেজ বাড়াবো।"

"আর তোমার তেজ বাড়িয়ে দরকার নেই। এখানেতেই থাকতে দিই,নো লাও।" যেই বলেছি অমনি—নাক নাবে খুঁতনিটা কেঁপে উঠলো। চোখ পাকিয়ে ভুতুল বললো—বাঘেদের গল্প না বললে তোমার সঙ্গে আড়ি- আড়ি। একদম আড়ি। বেদেমেয়ে চলে যাবো বনি-বাঘের বাড়ি।"

আমি বললুম—"তবে নতুন একটা গল্প খিলতে হবে এখনই আজই!"

ঘ্যাৎ!

"গল্প লিখলে আমি যে পড়তে পারি না। তুমি গল্প বললে, আমি শুনতে পারি, শুনে শুনে আমার সেটা বলতেও পারি। শিগ্‌গিরী বলো। বলাচি—বাঘের গল্প। যে বাঘেদের বাস আছে, তেজ আছে। ইলে আমার আরও বাড় বাড়বে, তেজ হবে, বলাটা বুঝবে তখন কিন্তু।" বলেই ভুতুল ঘরে এসে আমার সামনে সেবাসিলের তলাটই বসে পড়লো।

তেরী না করে অগত্যা নতুন গল্পটা আজ নিয়ে শুরু করতেই হয়।

সোঁদরবনের ধারে—মস্ত নদীর পাড়ে থাকতো এক বুড়ো বুড়ো, আর বুড়ি। তাদের ছিল একটা লম্বাকাণ রামছাগল, আর একটা পাকানো সিং ভুটে-ভেড়া।

বুড়ো বুড়ির মতোই—রামছাগল আর ভেড়াটাও বেশ বুড়ো হয়ে গেছল। তাদেরও গায়ের জোর গেছল কমে তাই কাজ-কর্ম না করে—খালি বুড়ো-বুড়ির কলাগাছ ঢুকতো, বাগানের গাছ-পালা গুলো খুঁড়িয়ে খেতো—আর নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো মশাইয়ের ধারে বাস-বিচুলির গাদার গা এলিয়ে।

বুড়ো-বুড়ি বাগানের ফল, শাকসব্জি বেচেই দুটো পয়সা পেতো। সেই রোজগারেই সংসার চলতো। কিন্তু রামছাগল আর ভুটো-ভেড়াটা বুড়োবুড়ির গাছপালা ফল-পাকুড় খেয়ে খেয়ে সাবাড় করছিল বলেই—তাদের আয় লোকসান হচ্ছিল, রোজগারও কমছিল। কাজেই বুড়ো বুড়ির মেজাজও হয়ে উঠল চিড়বিড়ে একদিন বুড়ো-বুড়ি বেজায় চটে গেল। তাদের অনেকদিনের পোষা সেই রাম-ছাগল আর ভুটে-ভেড়াটাকে খুব বকাবকি করলে। আচ্ছাকরে বকলে। তবে ক্ষান্তুলে দিলে।

বুড়োবুড়ির গালাগাল, বকুনি আর কানমলা খেয়ে—রামছাগল আর ভুটে-ভেড়াও সিং মেড়ে, লেজ নেড়ে—অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

যাবার সময় ভুটে-ভেড়া তবু গোয়াল ঘর থেকে পিঠে তুলে নিলে ভেড়া ভুটিয়া কম্বলটা—সেটা ভুটভুটে বলে বুড়ি গায়ে দিতো। ভুটে সেরেছিল কম্বলটা তাই। সে তার কম্বলটা হাত-পা ছড়িয়ে গড়াগড়ি দিতো, ডিগবাজি খেতো-ঘুমুতো।

রামছাগলটাও পিঠে তুলে নিলে মস্ত একটা বস্তা। তাতে ছিল বুড়ির গায়ের গাত্তু আটটা ঘুনো মাদুর।

ভুতুল গম্ভীর হয়ে বসে বললো "আচ্ছা, আটটা মাদুরকোল কি করে হবে দাদাভাই?"

—কেন হবে না? আটটা রোবড়া গুড়ু —আর একটা রোবড়া-ছাড়ানো।"

—ওহো বেশ! তাই বলো। গল্পটা তাড়াতাড়ি বলো।"

বলে পিঠে রামছাগল, আর ভুটে কম্বল কাঁধে দু'টে-ভেড়া হাঁটতে হাঁটতে চললো সোঁদরবনের দিকে।

খেতে-খেতে-খেতে, রামছাগল আর ভুটে-ভেড়া যখন সোঁদরবনের সুন্দরী-কাঠের জঙ্গলে পৌঁছলো, তখন বেলা গড়িয়ে বিকেল। সন্ধ্যে হয় হয়। ওদের দু'জনের তখন ভাবনা হচ্ছে—রাত কাটাবে কোথায়। মনে আসে বেশ একটু ভয় ভয়।

ঠিক তেমন সময় দূরাগত খলের মধ্যে একটা কটাপটি, কাপটা-কাপটির শব্দ।

রামছাগলটা—ব্যা! ব্যা! করতে করতে সেকালে বলেই ফেললে—"ব্যাপার কী!

ভুটে-ভেড়া—ভু-ভু করতে করতে বললে—ভু—উ!

চোখ বন্ধ করে, কান খাড়া করে রামছাগল আর ভুটে-ভেড়া এগিয়ে গেল সাবধান হয়ে। দেখে একটা মস্ত ভূমীর —লেজের দিক থেকে বয়েছে একটা আস্ত হরিণ-বেকল চাইবাঘকে। গিলেও ফেলেছে প্রায় বাঘের গোটা শরীরটা। বাঘের খাড় আর মুণ্ডুটা তখন ভূমীরের মুখের বাইরে। আর বাঘের সেই মুণ্ডুটা রামছাগল আর ভেড়াকে দেখে ফুকরে কেঁদে উঠলো—"বাঁচাও দাদারা আমাকে।"

ভুটে-ভেড়া তখুনি ছুটে গিয়ে—ভূমীরটার চোখেমুখে মাথে আর সেই ভুটভুটে ভুট কম্বলটা ঘুরোঘুরিয়ে দিয়ে—তড়াক করে তার ওপর উঠে—বাঁকানো সিং দিয়ে ভূমীরটার মাথায় আস্তে করে কাতুকুতু দিতে লাগলো।"

আর রামছাগলও তাই না দেখে কইমাছ খলে থেকে বার করলে—দুটো ছুনো নারকোল।—তারপর কুমীরটার মাথার ওপরের কষ্ঠলের দু'পাশে দু'ঠোক্কর মেরে বলে—সামনের দু'পাশে দুটো ছুনো নারকোল নিবে—কুমীরের মাকে মুখে দশীদম মারতে লাগলো।

মারের চোটে, কাহুকুহু খেয়ে—কুমীরটা ছটফট, ছটফট—তার ওপর ছুনো নারকোল দুটো খেঁৎলানোয় ছোকড়া দুকছে কুমীরটার মাকে — তাতেই লাগল সুড়সুড়ি! কুমীরটা হাঁ করে—জোরসে এক হাঁচি দিলে।

হাঁচির চোটে— বাঘের মুণ্ডুটা তিনহাত দূরে গিয়ে পড়লো। রামছাগল আর দুটো ভেড়াও কম্বল শুদ্ধ ছিটকে পড়লো—সাত হাত দূরে।

কুমীরটাও ভয় পেয়ে ঝাবড়ে গিয়ে, পিছু হেঁটে নেমে পড়লো খালের জলে। কুমীরও বাঁচল রামছাগল আর দুটো ভেড়াও বিপদ কাটলো। কিন্তু সন্ধ্যে তখন হয়ে গেছে! সোঁদরবনে শুরু হয়েছে শেয়াল, বাঘেদের হাক-ডাক!

ভয়ে ভয়ে রামছাগল—আর দুটো ভেড়া কম্বল-টম্বল গুটিয়ে—খলের ভেতর বাঘের মুণ্ডুটা ভরে নিয়ে গুটি গুটি এগুতে লাগলো।

খানিকটা দূরে এগুতেই দেখে—জঙ্গলের ভেতর একটা ঝোপের মধ্যে ইয়া মোটা কেঁদো কেঁদো চার পাঁচটা বাঘ গোল হয়ে বসেছে—আর মাঝখানে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর মস্ত হাঁড়ি চড়িয়ে ওরা কি যেন রাঁধছে।

দিব্যি খোশবু! খাসা গন্ধ!

দূর থেকেই রামছাগল আর দুটো ভেড়া গন্ধ পেয়ে বুঝলো—পায়েস রাঁধছে ওরা। দারুণ খিদে, দুটো—দুটোটার সঙ্গে লড়াই করে এতো-ভেড়া আর রামছাগলের খিদে পেয়েছে—তার ওপর পায়েসের ঐ দুরন্তরে গন্ধে ওদের জিভে জল আসছে। লোভ সামলাতে না পেরে—ওরা দু'জনে বাঘেদের মজলিসের পাঁশে হাজির। খলে কম্বল নামিয়ে দু'জনে খুব গম্ভীর চালে পা-ফাড়িয়ে বাঘেদের কাছেই বসে পড়ল। রামছাগল আর ভেড়াটাকে দেখে বাঘেরাও ভারি খুশি। বাঘেদেরও লোভ সামলাতে না পেরেই বললো—"ভালই হলো—তোমরা এসে ভালো—ভেড়া-ছাগলও এসে গেছে।"

শুনেই দুটো-ভেড়া আর রামছাগলের বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু মস্ত বোকা সবাই ভাবে ভেড়াছাগলকে, ওরা ভতটা বোকা নয়—।

রামছাগলটা পট করে মুখ ঘুরিয়ে দুটো-ভেড়ার কানে কানে কি যেন বললে! দুটোও চট করে খলের ভেতর থেকে সেই বাঘের মুণ্ডুটা বের করলে—বললে "এটাই খাওয়া যাকবে বাবু।

রামছাগল বললে—দূর বোকা! ওটাতো ছোট মাথা, বড় মাথাটা বার কর।"

রামছাগলের বুদ্ধি মস্তো—আমার খলের মধ্যে বাঘের মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে-নারকোলগুলো মস্ত মস্ত করে নেড়ে—দুটো-ভেড়া আবার সেই বাঘের মুণ্ডুটাই বার করলো।

রামছাগল বললে—"আরে এটাও নয় সেই বড় বাঘের মুণ্ডুটা বার কর না।" দুটো-ভেড়া এমনি করে রামছাগলের কথা মতো—সেই একটা বাঘের মাথাই বারে বারে বার করে—আর ঢোকায়। যেন অনেকগুলো বাঘের মাথাই ভরে এনেছে—তারা খুশি হে—এ মস্ত বাঘগুলোকে দেখায়, শোনায়, বাজা দেয়।

'ওদের খলির ভেতর থেকে বার বার বাঘের মুণ্ডু বেরুতে দেখে—বাঘেদের মজলিসের, ছোট বাঘ, বড় বাঘ, সর্দার বাঘ, কেঁদো বাঘ সকলেরই মুণ্ডু ঘুরে যায়। সকলেই বেজায় ভয় পায়। কেউ কাউকে কিছু বলে না পারে মার মার।- ভেঙ্গে হয়ে পড়ে যায়।

"দাঁড়া আমি কটুপাতা ছেটে আনি"—বলেই সর্দার বাঘটা আগেই সরে পড়ল। বাকিরা দুরে কেঁদো বাঘও উঠলো—চাপা গলায় বললে—'সর্দার এমনিতে ফিরেছেনাথে—দেখে আসি কি হলো।"

অনেকক্ষণ কেটে গেল—সর্দার বাঘ কেঁদো বাঘ কেউ ফিরলো না দেখে—বাকি কটা বাঘও বাপরে মারে। ভয়ে ভয় পেয়ে সেই ওটিয়ে দে ছুট, দে ছুট।

রামছাগল আর দুটো ভেড়া বাঘেদের কাণ্ড-কারখানা দেখে হেসে লুটো-পুটি। দুটো-ভেড়া হাসতে হাসতে বললে—"বাবু দাদা, তোমার ভাই এক বুদ্ধি—তবু লোকে যেন বলে বোকা যেন রামছাগল!

বলবেই তো ভাই দুটু—বাঘগুলোর তেজপাতা আর কাণ্ডকারখানা খেয়ে খেয়েই আমরা তেজ আর বুদ্ধির গরব।

তারপর দুটো আর বাবু পায়েসের হাঁড়ি নামিয়ে সপাসপ—পেট ভরে পায়েস খায়—আর বলে—খাসা গন্ধ। খাসা গন্ধ।

মুখ বেঁকিয়ে দুটুন বলে—"হবেই তো। বাঘেরা পায়েসে কিচ্ছুই তেজপাতা দিয়েছিল তেজ বাড়াবার জন্যে। বাঘেরা পায়েসটা খেতে গেলে ওরা কখনও ভয় পেত না, পালাতো না।

স্টেনসিল (১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

সবচেয়ে। স্টেনসিল ছাপার জন্য যে কার্ডবোর্ড ব্যবহার করা হয়, সেই কার্ডবোর্ড স্টেনসিলের একটি উপযুক্ত। এরকম কার্ডবোর্ড কালি পাওয়া যায়। যে কোন রঙের একটি কালি যা রঙিন কাগজে ছোপে একাধিক কালি ব্যবহার করতে পারো। কালি শক্ত হলে টার্পিনতেল দিয়ে পাতলা করে নেবে। কালি যেন আবার খুব পাতলা না হয়, সেটা যেন একটু থকথকে থাকবে।

এই লেখার সঙ্গে তোমাদের সুবিধের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্টেনসিলের নক্সার ছবি দেওয়া হোল। এর মধ্যে একটি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেটা বোধহয় বলে দিতে হবে না।

শিখ গুরু

স্বামিনীকান্ত সোম

গুরু তেগবাহাদুর ধর্মের জন্য যখন নিজের মাথা দিলেন শত্রুর কাছে, তখন তাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহের বয়স কেবল ন' বছর মাত্র। গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা ক'রে গুরু নানক শিখজাতি বিধ্বংসে দিশাহারা হয়ে পড়লো। তারা ভেবেছিল তাদের জীবনবিসর্জন দেওয়া বটেই তাদের সন্তানদের শিখধর্মও বুঝি থাকে না।

গোবিন্দ সিংহ সব বুঝলেন। তাঁর পিতার হত্যা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝলেন, শিখ ধর্মের মহা সঙ্কটকাল উপস্থিত। আর এ-কথাও বুঝলেন যে, শিখধর্ম না থাকলে সবাইকে দলে দলে মুসলমান হতে দেখতে হবে, নিশ্চয়। অতএব শিখধর্মের ও শিখজাতিকে রক্ষা করা চাই-ই। মনে মনে তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন। তাঁর বয়োবৃদ্ধি তাঁর দৃঢ় হতে লাগলো। এ জন্য সময় চাই। তিনি এক নির্জন পাহাড়ে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। ক্রমশঃ শিষ্য শিষ্যেরা তাঁর কাছে যেতে আরম্ভ করলেন। তিনি নিজের ইচ্ছামতো একটি দুর্গ তৈরী করালেন। কি করে নিজ দেশকে স্বাধীন করবেন, কি উপায়ে শিখধর্ম রক্ষা করবেন, এই হলো তাঁর চিন্তার বিষয়। কিন্তু শুধু চিন্তাতেই তো কাজ হবে না। এ জন্য তিনি নিজেকে নানাভাবে তৈরী করতে লাগলেন। খুব ভাল করে ঘোড়ায় চালাতে শিখে নিলেন। তীর-ধনুক চালাতেও দক্ষ হয়ে উঠলেন। ঘোড়ায় চড়তে আর শিকার করতে বড়ো ওস্তাদ হয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয়। সংস্কৃত, হিন্দি ও ফার্সী ভাষা শিখলেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে বীরপুরুষদের জীবন-কথা ও তাঁদের বীরত্বের কাহিনী সংগ্রহ করে নিজেই তাঁদের এমন জীবন্তভাবে লিখলেন যে, সে-সব কাহিনী শুনে শুনে শিখদের মন উৎসাহে ভরে উঠতে লাগলো। তাঁর আদর্শের কথা, তাঁর সাধন ও বীরত্বের কথা দেশময় প্রচারিত হলো। দলে দলে লোক এসে তাঁর কাছে জড়ো হতে লাগলো। তিনি এদের গুরু হানীয় হয়ে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগলেন সৈনিকের মতো করে। এইভাবে বহুদিন কাটলো। শিখেরা সংখ্যায় এখন অনেক আর সকলেই তাঁর অনুগত, এমন অনুগত যে তাঁর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

শেষে একদিন শিষ্যদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলো। গুরু আদেশ দিলেন যে, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন আনন্দপুরে খুব বড় একটি সভা হবে, আর ঐ সভায় তিনি সকলকে উপদেশ দেবেন। এই আদেশ পেয়ে যেখানে যত শিখ ছিল, সব এসে একত্র হলো, গুরু কি উপদেশ দেন শোনবার জন্য। সভামুখে একটি উঁচু টিলা। সেটি তাঁবু দিয়ে সুন্দরভাবে ঘেরা।

গুরু এসে দাঁড়ালেন। পরিধানে তাঁর উজ্জ্বল পরিচ্ছদ। মাথায় শিরস্ত্রাণ। হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। তারপর সেই বিরাট জনতাকে লক্ষ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন,—"তোমাদের ভেতর এমন কেউ আছ কি, যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পার? কে আছ বীর, এসো। একজন শিখ গুরুর জীবন আমি চাই।" গুরুর হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। জনতা নীরব। গুরু আবার হাঁকলেন, "কে আছ বীর, কে আছ ত্যাগী, এগিয়ে এসো।" জনতা নীরব—কোন সাড়া নেই। গুরু আবার ডাক দিলেন, "কে আছ বীর। এগিয়ে এসো।" জনতার ভেতর থেকে একটি একজন উঠে দাঁড়ালো। হাতে তুলে লোকটি বলে উঠলো,—"গুরু গুরুজী কী ফতে!—আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।" লোকটি এগিয়ে এলো। গুরু তার হাত ধরে তাকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অসি ঝাঁচ করে শব্দ হলো। বাইরের জনতা চমকে উঠলো। সবাই বুঝলে যে, লোকটির মাথা কেটে ফেললেন গুরু। তারপর তখন তাঁর থেকে তিনি বেরিয়ে এলে, তাঁর হাতের সেই খোলা তলোয়ারে রক্ত চিন চিন করে পড়ছে। জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

গুরু সেই জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আবার ডাক দিলেন —"আর কি কেউ আছ তোমাদের ভিতর যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে?"

সবাই দেখলে যে, গুরু একজনকে মেরে ফেললেন আরো একজনকে চান। কেউ সাড়া দিলে না—কেউ এগিয়ে এলো না। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গুরু বললেন—"কী, কেউ নেই! শিখদের ভিতর সত্যিই আর কি কেউ নেই যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে? অবশ্যই আছে।" "গুরু গুরুজী কী ফতে।"—বলে আর একজন এগিয়ে এলো গুরুর কাছে। গুরু তাঁর হাত ধরে তাকেও নিয়ে গেলেন তাঁবুর ভিতর। আবার খাঁচ করে শব্দ হলো। তারপর রক্তে রোঁয়রে এলেন, সবাই দেখলে, তাঁর খোলা তলোয়ার দিয়ে আগের মতোই তাজা রক্ত ঝরিয়ে পড়ছে।

সবাই এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু এই শেষ নয়। গুরুজী হাঁকলেন, —"আর কেউ প্রস্তুত। আর কেউ প্রাণ দিতে পার? আরো একজনকে আমি চাই।" আর একজন উঠে দাঁড়ালো। "গুরু গুরুজী কী ফতে" বলে কাছে এলো। গুরু তার হাত ধরে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেলেন। খাঁচ করে শব্দ হলো। গুরু রক্তমাখা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। এখনো শেষ নয়। তীক্ষ্ণ-উচ্চ কণ্ঠে হাঁকলেন, "আরো একজন চাই। কে প্রাণ দিতে পার, এস।" "গুরু গুরুজী কী ফতে"—শিখের ভিতর রব উঠলো। আর একজন কাছে এসে দাঁড়ালো। গুরু তাঁর হাত ধরে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেলেন। খাঁচ করে শব্দ হলো। জনতা স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেল। গুরু আবার তলোয়ার হাতে বাইরে এলেন। তলোয়ার বেয়ে রক্ত পড়ছে টস টস করে। গুরু উগ্র কণ্ঠে আবার হাঁকলেন,—"আর কে আছ? আর কে প্রাণ দিতে পার!

আরো একজন চাই। কি, কেউ নেই! এতগুলো গুরুদ্বী কী করবে, বলে আওয়াজ উঠলো। একজন এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো। গুরু তার হাত ধরে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেলেন। শব্দ হলো, খ্যাচ করে।

কিন্তু কী এ সব! গুরু কি এই পাঁচজন বীর ভক্তের প্রাণ নিলেন? সত্যিই কি এক এক করে এই পাঁচজনের মাথা কেটে ফেললেন গুরু নিজের হাতে? কিন্তু এ কি! এ যে আবার এক অদ্ভুত দৃশ্য! ঐ তো গুরু বেরিয়ে এলেন তাঁবু থেকে। কই, আগের মতো তাঁর হাতে রক্তমাখা তরবারি তো নেই! তার বদলে, এ কি! সঙ্গে যে সেই পাঁচজন বীরভক্ত, যাদের তিনি একটু আগে কেটে ফেলে দিলেন বলে সবাই ভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল! এ কি তাজ্জব ব্যাপার!

আসল ব্যাপার এই যে, শিষ্যদের ভিতর সত্যিই শিষ্য আছে কিনা, গুরু তা পরীক্ষা করছিলেন। তাঁবুর মধ্যে আগে থেকে পাঁচটা ছেড়াকে আড় গোপনে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কেউ-ই তা জানতো না। প্রতিবারে এক একটা ছেড়াকে খ্যাচ শব্দে কেটে, সেই রক্ত এনে দেখানো হচ্ছিল, আর তাই দেখে সবাই ভয়ে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। যারা যারা গুরুর আহ্বানে গিয়ে হাজির হয়েছিল, প্রকৃতই তারা আত্মত্যাগী ভক্ত। যে পাঁচজনের মাথা কাটা গেছে বলে সবাই ভেবেছিল, এখন দেখলে যে সেই পাঁচজন গুরুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রসন্ন মুখে। এই দেখে এখন প্রত্যেকেরই আনন্দে বুক ভরে গেল। সে কেন গুরুর ডাকে সাড়া দেয় নি।

গুরু এই পঞ্চ বীরের সাহস দেখে অত্যন্ত সুখী হলেন। তিনি তাদের আলিঙ্গন দিয়ে বললেন,—তোমরাই প্রকৃত সত্যিকার শিখ। এখন থেকে তোমরাও যা, আমিও তাই—কোন প্রভেদ নেই। আজ থেকে তোমাদের উপাধি হলো—'সিংহ'। তোমাদের আদর্শেই শিখধর্মের জয় হবে সবে।"

এতদিন গুরুর নিজের নাম ছিল গোবিন্দ রায়। এবার থেকে তাঁর নাম হলো—গুরু গোবিন্দ সিংহ।

তারপর শিখ জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন,—আজ থেকে তোমাদেরও প্রত্যেকেরই উপাধি হলো—'সিংহ'। এবার থেকে তোমরা মাথার চুল বা দাড়ি কেটে ফেলবে না। প্রত্যেকে একখানা করে লোহার বালা হাতে বালা করবে। সদাসর্বদা একটা কৃপাণ প্রত্যেকের সঙ্গে থাকবে। যুদ্ধে তোমরা উঠবে। উঠে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবে। গুরুর সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা হবে অজেয়। শিখজাতি এবার বড় প্রবল হয়ে উঠে শিখধর্ম রক্ষা পাবে, আর সমস্ত ভারত শিখের ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

টক্কা-টরে-টক্কা

যাদবেন্দ্রকুমার ঘোষ

১

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা
টেলিগ্রামে খবর এল
তিড়িং মিড়িং গল্প-কড়িং
যাবেন তীর্থে বক্সা।

২

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা
জরুর খবর ছড়িয়ে গেল
পাড়ায় পাড়ায় ঘরে-ঘরে ফড়িং
পাখনার নাম লক্সা।

৩

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা
তারপর থেকে খবর এল—
সংগে যাবেন বন্ধু-কড়িং
ইনসিউর-এর বক্সা।

৪

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা
আবার খবর নেই যে এল
ফোন বাজল—কাঁই.....
'হারো, পাল্লা-বক্সা...'

৫

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা
তার এসেছে এলোমেলো
তিড়িং মিড়িং গল্প-কড়িং
হঠাৎ পেছেন অক্কা।

৬

টক্কা-টরে-টক্কা
টক্কা-টরে-টক্কা
মাথার মধ্যে ঘুরছে কেবল
খেলেক দাঁড়া : কাঁ:—কাঁ:—
সবটাই কি ফক্কা?

সন্ধ্যাকাশ রাঙানো হয়ে সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকারের শাসনটা আরও ঘনো কিন্তু চরাচরের বুকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। নিশাচর শিকারীরা তখন আপন আপন বাসায় ফিরে আসে। শাবকদের জন্যে আহার জোগাতে টেনে নিয়ে তারা তখনও দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু বাদুড়েরা রাত্রিচর পাখি—তাই আকাশকে তারা ভয় পায় না। বরং অন্ধকারের শাসনটা আরও ঘনো হয়ে ওঠে তখন ওরা ক্লান্তও উজ্জীবিত হয়ে উঠে। দিনের আলো ওদের চোখে সহ্য হয় না। তাই তখন লুকিয়ে থাকে গুহার মধ্যে পুরনো ভাঙা বাড়ী কিংবা দুর্গের ভিতরে, অথবা কোন ফাঁকড়া গাছের ডালে পা আটকে ঝুলে থাকে।

সাধারণতঃ বাদুড় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং বংশপরম্পরায় একই গুহায় বা ভাঙা বাড়ী ও দুর্গে বসবাস করে। তবে কোন কোন জাতের বাদুড় তাদের প্রীষ্মকালের বাসা থেকে শীতের সুরুতে দূরে পালায়। হাজার হাজার মাইল দূরে পাড়ি জমায়। আবার এমনও দেখা গেছে যে শীত শেষে যখন এক দল বাদুড় তাদের শীতের আস্তানা থেকে বাইরে যাচ্ছে তখন আর এক দল গিয়ে তাদের থেকে যাওয়া আস্তানা দখল করছে। মনুষ্যের একটা নির্দিষ্ট সময় এরা ঘুমিয়ে কাটায়।

সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য বাদুড়দের খ্যাতি আছে। গভীর আঁধার ঘেরা ঘরের মধ্যে ওরা ঠিক ঠিক পথে উড়তে সক্ষম। তাই ত ওরা আঁধারের মাঝী। এরা যখন শ'য়ে শ'য়ে দল বেঁধে অন্ধকার পথ পায় হয় তখন পরস্পরের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে না। তাই লোকে বিশ্বাস করে যে বাদুড় চোখ বন্ধ করেও যাতে উড়তে পারে। শুধুমাত্র ঘরে কিংবা শিকার ধরবার জন্যে তবেই দৃষ্টি শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না।

ইটালির জীব-বিজ্ঞানী এ্যাবি-স্পালানজানি (Abbe Spallanzani) আঠারশ শতাব্দীতে স্বাইডের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনটী বাদুড়কে অন্ধ করে দিয়ে তিনি ছেড়ে দেন। কিন্তু তাতেও অন্ধকারে তাদের গতি অতিক্রম করে উড়তে সক্ষম হল। তিনি আরও দেখলেন যে অন্ধ অবস্থায় ওরা শিকার ধরতেও পারছে। দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন বাদুড়দের মতন ওরাও উড়তে শিকার ধরতে সক্ষম। এবার কয়েকটী বাদুড়ের শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। বস্! এবার ওরা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে লাগল। তিনি প্রমাণ করলেন যে, বাদুড় তার শ্রবণ শক্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-দশকে আরও পরীক্ষা চালিয়ে জীব-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে উড়ন্ত অবস্থায় বাদুড়রা একরকম মৃদু শব্দ করে। মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ে সেই শব্দের তরঙ্গ কোন সাড়া জাগায় না। এই শব্দের প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও বাদুড় সঠিক পথ ধরে উড়ে যায়। সুতরাং শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ঠিক থাকলে অন্ধ-বাদুড়েও উড়তে ও শিকার ধরতে অসুবিধা হয় না—কিন্তু বিকল হ'লে বাদুড় বাঁচবে। একটী কান খোলা থাকলেও বাদুড় কিছুটা স্বস্তি পায়। মুখ বন্ধ করে দিলে বাদুড় আবার বাঁচার হয়ে পড়ে। কারণ ওরা নিজেরা আর শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না—ফলে প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে আর উড়তেও পারে না।

উড়ন্ত বাদুড়কে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দু'ধরনের শব্দ শোনা যায়। একরকম শব্দ—চড়ুনার শব্দ। আর এক ধরণের মৃদু ক্লিক্-ক্লিক্ শব্দ উহার মুখ থেকে। এক সেকেণ্ডের সামান্য ভাগের এক ভাগ সময় এই শব্দ তরঙ্গের তীব্রতা বজায় রাখে। তারপর শব্দ তরঙ্গের সময় বাদুড় যদি কেবল নিজের মুখ-নিঃসৃত শব্দ শোনে তাহ'লে উড়তে পারবে না। নিজের মুখ-নিঃসৃত শব্দের প্রতিধ্বনি তাকে পথ দেখায়। বাদুড় যখন মুখ থেকে শব্দ সৃষ্টি করে তখন তার শ্রবণ-ইন্দ্রিয় থাকে নিষ্ক্রিয়। পরমুহূর্তে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের পেশীসমূহ সচল হয়ে প্রতিধ্বনির শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে শব্দ সৃষ্টি ও প্রতিধ্বনি গ্রহণের দ্বারা বাদুড় উড়ে চলে। সাধারণতঃ বাদুড় শিকারে চঞ্চল-পলাশ হয়ে মৃদু চিৎকার করে। আর তার এই চিৎকারেরও তারতম্য ঘটে। সামনে কোন বাধা দেখলে বাদুড় ঘন ঘন চিৎকার করে—না'হলে তার ঘন ঘন শব্দ করে না।

প্রতিধ্বনি-অনুসরণ-প্রক্রিয়ই (Echolocation) বাদুড়ের জীবন-ধারণের একমাত্র সম্বল। রাডার (Radar) এবং সোনার (Sonar) যন্ত্র ও প্রতিধ্বনি অনুসরণকারী বেতার তরঙ্গের প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে যাতায়াত শত্রু-বিমানের আগমন-বার্তা ধরতে পারে। আর সোনার যন্ত্র সমুদ্র-গর্ভে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে তার প্রতি-ধ্বনির সাহায্যে অতল জলের বহুমধ্যের নিশ্চেতন পদার্থকে ডুবো আহাজের অবস্থান নির্দেশ করে। *

অন্ধ ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রতিধ্বনি-অনু-সরণ-প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে। হাতের লাঠি ঠুকে ঠুকে তাই তারা সহজেই পথে যাতায়াত করে।

* এই প্রবন্ধ রচনায় এনসাইক্লো-পিডিয়া। বিভিন্ন ইংরাজী পত্র-পত্রিকা এবং Margaret O. Hyde এর 'Animal clocks and Compasses' নামক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি।—লেখক

অপূর্ণের সমাপনে—

(৬৫ পৃষ্ঠার পর)

বাড়ির জিনিসই নয়। এটা স্টেশন মাষ্টারের বাড়ি থেকে আমি আনিয়েছি।

বিলাস দত্ত—কেন? আপনার বাড়িতে কি কোন টেবিল ক্লথই নেই?

বিজয়বাবু—অনেক, অনেক আছে। কিন্তু গৃহিণীই বললেন, স্টেশন মাষ্টারের বাড়ি থেকে একটা টেবিল ক্লথ আনিয়ে নাও।

গম্ভীর হয়ে গেলেন নৃপাবতারণের বিলাস দত্ত। খুব গম্ভীর। যোগবলের জলদের বাজারে সাজাই ভয়ানক মন্দা আছে; এখানে এসে চাপা ক্রুদ্ধ যোগবল মুহূর্তাকুল হয়ে যায়।

বিজয়বাবু ডাকলেন—হরিবাস, জলদি কর।

আদুড় গা আর আধময়লা একটা খাটো ধুতি পরা, চাকর হরিবাস এসে ঘরে ঢোকে। আসন পাতে, আর এক গেলাস জল রেখে যায়।

—বসুন স্যার। বিলাস দত্তকে খেতে বসতে ইঙ্গিত করেই চলে যান বিজয়বাবু; আর তখনই নিজেই ভাতের থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। ভাতের থালা আসনের সামনে রেখে দিয়ে বিজয়বাবু আবার চলে যান। আবার একটা থালায় চারটে বাটি নিয়ে ফিরে আসেন। ডাল, পেঁপের ডালনা, বেগুন ভাজা আর আলুর দম।

খেতে বসেন আর খেতেও থাকেন বিলাস দত্ত। কিন্তু খেয়ে নিয়ে অদ্ভুত রকমের এক-একটা ভুল করতে থাকেন বিলাস দত্ত। যখন ডালের বাটিতে সাঁড়াশীর হাতটাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। জলছে হাতটা। আলুর দম পাতে ঢেলে তার উপর একটা বেগুন ভাজাকে চটকে দিলেন। এক গ্লাস জল তা ও মুখে দিয়ে তিনবার জল খান বিলাস দত্ত।

বিজয়বাবু হাসেন—পেঁপের ডালনাটা ফেলে রেখেন না, স্যার। খেয়ে দেখুন আপনার ভালই লাগবে মনে হয়। ঝি-এক্সপার্ট দিয়ে ডালনা করা হয়েছে, খাটি গাওয়া ঘি।

বিলাস দত্ত—আপনার স্ত্রীর মায়ের হাত তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে।

—না না; আজ সবই হরিবাস রেঁধেছে। আমার স্ত্রী এরকমের একটা আধা-বাঙালী চাকরকেও বাঙালী খাবার শিখিয়ে রেখেছে। বলতে বলতে শেষে হেসেই ফেললো বিজয় বসু।

বিলাস দত্তের হাত কাঁপে; দুপুর-বেলার এমন চনচনে ক্ষুধার মুখটাও যেন বিস্বাদে ভরে যায়। তবু খেতে থাকেন বিলাস দত্ত।

বিজয়বাবু শেষে আরও একবার উঠে গিয়ে এক বাটি পায়েস নিয়ে আসেন আর বিলাস দত্তের হাতের কাছে রেখে দিয়ে, আর খুবই বিনীতভাবে বলেন—এইবার মধুরেন সমাপয়েৎ। আমার স্ত্রী আমায়……।

হেসে ওঠে বিলাস দত্তের দুই চোখ —তাইবলুন আর কিছু না করতে না পেরে; শ্রীতাঁথির জন্য যে এই পায়েসটুকু নিজের হাতেই তৈরী করতে পেরেছেন আপনার স্ত্রী, সেটাই যথেষ্ট।

বিজয়বাবু—আজ্ঞে না; এই পায়েস স্টেশন মাষ্টার মশাইয়ের স্ত্রী আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। এক ডেকাঁচ পায়েস, স্যার।

আমার একটু পায়েস মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন বিলাস দত্ত। তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে নিলেন। আরশির আর ঘরের ভিতরের তক্তপোষের উপরেও বসলেন না।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েই ডাক দেন বিলাস দত্ত। আমি চাঁদ।

বিজয়বাবু ছুটে আসেন—এখনই যাবেন?

বিলাস দত্ত—হ্যাঁ।

বিজয়বাবু—আপনার বেশ কষ্ট হলো স্যার।

বিলাস দত্তের চোখ দুটো কেঁপে ওঠে; ঘুম ঘুমিয়ে পড়ে যাওয়া মানুষ যখন ঘুমতে চাইলে তার চোখ দুটো যেমন করুণ হয়ে কাঁপে আর জলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন বিলাস দত্ত—হ্যাঁ, বেশ কষ্ট হয়েছে। আমি এখন, চাঁদ।

ভাগবতী তনু

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কৌতূহল কেন্দ্রে পড়েছি। তাঁর জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন-ভরা যার এতো জিজ্ঞাসা, অন্ত-জিজ্ঞাসা যাদু আর কাঁসে তার বিয়াহি হবে? আমি তুর নাম রাখলাম,—মৈত্রেয়ী।

সেই থেকেই আমার মৈত্রেয়ী নাম। আমি আমার পাঠশালায় ভর্তি হলাম। আমি 'পাঠশালা' বলছি বটে, আসলে সেটি চতুষ্পাঠী। সংস্কৃত পড়ানো হয়।

বাড়ীতে বড়ো মা-ও আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন।

সব মিলিয়ে, যেন আমরা সেই আর্য-ভারতের ছোটো তপোবনে বাস করতে এসেছি। বড়ো-মা আমার মার ইতিহাস কতটুকু শুনেছিলেন কে জানে, মাকে সে-সম্পর্কে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না। দেখতে দেখতে এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, আমার মা হয়ে গেলেন বড়োমাই ছায়া-বিগ্রহ। বড়ো-মার একান্ত অনুগত। যাকে বলে, 'ভক্তি' করতে আরম্ভ।

দুপুরে গিয়ে এক একদিন বড়ো-মার পা টিপ্‌তে বসতেন মা। মড়মড় শব্দে সবে পা টেনে নিয়ে উঠে বসতেন,—বলতেন,—ও কী দুর্দান্ত! আমরা নিজেরাই সোধকা, 'সেবা' আমাদের নিতে নেই।

মা বলতো,—জানবত পড়বে তিনি? তোমার মুখে 'হরিকথা' শুনতে যেন লাগে।

বড়মা হেসে বলতেন,—মাস্টারে তোমা জানবজনেই 'হরিকথা' বলিস বুঝি?

মা একটু অপ্রস্তুত হতো, বলতো—হ্যাঁ, প্রায় তা-ই। সুর করে পড়ে বলে, সুরটা আলাদা।

—তুই আমিস না সেই সুর?

মা আরও লজ্জা পেতো, মুখ নীচু করতো।

বড়ো-মা তখন মাকে আরও ক্ষেপে দিতো। বলতো,—শোনা, মা? 'তব' মানে কথা সঠিকভাবে জানলে তার আর মার আছে? মা—মা?

শুধু 'হরিকথা'ই নয়, মা ধীরে ধীরে আরও গান গাইতে লাগলেন বড়ো-মার অনুরোধে। আমি পর্যন্ত শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মার গান আগে, আমি কখনো শুনিনি। এতো সুন্দর আমার মায়ের গলা?

মীরার একটা ভজন শুনতে শুনতে বড়মার চোখে জল এসে গেল। চোখ মুছে বললেন,—হ্যাঁরে, এরা বড়ো 'জাত্যার' নিয়ে দুপচাপ আছিস?

সেই থেকে দুপুরবেলা, নির্দিষ্টমত 'ভজনের আসর' বসতে আরম্ভ করলো। পাড়ে থেকে ভাড়াটেরা ওরে আসতো, লাইন লাইন হয়ে থাকতো। কারুর কারুর হাতে জপের মালা, ভজনও শুনছে জপও চলছে। কেউ কেউ ঝুঁ দিয়ে ঝুঁ দিয়ে কেঁদে উঠতো।

মার সেই তন্ময় হয়ে গান গেয়ে-ওঠা দেখে আমারও প্রবল ইচ্ছা হলো, আমি গান শিখবো।

মা অবশ্য একটু বেলোহিল আমার কথায়, কিন্তু বলেনি। বড়ো মা শুধু বলেছিল,—তা শেখ না, গান?

গান অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার হয় নি। কিন্তু একটা সময় তাঁর আমার ছিল, আমার দুটো মা যেন দুই সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে, একে অপরের পরিপূরক।

মাস্টারের বাড়ী ঝিকী ভয়ার মতন প্রচুর টাকা ছিল আমার মার হাতে? বেনারসের ব্যাঙ্কে সে-সব 'বন্ধুল করে আনা',—চেক্-বই হিসাব-টিসাব,—সব মা করেছিল নিজের হাতে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতাম, ইংরেজীতে চিঠিপত্র সবই মা লিখতো নিজের হাতে।

দুএকে মার গলা ছাড়িয়ে গেলে বলতাম, কতদূর লেখাপড়া শিখেছো তুমি, মা?

—কোথায় আর শিখলাম!—মা বলতো,—জোর মাসার কাছেই যেটুকু শেখবার, শিখেছি।

বলাবাহুল্য, বেনারসের বিকেলের দিকে এক মাসের স্কুলে আমি যেতাম। এ-স্কুলের শিক্ষা ঠিক মাস্টারের মতো ছিল না, তবে, এখানে পাশের বাড়ীটা শেখার খুব মন্ত্র করে। বড়ো হয়ে যেনেছি, এখানে যা শিখেছি, তা অনেকটা 'ভক্ত' ধরনের। এ-স্কুল যারা চালাতেন, কিন্তু সংসারের ব্যাপারে বেশী কিছু খরচ করতে চাইলেই বড়ো-মা বকুনি দিতো মাকে, বলতো,—এসব কী ছেলেমি? মেয়ে বড়ো হচ্ছে, সে-খেয়াল আছে?

কিন্তু 'মেয়ে' যখন সত্যিই স্বাভাবিক ভাবে একদিন 'বড়ো' বা 'সমর্থ' হয়ে উঠলো, তখন 'বিয়াহ' নামক ব্যাপারটি নিয়ে দুই সখীতে পরা পরামর্শ চললেও আমার 'ভাগ্য' আমাকে নাটকীয়ভাবে ছিন্ন এক জগতে টানিয়ে নিয়ে ফেললো।

সন্ধ্যার সময় মা, বড়ো-মা দুজনেই বিশ্বনাথের মন্দিরে যেতো আরতি দেখতে। আমার পায়ের মুলের দুটি থাকলে আমি যেতাম। সেদিন আমি বাড়ীতেই আছি, আমার বন্ধু-টন্ধু কিছুর ছিল না, চতুষ্পাঠী তখনকার মেয়ে নিয়েছিলাম, আর পায়ের মুলে আমিই ছিলাম একমাত্র বাঙালী মেয়ে। এখানে আর যা ছিল শুধু একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে, মেয়েটি বাঙালী। অবশ্য, মার শুনলে যে বলবে বাঙালী নয়? মেয়েটি আমারই বয়সী, তবে আমার দুএকমাস যেন বেশী বড়ো-গড়ো আর সাদুক। মেয়েটি আসতো গান শিখতে। মুলটা ছিল নাচ-গানের মুল একসঙ্গে। এক-একসময় দেখতাম, ওর ক্লাস শেষ করে আমাদের ক্লাসে বসে রয়েছে চুপচাপ। আর যতক্ষণ থাকতো, আমার দিকেই লক্ষ্য থাকতো বেশী। একদিন আমিই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —What is your name?

মেয়েটি আমলের দেখা বেঁকিয়ে দুটি বড়ো-বড়ো চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, বললে—বড়া মজুমদার।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—তুমি বাঙালী?

ও আমার—কথা যোগাতে আমাকে খানিকটা বুঝিয়ে, বললে,—নেহি। মহারাষ্ট্রী।

প্রশ্ন-চিহ্ন' করে জেনেছিলাম,—খাঁটি মারাঠী, এতে কোনো ভুল নেই।

সেই থেকে মেয়েটির সঙ্গে আমার কিছুটা বন্ধুত্ব হলো। এবং সেই সূত্রে মাঝে মাঝে আসতো আমাদের বাড়ী।

আসতে যেতে যার গান শুনতে পেতাম একদিন। আর থাকে কোথায়? মার শুভদৃষ্টির আসরের একটি ছোট্ট বাড়লো। সবদিন ও বলতে পারতো না, কিন্তু সময় পেলেই আসতো। কখনো বা নিজেও গান গেয়ে শোনাতো। এই ছলা সোদিন আমার সঙ্গে গল্প করতে এলো, মা বড়-মা তখন বেরিয়ে গেছে।

বললাম,—কীরে? এমন মুখ ভার-ভার কেন?

ছলা বললে,—টেমিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম।

—কিসের?

ও বললে,—তোমার সঙ্গে আমিও নাচ শিখবো।

বললাম,—ভালো কথাই ত। তোমার কিসের এত নাচের কিসের?

ও বললে,—নিজের দিকে তাকিয়ে তারপরে কথা বলবে।

হেসে ফেললাম। ওর সঙ্গে ঘরের কোণে বসে তন্ময় হয়ে গল্প করছি, অন্ধকার হয়ে আলোও জ্বালিয়ে নিয়েছি।

দুজনে মিলে তারপরে গিয়ে গল্প গরম করে দু-কাপ চা-ও বানিয়ে নিয়েছি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ও একসময় বললে,—তোমরা ত যাচ্ছ যাও, না?

বললাম—দূর! আমার ছুই মা বিহনে, তবু আমার জন্য মায়া-টায়া আছে কেন? আমিই যাবোনা ছাই না, আমার ভালো লাগে না।

এইসব আলাপ গল্প করতে করতে যে রাত হয়ে গেল খেয়াল করিনি, হঠাৎ দেখি মায়েরা ফিরলেন সবে একটি মহিলা।

নবাগতা বয়সে নিজের শাড়ী ব্লাউজে পরা, কানে আর নাকে পাথরের ফুল। ছুজনে সাধারণ ব্যবহারের দুটি ফালোয়েডের। ট্রাউজার্স। বয়স ত্রিশ-বাত্রিশ হবে, আমার বয়সের থেকে অনেক বেশি। মাথার চুল মধ্যম, নীচের ঠোঁটটা একটু পুরু। সরল, আর শান্ত ভাব আছে। মা আমাকে ডেকে বললে,—তুমি নাচ শিখবে? একে বলে নিয়ে এসেছি।

এর চেহারায় দক্ষিণা বৈশিষ্ট্য মাদ্রাজের মতন, তাঁমিল বলতে আমার কই হয় না। আমার থেকে আমার মায়ের পরিচিতা অবশ্য অনেক বেশী। মা আমাকে দেখিয়ে ওকে বললেন,—চিনতে পারলো কী, অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, তারপর মাকে বললো,—তখন ছিল খুব ডিসেম্বের, কেমন কি যায়? তবে চোখে মুখে কথায় যেন এখনো সেই শিশুটি লুকিয়ে আছে।

আমি লজ্জা পেয়ে মুখখানা নীচু করে রইলাম। মহিলাটি ছলাকে দেখিয়ে বললে,—এটি কে?

—ওরই বন্ধু। ছলা।

মহিলাটি অবশ্য বেশীক্ষণ বসলেন না, বললেন,—দেরী হয়ে যাচ্ছে। আজ উঠি। কাল-পরশু-তরশু একদিন ওকে দুপুর বেলা ওদের বাড়ীতে দিয়ে আসব তাই, কী বলো?

মা বললে,—তা'দিন আছেন এখানে?

মহিলাটি হাসলো, বললো,—তা হাসপাতালের তার নয়, ছয়ছ মাস কাটলে আরও কিছুদিন থেকে যেতে পারি।

আসল দিয়ে এসেছো বুঝি?

—হ্যাঁ—মহিলাটি বললে,—আসের নয়, চাঁদাকথার বাবদ।

—যেমন' আসরাও শুনতে যাবো।

মহিলাটি বললে,—অনেক রাতে আসর হয় যে।

—কোথায়?

মহিলাটি বললে,—খুব বেশী দূর নয়, তিনতাকেতনের কাছে। একটি আমাদা মন্দির হয়েছে—নতুন, এখানকার দক্ষিণীরাই করে থাকবে হয়ত। আচ্ছা, চলি।

নিমন্ত্রণের মধ্যেই দেখলাম, ছপুর তিনটে-চারটের মধ্যেই গাড়ীগুলি না 'বাস্' আসতে আরম্ভ করলো। প্রথমেই আমায় দেখলো। তারপরে আমার দাড়ীটা তুলিয়ে ঠিক-ঠাক করে পরিয়ে দিলো 'ভারত নাট্যম'-এর উপযোগী করে। প্রথম শিক্ষাই হলো,—'আডাব' একে 'আডলাম' 'সকলম' বলা যেতে পারে। প্রথম ভঙ্গিমা,—"তাম।" সামনের দিকে তাকিয়ে দুটি হাত ছড়িয়ে প্রণামের ক'রে বাঁ দুটো একটু ভেঙে দাঁড়ালো।

দরকার নেই, 'মাদ্রাজিরা' নিমন্ত্রণের পরেই আমাকে তাদের ছুটা দেখাতে লাগলো। ওরা ব'সে ব'সে সব দেখলো। আমার মা-ও মাঝে মাঝে আসতে আরম্ভ করলো। একদিন একটা কী যেন ভুল হচ্ছিল। মনে পড়ে, সেটা 'তৎ তৈ-তা-তা' প্রকরণের বেলায়। দুইটির মুদ্রা চোখের দৃষ্টি ঠিক রেখে দুই পাশে সামান্য একটু লাফ দিয়ে ওঠার ব্যাপার ছিল। পায়ের ঘোড়াল মাটিতে ঠেকবে না, পায়ের পাতার ওপর ভর রাখতে হবে। এবং ছুপে সঙ্গে বাঁ-হাত বাঁ-দিকে প্রসারিত করে তানহাতখানা বুকের কাছে এনে, সেই হাতের মুদ্রার দিকে তাকাতে হবে। অর্থাৎ একসঙ্গে কাজ একসঙ্গে। এতে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক, যাওয়ার ভুল হচ্ছিল,—ভয়ে অস্বস্তিকর হয়ে আমার মা উঠে দাঁড়ালো। বললে,—বুঝতে পারছিস না কেন, এই দেখ।

অবাক হয়ে দেখলাম, মা আঁচলটা কোমরে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে অবলীলাক্রমে 'তৎ-তৈ-তা-তা'র আপাতটা দেখিয়ে দিলে। আমরা সবাই অবাক। ছলাও বলতে লাগলো, ওর মাদ্রাজিনি। বললে,—সবাই কিন্তু তোমার এখনো কিউ আছে।

—ছিঃ—বলে লজ্জা পেয়ে মা কাপড়ের আঁচলটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললো।

খুলে, আঁচলটা মাথায় কাছে আসতে না-আসতেই তখনকার দিকে তাকিয়ে চমকে গেল মা। আরও লজ্জা পেলো। তখনকার কাছে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা-মা। মাকে লজ্জা পেতে দেখে তার গাম্ভীর্য ধীরে ধীরে অপসারিত হলো, মুখ একটু হেসে বললে,—এটাও তুই বন্ধ করেছিলি?

বলেই আর দাঁড়ালেন, চলে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে। মাদ্রাজিনি বললে,—আপনিও ত মেয়েকে শেখাতে পারেন! আমার আর কী দরকার?

—পাগল নাকি!—বলে মা-ও চলে গেল বাবার কাছে।

বাবা আমার নাচ-টাচের ব্যাপারে কিছু বলেন নি। কিন্তু, মাদ্রাজিনি যখন মাস খেড়েক পরে দেশে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি প্রস্তাব করে বসলো বাবার কাছে, বড়-মা তখনই একেবারে বেঁকে বসলেন।

খেয়ে যাবে—অন্তত! আর এই 'লোহার' বংশের মেয়ে?

মা বলছে—আমি বলছি দিদি, কোনো ভয় নেই।

—তুই ওকে খেতে যাবতে পারবি?

মার চোখদুটো ছলোছলো করে এলো। মুখ নীচু করে তবু নিজেকে সামলালো, বললো—পারবো।

বড়-মা বললেন,—কিন্তু এই ন্যাচ-টাচ শিখে কী হবে বল্ লোখ ওর—মেয়েকে কি সেনাদলে নাচিয়ে করে তুলবে চাস?

—না-দিদি—না!—মা বললে,—খেতে কি সুন্দর নাচে, দেখেছো ত! জিনিষটা ভালো করেই শিখুক না?

কিন্তু, ব্যবস্থাটা কী?

মা বড়-মার পায়ের কাছে বসে পড়েছিল বড়মার ঘরে, আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে সবই দেখছিলাম।

বলেছিল—দিদি, দাও। বলছি, আমার বড়ো সাধ।

বড়-মা গাঢ় করে বলেছিল—তোর সাধের, দুই শেখ না বিয়ে!

মা কিছু বলেনি, মুখ নীচু করে বসেছিল অনেকক্ষণ, চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

—কাঁদছিস কেন?

মা মুখ তুলে বলেছিল,—দিদি, আমার সম্বন্ধে কতটুকু তুমি জানো জানি না। এ আমারই মেয়ে, আমার কলঙ্ক কি সহজে চাপা পড়বে? তার থেকে মেয়ে আমার শিল্পী হয়ে উঠুক। হয়ত এ-ভাবেই ওর জীবনে সার্থকতা আসবে।

বড়-মা আর কিছু বলেন নি, আমি কিন্তু তৎক্ষণাৎ সরে এসেছিলাম জানালা থেকে। আজকাল মা বড়-মার ঘরেই থাকে, আমি থাকি সেই আমাদের ছোট ঘরটায় একা। মায়ের কলঙ্ক, এসম্পর্কে মোটামুটি জানবার যে কিছু আমার মা সঠিক বিবাহিতা ছিল না বাবার সঙ্গে। যদিও বাবা মাকে কখনো তোরো অনাদর করে নি, যাত্রাদলের অভিনেত্রী বাড়ীটা ও মায়ের নামেই করে দিয়েছিল বাবা। আজ মনে হলো, এ'ছাড়াও মায়ের কি আর কোনো পরিচয় ছিল, যেটা মর্মান্তিক, সেটা কখনই বাজ করার মত। মনে একটি প্রবল বাধা পেয়েই সরে এসে দেখি, হরা একা বসে আছে। চমকে বললাম,—কীরে! একা বসে?

ওর মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছিল, বললে,—তুমি কি সত্যিই বাঈজীদের সঙ্গে যাচ্ছো?

একমুহূর্ত থেমে থেকে জবাবদিহি বললাম,—যাবোত।

হরা বললো—যদি যাও, ত আমি তোমার সঙ্গী হবো।

অবাক হয়ে বললাম,—সে কী রে?

হরা বললো—আমিও নাচ শিখবো। বাঈজীদের সঙ্গে দেখা করে মনেও আসায়।

—তারপর?

হরা বললে,—মা রাজী হয়েছে। এবং বেশী উৎসাহের সঙ্গেই রাজী হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ওর বাড়ী কখনো যাইনি, বা ওর মা-বাপ সম্বন্ধে খোঁজও রাখিনি। আর, ও-ও আকর্ষণ দেয়নি, কখনো আমাকে ওর বাড়ী নিয়ে যায়নি, মা যেতে বলেনি।

তাই, বিশেষ কিছু না ভেবেই, সাধারণভাবে প্রশ্ন করলাম—আর তোর বাবা?

—বাবা!—হরা বললে,—বাবা কে? ওঃ সাহ্ মিঞার মজুমদার? তাঁকে আমি জানি বটে অবশ্য কখনো দেখেই নি। শুনেছি, তিনি জাহাজে-জাহাজে ঘুরে বেড়ান, চাঁদবিবার।

উত্তরে কী যে বলবো ঠিক করতে না পেরে বলে বসলাম—তাহলে—?

কথাটা শেষ করলাম না। হরা আমার চোখের দিকে তাকালো, বললো, না তাই আমার অতো সংকোচ নেই। পাশের ঘরে আমার জন্য পাশের ঘরে আসা। যাব। তবে, বড়ো একঘেঁয়ে মেয়ে আমি, তাই, ওর বড়ভাই মা। আমার মা বাইজী, কিন্তু আমাকে ঠিক সেদরে টানতে পারেনি আজো। 'ভারত নাট্যম' শিখতে যাবো শুনে হাসি আর ধরে না। বলে,—যত টাকা লাগে, লাগ দেবো, তুই জানিস না।' তার মানে হচ্ছে, নাচ শেখার পর যখন আমার বেতারে ফিরে আসবো, তখন যার পরিবেশন আমার হাত ধরে দাঁড়াবে বিলাত, ডিমলা।

যেন হঠাৎ ঘরে ওর কথাগুলো গুমরিয়ে। আমার বুকের ভিতরটাও ধড়াস-ধড়াস করছিল। জানতে চেয়েছিলাম,—আমিই যে তাহলে ওর থেকে?

মাইফোনে আর অনেকটা দিনের মধ্যেই বওনা হলাম। সেখান থেকে মাদ্রাজ। সেখান থেকে তাঞ্জোর। তাঞ্জোর থেকে 'মেলাটুর', মেলাটুর থেকে এই গ্রাম। বাঈজীরা বললেন,—আমার ঘরেই থাকবে তোমরা দু'জনে, বীরেন্দ্র? মা করবার আমিই করবো। আমিই তোমাদের দুজনের অভিভাবিকা। কেমন, তাই না বলেছিলে বাঈজীরা।

॥ তিন ॥

এই বাঙালী আর মারাঠী মেয়ে দুটো আমাকে 'বাঈজীরা' বলেই ডাকতে আরম্ভ করেছে সেই বেতারের থেকে। আমি 'ম-লক্ষী'—আমি নিজেকেই নিজে দেবতার কাছে উৎসর্গ করেছি। এই যে আমার পাকা দেয়াল আর টালির ঢাল-ওয়ালা ছোট বাড়ীটি, এখানে আমার পূজো-আচার কোনো ব্যবস্থা নেই, আমি নিজের মাধ্যমেই দেবতার পূজা সারি। বাবার জায়গা থেকে আমার 'হরিকথা' শোনাবার জন্য আহ্বান আসে, আমাকে যেতেই হয়, তাছাড়া, একটা আমার পেশাও বটে, নইলে খাবো কী? আর, যখন আমাদের গাঁয়ের দেবতা-মন্দিরে, অথবা মেলাটুরে যখন উৎসব-টুৎসব হয়, তখন আমাকে যেতেই হয়, আমার নৃত্যকলা পরিবেশন করতে হয়। এখানেই থাকি, আমার শিক্ষক বা 'নট্টুবান' যখনই আমাকে খবর দেবেন, তখনি আমাকে যেতে হবে। 'নট্টুবান' এর সঙ্গে এই-ই হচ্ছে আমাদের জীবন-জোড় টুকু।

মেয়েদুটোকে নিয়ে এখানে কোনো জ্বালা আমার নেই। আমার দুখানি ঘর, একটিতে জিনিষপত্র তুলাভার পড়ে থাকতো, ওরা দু-জনেই পরিষ্কার-টরিষ্কার করে নিলো, দুটো মেয়াদের খাট জোড়া করলো, দেখতে দেখতে আমার ঘরখানা অন্য এক শ্রী ধারণ করলো। কিন্তু, ওরা ত এখানে 'ঘরকন্নার' করতে আসেনি? ওরা যে-কাজে এখানে এসেছে সে-কাজের ব্যাপারে আমারই অগ্রণী হওয়া দরকার। প্রথমেই আমি নিয়েছিলাম 'মেলাটুরে'। কিন্তু সেখানে ওদের স্থান হলোনা। ওরা 'ব্রাহ্মণ' বলে বেশী, ব্রাহ্মণী কম। সেজন্যই আমারই প্রস্তাবে ওরা 'নট্টুবান' খুঁজে পেলো, 'নাবারসেন' সেই অঞ্চল নট্টুবানের নাম। বয়সে অল্প হলেও এর মধ্যে বিদ্যা আর বুদ্ধিপাকা জন

ও সবাই মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখে মুখে অবশ্য ওকে খুবই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু মনে মনে জানে মানুষের শক্তি কতোখানি। ওকে এর উঁচুতে ছিল 'মেসার্স'-এ টেনে নেয়া, কিন্তু ফ্লোরাসিস-বেয়াদবির জন্য সরে আছে এই গ্রামে।

প্রথম শুক্রবারের দিনেই, মেয়েটিকে চা-চায়ের, এইসব কিনে আনলো, বাসন-এ চায়ে বিয়োরিস তাকেও। ওরা যোগিয়ে বলা চলে, আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম সাথেই।

'তাকোর'-আমার কাছে নতুন নয়, মায়ের কাছে নয়, কিন্তু 'শ্রীমতী' ও 'ওরায়' কাছে নতুন। চার্চিলকে দুটি জলাশয়, আর মাঝখানে দুর্গের তা মাঝারি চারপাশে দুটিচ্ছ প্রাচীর যে রেখা। জলাশয় অবশ্য , কাঁচকটা দুর্গ শুকিয়ে গেছে কালক্রমে, বর্ষায় দু জল জমে, এইমাত্র।

ওরা চড়ল মাঝিদের উচ্চতা দেখে ভয় হয়ে গেল। শ্রীমতী বললে—যো চৌক্স চলার জন্য হবেনা উঁচুতে। বললে—তা' প্রায় কেড়েখো ঠুট ন।

আমাদের বিলাস গোপুরম্ সাথ ও কিস্তরের নাটাশালা দেখে ওরা দুর্গে,—চমৎকার! বললাম—এখানেই বলনৃত্য করতেন।

শ্রীমতী বললে—এখন?

বিলাস—কেরলাসী প্রথাও নেই, কুচি আমার মতো ও-দাসীরা আছে। যা এই বৃত্তের চর্চাটা কিছু কিছু খেয়েছে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে এসে নাচ খান। এখানকার তাকোর নাচ খাস্ত। তারও নাইমেরই একটা শাখা। সা, আগে কেরলা দর্শন করে যাও। বিকেলে আলাপ করিয়ে দেবো দু-একজন নাচের সঙ্গে।

মাঝিদের দর্শকদের ঠিক সামনে যে ছোট 'ওম' বা -মন্দী' মূর্তিটি আছে তা দেখেও কম অবাক হলো না ওরা। মায়ের সাথে সঙ্গে যেন দাঁড়িয়ে কথা বলছে এখানে, তবে ওরা কোনো মিশুনোনা মানুষ তাকোর-মাঝিদের। যে-জাতিকে, একটা শিশুর দেখে মেয়ে টের স্বাস্থ্যাভাবিক আর নেই। বরা লক্ষ্য করে মুখ মুছে করেছে—কিন্তু শ্রীমতী হচ্ছে। প্রসন্নশ্রীর মতো ছেলে-ছেলে হচ্ছে। আর কিছু নয়, বিলাসকার মূর্তির পায়ে উৎকীর্ণ আছে নব-নারীর বিভিন্ন-মূর্তি। কাম-ভাব বলে নারী-মাত্রেরই মুখ দেখান, তবুও তবও-ও কৌতুক উদ্রেকও উত্তীর্ণ করে, কিন্তু আমার বক্তব্য আর মানসিকতায় পৌঁছে এসবের একটি ভিন্ন অর্থ এসে ওদের কাছে ধরা দেবে। কাম-ভাবের একটা মূর্খ আছে, যদি তা' ঠিকভাবে জীবনে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এসব কথা ওদের এখন বলার দরকার নেই।

ওদের ফেলে নিয়ে কিস্তরে চুকলাম। এ চাঁদের মন্দিরের মাঝিদ, শিবালিঙ্গ। একটা মানুষের প্রায় তখন উঁচু। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করলো নারায়ণকে। নারায়ণ বললে,—ভেতো ঠিক।

একটা জিনিস দেখেছ, শ্রীমতী হাসিল, মোটামুটি বলতে পারে, বলা অবশ্য পারে না। কিন্তু না পারলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে নিতে চায়।

তাকোর মেয়েটি যথারীতি পূজা-আর্চা করলো, দেবতা সাক্ষী রেখে নারায়ণকে গুরু বলে গ্রহণ করলো। তারপরে আমরা বেরিয়ে আশে-পাশের আরও দুই দেব-দেবীকে প্রণাম জানাতে লাগলাম। মন্দিরের কপর 'কার্তিকেয়'-মূর্তি দেখে ওদের বিস্ময় প্রকাশের কথা। কার্তিকেয়ের বারোটি হাত, দুই পাশে দুই স্ত্রীর মূর্তি।

শ্রীমতী আমার কাছ ঘেঁসে এসে কানে-কানে প্রশ্ন করলো,—কার্তিকের দুই স্ত্রী ছিল নাকি?

—হাঁ, তা' জানো না?

—না?—বলে, আকাশে একবার নারায়ণের দিকে তাকালো। কেরলী গৌর নয়, বরং কালোই মাথায় বাবরীর মতো বড়ো-বড় চুল, সুকটিত নাকের নিচে, তীক্ষ্ণ নাসা, এবং সদোপরি দুটি টানাটানা বড়ো-বড়ো চোখে ও নাইমানও বটে, নর্তকও বটে। নাচের সময় ওর চোখে যে বিদ্যুৎ ভাব ফুটে ওঠে, সে ওরা এখনো দেখেনি, দেখতে পাবে।

আমি শ্রীমতীকে বললাম,—কার্তিকের দুই স্ত্রী কে-কে জানো? প্রজাপতি-কন্যা ও বধূদেবী।

কী মনে করে শ্রীমতী যেন মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগলো। এটা লক্ষ্য করেছি, শ্রীমতী বড়ো প্রাণবন্তী মেয়ে। ওর উৎসাহ, ওর কৌতূহল ওর বয়সে আমার পাবার কথা।—বড় চুল ও বড়।

শ্রীমতী জানে না ওর মায়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ এই তাকোরের মাঝিদের। ওর বাবা আর মা একসঙ্গে পূজো দিতে এসেছিল, তখনো শ্রীমতী জন্মায় নি। আমিও সোলন এসেছিলাম ঋতুমতী ও একটা উৎসব ছিল দুদিন। এখান আলাপ হয়ে গেল। তাকোর-মাঝিদ নিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমি কী আরো সব জানি? দেখলাম, তাকোর-নাটাই সম্বন্ধে ওর আগ্রহ খুব বেশী। বললাম, তাকোরনাটাকের যে অংশটুকু কেরলাসীরা নাচেরো, তাকে পাঁচমেরা বলেন, পাঞ্চাল বুঝা। কেরলাসীদের নাচ বলে একে কেরলাসী আটাম'ও বলে। তাকোর মাঝিদেই এর চর্চা হয়ো'তাই একে তাকোর নাচও বলে।

এর সঙ্গে শেষে এমন আলাপ হয়ে গেল, যে, আমি 'কবিকথা' জানি বলে আমাকে সে বিশেষ নিমন্ত্রণ জানিয়ে তাকোরে নিয়ে গিয়েছিল। তবেই কি আমি? আমার সঙ্গে নিয়ে মেয়ে বলেছিলেন 'কবিকথা'ই যিনি পরিবেশন, সেই সন্ধ্যাসিনীকেই। নাটকের ইচ্ছা ছিল মহাবলীপুরম্ দেখার। তিনি যেতেন আমার সঙ্গে। তাঁরও এক মাঝিদেই এর 'কবিকথার' আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু আমরাই খবরটা দিয়েছিলাম শ্রীমতীর বাপ। সেইজন্য, শ্রীমতীর মাকে যখন দেখলাম তাঁদের বিষ্ণুনাথের মাঝিদে, তখন আনন্দের অবধি রইল না। আমার মনে হয় মায়ের 'তাকোর নাটাই'-এর প্রতি তীব্র অনুরাগই আজ মেয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। শ্রীমতীকে জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এই মায়াবী মেয়ে যাকে আমি ঠিক আজও বুঝে উঠতে পারলাম না! ও কথা বলে কম। নাচের কথা জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে চায় না, অথচ বাড়ীর অবস্থা যে খারাপ নয়, এটাও বেশ অনুমান করি। আমার আর কি, আমি ফকীর মানুষ, ওরা দুই বন্ধুতে নিজেরাই খরচ খরচা করে থাকে। একদিনে মেয়েটি ভালো, কিন্তু ও যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে, তখনই আমার ভয় হয়। মনে হয়, ও আমাদের কিছুই বোধ হয় ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখছে না, সমালোচনার খড়্গ-ঘাতে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দিচ্ছে। সোলন যখন তাকোরের পর আমরা

খেলাটুই খেলায়, দেবদর্শন করায়, তারপরে যাচ্ছেতাই পদ্মাদিনীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে ও হয়তো বলবে, এটাও কি নিয়মের মধ্যে পড়ে নাকি?

নারায়ণ বললে, হাঁ। মুশকিল হচ্ছে আমার কাছে 'দেবদাসী বা দাসী আটাস'ই লিখবে, তবু, 'ভাগবত' মেলা নাটক-এর পৃষ্ঠভূমি ঐ বাড়ীটাতে না গেলে অনুষ্ঠানটা যেন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় না।

কিন্তু না বলে এবারে শুধু ভ্রূ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে শ্রীমতীর দিকে তাকালো।

শ্রীমতী অমনি বলে বসলো, যাওয়া যাই?

নারায়ণ খবরের কাগজ রাখলো। আমি শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম—সে কী? তোমার তখন বছর বারো, তোমাকে কোলে নিয়ে তোমার মা আড়ালে বলে এই পদ্মাদিনীবাঈ'-এরই হাসিকথা শুনেছিলেন।—তোমার মা যাবার আগে কী ঘটলো?

মন্ত্রা আবার তাকালো শ্রীমতীর দিকে। শ্রীমতী বোধহয় ওর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতো। বলে উঠলো,—যাবো, কিন্তু সর্তস্বরূপ আমাদের দুজনকে ভাগবত মেলা নাটক দেখাতে হবে।

আমি বললাম, বলো কী! ওটা পুরুষের নাচ।

কিন্তু সে কথায় কে কান দেয়! শ্রীমতী নারায়ণের কাছে আবদার করে বলতে লাগলো, দেখাবেন বলুন?

নারায়ণ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, মন্ত্রার ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

মনে হলো, আসলে এটাই চাইছিল মন্ত্রা। কিন্তু ওর চাওয়ার ভঙ্গী একটু ভিন্ন ধরনের। ও যা চায়, তা' শ্রীমতীর কথা দিয়ে নেতাজীর মনে ঢুকতে চায়। বললাম, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো'ত মন্ত্রা?

মন্ত্রা বললে, হাঁ, তা হলো।

৪ চার ৪

আমি মন্ত্রা, জানতাম বেহু, আমি কেন মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এসেছি, তা' বোধহয় মৈত্রেয়ী জানে না। মৈত্রেয়ীকে আমি মনে মনে ভীষণ ঈর্ষা করি। ওর নাচের পারদর্শিতা দেখেই আমার নাচ দেখবার ইচ্ছা হলো। ওর প্রাণচাঞ্চল্য আমার বুকের মধ্যে দারুণ হিংসায় আগুন জ্বালিয়ে তুলতো। ওর যা ছিল আমার মায়ের মতো 'দেহ ব্যবসায়িনী' না হলেও মৈত্রেয়ীর বাবাও সঙ্গে তাঁর বিবাহটা বৈধ ছিল না। ফলে ধরে নেওয়া যায় ওর মায়ের জীবনেও কলঙ্করেখা আছে। তাহলে? তাহলে আমি এতো দুঃখবাদী হলাম, হিংসাপরায়ণ হলাম, সেই জায়গায় ও অমন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হলো কী করে? আত্মবিশ্বাসই বা ও এতো অফুরান পেলো কোথা থেকে? আমি আসলে ওর' সঙ্গ, কিন্তু সবার সামনে বিদুষী ছদ্মবেশ পরলাম। তাহলে একেবারে কাশী থেকে সুদূর তাঞ্জোর যাবো এতটা ইচ্ছা ছিল না। এখানে আমার দুটো মনোভাব একসঙ্গে কাজ করলো। এক, মন্ত্রার এর সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। দুই, আমি মারাঠী মেয়ে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস আমার ভালো করেই পড়া আছে,—আমি জানতাম, 'নায়ক' নরপতিদের উল্লেখ করে ছত্রপতি শিবাজী তাঞ্জোর দখল করে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাই ভেঙ্কজী নিজে রাজা হন তাঞ্জোরের। এটা মনে পড়ে ১৬৭৮ সালের কথা। সেই থেকে মারাঠা রাজারাই তাঞ্জোরের অধিপতি। এই তাঞ্জোর ইংরেজরা কেড়ে নেয় এক ঐতিহাসিক বৎসরে। সে সালটা হচ্ছে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ। শেষ মরাঠীপুর যুদ্ধে ঐ সালেই আত্মদান করেছেন বীর টিপু সুলতান। শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ প্রাকারে মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়, মাথার খুলিতে, দেহের নানান জায়গায় গুলির দাগ। আমাদের ইতিহাসে এ-সবের বিশদ বর্ণনা ছিল। শ্রীরঙ্গপত্তন্ শুনেছি মহীশূরের খুব কাছে, কখনো যাইনি। কিন্তু তাঞ্জোরের মারাঠা নরপতিদের সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল। তাঞ্জোরে ছিলেন দেবদাসী যাদু করতো। মারাঠারা কি কোনো মারাঠী মেয়েকে এই দেবদাসীর শ্রেণীতে এনে ফেলেন নি? আচ্ছা, এই 'পদ্মাসিনীবাঈ' কে? 'বাঈ' উপাধি ও তামিলনাদের নয়, এ-তো একেবারে মারাঠী ব্যাপার। অবশ্য এ-কৌতূহল হয়েছিল পরে, এখানে আসবার পর। তার আগে 'শিবাজী', 'ভেঙ্কজী' এঁদের স্মৃতিই আমাকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে।

বাড়ীটা আর পাঁচটা এমিকারার বাড়ীর মতোই। মাঝখানে চতুষ্কোণ একটি উঠোন, উঠোনে কোনো চালাঘর, চারপাশে ঘোরানো বারান্দা আর ঘর। উঠোনের ওপর চারদিক থেকে চারটে সিঁড়ি নেমে এসেছে। আমাদের 'নটুভানার' (মৈত্রেয়ী সংক্ষেপে বলতো, 'নটুবান') নারায়ণন্ আমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন, বারান্দায় অবশ্য আগে ভাগেই ছুটে গিয়েছিল সেখানে। মহিলাটির বয়স হয়েছে, প্রৌঢ়া বলতে পারি, একেবারে 'বুড়ি' হয়ে যাননি, তখনো। নাকটি টিকালো, ছোট, কপাল, মাথায় চুল যথেষ্টই ছিল, তখন উঁচে-উঁচে পাতলা হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটি পাতলা, পানের রং করলাই বলা চলে, একটু হলদে-হলদে ভাব আছে, সেটা হলুদ মাখার ফলে কিনা জানিনা। আমরা যখন গেছি, তখন সন্ধ্যে দুপুর বলা যায়, বিকেল হয়নি ঠিক। নারায়ণন্ ঘরে ঢুকে ওঁকে প্রণাম জানিয়েই অন্তরঙ্গভাবে কী একটা মন্ত্র পড়লেন। তারপর, বারান্দার নির্দেশে আমরা চারজনে ওঁকে প্রণাম করলাম। উনি একটি কিনারে লাল রঙের পাড়ী পরে একটি সতরঞ্চির ওপর বসে ক্ষীণ একটা পুঁথি পড়ছিলেন। আমাদের বসতে বলে নানান্ কথা শুরু করলেন, সে-সব কথা আমি বুঝিনি, বুঝেছিল মৈত্রেয়ী, সে ওঁর সঙ্গে দিব্যি কথাবার্তা চালাচ্ছিল। আর ওঁর অনুরোধে এও ঠিক আসলে চুপ করে বসেছিলেন নারায়ণন্। আমাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়েই শুনছিলেন মনে হলো। কথাবার্তা যা যা হয়েছিল, তা আমি পরে মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছিলাম। যেটুকু আমার মনে আছে, এখানে বলে রাখি। ছেলেটাকে পাঠী বলে যে ডেকেও ব্রাহ্মণ 'ভাগবত মেলা নাটক'-এর নাটক লিখে গিয়েছিলেন, তাঁর সময়ে তাঞ্জোরে-যুদ্ধ ছিলেন সার্ফোজী। ইংরেজরা তাঞ্জোর কেড়ে নিলেও এঁর রাজত্ব যায়নি, তবে, তখন ইনি ইংরেজদের তাঁবেদার রাজাতে পরিণত হন। এই 'সার্ফোজী'-ও মারাঠা নাম। কার কাছ থেকে যেন শেলে নিয়ে সালটাও তখন টুকে রেখেছিলাম নোট্‌বইতে। লেখা আছে, সার্ফোজীর কাল "১৭৯৮-১৮২৯।" 'ভাগবত মেলা নাটক'-এর পরবর্তী খ্যাতিমান নায়ক হচ্ছে 'নটেশ আইয়ার।' ইনি মারা যান ১৯০০ সালে। এঁর দুটি কন্যা ছিল, পুত্র ছিলনা। 'পদ্মাসিনী বাঈ' হচ্ছেন এঁদেরই পালিতা কন্যা। কন্যাও বটে, শিষ্যাও বটে।

ভূলিদি বলে,—এই বুঝি শিক্ষার সঙ্গেই ভামিনীবাইয়ের ঘরিকথার এতো প্রাণ পায়ে, এতো ভাব আসে!

যাইহোক, নষ্টেম আইয়ার পরে ভটি দত্তকপুত্রও গ্রহণ করেন নিজের ামে 'কুঞ্জমল'-এর ছেলে ছিল এই ুক পুত্রটি। অর্থাৎ প্রকৃত সম্পর্কে, াতি' বা দৌহিত্র। কিন্তু সে এঁদের গোত্রের ক্ষেত্রে এলো না কিছুতেই।

কেরলাবাস সাত্তীর মাইকাবলীর ভূলিদি বয়সাংশেই শঙ্কিত ছিল টেম আইয়ারের কাছে। ১৯০০ সালে রে মৃত্যু হওয়ায়, সন্তানহীনা পাভূলিদি-ছিকে নিজের কাছে এনে রাখেন। বসব সময়ে আপনমনে সুর করে তিনি াজ এইগুলোই পড়তেন। যে-মাস্টারনী ামরা তখন বিদেশিনীয়, ওটিকে পুরোপুরি ন বলে গণ্য করা হয়। যাঁরা এই মনা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বা এই শিক্ষের যাঁরা ঠা করেন, তাঁরা এদিকে এলে একবার ই বাড়ী ঘুরে যাবেনই। ভিক্ষাচার্যের াত তাঁরা বাস্তবিকই বিস্ময়ের সঙ্গে ক্ষা করার বিষয়।

যাইহোক, আমার ঘরেবার জিজ্ঞাসা রতে ইচ্ছা করছিল, উনি ও নষ্টেম াইয়ারের পারিবার কারা?—আসলে নি কে? কোনো যাযাবরী দেবদাসী-বংশ ুক্ত কী?

খাঁসাসো হলোনা। কারণ, এঁরা ায় এতো গম্ভীর যে, এ-ধরণের প্রশ্ন রে বসলে এঁরা হয়ত ভেবে যাবতে াগবেন। আমার তবু কৌতূহল নিরস্ত জল না। আমি তোলো এক হলমুতোর রত্নেরীকে টিপে ছিলাম। বললাম, নন্দা, আমি তোর মত বাঙ্গালী নই, ামি মারাঠি।

মৈত্রেয়ী কথাটা বলবো-বলবো ংরেও বলতে পারলো না। মুখ ফিরিয়ে াকে ঝিকমিক করে বললে,—কী ধিকল, হঠাৎ এ-কথাটা বলি কী করে? ভামিনী চমক দক্ষ ভরছিলেন আমাদের ানীই বলে উঠলেন,—কী মো, কী দ্যায়ন্তি করছো তোমরা?

আমি একটু লজ্জা পেলাম, মৈত্রেয়ী কটু ঝুঁকি দিলে বললে —আমার এই ুর বন্ধু একটু আলাপ-পরিচয়-টরিচয় রুক।

পল্লিসনী ওর দিকে তাকালেন, বললেন,—বায় কী তোমার?

—এইটু তামিল শিখে নেবে বলা, না বোঝবার কিছু কারণ নেই, মৈত্রেয়ী বলে উঠল। আমি কিন্তু সোজা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে মারাঠী ভাষায় বললাম,—আমার নাম বলে বসা মহুমদার।

মহিলাটি একটু যেন অবাক হলেন। মুখের উপর দিয়ে একটা ছায়া খেলে গেল যেন, বললেন,—তোমার কথাটা আমি বুঝেছি। কিন্তু মারাঠী আমি ভালো জানি না।

ওর কথার অনুবাদ করে দিলো মৈত্রেয়ী। আমি মহিলাটির দিকে তাকিয়ে কের ঐ মারাঠী কথাতেই বললাম,—একটু-একটু ত জানেন? তাতেই হবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার কথা?

পল্লিসনীর মুখখানা তখনো ম্লান। এবার কিন্তু মারাঠীতেই উনি কথা বললেন। জিহ্বায় জড়তা আছে, বর্তমানের অনভ্যাসে একটু বোঝা গেল। আমাকে বললেন,—মাঝে মাঝে এলো, কথা বলে আনন্দ পাবো। আমার বাবা এদেশীয়, কিন্তু মা মারাঠী ছিলেন। এখানে আশে-পাশের কানে খুঁজলে এখনো কিছু মারাঠী মানুষ পাবে, যারা ভাষা প্রায় ভুলে গেছে, এমন তামিল-নাদের জামাই তাদের মুখে।

যাইহোক, আমার অনুমান যে মিথ্যে নয়, এটার প্রমাণ পেয়ে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। নারায়ণম্ এই সময় উঠলেন, বললেন,—ওঁর অনেক সময় নিয়েছি, এবার ওঠো।

মৈত্রেয়ীর ইঙ্গিতে উঠে পড়লাম। এই একটা জায়গা, যেখানে আমার ইঙ্গিতেও চলে না, ওর ইঙ্গিতে আমি চলি। তাতে না জানার জন্যই এটা হচ্ছে, ওটা বন্ধু হলে আমাকে আর পায় কে?

সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই নারায়ণম্ এলেন। আমাদের ঘরটা তেমন বড়ো নয়, সেইজন্যই ভাগুলিদির ঘরের একাংশ একটু ফাঁকা করে নিয়ে মাদের আসর বসলো। প্রথম পাঠের দিন, ভাগুলিদি আমাদের দুজনকে একেবারে খাঁটি, দাক্ষণী নর্তকীর সাজে সাজিয়ে করে তুললেন। এমনকি, নাকেও 'নথ' পরতে হলো। আমার নাসিকায় ছিদ্র ছিল, এমন কি মায়ের দেওয়া নাসিকার পরবার ফুলও ছিল। ছিল না মৈত্রেয়ীর। ও বললে,—আমি আনই কিনে আনবো। এখানে পাবো না।

ভাগুলিদি বললো —খুব পাবে? একটু দূরে—চোল খানেক হবে—সাকুরার বাড়ী আছে—তা' তোমায় যেতে হবে না, খবর পাঠালেই চলে আসবে।

মৈত্রেয়ী উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো,—আমার নাক দুটো করে দিতে পারবে?

ভাগুলিদি বললে,—খুব। ক্লিপ দেওয়া 'নাথনি' পাওয়া যায়, তাই কিনে নিও।

এইসব ছোট কথাবার্তার পর আমরা ভাগুলিদির ঘরে এলাম নষ্টু-জানার ব্যবসের সামনে। সিল্কের ধুতি পরনে, গায়ে সাদা সার্ট আর একটি সিল্কের জরির পাড় বসানো চাদর, কপালে ভস্ম লাঞ্ছিত রেখা আঁকা। সমাস্তরালভাবে যা থেকে সহজেই বোঝা যায় উনি শৈব। চুপচাপ ধ্যানস্থের মতো বসে ছিলেন, পাশে ধূপের ধোঁয়া- মাখা ঘর ঘুরে সন্ধ্যাই একটা পবিত্র ভাব বিরাজ করছে।

আমাদের সামনে বাঁধা ঘুঙুরের শব্দেই উনি চোখ খুললেন, উঠে দাঁড়ালেন, আমরা প্রণাম জানাতেই আশীর্বাদ করলেন। তারপরে বললেন,—তোমরা পাশাপাশি দাঁড়াও, দুজনে এক সঙ্গেই আরম্ভ করো।

বলেই নিজে 'তাল' তরঙ্গীতে দেহ সংস্থাপনা করলেন। ভাগুলিদি কাছেই বসে সব নিরীক্ষণ করছিলেন, বলল, এরা যা করছে সেরকম করো।

মৈত্রেয়ী আগে সহজেই দাঁড়ালো, আমি পারছিলাম না, হাত দুটি দুপাশে প্রসারিত করে মাথা দুলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, কিন্তু মনে হচ্ছিল হাত দুটো পাখির মত ভারী হয়ে এখুনি ঝুলে পড়বে।

উনি কিন্তু দেখছিলেন মৈত্রেয়ীকে। মৈত্রেয়ী সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে হাতের মধ্যবর্তীত মুদ্রা ক'রে, হাঁটু দুটো একটু মুড়ে। উনি বললেন, না শ্রীমতী, তুমি যে কিছু জান এটি আজ তোমাকে ভুলে যেতে হবে। যা বলছি, সেভাবে করো। আমি তাকালাম মৈত্রেয়ীর দিকে। ও যা একটু আগে শিখেছিল সেটা দেখিয়ে ওকে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সেটা হলোনা। ওর মেজের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ছেলে বললাম, কী

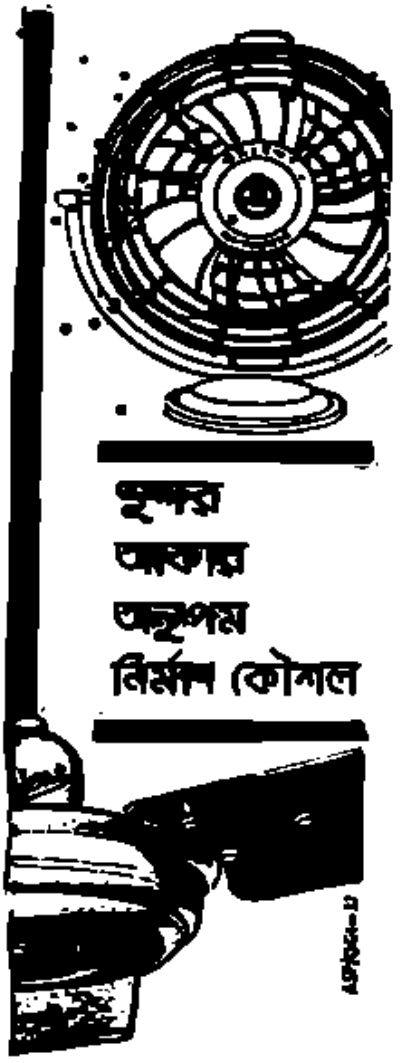

ভালো হোক! ওঁকে বলনা, এসব ছোকে দেখাতে হবেনা তুই জানিস।

মৈত্রেয়ীকে পুরাপুরি জানতাম বলে আমার একটা ধারণা ছিল। কিন্তু সে ধারণাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েও হঠাৎ প্রমাণ করে দিলো যে ও অন্তোখানি আবেগপ্রবণ মেয়ে। মুখটা নামিয়ে মুখ ঢেকে বলে উঠলো, আমি কিছু জানিনা, আমি কিছু জানিনা।

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ করতেই ও ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে। আমি কোনমতে নিজে থেকে স্বাভাবিক ভাবেই দাঁড়িয়ে আছি। যাদুদাদি চলে গেলো তখ পিছনে পিছনে ওকে শান্ত করতে। আর নারায়ণের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বয়স আমাদের সেকেলে দাদাই একটু বেশী গম্ভীর। বয়ত বা গাম্ভীর্য একটা হয়েছে, ওটা না হলে, শিক্ষা-দীক্ষায় কাজ চলেনা।

নারী-সুলভ চঞ্চলতায় আমার বিলাস। বলেছিলাম নষ্ট জানাবলী, সেদিন।

ওকে ঘরের দিকে হাত দেখালাম। অর্থাৎ বলতে চাইলাম ও ঘরে যান? অর্থাৎ যান তাড়াতে শিখান। উনিও মেলেনই না, উপরন্তু মাথা ঘরে কি যেন বলতে লাগলেন সঠিক বুঝলাম না।

আমি তখন দুটো একটা নতুন বুলি দিয়ে ওকে বোকাতে চেষ্টা করলাম, আর কি করবেন। আমাকেই শেখান। বোধ হয় কাজ হলো, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রচুর উৎসাহে আমাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন। কয়েকবারের চেষ্টায় আমি সাবলীলভাবে দাঁড়াতে শিখলাম। ছাঁটি ইঞ্চি ফেঁজে হাত দুটো প্রসারিত ক'রে চারটা আঙুল পরস্পর সংলগ্ন রেখে বুড়ো অঙ্গুলীর পাশে টোকরে। উনি বললেন, 'পতাকা', হাতের মুদ্রা নিজে করে বুঝিয়ে দিলেন, একে বলে 'পতাকা'। 'পতাকা মুদ্রা।'

ততক্ষণে ওঘরের কাজ সেরে এসে দাঁড়িয়েছে যাদুদাদি মৈত্রেয়ীকে নিয়ে। উনি সেদিকে দৃকপাত ও করলেন না। যখন বুঝলেন আমার কিছু বোঝাতে পারবে না, তখন প্রতিটি আঙুল নিজে ধরে ধরে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। এইসব, প্রাথমিক শুরুগুলি আমি মেলাবলেই দেখেছিলাম মৈত্রেয়ীকে করতে। কিন্তু তখন, উনি যেখানে, যেন

সহজ ভাবেই আয়ত্ত করতে পারছিলাম। এখন কি পদক্ষেপও ধীরে ধীরে নিখুঁত হয়ে উঠছিল।

এই রকম একে একে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেল। একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম, মৈত্রেয়ী আমার পাশে নেই। ঘরের বাইরে বারান্দায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কান পেতে শুনলাম, মৈত্রেয়ী বলছে, 'আমি কিন্তু ওকে নিয়ে যাবো।' ওপাশ থেকে কে যেন বলছে, 'তা কি করে হয়? ও তো এখনো ঠিক তৈরি হয়ে ওঠেনি।' মৈত্রেয়ী বলছে, 'তা হোক, আমি ওকে নিয়ে যাবো।' ওপাশ থেকে কে যেন বলছে, 'তা কি করে হয়? ও তো এখনো ঠিক তৈরি হয়ে ওঠেনি।' মৈত্রেয়ী বলছে, 'তা হোক, আমি ওকে নিয়ে যাবো।'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। মৈত্রেয়ী আমাকে দেখে বলল, 'ওঠো, ওঠো, আমরা এখনই বেরোব।' আমি বললাম, 'কোথায়?' মৈত্রেয়ী বলল, 'সে তুমি পরে দেখতে পাবে।' আমি বললাম, 'আমি কিন্তু এখনো তৈরি হয়ে উঠিনি।' মৈত্রেয়ী বলল, 'তা হোক, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমার কাপড়-চোপড় কোথায়?' মৈত্রেয়ী বলল, 'সে সব আমি গুছিয়ে নিয়েছি।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমার টুথব্রাশ?' মৈত্রেয়ী বলল, 'সে সব আমি নিয়েছি।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমার চিরুনি?' মৈত্রেয়ী বলল, 'সে সব আমি নিয়েছি।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমার...' মৈত্রেয়ী বলল, 'সে সব আমি নিয়েছি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমার...' মৈত্রেয়ী বলল, 'সে সব আমি নিয়েছি।'

না, সে আবার ওদের ভাঙিয়ে রইলো মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে। মৈত্রেয়ী বলতে লাগলো।—বাবার এই অসুখের মধ্যে মনে হলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়। তখন মনে হয় কী হবে নাচ-টাচে? এই সব নাচ, গেয়া, বাজনা, সব মিছে।

মানু ঠিক যেন আঁতকে উঠলো।—না-না-ওকথা বলো না, বলতে নেই।

আমার মনে হলো, নারায়ণও কি এমনি ভাবে কাঁদতে চাইবে? ওঁর মুখের ভাব কেমন হয় একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার মৈত্রেয়ী?

॥ পাঁচ ॥

আমার মাথায় দাদাই আইডিয়া ঘুরে গিয়েছিল। আমাদের শিক্ষায় এগুচ্ছে, ওদের 'আদিবন মেলা নাটকের'-এর আয়োজনও চলছে। মন্দিরের সামনের রাস্তাটার পাশবর্তী আর বাঁধ পুকুর মাঝার ওপরে 'ক্যানেল' টানিয়েছে। মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে কাঠের প্যাটফর্ম তৈরী হচ্ছে, সেখানেই হবে স্টেজ। 'নটুবান' বললেন, তোমাদের কলকাতার মতো কিছু নয়, এর সামনে আর পিছনে পর্দা থাকবে।

সেদিন আমি একাই বেরিয়েছিলাম ঘুরতে, সঙ্গে কেউ ছিলনা, শরীর খারাপ বলে বাড়ীতে শুয়ে রয়েছে। এ-সব জায়গায় একটা সুবিধে এই যে, মেয়েদের চলাফেরা নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। হাটে-বাজারে মেয়েরা বাজার করছে, মেয়েরাই বিক্রী করছে, পুরুষও আছে, তবে সংখ্যায় মেয়েরাই বেশী। আমিও সময় পেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, মন্দিরে যাই, জোকাপল্লী দেখি। কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড বড়া পুকুর আছে, সেখানে বাসনেরকম পক্ষী এসে বসে, সেই পাখীর মেলা দেখতে যাই। আজ যেখানেই যাই ওঁর সঙ্গে দেখা। বললেন, কোথায় চলেছো?

বলে ফেললাম,—আপনার আয়োজন-টায়োজন দেখতে। বিয়াত্রিস কি আর কেউকে দেখবে না?

উনি বললেন,—বিয়াত্রিস কোথায়, যে দেখবে! দু-তিনজন এসে পৌঁছেছে সত্য, বাকীরা এখনো আসেনি।

সবাই কি পুরুষ?

হ্যাঁ।

ওঁরা এখানে থাকেন না?

—হুজন মানুষের থাকে যাঁরা, ভূপালবরা কেউ থাকে না, সব চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-টাবসা করে, এই সময় দুটি দিনে যে-যার চলে আসে। নিজেদের ও প্রায়। দেখে আসিও হলো, কিছুর চটাটাও হলো।

ঘরকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, বললাম,—তাহলে একা আমিই থাকবো এখানে, এইসব সাজ-টাজ আর পুজো-আচা নিয়ে?

উনি হাসলেন, হ্যাঁ তা, বলতে পারো।

বললাম—আপনার ওপর আমার ভীষণ রাগ। এতো বলেছি, একদিনও আপনার বাড়ী নিয়ে গেলেন না। মানু-মিতিকে বললে উড়িয়ে দেয়। বলে ওকে কী বাড়ীতে পাবি? কোথায় কোন্ রাজা বা রাজীকে নাচ দেখাতে গেছে? মেলাটুকেই ও ওর হাত ছাড়া আছে কয়েকজন।

বলে ওঁর দিকে অপাঙ্গে দৃকপাত করলাম, বললাম,—সত্যি, রাজীও আছে আপনার ওখানে?

—হ্যাঁ, তা আছে।

—কয়জন?

—একজন।

—কোন্ দেশের মেয়ে। কী নাম।

উনি বললেন,—মেয়েটি অন্ধ্রদেশের মেয়ে, নাম সেবন্তী। মেলাটুকে সে এক আত্মীয়ের বাড়ী হয়েছে। আমি ওকে পুঁচিপুড়ী নাচ শেখাই।

—সেটি আবার কী?

উনি বললেন—এই 'আদিবন মেলা'র মতোই, সামান্য একটু তফাৎ আছে। আগে এসে মেয়েদের নেওয়া হতো না, আজকাল নেওয়া হচ্ছে। ভাবছ, খুব্বো ঘনঘনায় ব্যাপার।

বললাম, বক্তৃতা থামান। আসল কথা চাপা পড়ে গেছে। বাড়ীতে আপনার অর্ধাঙ্গিনী কেউ নেই। এমন কেমন করে চলে? আপনারা ও তলাটে খুব অল্প বয়সে বিয়ে করেন। আপনি করেন নি কেন? সন্ন্যাসী নাকি?

লোকটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। গাম্ভীর্যের মেঘ নামতে একটু যে চঞ্চলিত রেখা গিয়েছিল, মুহূর্তে তা যেন ঢেকে গেল আবার।

বললাম—চুপ করে রইলেন যে?

মুখখানি আরও গম্ভীর করে বললেন, দেখ, তুমি বাচ্চামী, অল্প বয়েসের মেয়ে, যা শিখতে এসেছো তাই শিখে দেশে ফিরে যাও, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তোমার অতো কৌতূহল কেন?

কথাটা এত বেশী রূঢ় যে, আমাকে মুহূর্তে নির্বাক করে দিলো। একটা অজানা আতঙ্কও আমার মনে। ভয়ে ভয়ে উঠতে লাগলো। উনি কথাটা বলেই আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলেন, আমি তবু পিছনে পিছনে গিয়ে ওঁর সঙ্গ ধরলাম। উনি একটু থেমে আমার দিকে মুখ ফেরালেন, তারপরে যেমন স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলেন, তেমনি করে বললেন,—কী জিজ্ঞাসা করবে? আমরা তখনকার মন্দিরের সামনেকার সেই ফেরদার-চাকা বড়লের ছায়ায় এসে পড়ি। ছায়ার ঠোঁটটা তাকিয়ে ঘরে মাথা নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

—তাহলে, এগিয়ে যাও, আমি আসছি।

মন্দিরে যাবার জন্য দাঁড়াই বেরোই নি, তবু কেন জানি না মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে,—হ্যাঁ, মন্দিরেই যাবো।

উনি যার সঙ্গে যেন তখা বলতে লাগলেন, আমি মন্দিরে চলে এলাম। মন্দিরে লোকের আনাগোনার বিরাম নেই, আমি নাটমন্দিরে একধারে একটা থামের গায়ে মাথা হেলিয়ে বসে পড়লাম। মনটা যেন কেমন ভারী হয়ে গেছে। কার কথা যেন মনে পড়তে লাগলো। বড় আপন কথা মনে পড়তে লাগলো। একবার মনে হলো,—সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যাই। কী হবে আমার নাচ শিখে? আমি কি নাচ শিখে সেনাবাহিনী বর্ডারের মতো পরবে পরবে নাচ দেখিয়ে বেড়াবো?

তবে, এখানেই বা কেন? বাবের দিকে এমন করে আকর্ষণই বা অনুভব করি কেন?

এই সব যখন পাঁচ ভাবনায় ডুবে আছি, হঠাৎ চমক ভাঙলো ওঁর কণ্ঠস্বরে, হাতে একটা টাকা আনারসের বাঁধন বই, তেমনি গম্ভীর মুখ, বললেন—এসো?

তত সময় ছেড়ে গেছে আমি না, গম্ভীর ধ্যান থেকে যেন জেগে উঠলাম। দেখলাম, মন্দির অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। উঠলাম ওঁর আহ্বানে। এক করলাম না, কিছু বা, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম মূল গর্ভগৃহের পিছনে। পিছনে একটা খিড়কী দরজা। হিসেন মোটা খিল খুলে ভেতরে উনি ঢুকিয়ে এলেন, ছোট্ট একটা গলি। গলি দিয়ে

সঙ্গে সঙ্গে চলছে
গাড়ি।

একটু পরেই এসে পড়লাম একটা দীর্ঘ অরণ্যের মধ্যে। সেখানটায় গাড়ি দাঁড়ালাম. সেটা একটি ছায়া বহুল ঘাট। পাশ দিয়ে ঝরণাধারার একটা ছোট ছায়ার সৃষ্টি করে ঝির-ঝির শব্দে-লা পড়ে আছে। পুরুষটি ভাড়াদার ও. বেশি বোঝা যায় এখানে কেউ আসে না।

ঘরটে দাঁড়ালেন। পকুরের পশ্চাতে ছোট ছোকেলে ঘাটের ডানদিকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ঘরটা বোধ হয় ভিতরে ছিল. ছেড়ে পড়ে রয়েছে একটি ঘর একটি বেডরুম ঘর অবশিষ্ট রয়েছে। তারই পাশে মহাল পাশের ঘরে। ওরা আজ একটি অথবা দুই আকাশে না তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বললেন,—এখানেই আমি থাকি।

কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। চারিদিক নীরব-নিস্তব্ধ—একটা লোকের যা যাচ্ছে না বোলাচ্ছে—এমন কি কোন পাখীর ডাকও শোনা যাচ্ছে না। গাড়ী কেমন যেন ভাঁকরে উঠলো, কোন মতে বললাম,—আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন!

বললেন,—আমার ঐ ভাঙা বাড়ীতে।

সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘরা পাতার ঘর ছুলে চারিদিকে বেঁকে একটা পাকে সরু পথ ধরে উঁর সেই ভাঙা বাড়ীর দোর গিয়ে পৌঁছলাম। ঘরখানি ভালো লেগে। আর মনে হলো, এরকম দুটিকে ভাওয়া যেন দুটি লো।

ঘরখানা ঝাড়াবুঁছা। একপাশে মেঝের ওপর ধবধবে বিছানো বিছানা, মাথার দিকে একটা টিনের ট্রাঙ্কের, একটি দড়ির আলনায় কয়েকটা জামাকাপড় ঝুলছে। পাশে একটি ছাতাধরানো, জুতো, মাজবা, এইসব প'ড়ে আছে। তার কাছে একটি নিবানিপদ্ম ছাবিকেন। কোন থেকে যেন একটা মোড়া টেনে বললেন, বিছানার ধারে রেখে বললেন, বসুন।

তারপরে ঘরের জানালাগুলো একে একে খুলে দিলেন।

বললাম—জানালা খুলে রাখেন যেন?

একটু হেসে বললেন,—অভ্যেস হয়ে গেছে। একবার একটা সাপ বেরিয়ে এসে উঠে জানালা দিয়ে—

আমি ওরকমে আরও প্রায় চীৎকার করে উঠেছি,—সাপ!

উনি বললেন, ভয় পাচ্ছো কেন?

বসতে বসতে উনি বললেন বিছানার ওপর। বললেন,—ব'সো।

আমি মোড়ার না বসে মেঝের ওপর বসে পড়লাম। উনি ও। উ-ও করে উঠলেন, কী করছো, শাড়ীটা ময়লা হয়ে যাবে।

আমি ওঁর কথা শুনলাম না, বসে পড়লাম।

উনি বললেন,—তুমি সিদ্ধেশ্বর ঘোষীর নাম শুনেছো?

—না! কে উনি?

বললেন—অঞ্চলে কুচিপুচী বলে যে বৃত্তান্তটা-জন্ম আছে আমাদের ভাগবত মেলা'নাটক-এর মতো! তার প্রায় সবটা বলতে পারো। কিন্তু ব্রাহ্মণ ছেলে হয়ে উনি একটা প্রায়ই পালন করেন, তবেই নাম হয়, 'কুখীনবপুর',—যা থেকে আজ নাম দাঁড়িয়ে গেছে, 'কুচেলাপুরহ' বা 'কুচিপুচী।' অঞ্চলটার অধিবাসিরাও এই প্রায়। ওখান থেকে অনেক-অনেক দূরে। যা'ই হোক, সেই সিদ্ধেশ্বর ঘোষীর জীবনটা ছিল বড়ো অদ্ভুত। ছোলো একটা গ্রামে বাউন্ডুলের মতো একটি অনাথ ছেলে ঘুরে বেড়াতো,—তাকে সবাই ডাকতো 'সিদ্ধাদা' বলে। তখনকার দিনে লোকে মানুষের বৈহিক লক্ষণ দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারতো। গ্রামটানের ছেলেটার মধ্যে তেমনি সুলক্ষণ দেখে ওকে ব্রাহ্মণ বলেই স্থির করলেন। তখনকার দিনে আরও একটা নিয়ম ছিল। মঞ্চল অবস্থায় ছোলো লোক যখন তার ছেলেদের পৈতে দিতেন তখন আশে পাশের গরীব বা অনাথ ছেলেদেরও পৈতে দিয়ে দিতেন তিনি। সেই ভাবে সিদ্ধাদারও পৈতে হয়েছিল। পৈতের পর ছেলেটাকে ওরা পাঠিয়ে দিল উপাসীর মঠে। মঠ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও ফিরে এলো সিদ্ধাদা নাম নিয়ে। সিদ্ধেশ্বর ঘোষী। তাঁর বিয়েও হয়েছিল কিন্তু উনি সংসার করেন নি। অসাধারণ ভগবৎ বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর ভক্তি পথ খুঁজে পেলো ভূতের মাধ্যমে। ছেলেদের ভূতা দেখাতেন, তার ভূতা দিয়ে ভবিষ্যৎ-ভাব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আমাদের এই যে ভাগবত মেলা আছি,—এও সেই ভাগবতীদের উপাসনার। এ যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, তাহলে এই ভাগবতীদের বিষয়ে গ্রহণ করতে হবে।

বললাম, এ কথা বলবার জন্যই কি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন?

বললেন,—না ঠিক তা নয়। তখন মনে হলো, তুমি হয়ত মনে মনে ভয় পেয়েছো। তাই তোমাকে কয়েকটা কথা বলবো বলে এখানে নিয়ে এলাম।

—বলুন!

উনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, বললেন,—আমার গুরু ছিলেন মেলাটুরে। তিনি যাবা যেতেন বেশ কয়েকবছর ধরে; তিনি যাবার পরই আমার বাবা বিবাহ হলো। আমি চাকরী খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম, এমন সময় তোমাদের কলকাতায় সর্বত্র বিরোধিতেছে। চাকরী একটা জুটিয়েও ছিলাম, কিন্তু বছর খানেকও টিকলো না, প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠলো, ছিটকে চলে এলাম মেলাটুরে। কিন্তু সেখানে ঠিক আমার স্থান হলো না। আমাকে, আসলে কেউ গ্রহণ করতে পারে না,—তবু আমি এই কাজ নিয়েই মেতে আছি। সারা জীবন এই নিয়েই থাকতে চাই। কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গেলেন। বললাম,—বলুন, কী বলতে যাচ্ছিলেন?

আবার চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, বললেন,—আমাদের এখানে শিক্ষক আর ছাত্রীর সম্পর্ক সিদ্ধাপুত্রীর সম্পর্ক। কিন্তু তুমি বলতে বলেছো তা?

—কী?

ওঁর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা আলো ছুরে বেরোচ্ছিল,—বললেন,—আমাকে—আমাকে তুমি—

হঠাৎ মনে হলো, গো গো করে এখন চাঁদিতে ফেটে পড়ি। ওঁর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছিল আমি জানি। ঠিক এমন কথা কখনই হয় নি। তবু সে কেন যে একদম কথা ওঁকে বাড়িয়ে বলতে গেল কে জানে!

উত্তরে আমার বলা উচিত ছিল—সব ভুল—সব ভুল—ও সব কথা একেবারেই বানানো—বিশ্বাস করবেন না!

কিন্তু, নিজের অজান্তেই বলে উঠলাম অন্য কথা,—ওরাটা ত আর মিথ্যে নয়।

আমি কেন জানি আমার মনের কথা এ নয়, তবু আমার অদ্ভুত এক খেয়ে একটা কৌতুক, একটা খেলা করবার জন্যই উদ্ভূত

হয়ে উঠলো। উনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন—নিশ্চয়ই নয়!!

মুখ নীচু করে বসে আছি নবোঢ়া বধূর মতো।

উনি যেন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন,—তাহলে আর তো এভাবে চলে না! তোমরা চলে যাও—আলাদা ফিরে যাও তোমাদের দেশে।

কথাটায় কৌতুক অনুভব করলাম। বললাম,—তোমরা বলছেন কেন? দোষ যদি করে থাকি, আমিই করেছি, ওকে তাড়াতে চান কেন?

বললেন, বিশ্বাস নেই—তোমাদের বিদেশী মেয়েদের একটুও বিশ্বাস নেই!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—এমন করে উঠলেন কেন? আমরা তো কোনো পাপ করি নি।

উনি যেন মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে গেলেন। 'ঈশ্বর' 'ধর্ম' 'শিল্প' 'ভালবাসা',—এসব বারবার উচ্চারণ করে কতো কী যে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, তার ঠিক নেই! বাইরে আমার মুখের ভাব কেমন দেখাচ্ছিল জানি না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার যে তীব্র হাসি পাচ্ছিল, তাতে আর ভুল নেই।

তবু উনি থামতেই, আমি বললাম,—আপনার সব কিছুই মানে। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পটাই সত্য—ধর্ম আর ঈশ্বরকে তখানে আনেন কেন?

উনি চীৎকার করে বললেন,—ছাটোকে আমরা আলাদা করে দেখতে পারি না।

বললাম, সেখানেই তো ত্রুটি। আপনাদের শিল্প একটা বিশেষ ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আছে, নইলে এর আরও অগ্রগমন ঘটতো।

বলে, আর দাঁড়ালাম না, ছুটে চলে এলাম ঘর থেকে।" আবার সেই ঘুমা-পাড়ানো ঘরে। আবার সেই পুরুষের ভালোবাসা, সেই বাঁশিতের বিছানা, বাঁশিতের জিনিসটা, বাইরের বাগান, আর চারপাশে আমাদের বাসা।

একটা বিরাশার ওরোহিল, উঠে বসে বললে —এমন করে হাঁপাতে হাঁপাতে কোত্থেকে এলি? কোথায় ছিলি এতক্ষণ।

ওর কাছে গিয়ে বললেম,—এই, ওকে কী বলেছিলাম?

—কাকে?

—নারায়ণকে?

ওরা একটু অবাক হলো প্রথমটায়। তারপরে একটু হাসলে, বললে,—তুই বলো, ওরই কাছে ছিলি বুঝি এতক্ষণ?

হঠাৎই হেসে ফেললাম। হঠাৎই মনে পড়ে গেলো ওর সেই উদ্ভাসন। এবং তখনকার সেই হাসির উচ্ছ্বাসটা যেন এখানে এই ঘরে এসে ফেটে ছড়িয়ে পড়লো।

ওরাকেও সংক্রামিত করলো সেই হাসি, সে হাসতে হাসতেও বলতে লাগলো,—এই কী হয়েছে, এই?

একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলাম, বললাম,—বাচ্চাদাদি করবে?

বললে—বাড়ীতে নেই, চান-টান করে মাঁশিতের লিফটে গেল, না, তা?

ওর গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম,—আজ ও ঘরিয়ে দিবোনিল, এরপরে কী হবে?

বলে, ওকে আস্তে আস্তে সব বলতে লাগলাম। যখন শেষ করলাম, তখন দেখি, ওর মুখখানা গম্ভীর, ঠোঁট দুটি দৃঢ় সংবদ্ধ, চোখে যেন একটা জ্বালা ফুটে উঠেছে। বললে,—ঠিক করেছিস। লোকটা বাঁচবে।

—মানে?

ও উত্তর দিলো না। পাশের ঘরে তখনকার বাচ্চাদিদিও এসে গেছে বোধ হয়।

॥ ছয় ॥

আমাকে ওরা দিদি বলে, 'বাচ্চাদিদি',—আমি ওদের ছোট বোনের মতোই দেখি। বিশেষ করে শ্রীমতীর ওপরই আমার স্নেহটা বেশী। কিন্তু সেই শ্রীমতী যে এমন করে নারায়ণকে আঘাত করতে পারে, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। ওরা জানে না, ওদের দুজনকে নিয়ে আমাদের এই গ্রামে, শুধু আমাদের এই গ্রামে কেন, মেলাটুরেও খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে। একদল ওদের বিরোধী, আবার আরেক দল বলে ঠিক বিপরীত কথা। বিশেষ করে মেলাটুরের পল্লিসেবী-মহিলা বলেছেন,—বড়ো মেয়েটার কথা বলতে পারি না, সে হয়ত নাচিয়ে হিসাবে খুবই নাম করবে, লোকে তাকে মঞ্চে নৃত্য করতে দেখে মোহিত হয়ে যাবে। যাকে বলে, 'লোক আকর্ষণী ক্ষমতা,' মেয়েটার মধ্যে সেটা আছে। এর সঙ্গে যদি সত্যিকার শিল্প যুক্ত হয়, তা, অদ্ভুতকাণ্ড হবে। দেশ-বিদেশ থেকে ওর ডাক আসবে। আন্তিয়ানের ভাঙ্কর্যের মতো দাম হবে ওর। কিন্তু, শ্রীমতীর কথা আলাদা। ওর স্নেহলক্ষণ অন্য কথা বলে। পল্লিসেবী বললেন, দুই বিঘার ঘর বাদু, ওকে যেদিন দেখেছি, সেদিন থেকেই আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে; মনে হয় বার বার ওকে দেখি, ওকে কাছে রাখি, মেয়ের মতো মানুষ করি। মন যদি চায়, তা, মন ওর কল্যাণ করে নিজে—অর্থ যদি চায় তা, সে-ও হবে ওর প্রচুর, অল্প সময়ের মধ্যেই। আর যদি সংসার করতে চায় তা, সে-সংসার সব সুখ-সম্পদে ভরপুর। যদি কোনো পুরুষকে ভালবাসতে চায় তা, সে পুরুষ মন প্রাণ দিয়ে ওকে নিজেকে কৃতার্থ হবে। কিন্তু, ভালোবাসে দেখছি, ও এসব কিছুই চাইছে না। ওর মনের গতি-প্রকৃতি অন্য!" তা, হয়ত মীরাবাই থাকের মেয়ে, পরমার্থের

Puja Greetings

From

JINDAL (INDIA) PRIVATE LTD.

Makers of Steel Pipe Fittings

Regd. Office :

P.O. BELUAH Dist. HOWRAH

জন্ত ওর ভুল আদায়, ওর বৃত্তা হবে ওর আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গ।

অথচ, মাঝখানে গিয়ে নারায়ণদের কাছ থেকে আমি কী শুনে এলাম? সব কথা আওড়ালো না, কিন্তু মনে হলো, ভয়ানক বেগে গেছে, বিষণ্ণ হয়ে গেছে। বললে,—ওদের দেখাতে পারবো না আমি বলে দিও। ওরা নৃত্য শিক্ষা করতে আসেনি, আমাদের ধর্ম, বিশ্বাস, দেবতা আর সব কিছু ব্যাঙ্গবাঙ্গোক্তি ভেঙে চুরমার করে দিতে এসেছে।

নারায়ণদা বয়সে যুবক, কিন্তু ওর যে নিষ্ঠা, ওর যে ভক্তি—তা' দেখে, কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হলেও, ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে সবাই। এই অল্প বয়সের মেয়ে দুটি যদি ওকে আঘাতে দিয়ে থাকে তো, সেটা ভয়ানক অন্যায়, আমিও সেটা সইবো না, কিছুতেই না।

আমি তখুনি অবশ্য কিছু বললাম না। কথাটা তুললাম খাওয়া-দাওয়ার পর। প্রথমে ভেবেছিলাম, ওকে আড়ালে ডেকে নিয়েই বলবো। কিন্তু, কী দরকার? যা শোনবার ওরা দুজনেই শুনুক।

বললাম,—নারায়ণ তোমাদের আর কিছু দেখাবে না বলেছে।

মন্না বললে,—তা আমি কী দোষ করলাম বলোত?

শ্রীমতী কিন্তু হাসছিল মিটিমিটি। বললে,—না শিখিয়ে যাবেন কোথায়? দেবতা সাক্ষী করে 'নই্‌জানা' হয়েছেন। আর যদি বলেন, আমি দেবতা মানিনা, তখন ঠিক আছে, এক মিনিটেই তল্পীতল্পা বেঁধে ফেলবো।

হতবাক্ হয়ে গেলাম। কথাটাও সত্যিই! এখানকার, যা রীতি, তাকে ত্যাগ না করলে শিক্ষক তাকে ত্যাগ করতে পারে না।

তবু বললাম,—যাই বলো, এ তোমাদের অন্যায়। ওকে যা-তা বলে চটিয়ে দিয়েছো কেন?

মন্না বললে,—কেন 'তোমাদের' 'তোমাদের' বলছো? বাবে আমি কি ভিন্ন?

এ-কথাটারও জবাব দিতে পারলাম না। তাছাড়া, আমারও হয়েছে জ্বালা, মেয়ে দুটোর কাঁচ মুখের মিষ্টি ভাবিকে আমার এতো ভালো লাগে যে, বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতেও পারি না।

হেসে ফেললাম, বললাম,—তোরা বলছো? শিক্ষক আর ছাত্রী, আজীবনের সম্বন্ধ তা জানিস?

শ্রীমতী আবার হাসতে লাগলো, বললো,—তা বাব্বাঃ, কথাটা কীরকম হলো? আজীবনের সম্বন্ধ ত হয় শুধু স্বামী স্ত্রীর! আমি বাপু বাঙালী মেয়েও মাদ্রাজী বিয়ে করতে পারবো না।

কথাটা এমন ভাবে বললো, যেন, আমিই লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি ওর পিঠে দুম করে একটা কিল মেরে বললাম, যা নয় তাই বলিস!

দুজনেই তখন খিলখিল করে হাসতে লাগলো। আর, সেই হাসির ঝড়ের বিষম বেগে গাম্ভীর্য যে কোথায় হারিয়ে গেল, তা খোঁজ কে রাখে!

মন্না বললে,—তা বাব্বাঃ ওঁকেও 'ভারতম্ভ মেলা'তে এসে পড়তে বলো!

—নিশ্চয়ই।

শ্রীমতী বললে,—চলোনা, ওদের বিহারসাল দেখে আসি।

আমি বললাম,—বিহারসাল এখনো আরম্ভ হয়েছে নাকি? লোকগুলো সব জড়ো হচ্ছে, এই মাত্র। তবে দেখতে যদি হয়, ত মেলাটুরে যাবি। সেখানে এখন অনেকগুলো শালা হচ্ছে। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র-চরিত্র, তত্তো কী হবে বলে তুর্নি!

শ্রীমতী কথাটায় কোন গুরুত্ব দিলো না, বললো,—না বাবা, তার থেকে আমাদের 'পারিজাত হরণ'ই ভালো। বললাম, সেটাও আসবে হবে। এখানকার ত ঐ একটাই পালা। এটা শেষ হবার পর মেলাটুরে হবে। এখানকার লোকগুলোই সেটা করবে।

—তাই নাকি!—মন্না বললে, আমাদের স্বামিজী, গুরুজি, 'নই্‌জানজী'ও থাকবেন ত?

হেসে ফেললাম। সন্দুকণ্ঠে বললাম, তোরা কি সত্যিই ওকে মনে মনে—

মন্না দু-হাত তুলে কপালে ঠেকালো, বললো,—বক্ষে করো, সতীন নিয়ে ঘর করতে পারবো না।

শ্রীমতী বললে, কী দরকার! দুই একাই নিয়ে যে-না।

মন্না বলে উঠলো, খুব যে দাতা দেখছি? প্রাণে ধরে দিতে পারবি কী?

কথাগুলো ওরা পরিহাস করেই বলছে, আমিও যোগ দিয়েছি সেই পরিহাসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের মুখটা ভেসে উঠতে লাগলো, ওর চেহারাটা সত্যিই সুন্দর। এমনিতেই যে-কোনো যুবতী মেয়ের ভালো লাগবার কথা। ওর ভাবী আসেত ছিল। এরা দুজন ছাড়া এখনো আরও আছে, কিন্তু তারা সব প্রাক্তকালই মেয়েধর্মের বাঁধন ভাঙের পক্ষে। এদেরই হয়েছে মুস্কিল, এরা যেন অল্প জলের মাছ ডাঙায় ছিটকে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু, তা আসুক নারায়ণের ধ্যান ভঙ্গ করা সহজ নয়। সে তার শিক্ষক-রূপ ভুলবে, কখনো ভুল করবে না।

॥ সাত ॥

সে-কথা আমিও জানি। আমি জানি যে, দেবতা সাক্ষী করে একবার 'নই্‌জানা' হয়েছি ওরা তাকে না করলে আমি ওদের ত্যাগ করতে পারি না। আমি তিন-চারদিন পরে ঠিক যথারীতি ওদের শিক্ষা দিতে শুরু করলাম। গিয়েই কাজ আরম্ভ করি একটা নিদারুণ পরিশ্রম করি, ওরাও খুব খাটে, বিশেষ করে শ্রীমতীর চোখ বুজে নেবার বা ভুলে নেবার ক্ষমতা অসাধারণ। ওরা ঈষৎ স্থূলাঙ্গী, ওকে ভুবাঙ্গ-ভঙ্গিমা বারও দেখাতে হয় এক-একটি মুদ্রা। এ সব শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম যে গুণটির দরকার, সে হচ্ছে—স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি 'বাঙ্গালিনীরা বিলক্ষণ জানে। সে সব দিকে ওর কড়া নজর। খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ আছে, রকমফের আছে। মেদবাহুল্য না ঘটে, অঙ্গভঙ্গিকে দেহও না দুর্বল হয়ে যায়। সে সব দিক থেকে মেয়ে দুটিরও নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অসাধারণ। পর পর একটানা দিনসাতেক এইভাবে চললো। আমি গম্ভীর মুখে কাজ করে যাচ্ছি সত্যি, কিন্তু মনের মধ্যে ওর ঐ মারাত্মক কথাটা কেবলই খুবপাক খেয়ে মরছে!—শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পই সত্য, ঈশ্বর, ধর্ম, এ সব আবার কী?' কথাটা আমাকে বড়ই পীড়ন করে মেরে! সময়ে-অসময়ে কথাটা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এদিকে 'ভারতম্ভ মেলার' আয়োজন, তার চাঁদা তোলা থেকে সাজসজ্জা-সংগ্রহ, মহলা দেওয়া,—সবই করতে হচ্ছে একা—আর অন্যদিকে,—এই মেয়ে দুটি আর মেলাটুরের দেবতী। দেবতী খুব অল্পবয়সী মেয়ে তার নাচ তুলতে দেরী হয়, কিন্তু একো গ্রাণ্ড আর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ স্বভাবের মেয়ে, যে, একটু কড়া কথা বললেই কেঁদে ফেলে। কিন্তু,

অনবরে 'বাস্তু'র আমার দিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখি, বড়া দরজায় বসে কী একটা বই পড়ছে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। মমস্কার করলো।

বললাম—ইয়ে, ও কোথায়? শ্রীমতী?

বড়া বললে,—বেলাইন গেছে, বাবু-টিনির সঙ্গে।

—কেন?

বড়া বললে,—স্থানীয়া মাস্টারের কাছে। তিনি ওকে দেখতে চেয়েছিলেন।

—কেন?

বড়া সে কথার উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসলো। বললো,—ভিতরে আসুন।

ঘোমটা। আমি বলতেই বললো,—চা কি খাবেন?

BOOKS ARE IDEAL PUJA GIFTS.....

SOCIAL EDUCATION—CONCEPT AND METHOD by Sohan Singh. Deals with the ideas and methods of social education and stresses the importance of literacy in the field of social education. Rs 11.00

HINALAYAN BATTLE-GROUND—Sino-Indian Rivalry in Ladakh by Margaret W. Fisher, Leo E. Rose and Robert A. Huttenback. Rs. 15.00

INDIA—A WORLD IN TRANSITION by R. P. Lamb. The most comprehensive and balanced survey of India. Rs 15.00

THE GITA AND INDIAN CULTURE by H. H. the Maharaja of Mysore. Attempts in a fascinating manner, the exposition of the quintessence of the Gita and its influence on Indian Culture. Rs 2.00

PRABAD RATNAKAR (A Dictionary of Bengali Proverbs) by Satya Ranjan Sen. Vol. I to 4 Rs 3-50 each. Combined Volume Rs 15.00

STEAMBOATS ON THE GANGES—A Case Study of Science, Technology and Development in 19th Century by Henry T. Bernstein. Rs 15.00

ORIENT LONGMANS LTD.

17, Chittaranjan Avenue, CALCUTTA 13

BOMBAY — MADRAS NEW DELHI

—লাও।

আচমকা বাস্তু এলো। বললাম,—চাল কিনে ওরে খেলায় ভরু।

—নিশ্চয়ই খেলো বড়ো, কিনে ওরে?

—যা তোমার ইচ্ছে।

খেলো ওদের ঘরে ফিরে যাও খুললো। ছুটে দশটাকার নোট নিয়ে এলো। ওকে বললাম,—এটা!

ও বললে,—সবার কাছে টাকা চেয়ে বেড়াচ্ছেন, আমাদের কাছেই আসেন না! আমরা দুজনে এই খেলো বলে ঠিক করে রেখেছি।

বললাম,—তা'বলে এতো নিয়ে কে বলেছে? ৫ টাকা ৬ টাকা চাওটাকা লাও।

ও তবু নোট দুটো নিয়ে খেলো না, আমার পায়ের কাছে রেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো।

নোট দুটো আবার তুলে নিলাম, আমাদের 'বাস্তু' খুশী হল, একটাকার মধ্যেই উপকার হবে কিন্তু দুজন শিক্ষয়িত্রী তাদের কাছ থেকে এ-ভাবে নেওয়াটা যেন ঠোক-করবার্তায় চাড়া কিছুই নয়। মনটা মায় দিচ্ছিল না।

হঠাৎ দেখি, বড়া আমার দিকে দুটি তীক্ষ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। আমার চোখে চোখে মিলে যেতেই বললে, নতুনদাদী কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

—কেন?

ও বললে,—আমরা শিক্ষাকে ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখতে চাই বলে?

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম,—কিন্তু, এটা কি তোমাদের ঠিক হচ্ছে?

ও বললে,—আপনারা যাদুঘরের বস্তুর মধ্যে শিল্প ধরে রাখতে চান, এতে শিল্পের সত্যিই অগ্রগমন হয় না। এ যুগ ছেড়ে বাইরের মানুষের দিকে তাকান। সেখানে 'ধর্ম' আর 'উপকে' মানুষ চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে দিয়েছে। এই বইটা পড়ে দেখবেন—আমরা ঠিক থাকবো। ভালো কথা, না থাকেন ১০ 'ধর্ম' থেকে বিদায় নিতে হবে।

সেই মারাত্মক তাৎপর্যবাহী প্রতিক্রিয়া। বলে উঠলাম, শ্রীমতীই এ-সবের কথা বলে থাকে, তুমি কি শ্রীমতীর দ্বারা প্রভাবিত? ও বললে, যে যে কারণে আমরা বিয়ে করেছি।

বললাম,—আচ্ছা, তোমরা যে এতো বড়ো বড়ো কথা বলো, শিল্পের তোমরা আসলে করছ? এখনো তফাতে যে তোমাদের ঢের বাকী।

ও বললে, সত্যি কথা। কিন্তু যেটুকু জানায়, তাকে এই সব কথাই মনে ভীড় করে আসে। আপনি আমাদের ওই আপনার কাছ থেকে মনের দরজা বন্ধ করে নেবেন না।

চুপ করে রইলাম। ও কাছেই দরজাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে। আমার কাজ হয়ে গেছে, উঠে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ছেড়ে পারছি না। হঠাৎ বলে উঠলাম, সেদিন ক্লাসে আমাকে একটি মেয়েকে কথা বলেছিলে।

—কী কথা?

বললাম, বলেছিলে, ও আমাকে—আমাকে—

কথাটি কেড়ে নিয়ে বড়া বললে,—ভালবাসে, এই তো? কেন বলবেন বলুন! আপনি কী অসাধারণ মানুষ!

উঠে দাঁড়ালাম। আবার শিক্ষক-ছাত্রীর প্রসঙ্গ তুলে উত্তেজনার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু পারলাম না। হঠাৎ, মুখখানা আজ দিনের বেলাতেও ফেকাসে ছিল, বলে উঠলাম,—আমার কতটুকু তোমরা জানো? এক অনাথ শিশু, সবের সমাজ বড়ো করে উঠেছি। আজ আমাকে নাড়া-চড়া অনেকে করে, কিন্তু,—যে-কথা বললে, ওটা যে আমাদের 'দেওয়া' নেই, ও চাহিদাও থাকতে নেই আমাদের জীবনে।

হঠাৎ চোখদুটো যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো,—কেন থাকতে নেই?

আমার বুকের ভিতরটা ওখনে যেন থরথর করে কাঁপছে, বললাম,—থাকলে আমাদের কাজে বাধার সৃষ্টি হবে। এবং, সুযোগও অল্প থাকে না।

বড়া বললে—তার মানে চাহিদা ঠিকই আছে, জোর করে সেটাকে চাপা দিয়ে রাখতে চান, আই না?

এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে। তারপরে আমাদের 'সভা' শুরু হলো, ছাত্রীদের কাছ থেকে ছুটি নিলাম তাদের জন্য। কিন্তু যখনই 'সভা'র কথা মনে হয়, যখনই সভাস্থানে আসার আগে আসে, তখনই মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিরাট একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। 'সভাস্থান' 'বাসা' দুজনেরই প্রেম 'ভক্ত'কে কেন্দ্র ক'রে,—কিন্তু, অনুষ্ঠানের অন্তে

তখন; 'তবে আমি ওকে ডেকে তুলবো, 'সত্যভামা' 'জোর' ক'রে তার করেছেন। দুটোই বিশ্রী 'বাবার সাধনা'। তাও ঘটলো বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়। যারা চিরকুমারীব্রতী, তিনি বীজ আকাশে মেলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের অনুষ্ঠানে বিজয়া হলেন...তখন তিনি কী ক'রে তাঁদের স্পর্শসুখ অনুভব করবেন! আর সত্যভামা? তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মুহূর্তের তরে কাছছাড়া করতে পারেন না, প্রতি মুহূর্তে তাঁর ভয়—এই বুঝি হারালাম! তিনি তাঁকে সর্বক্ষণভাবে বেঁধে রাখতে চান। তেবে তেবে সেবার দর স্থির দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণকে যখন কোনো বিষয়ে নিশ্চিত মতো অনন্যার মনে হয়, তখন তাঁর মধ্যে মানুষের জেগে ওঠে, যখন শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তাঁকে দাসীর মতো সেবার আঁচলে বিঁধে চান! আর বয়েছে প্রেম, এমন কি, কাব্যের মধ্য দিয়েও সেই প্রেম অনুভব হয়ে ওঠে!

এই এক 'সত্যভামা'র মধ্যে অন্য ভাব দিয়া করছে! সেই জন্য 'পারিজাত-অপহরণ' পালার 'সত্যভামা'র ভূমিকা এতো কঠিন! বৃন্দা, বৃন্দা ও অভিনয়ে পাকলেই না হলে ও—ভূমিকা কেউ করতে পারে না। এই পালার সঙ্গে 'ভূমিকুড়ী'র 'রাধাকলাপ'-এর সঙ্গে অনেই মিল আছে। অভিনয়ও আছে। অভিনয় হচ্ছে, 'রাধাকলাপ'-এ যেমন অন্তরঙ্গলো একত্র অভিনয় আছে সত্যভামার, সেগুলো বিশ্লিষ্টভাবে দেখানো চলে, কিন্তু এখানে তা চলে না। কিন্তু 'সত্যভামা'র অভিনয়ের মহলা দিতে দিতে হঠাৎ মনে হলো,—যারা প্রাচীনকালে এই 'পালা' রচনা ও প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা ও সত্যভামার জীবন থেকে 'রাধাভাব' বাদ দেন নি? তবে?

বলেছিলাম, তবের কাছে আপাতত: আর যাবো না, কিন্তু সোজা ছুটে গেলাম। শ্রীমতীকে ডাকলাম যাইবে। মেয়েটা তোরবেলা, বাসু ফুল তুলতে শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে গেছে। মেয়েরাই তোর উঠে। তারা তার ঘরে। শ্রীমতী তার বন্ধুদিকে নদে যাইতে এসেছে, বাঁশের ওপর ছিপে ফুলের ডালি, বেলে মেওয়া, দুধবাদাম, সন্দ" শিশির তোরা ফুলের মতোই অনন্দল করছে, আর, নদীর দিকে একটা অদ্ভুত সৌরভ চারদিক আচ্ছন্ন

আমার মুখ দেখেই বোধ হয় ও মেয়ে তার মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো,—কী ব্যাপার?

বললাম,—আমি বড়ো অদ্ভুত মনে (ে ীছ: মনে হচ্ছে, বাঁশের ঝোপে বেঁধে যাচ্ছে—তেমনি অন্তরায়! প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ও বলতে পারবো,—হেসে কথা ছুটে আমাকে বলতে এসেছেন কেন?

কিন্তু তা' বললো না,—ঐসব কথা আপনার উচিত মানুষের জন্মনা। প্রায়শ্চিত্ত আবার কি?

আমি আবার চিত্ত নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু, তারপর?

যেন মনে আছে, আর ডিসেম্বর, কী, চারদিক বাসী 'রাধাকৃষ্ণ খেলা'র,—'সত্যভামা'র মহলা দিতে দিতে যাবার অন্যমনা হয়ে যাই, আর সব শেষ,—চারদিকের সব ভেঙে পড়ছে!

সোজাসুজি তোর বেলা ছুটে গেছি। এতো তোর, যে, আকাশে তখনো চাঁদ রয়েছে, তখনো দিগন্তে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। তারো কাঁচে শেষ হয়ে ওঠেনি চারদিক, 'বাসু' উঠেছে। উঠে, কী তোর পাই করতে করতে যাবের দুয়ারে তলের ছিটে দিচ্ছে 'আমাকে দেখে অবাক হলো, বললে,—এতো তোরে যে?

বললাম,—তবা উঠেছে কী

—না।

—ডেকে দাও।

তখনখেই।

বললাম,—ও্যা—না—আচ্ছা—একটু ডাকো—শ্রীমতীকে—একটু কথাটা বলে যাই।

যাবের দোরকাছে আছি। তাদের ঘরের দরজা খুললে শব্দ শোনায়। শ্রীমতী বোধহয় উঠলো। বোধহয় মুখ ধুয়ে কলঘরে গেল। তারপরে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালো আমার ডাকে।

সদ্যোত্থিত তরুণী নারীরও একটা সৌন্দর্যের বিকিরণ আছে। চুল বেণীবদ্ধ কিন্তু চুলেকেশগুলো সারা রা মেনে কাঁচ কাঁচ ঘামের শাঁখের মতো মুখ ঘিরে আলোলিত হচ্ছে। পরণের শাড়ীটা নানান্ ভাঁজের রেখায়-রেখায় আকীর্ণ, মুখখানাতে কেমন একটা বিবর্ণ ভাব। বললে,—ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ। একটু বাগানের দিকে সরে এসো।

একটা তরুণী মেয়ের সোজাসুজি কাছে এসে আমার বাধলো, বললাম, দু একটা ভাবছো তাদি না—কিন্তু বলো মনস্থির আমি—সেটা অদ্ভুত মত আমার সেখোর—বৈষ্ণবের প্রায়শ্চিত্ত করছে—বাধা দিতে বলতে পারছো,—তাতে আমার কী? আমার কাছে এ-ভাবে ছুটে ছুটে আসার কেন?

কিন্তু পাছে না বাবে, চোখমুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তাঁর আমার একেবারে কাছে সরে এলে, আমার একটা হাত ধরবের মতো টেনে নিলো। আমার সর্বাঙ্গ যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। ও বললে,—তয় পেও না।

দুজনের চিত্তটা ঘড়ির ঘড়াস করে উঠলো সজোরে। এতে তয় পাবার, তাকে তয় দেখাবার এই এমন 'তুমি' করে কথা। আমি যেন এবার উত্তাল হয়ে উঠলো! আমি তাড়াতাড়ি তয় তার মাথাটুকু নিয়ে—পালাতে যেতেই—

—দাঁড়াও,—বলে ডেকে উঠলো পিছন থেকে।

কাছে এলো। বললে,—যেও না।

চীৎকার করে ঘরকে বলা উচিত ছিল, 'তুমি' করে বলছে কেন? কে অধিকার দিয়েছে তুমি করে বলবার?

কিন্তু পারলাম না। তখন আমাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিলো। কাছে এসে দুটি দুটি তরুণ অঙ্গে পরের কাঁধ রেখে তাঁর মতো করে বললে—তয় পেও না। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

তখনে ফিরে তার দিকে তাকালাম। তার চোখে যে বিষ্ণুর তবে দাঁড়াই ছুটে উঠেছে তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এই 'তাব, ঠিক এই 'তাব' ছুটে ওঠা সবতাব সত্যভামার চোখে মুখে!

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গতাবেই বলে উঠলাম —তবে কী—তবে কী—তার তাঁর নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—বাসনা—কামনা—এ-সব' রূপ দিয়ে দেবেন দেবতাদের রূপ-মহিমা মধ্য দিয়ে?

—অবিশ্বাস করো?

বললে—তুমি না—আমাদের সব চিন্তা-ভাবনা গুলোট পালট করে দিচ্ছে।

শ্রীমতী বললেন,—ভিতরে এসো। কাজ টাজ সেরে তয় করে আবার যাবে। আর শোন, ফিরবে ফিরে যেন

আমরা অন্য কথা বলবো, কেমন? বরঞ্চ আমার মনে মনে চট আছে।

॥ আট ॥

এইটেই ওর চরম, আর্যিকে ভয় করবার কিছু নয়। আমিত পরিষ্কারই জানতাম, ও কী করতে চায়? ওর মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যা একটা-কিছু 'লীলা' না হলে বাঁচতে পারে না। আমিও নারী, কিন্তু আমার মনটা কোথায় যেন ভয়ে আধমরা হয়ে আছে, আমার মায়ের কলঙ্কিত জীবন, যা শিশুকাল থেকেই ভিলে ভিলে আমার চেতনাকে পীড়িত করেছে,—তারই ফলে এটা ঘটছে হয়ত। আমিও কাশীতে প্রথম যৌবনে কোনো পরুষ মত তরুণ পুরুষকে দেখে বুদ্ধতী-সুলভ লীলায় চঞ্চল হবার চেষ্টা করেছি, এবং সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু পারিনি। যাকে কোমাক বলে, সেটা বোধহয় আমার স্বভাবে ঠিক প্রাক্তকালিত নেই। এবং বলা যায়, এই সহজ লীলাভাব মৈত্রেয়ীর মধ্যে আছে বলেই আমি ওর প্রতি এমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। ওর সঙ্গে ধীরে ধীরে কেমন করে এই লীলা প্রকটিত হয়ে ওঠে, সেটা দেখবার জন্য আমার তৃষ্ণা অদম্য। নইলে, কে চেয়েছিল এই বৃথা শিক্ষা? এ সব ত ওরই জন্য।

আমি জানতাম, সেদিন-ই লীলাবশে ও ঐ সহজ সরল মানুষটাকে নাড়া দিতে ছেড়েছে। যেদিন ও ওর সম্পূর্ণ বশে আসবে, সেই দিনই সে ওর কাছ থেকে দূরে আসবে। আর তখন আমার কাছে এসে যে কী বলবে, তা-ও আমার জানা। ও বলবে,—চল বহ্ন, আজই আমরা কাশী চলে যাই। 'জাগরত মেলা নাটক' লিখে আমাদের কী হবে?

আমিও স্বাভাবিক রীতিতেই বলবো,—চল্।

আর তার পরেই আমরা 'হোল্ড্-অল' বাঁধতে শুরু করবো। সুটকেশ গুছোতে শুরু করবো। চলো মোটর গাড়ী ভাড়া করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে আস্তাস হয়ে একেবারে দূর পাল্লা—কাশী।

কিন্তু, সম্প্রতি আমি ভয় পেয়ে গেছি! ও যখন মেলাটুর থেকে ফিরে এলো বাস্তুদীদির সঙ্গে, ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে, ও যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ! আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বললো না, বাস্তুদীদির কাছে ও বসলো না, একটু নির্লিপ্ত—একটু নির্জনতা—এই-ই যেন ও খুঁজে বেড়াতে লাগলো। নাচ দেখার সময় সুযোগ চাতকীর মতো সব কিছু করে গেল, কিন্তু ওর সেই কথায় কথায় হেসে ওঠা, ওর সেই সুযোগ পেলেই ঠাট্টা করা, মজার কথা বলা,—সে সব গেলো কোথায়? আর তারপর, রাত্রিতে? হঠাৎ টের পেলাম, ওর বিছানায়, উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। ঘরের কোনে একটা ছোট্ট মাটির প্রদীপ জ্বলে সারারাত, তারই আলোয় অস্পষ্ট দেখলাম, সারারাত দেহটা ওর ফুলে ফুলে উঠছে।

উঠে কাছে গেলাম, বললাম,—কী হয়েছে বে?

কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললে কিছু না।

বললাম,—কিছু না যদি? কাঁদছিস কেন এমন করে?

প্রথমে কোনো উত্তর পেলাম না। বার বার অনেক করে জিজ্ঞাসা করতে বললেন,—আমার ভয় করছে। আমি এখানে থাকবো না!

—সে কী, কেন?

বললে,—পদ্মাসিনী দেবীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার হাত দেখলেন, আমার পায়ের পাতা লক্ষ্য করলেন, আমার চোখ, আমার কপাল, আমার চিবুক,—এসব দেখলেন। কতো-কী গল্প করতে লাগলেন। মানুষটি এমনিতে ভালো, কিন্তু, কী সব যে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন, শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বাস্তুদীদিকে বললেন,—আমি নাকি পদ্মিনী নারী। যা যে বলা, মেয়েরা নাকি চার রকম পদ্মিনী-শঙ্খিনী চিত্রিনী, হস্তিনী? জানিস এসব, শুনেছিস?

বললাম,—না।

মৈত্রেয়ী বলতে লাগলো,—পদ্মিনী শঙ্খিনীতে দৈহিক গঠনে অনেক মিল থাকে, আবার অমিলও প্রচুর। শঙ্খিনীর উচ্চাবস্থাই নাকি পদ্মিনী। এসবই শিখে এলাম! বাস্তুদীদি অবশ্য জানতো।

—তাকবো, বাস্তুদীদিকে?

ও বললে, ছিঃ—মুখের-ওপর।

বলতে-বলতে ও হেসে ফেললো,—বললো, তোরও ত আমার মতো লম্বা লম্বা আঙুল নিটোল-গোল, তুই-ও পদ্মিনী নাকি?

With Complemens From :—

P. PAUL AND BROTHERS (PRIVATE) LTD.
39B & 30, Nirmal Chandra Street, Calcutta-12
Registered Tata & Iisco-Dealers, Asbestors Cement Sheets,
Horse & Bullock Shoe Nails Merchants &
IRON MERCHANTS
Phone : 24-4223 & 24-4915

সে ফেললাম,—না বাপু, তাহলে
যাচ্ছেতাই শাস্তিনী —তোর নীচের
আর কীসে শাস্তিনী হলো
ী বাই আমাকেও আশ্রয় করে
চাইছেন!

ঠিক আমার সঙ্গে হাসতে গেল
।, বললে, —আমার গায়ে লাগে
আছে।

।—তাই টের পাচ্ছিলে তা?

।-ই লজ্জা পেয়ে ও মুখ নীচু
করে মুখ ঢাকলো। বললাম,—
ং, কী হলো রে?

কণ্ঠে ও বললে,—তুই পাবি
আমার স্বামী পাবে।

সে বললাম,—ও, এই কথা!
টাই যদি Last হয় তা,
করবার জন্য একটা স্বামী জোগাড়
তাড়াতাড়ি। আমাদের
নতা' ত হয়েছেনই!

াটায় ও একেবারে উপুড় হয়ে মুখ
য়ে পড়লো। ওকে নড়াবার
করলাম, বললাম.—এই দেখ!
ত লজ্জা!

তবু বালিশটি আঁকড়ে মুখ গুঁজে
ইলো। রাগ করে বললাম,—
ছে। চাষাও যদি না বুঝিল—
নিরক্ষর। কী-একটা সন্দেহ হতেই
ধে কাছে মুখ নিয়ে গেলেই দেখি
খ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রুধারা বয়ে
।

ছি ওকে আদর দিলাম না, ওর
থেকে আস্তে আস্তে উঠে নিজের
য় ফিরে এলাম। সান্ত্বনা এবার
ভয় হতে লাগলো। ঠিক কী
ভয়, কীসের ভয়, তা বোঝাতে
না। যেন একটা আক্রোশের সাপ
ত করে আমাকে দংশন করতে
। একবার ভাবলাম, ওকে
াকি,—তাই চল, কালই আমরা
লে যাই।

ছু বলতে পারলাম না। সেই
ঘ'সাপটা যেন আমাকে পাকে-
াঁড়িয়ে ধরে অবশ করে ফেলে
। সান্ত্বনা-সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়ে
ুখ তোষের দিকে ফেরাতে ,যা
ীকে উঠলাম। রাজুদীদিই তাড়-
াড়ি-নাম ক'রে। দেখলাম, ও
কথা খুললো, রাজুদীদি ওকে
ু করে কী যেন বললো। ও
কেই ওর লজ্জা করেনি, আমি দূর থেকে
দেখতে পেয়েছিলাম,* কিন্তু এখন রাজুদীর আড়ালে রাজরাজেশ্বরের সঙ্গে কথা বলছে
মৈত্রেয়ী। ওর মুখখানি সূর্যমুখী ফুলের
মতো উঁচু হয়ে আছে রাজরাজেশ্বর দিকে।।

লজ্জা কথা বলতে কী, আমি ঈর্ষান্বিত
হইনি, ঈর্ষাও করিনি আমার। শুধু মনে
হলো মৈত্রেয়ীকে বিয়ে। ও যদি
গুণীবরণে—!

॥ নয় ॥

সেই আশ্চর্য দিনটি ধীরে ধীরে এসে
উপস্থিত হলো। সেই দিনের কথা
বেলা। রাজুদীদি ডাকলো। আমি
উঠলাম, দরজা তখনো ঘুমুচ্ছে আলোয়।
খেলায় ওর ওঠে। বললে,—যাবে
আমার সঙ্গে? তাড়োর?

—যাবো।

ও বললে,-এখ্খুনি। তোমের প্রথম
বাস্‌টায় রওনা হবো।

বললাম,—এক মিনিট। তৈরী
হয়ে নি।

কিন্তু তৈরী হতে গিয়ে দাড়িতেই অনেক
দেরী হয়ে গেল। আমি পাড়ী বললে—
টাকার ছোট্ট ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে—প্রণাম
সেরে বাইরে বেরোচ্ছি, দরজা বললে,—
আজই ত 'তাপবত মেলা' মাকি শুরু।
কোথায় যাচ্ছিল এত সকালে।

—তাড়োর। তুই যাবি?

—না—দরজা বললো —তুই-ই ঘুরে
আয়।

রাজুদীদিও সেই কথা বললো—তুমি
একাই ঘুরে এসো।

কিন্তু যাকে নিয়ে ঘুরবো, সে
তাড়ার ওপর হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ধবধবে জমা। দুটি পরনে, তেমনি দামী
ধবধবে পাঞ্জাবী, গায়ে সেই জরির
পাড়-এবালা বাদ্রাজী চাদর। কপালে
সৌম্যর তিলক-টিলক আঁকেনি,—
লোকটাকে কিন্তু সত্যিই সুন্দর
দেখাচ্ছিল। একটা অদ্ভুত পুরুষালী
চেহারা,—একটা তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব, যেন ফুটে
বেরিয়েছে।

আমি তাকে যেতেই বললে,—'বাস্'
চলে গেল। এখন আর মাত্র আধঘণ্টা।

হেসে বললাম,— 'বাস্-এ যাবো
মাকি? 'গাড়ী ভাড়া করো।

যেন আৎকে উঠলো,—সে যে অনেক
টাকা।

বললাম,—টাকার জন্য ভাবতে হবে
ও বার করতে লাগলো, আমিও
ছাড়লো না। শেষ পর্যন্ত সে এক
'ভূবেরা'র বাড়ী থেকে তার একটা
চকচকে সেকেণ্ড হোটর বার করে নিয়ে
এলো। গাড়ীতে আমরা দুজন—দুটি
পটে-আঁকা ছবির মতো বসে
রইলাম।। আমি জানি, ওর মনে একটা
আনন্দ ঘূর্ণায়িত হয়ে ঘুরছে। আজ
ওর 'লাইফ' আসছে, ওর এতদিন মনে একান্ত
ঘরে এই,সুদূর গ্রামে 'লাইফ'-এর ব্যবসা,
—কেমন যে হবে, কী ভাবে লোকে নেবে,
—এসব চিন্তাতেই ওর মনটা আঁধার হয়ে
আছে।

সে আঁধারটা বাইরে প্রকাশ না
করলেও আমি তা' মনে মনে বুঝতে
পারি। তাই কোনো কথা না বলে একটি
বার মাত্র ওর হাতখানা টেনে নিয়ে হাতে
মৃদু একটু চাপ দিলাম। চকিতে আমার
দিকে তাকালো। আর ঠিক তখনি
মনে হলো ওর চোখদুটি সত্যিই বড়ো
উজ্জ্বল—তাতে জলা নেই, আছে
স্নিগ্ধ দীপের দীপ্তি।

তাড়োর মন্দিরটাকে সেদিন যেন নতুন
করে দেখলাম। মনে হলো, এ যেন
আমার কতো চেনা—এ-মন্দিরে যেন
আমি বহুবার এসেছি-গেছি। তার
হলে এর ইতিহাস নিয়ে পড়তো, শিবাজী-
মারাঠা; ওদের কথা ভুলতো। সবসময়
বলতো আমাদের রাজাদের কথা। আমার
মন যেন সে-সব ছাড়িয়ে আরও
অতীতে চলে গেল। বিজয়নগর রাজ্যের
মহিমা তখন প্রথম প্রচারিত, তখন শুনেছি,
'তীর্থনারায়ণ' বলে একজন ভোলেও ব্রাহ্মণ
এই তাড়োর মেলায় এসে স্নানাদি করতে
শুরু করেছিলেন। ইনিই ছিলেন সবার
গুরু, ইনিই রচনা করেছিলেন 'কৃষ্ণ-
লীলা তরঙ্গিণী'—তিনি যে ঘাটে
স্নানাহ্নিক করতেন, সেই 'তাপবত' ঘাটে
আজও কৃষ্ণ তরঙ্গিণী দিয়ে 'কৃষ্ণ
তরঙ্গিণী' গীত হয়ে থাকে।

এসবই আমি সেদিন শুনেছিলাম
পাঞ্জাবী ভাইয়ের কাছ থেকে। তিনিই
বলেছিলেন,—জয়াদেব তুমি এসেছো
স্নান করতে।

তিনিই বলেছিলেন,—লোকে বলতো,
'তীর্থনারায়ণ'ই কবি জয়দেব, জয়াদেব
রূপে এসে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনিই
জয়দেবের পদাবলী, বিশেষ করে তাঁর
বিখ্যাত অষ্টপদীটি,—'দেহপদপল্লব মুদারম্

প্রচলিত করেন। আজও পুঁচিপুত্তী বৃত্তের 'পালন'এর অংশে ছয়দেবের পালা-বদীয় কোনো কোনো অংশ গান করা হয়ে থাকে।

তাজোড়-বাঁশবনে ঘুরতে ঘুরতে আমার মনের মধ্যে যেন এইসব কথাই গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে লাগলো। সেই বিপুল 'গুহামূর্তি'র গায়ে নব-নারীর 'মিলন-চিত্র' রয়েছে, তার দিকে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

ও তাড়া দিলো, বললে,—কী দেখছো? এসো।

পূজা শেষ হলো। ওর প্রণামের পর ওর পায়ে হাত রেখে ওকে প্রণাম করলাম। ও বললে,—আজ আমার কঠিন পরীক্ষা। জানি না আমার নাটক-এর কী হবে? এতকাল যে-বিশ্বাস মনের মধ্যে লালিত করে এসেছি, সেখানে ফাটল ধরেছে। সেই জন্যই এই সংশয়। প্রত্যাদেশ যদি পাইলে শিল্পী তার শিল্প প্রকাশ করবে কী করে? আমার সব কিছু উলিয়ে দিয়েছো তুমি।

কিছু বলিনি। আবার গাড়ী ঘুরেই আসি। ফিরে এলাম, সেই কুয়োবার জন্য বলে গাড়োয়ানও করেই। ও বললে,—আজ আর দেখা হবে না, আসরে আসতে বেশী দেরী করো না, এতো-ভীড় হবে যে, জীবনে পাওয়া দুষ্কর।

বললাম,—আমিও জায়গা পাবো না?

ও বললে,—পাবে না, করে নিতে হবে।

সত্যিই তাই। করেই নিতে হলো। রাজুদাদি আমাদের দুটিকে তাড়া দিয়ে সকাল-সকাল খাইয়ে দিলো। ...আর-টা। বাজতে-না-বাজতেই আমা দিকে রওনা দিলাম আমরা। যা উপরে ডেরপল, তা-ও বহু জায়গায় ছে মাটির ওপরে কোথাও চট, কোথাও তা পাতার বোনা চাটাই। আসরের মা খানে ছিয়ে চাঁদ বাঁধা স্যাং একদিকে পুরুষ, অন্য দিকে চারজন পুরুষদের দিকে শুধু অনেকটা। খা জায়গা আছে কিন্তু মেয়েদের দিয় 'নয়ানং-ভিল ধারণে।' ওমোট গ্র বলে সবাই হাতে তালপাখা নি এসেছে, আমরাও এনেছি। তবু রাজুদিদি করেছে কী বাটা-ভ পান এনেছে, আর এনেছে একঘটি জ এইসব নিয়ে কেমন করে এগিয়ে যি বলবো ভাবছি, রাজুদিদি ঠিক ক কাটিয়ে আমাদের নিয়ে একেবারে এ সামিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। এ ফাঁক ছিল এখানে, উদ্যোক্তারা সমা করে আমাদের বসিয়ে দিলেন।

যদ্যা বললে, স্টেজটা দেখ!

স্টেজ মানে উঁচু পাটাতন। পেছ ম্যাস্ক জলছে চার কোণায় চারটে কোনো পর্দা নেই, পিছনে কা পর্দা ঝুলছে। আর স্টেজের পাশে 'এপ্রিসিনিয়ম' বলে কিছু নেই, যে চালের ভার রাখবার জন্য শালপ্ পোতা, দেবদারু পাতায় মুড়ে এ ভদ্রা চেহারা দেওয়া হয়েছে মা আর সবার থেকে যদ্যার লাগলো স্টেজ দু-পাশের দিকে তাকিয়ে। কলা কেটে বসানো, তার মাথায় জ্ব অতিকায় মাটির প্রদীপ। জল য তাকিয়ে দেখলাম পাত্র-প্রদীপের সঙ্গ তাই। কলা গাছের ওপরে প্রদী সারি সারি পোতা রয়েছে।

যদ্যা দেখে শুনে হাসতে লাগলে তারপরে একসময় বললো, চল্ মা সাজঘরে? কে কেমন সাজছে দে আসি। রাজুদিদি মুচকি হাসলো, বলা মাহাওপস্ এখন সাজবে না। ও-সা পরে।

যদ্যাই আমায় ওর বুকের মি জানালাম। যদ্যা বললে, উনি ত প্ চালক। উনি আমায় নিজে সাজা সাজি? রাজুদিদি বললে, ওমা, ত আমোনা! ও-ই তো সাজিয়ে-গুজিয়ে

করেক মুহূর্ত রাজুদিদির মুখের দি তাকিয়েই থাকবার পর বেরে উঠলো

নববধূর কাছে আশীর্বাদ—
"সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় থাক"

শ্রীমতী

সিঁদুরে, আলতা,
কুমকুম, স্নো,
পাউডার ও কেশতৈল

ফোন: ৩৪-০৮৮৭ জে. এন. কুণ্ডু এণ্ড কোং

গলে. মেয়ে সাজলে বটে তারাই। অমনি ঢেঙা দাড়োয়ান দাদা মানুষটা!

কিন্তু, আচমকা যখন আলো জ্বলো, আমরা সবাই তখন নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে ন-টা নাগাদ চং চং করে সেটা ঘোষণা করা হলো। অর্থাৎ একটা দাড়া পড়ে গেল প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। প্রেক্ষাগৃহটা তখন এক বিশেষ ধরনের পরিবেশ হয়েছে।

চারদিকে সমবেত উল্লাসধ্বনি আর চাপা হাসির শব্দে চেউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকার একটা সাদা পরে একটি মানুষ মঞ্চে এসে ঢুকেছে। দর্শকরা কেউ কেউ মুখে 'হিপ হিপ' দিতে উঠলো পর্যন্ত। লোকটা জীবাণুবিশেষের মতো ভঙ্গী করে লম্ফ ঝম্প করতে লাগলো। আর বলতে লাগলো 'সাধু-সাধু'।

অর্থাৎ চুপ-চুপ।

একটা জিনিস বুঝলাম, লোকটাকে দেখে দর্শক সাধারণ মজাই পাচ্ছে, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ত কথাই নেই!

যাদুগিনি বললে, ভোজবাজী।

—মানে!

যাদুগিনি বললে,—লোক-হাসানোই ওর কাজ। দাদা নাটকে কোথাও হাসির জায়গা নেই, তাই প্রথমেই মানুষকে ওরা হাসবার আয়োজন দিয়ে নেয়।

উৎসুক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম লোকটার কার্যকলাপ। একজন লম্বা কার্বান, বকে আরও একটি লোক এসে বসেছে, তার মুখে একটা সানাই-জাতীয় বাঁশী। বাঁশীতে তিনটি যন্ত্রপাতি আছে, সেই তিনটিই সে বাজাচ্ছে পর্যায়ক্রমে।

যাদুগিনি বললে,—একে বলে 'নকরী।' অবশ্য ঠিক 'নকরী'ও নয়, নকরীতে লোকে মুখোশ থাকে না।

এ তিনটি সুর আর তার নিজের পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ,—এই দিয়ে লোকটা নানারকম পায়ের কাজ দেখাতে লাগলো। তাল-কেটে-যায়-যায়, কিন্তু লোকটা, ঠিক 'সোম' ফেলতে লাগলো। আর্কাদের 'ক্লাউন'-এর মতো, আসলে তার নিজের কাজে সে খুবই দক্ষ, কিন্তু লোকদের হাসাবার জন্যই তার এই অভিনয়। তার তাক-ভঙ্গী দেখে লোকে হেসে উঠলেই সে দর্শকদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে আর বলছে—'সাধু সাধু'।

তারপর, এক সময় সে চলে গেল। আর সে চলে যাবার পরই ঢুকলেন 'নায়কেরা'। আর বলিহারি দল! 'ক্লাসিক-ফ্লেমেঙ্কো'ওয়ালা আছে, 'ব্যালে'ও আছে। এঁরা সাবি দিয়ে দাঁড়াতেই মঞ্চটা একটু ভরাট হয়ে এলো। বেশ বুঝলাম, যুদ্ধে যেন জাপ করা হয়ে গেছে। মাথায় পাগড়ী, পরনে জরিপাড় ধুতি-চাদর, পায়ে সেই জরিপাড় দিয়ে চাদরটি জড়ানো। হাতে ছোট খঞ্জনী, ঠিক স্প্যেনের কাঠের মতো সুর করে একটা গান করতে লাগলেন।

যাদুগিনি বললে, এ ভক্তে ভোট হলেন।

সবার মঙ্গল চোক ইত্যাদি ভাবভোতক এই গান।

ওঁরা গান গেয়ে চলে গেলেন। এর পর এলেন বলরাম। তাঁর যেন লাটা-সাহেবের সব আনা লক্ষণ আছে। এই-ভাবের অনুসরণ হিসাবে একটি অন্তরাল থেকে তিন এক ব্যক্তি খান ও গাইতে লাগলেন। আমার বুঝতে বাকী রইলো না, দেখলাম, বলরাম আজকাল তাঁদের বুঝতে পারে।

এর পরে যিনি এলেন, তাঁকে বলে, 'আউয়ানকারে।' অবশ্য যাদুগিনিরই ভাষ্য অনুসারে। 'নই চান' এরই মতো সাজ পরেছেন, তবে, বয়সে অনেক বৃদ্ধ। তাঁর 'চরিত্রখানি' মতো সুর করে নাটকের বিষয়বস্তু, নাটকের ভাবনা,—সব বলে গেলেন একে একে। এমন কী, শেষটা কি হবে—তাও তিনি চেপে রাখলেন না। তারপরে শুরু হলো নাটক।

দুটি স্ত্রী-বেশ-ধারী পুরুষ একটি চাপা মঞ্চের চাদরের দুই প্রান্ত ধরে দুই দিকে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করে দেখলাম, চাদরটার আড়ালে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে, স্ত্রীলোকেরই সাজসজ্জা, তবে মেয়েদের কেউ নেই, কোনো পুরুষই দেখেছে হবে। চাদরটি খাটো, ওপরে মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে, নীচে দেখা যাচ্ছে—অসংখ্য পদা পা-দুখানি।

চাদরটি চাদরের আড়ালে অন্তর্ধান করলো। দুটি চপল চরণের তাল, আর মুখের লাস্যাভিব্যক্তি। চাদরটি পান আরম্ভ করতেই চাদরটা নড়িয়ে সখী-যুগল ধরে গেল। তিন পান গাইতে গাইতে আত্মপরিচয় দিতে লাগলেন। তিনি কে, কী জন্য এসেছেন, কী করবেন। যাদুগিনি বললে,—এরে বলে,—'ধাক'।

কিন্তু, যে-ভাষায় তিনি গান করছিলেন, তার এক বর্ণও আমরা বুঝতে পারছিলাম না। যাদুগিনি বললো,—স্পেনিশ ভাষা।

সবিস্ময়ে বললাম,—কেন?

যাদুগিনি বললো,—এই ভাষাতেই নাটকখানি লেখা যে।

—এখানকার লোকেরা বুঝতে পারছে?

যাদুগিনি বললো,—সবাই না বুঝলেও অনেকে বুঝতে পারে। আমিনী ত আছেই, বলে দিচ্ছে, না বুঝবার অসুবিধেটা কোথায়?

বয়া একমনে দেখছিল, বললে,—কিন্তু ইংলিশে?

যাদুগিনি বললেন,—'লক' শুনলে না? উনি লন্ডনের।

চমকে তাকালাম। 'লন্ডনের'? লন্ডনের যদি হয়, তবে ত—

বয়া বললে,—আশ্চর্য, চেনা আছে না ত নই চরিত্রটিকে!

অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। মাথায় একটা সিল্কের স্কার্ফ, তারই কাছে, গলার কাছে চওড়া লাল বর্ডার, আর পরনের শাড়ীটা সিল্কেরই,—একটু ঢিলে কমলা রঙের। কোমরে কোমর বন্ধ, হাতে বালা, চুড়ি, বাহুতে 'বাজুবন্ধ' জাতীয় অলঙ্কার, গলায় মোতিহার, নাকের দুপাশে দুটি দুল, কানে দুল, মাথায় টিকলী, দিঁথির দুপাশে দুটি খোপাকার গয়না কাঁটার মুখে বসানো। সবগুলি খুঁটিনাটি দেখার বলে বোধ হচ্ছে, চশ্ম বা জোড়া খোড় চোখ, কিংবা, বকল লোনা।

'নেক-আপ-এর সকলই মায়ের বড় ছাঁচিমত রকমা দেখাচ্ছে, আর আশ্চর্য সত্যিকার গলার স্বর শোনা গেল,—অমন লম্বা চওড়া লোকটা ঠিক আমাদেরই মতো কোমলাঙ্গী কোনো নারীতে পরিণত হয়েছে! পাকা গলার ঘরটিই কোন, আর আঙ্গিকটির সকলই হোক,—সেরকম লম্বাও সাজছে না। যে মেয়ে কোনে হাসি, চোখে কটাক্ষ, লাজুকে পর্যন্ত কোমলতার বিস্তার। বাচনকালনে এমন সুদক্ষ, যে, কে বলবে, উনি পুরুষ।

কথা-টথা সব হারিয়ে গেল। নাটকে মূল চরিত্র খুবই কম। সত্যভামা, কৃষ্ণ, নারদ ও একজন সখী। এই চারটি চরিত্র আমোদের সাজঘরে মোহিত করে রাখলো। এবং বিশেষ করে সত্যভামা। আমরা ঠেটুই শিখেছিলাম, যে-সময়

দেখলাম এতে দেখে নেয়ে। এ-ছাড়া যা আছে তা-ও অদ্ভুত। একদল পদ-সঞ্চালনে যেন 'সবক'-এর আভাস পেলাম। তখন 'গ্রোটেস্ক' আর 'ফ্রক' খুব দ্রুত তালে চলেছে। হৃদয়ের যন্ত্রিবেগের আমারও পা দুখানি যেন চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়। তাঁর বোধহয় জানেনওনা, যে, আমি 'সবক' জানি, এ-কাজটা আমি সহজেই পারবো।

কিন্তু তারপর এলো 'আঙিনয়ের পালা। ওঁরা 'আঙিনয়' বলতে নয়ন তারকা নাচানোর এক বিশেষ অর্থ বোঝান। সেখানে বৃত্যাঙ্গন একটা প্রবহমান থাকে ঠিকই, কিন্তু অহো হয়ে দেখা দেয়, ভাবপ্রকাশ। এই ভাব প্রকাশের সময়ে পৌঁছে আমরা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। রঙ্গমঞ্চের প্রায় উপরে যেখানে জলছেন, সেখানকার ভাব এবং আরেক যায়গায়, যেখানে কিরণের আনন্দে তিনি আত্মহারা, সেখানকার ভাব। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, একটা যায়গায়, সত্যভামা দর্শকদের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছেন। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নৃত্য করার একটা শুদ্ধ সাত্ত্বিক নৃত্যেরও আছে, সেটা আমাদেরও শিখিয়েছেন। কিন্তু, সেটা সেখানে নয়, সেটা এখানে দেখলাম। তাঁর দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। 'সাত্ত্বিক নৃত্য'-এর সেই ভঙ্গিমার পরে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। আর আশ্চর্য স্নায়ুসঞ্চালনের গুণে নিতম্বের-জঘন, নিতম্বের দুটি অংশে হিল্লোল বইতে শুরু করলো কেন। প্রথমে সব নিতম্বে দোলা লাগলো, তারপরে দুই অংশে, পরমুহূর্তে ডাইনে আর বাঁয়ে দুই এবং তারই পরিবর্তিতে, নিতম্বের ঠিক কেন্দ্রবিন্দু দুটিতে এসে সেই হিল্লোল যেন ক্ষুব্ধ এক চক্রে পরিণত হলো।

আর তখন, দর্শকমণ্ডলীতে কী হাততালি!

তাঁর তখন মুহূর্তে ফিরে দাঁড়িয়ে নৃত্য ভঙ্গীতে পিছনে চলে গেলেন, একটা পা সামনে রেখে একটু নত নিতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন আঙিনয় আরম্ভ করলেন। তার শেষ হবার পর আবার তাঁর দিকে ছুটে এলেন সত্যভামা, একটি হাত বাড়িয়ে দিতে। চোখে মুখে সে-এক অনির্বচনীয় প্রেমভাব ফুটে।

এর ভাবে, কখন যে ভোর হলো, বুঝে আমরা টেরও পেলাম না। হঠাৎ দেখি, বাঙ্গালিদা ডাকছে, চলো।

বাড়ী এলাম, সারাটা দিন কাটলো। আমরা দুটি মেয়েই অভিভূত হয়ে গেছি। এ-সম্বন্ধ নিয়ে যে আলোচনা করবো, এমন শক্তিও ছিল না। বাঙ্গালিদা বললেন,—কী হয়ে গেল যে! কেমন লাগলো, বল।

বত্রা বললে,—যাচ্ছেতাই। পুরুষ হয়ে মেয়ে সাজা!

বাঙ্গালিদা হাসতে লাগলো। আমি বললাম,—এবার আসুক। আমি অন্য কিছু শিখবো না, আমি সত্যভামার আঙিনয় শিখবোই।

বত্রা বললে,—তাহলে আমিও যাব না।

বললাম,—তুই কি পারবি? সত্যি খুব শক্ত।

বত্রা বললে—তোমার থেকে ভাল পারবো?

এলেন সেই সন্ধ্যার পর। কেমন যেন লাজুক-লাজুক ভাব। বত্রা বললো —দেখতে এলেন নাকি?

—কী?

বত্রা বললে—সত্যভামার নাচ!

সলজ্জ একটু হেসে বললে,—দূর, ও তোমরা পারবে কেন?

বললাম,—খুব পারবো। আপনি আমার পায়ের কাজ দেখবেন?

—দেখি।

ঘুঙুর খুলে পায়ের কাজ দেখালাম। তাঁর সবিস্ময়ে বললেন,—শিখলে কোথা থেকে?

হাসলাম। বললাম,—কাল, স্টেজে আপনাকে দেখে।

বত্রা বলে উঠলো, মিথ্যে কথা। ও আগেই জানতো।

জার্মানীতে কবক' শিখেছিলে যে।

সেদিন অবশ্য গল্প করেই আমরা কাটালাম। তার মধ্যে প্রধান বক্তব্যই ছিল, সত্যভামা। বললাম,—সত্যভামা শেখাতেই হবে।

রাজী হলেন।

এবং প্রাথমিক কিছুদিন শিক্ষাদানের পর যখন আঙিনয়াংশ এলো, তখন তিনি একটা প্রস্তাব করলেন।

বললেন,—দুজনে আলাদা-আলাদা ভাবে শেখো। না হলে হবে না।

—বেশ।

সকালে বিকেলে ভাগ হয়ে গেল সময়। বুঝলো আমি সকালে, বত্রা সন্ধ্যায়। পরদিন এ-ভাবে চলার পর আবার উনি নিষেধ করলেন। বললেন,—আমার কোন দোষ নেই, তোমাদুটি শিখতে চেয়েছো-সত্যভামা। এ-শিক্ষা মেয়েদের আমরা চটকরে দেই না। সেইজন্য, যত বলবো, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

বত্রা খুব ভাব করে বললে—কখনো কি পালন করি নি?

উনি বললেন,—এবারের ব্যাপারটা একটু ঘোরালো আমি একটু সেখানে নিষ্ঠাটাকে দেখাতে চাই। একের নাচ অন্যে দেখতে পাবে না।

বত্রা বললে,—এ আর এমন কি শক্ত।

উনি বললেন,—এখানে নয়—আমার সেই তাড়াবাড়ীতে—তারা ঘরে?

বত্রা শিউরে উঠে বললে,—বাপ্রে!

উনি বললেন,—না, রাত্রে নয় দিনে। সকালবেলা। ধরো, সকাল ন'টা থেকে।

—বেশ।

প্রথম সকালে বত্রাই গেল। পরের দিন আমার পালা। বত্রাকে বললাম,—কী শেখালো রে?

বত্রা ঠোঁট উল্টে বললে,—বলবো কেন?

—বল্ না!

বত্রা বললে,—ভাল নিজে জানতে পারবে। জিজ্ঞাসা করছো কেন, মিথ্যেবাদী?

সারাটা উৎকণ্ঠায় কাটলো সারাদিন। বত্রা হ্যারিকেনের আলোয় বসে বসে চিঠি লিখতে লাগলো ওর মাকে।

বললাম,—কী অতো লিখছিস?

ও বললে,—আমার আঙিনয়ের কথা।

—কী আঙিনয়?

ও আর একটু হেসে বললো,—প্রেমের আঙিনয়ের কথা।

পরদিন সকালে এলো সেই পত্র। সেই তারা ঘাট। সেই বড়ো-বড়ো ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। নির্জন নিস্তব্ধ—একটা লোকও ডাকে না। আমি যেন শ্রীরাধিকা—অভিসারে চলেছি।

ও বললে,—এসো।

বললাম, এটা কী করলে? এতো লুকোছাপা কেন?

—লুকোছাপা নয় জিনিষ।

আবার ফিরলো ওর কাছে। ঘরে আর কেউই নেই—আমি আর ও। পেশীর চলন ঈষৎতা বিদ্যুৎ এটাই হলো শিক্ষণীয় বিষয়। একটু পরে বুঝলাম, এ-লড়াই কেন ও চেয়েছিল।

সেই যে সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম ওকে ফিরে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপের পেশী ফোলাতে তারই শিক্ষা এখন এক আলোচ্য বিষয়। আমাকে ঠাট্টা করবে বিয়ে ও মেটে ঘরে বললো আমার শিয়রে বিসে। নির্দেশ দিতে লাগলো। আমি মুহূর্তেই ভিনঘটা বুঝতে পারছি দেখে ও খুশী হলো, বললে,—বড়া কিছুতেই পারলো না।

তারপরেই উৎসাহিত হয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—একটা কাজ করবে?

কী?

বললে—দাড়ীটা একদিকার ব্রাহ্মণ মেয়েদের মতো করে পরবে? মালকোচা দিয়ে?

একটু আড়ালে গিয়ে সেই ভাবে দাড়ী পরে ফিরে এলাম ও আবার আমাকে ঠিক করিয়ে নিতে বললো। বললো,—পায়ের আঙুলের পেশীর দিকে মনোযোগ দাও। ওপরে টেনে তুলতে হবে।

আমি বললাম, তুমি ত ওটা করো কি?

ও বললে,—না আমি ঠিক পারি না আজকাল। তোমাকে দেখাচ্ছি।

বলে আমার পায়ের পাতায় হাত দিয়ে—পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত টেনে তুলে কী ভাবে পায়ের শিরার চাপ দিতে হয়, সেই প্রক্রিয়াটা দেখাতে লাগলো। কয়েকবার চেষ্টাতেই ওটা আমি পারলাম।

ও বললে,—ব্যাপারটা বুঝলে ত? এবারে ওপরে ওঠো।

ও কী চাইছে বুঝতে পেরে সেই চেষ্টা করতে লাগলাম। ও প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে দিতে লাগলো। ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক সহজ হয়ে গেলপর্যন্ত করে উঠতে পারলাম।

ও বললে, থাক। এইবার স্থির হয়ে বসো। বুঝিয়ে দেই।

বলতে লাগলো,—এই খেলা ও আঁধারের অসুর। যেমন বাঁশ, তাউস, দেওয়াল, প্রভৃতি তাদের মধ্যে আছে, সব বেয়ে, জড়িয়ে তুললেই বাঁশ, বাঁশ, হয়ে যেতে পারে, তেমনি এই খেলা। শিরায় শিরায় পেশীতে পেশীতে সুখ আর আরো, সন্ধান আসতে হবে সেই জায়গা, যেখানে ওর জোরার পালা। ও কী, বসো!

আমি জোরের চাপ দিতে সেই জায়গা খুঁজিয়ে আছি ও আমার সামনে। বললাম,—আচ্ছা, এইবার দেখো, পারি কিনা?

ও স্থিরনে যেতেই আমি শুরু করলাম। কিন্তু, জোরের চাপ কয়েকটা ঠেলে উঠলো, আর কিছুই হলো না। ও বললো,—কোন্ পেশীর কোন্ পেশীর সংযোগ সেটাও জানতে হবে। তুমি তোমার হাঁটুদুটো জোরে জোরে নাড়াও, দেখবে, শিরায় একটা চঞ্চল ভেগে উঠেছে। বুঝে, নিজেই তারপর নিজের কাজটা করতে পারবে, আমাকে আর বলতে হবে না।

আমি ওর কথামতো চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার শরীর যেন হঠাৎ শিউরে উঠলো। যেন বুঝতে পারলাম, আর অবহা যেখে ও উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি আর পারলাম না, ফিরে দাঁড়িয়ে ওর বুকে আছড়ে পড়লাম। অস্ফুটস্বরে পাগলের মতো কী যে বলেছিলাম, আজ আমার ঠিক তা মনে নেই।

ও আমাকে ধীরে ধীরে শান্ত করলো। বললে—আমাকে ক্ষমা করো। বললে,—এ কঠিন কাজ তোমাকে আমি শেখাতে পারবো না।

বললাম,—যাক—শিখতে চাইনা—কিন্তু তুমি কী বুঝতে পারছো না, আমার মন কী চাইছে?

ও বললে,—আমিও বুঝি উদাস হয়ে গেছি। তুমি কি বুঝবো না আমার মনের গোপন পাপ আমারও অগোচরে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে? কেন, আমি এ-জিনিস শেখাবার জন্য এইরকম নির্জনতা খুঁজে নিলাম? তোমাকে—পাবার জন্যই ত?

বলতে বলতে নিজেকে সরিয়ে নিলো আমার কাছ থেকে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে বলতে লাগলো,—আমার কাছ থেকে নিজেকে এখনো বাঁচাও। আমি একটা জানোয়ার হয়ে গেছি।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো কাছে গেলাম, বললাম, কেনো—কেনো আমার দিকে!

ফিরলো। ওর হাত দুটো ধরে বললাম,—বাঁচতে আমি চাইনা। এইত আমি, যা খুশী করো।

ও আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো। বললে,—আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে। এখানে আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারবো না।

বললাম,—কেন? আই,জামাবাবা কি বিয়ে করেই না?

ও আমাকে ছেড়ে দিলো, বললে,—করেন ও কিন্তু চাইতে না।

বললাম,—চাইতে বিয়ে করে তুমি নষ্ট ওর একটি ছাড়ার চাপিয়ে করলে?

ও বললে,—কিন্তু ওর থেকে নিস্তার নিতে হবে। আমার এই গ্রাম, এই পরিবেশ, এ সাপের-মস্তিষ্ক-সব থেকে নিস্তারিত হতে হবে।

—পারবে না?

ও আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি দেখলাম, চোখদুটি ওর চলচল করছে। ও যে কেমন যেন একটা মায়া হলো, বললাম,—থাক—এখন ওসব ভাবতে হবে না। যেমন চলছে, কয়েকটি দিন ত চলুক!

ও, বললে,— এই লাভ ছাড়া আর আমি কিছু জানি না। ফলের পরিণতিতে আমি কী কাজে লাগবো, বলো ত? তাই এই ঘোটর থেকে বাইরে বেরুতে ভয় হয়।

আর একটু হেসে বললাম,—এ যেন লড়াইয়ের কথা হয়ে গেল। শুরুতের কথা হলো না।

ও বললে,—উপায় কী? শুরুতের সৌন্দর্যও চরম বিষয়।

ওর দিকে তীর্যক দৃষ্টিপাত করে বললাম,—সেটা বোঝো!

ও অন্যদিকের মতো বললে—কিন্তু, আমি কী করবো, বলতে পারো?

একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ওর হাত ধরলাম, টানিয়ে নিলাম কোড়ায়। আমি বললাম ওর পায়ের কাছে! বলে, দুটি হাত জড়ো করে রাখলাম ওর চাঁদ উপরে। তারপরে চিবুকটি আমার হাতের ওপরে দুঁইয়ে রেখে বলতে শুরু করলাম,—কী করতে পারো, আমি বলতে পারি।

—কী?

বললাম,—পৌরুষ আমার বলে, সভ্যতার ভাষা জেনেও বোঝে না। কিন্তু তোমার নাচের মধ্যে তারা শুনলো কী করে? নিশ্চয়ই আদিমতার এমন এক সুরে তোমরা পৌঁছতে পারো, যেখানে ভাষা নিরর্থক, ভাবই সব বুঝিয়ে দিতে পারে। তা' যদি হয় তাহলে

সাথে আজ খুবে একটা প্রচার করো না কেন? আমি আর বন্ধু—দুজনে চটি ছুটি ছাড়িয়ে নিলাম, ছুটি ও বইলেই, সঙ্গে আর দুজনকে নাও। তুমি তোমার 'কোয়ারটা' আর 'ধবলপতি' সাথে নিয়ে হবে?

ও বললে,—কিন্তু বলছো কী তুমি! আমাদের নাটকের মূল কথা,—'বিদ'—বাইরের লোকে দেবে?

বললাম,—দেবে না কেন?

ও বললে,—আমাদের নাটক যে-লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, সে কিন্তু আদর্শে—ভক্তি। মন্ত্র মন থেকে ভক্তি ও প্রণতে উত্তরণ।

মুখ তুলে বললাম,—সেইখানেই আমার আপত্তি। 'ভাঙা ঘর' এ-যুগে অচল?

—তাহলে?

বললাম, 'সন্তাতাম' কি আজকের মেয়ে গড়তে পারে না?

—যাবে।

বললাম,—আজকের মেয়ের মধ্যেও কি 'প্রেম' আসে না? 'ভাষা' যেমন 'প্রভু'কে ঘিরে তার সব তার প্রকাশ করতে তেমনি আজকের মেয়েও কি করতে চায়ে না তার পাত্রকে নিয়ে?' 'নাথ' আর' মতো মানুষ আজকের সমাজেও আছে। 'ভামা'র মতো মেয়েও আছে।

ও কণ্ঠস্বরে কোনরকমে বলে উঠলো, বলছো কী?

বললাম,—ঠিক এইখানেই তোমরা আটকে আছো। 'কৃষ্ণ-সত্যভামা'র প্রেম-লীলা মানুষের প্রেম-লীলার চলে আসুক। ধরো, আমি একটি বিদেশী মেয়ে, আমি তোমার প্রেমে পড়লাম। আমার সেই প্রেমের অভিব্যক্তিই কেন লাভ করুক না কেন, তোমাদের এই ভাবতে বেলা নাটক এর আজকে? আমিও প্রথম যখন প্রবেশ করে আত্ম-পরিচয় দেবো। আমি এসেছিলাম একজনের প্রতীক্ষার পরিবেশে কিছুদিন থাকবো বলে। তারপর দেখলাম একটি মানুষকে, যে আজকের নবম সভ্যতার কোনো জটিলতার প্রবেশই রাখেন না, যাদি বিয়ে শুধু মেয়ে পুরুষ বাকুয়ে। আমি তার প্রেমে উন্মাদিনী হলাম। তাকে বিয়ে করে তার ঘরণী হলাম। আমার এই যে কার্যকলাপ, এর মধ্যে কত আনন্দ, কতো বেদনা, কতো ঘাত-প্রতিঘাতই না আছে! রস দেওয়া যায় না একে?

লোকটা ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলো আমার কথাগুলো।

হঠাৎ একসময় চটপট উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—যাই। সূর্য যে পাখার ওদিক, সে খেয়ালে আছে? ব'লে, ওকে বসে বসে আরও কিছুক্ষণ ভাবতে দিয়ে আমি সাড়ী। আগের মতো পরে নিয়ে আবার সেই ঝোপ-জঙ্গল ভাঙা ঘাটের পাশ দিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

'বাজুবাসি' ভাবাভিল আমার দেরি দেখে। কথা শুনে খুশকী হাসলো।

ঘাটকে কিছু বললাম না, নীরবে স্নান খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ করে নিজেদের ঘরে এসে বিছানায় এলিয়ে দিলাম দেহটাকে।

বন্ধু আমার বিছানায় এসে কোলের কাছে বসলো, বললে,—কীরকম শিকার?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমাকে যা-যা ও শিখিয়েছে, সে-সব বন্ধুকেও নিশ্চয় বলেছে। হয়ত বন্ধুর দেহে হাতও দিয়েছে। বললাম,—তুই কী শিখালি, আগে বল?

ও বললে একই ও ব্যাপার।

ও বলতে গিয়ে মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো দেখে বললাম,—দেবোরিস ভুলতে?

ও লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরালো, কোনো উত্তর করলো না। আমি বললাম,—দাঁড়ানা, পিছন থেকে দেখি, কেমন ভুলেছিস।

ও হঠাৎ আমার পাশে শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে। মাথাকে মুখ লুকিয়ে বলতে লাগলো,—আমি আর শিখবো না।

—কেনরে?

ও বললে, সারা পৃথিবীকে ঘৃণা করি।

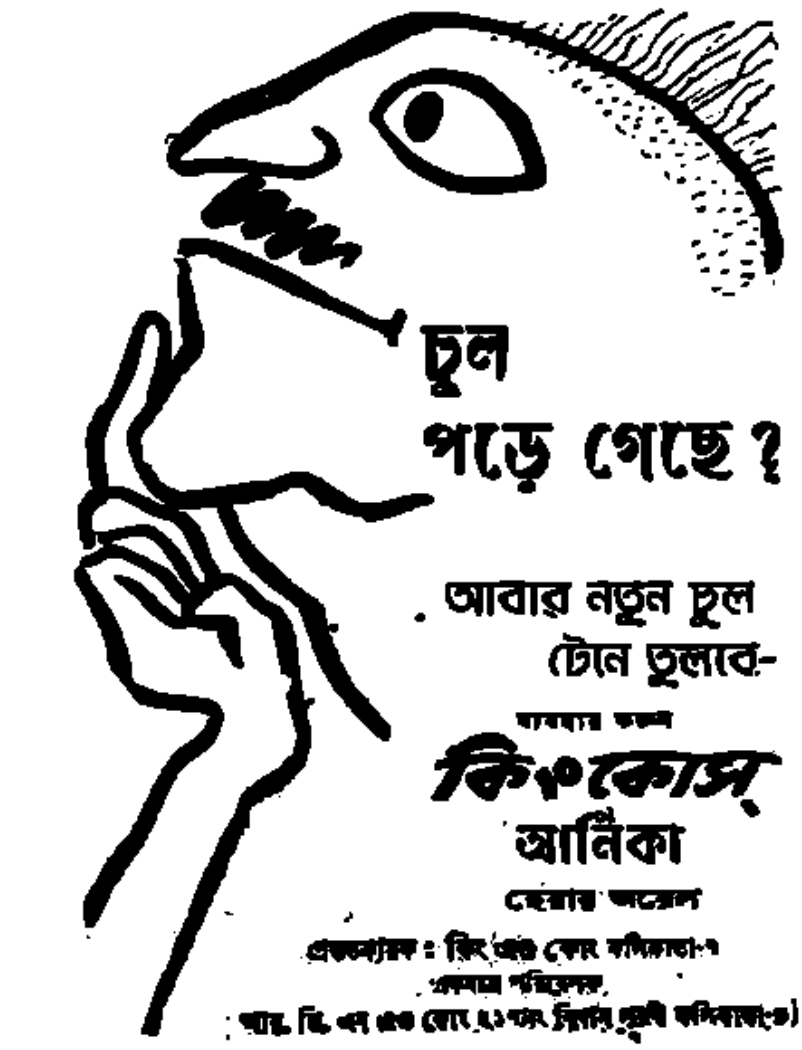

॥ সপ্ত ॥

াটা মিথ্যে নয়, সত্যিই ভালো লাগবে। আমার এই ইচ্ছার ভাল, ভালো লাগানো এমন কিছু ইচ্ছে ব্যাপার নয়। তাই দুটো আলোচিত ক'রে নিজের-প্রদেশে রোল তুলছি, আর মনে হচ্ছে, ীরটা হঠাৎ বীণার তারের মতো ্ করে বেজে উঠলো। নিজেকে নো তখন সত্যিই কঠিন, হয়ত বা ালা হয়ে যাবো। মনে হচ্ছিল, মাথা খুঁড়ছে, আমি এখুনি লুটিয়ে । লুটিয়ে পড়বো মাটিতে নয়, ওর ত বুকের ওপর। ছি-ছি-কী খেলা! তাড়াতাড়ি নাচ-টাচ সব থামিয়ে ছুটে চলে এলাম। বৃত্তা-শিক্ষার ই হাঁক।

কে দীর্ঘ চিঠি লিখেছি। আমি বো, মৈত্রেয়ী কী ভাববে, জানি

॥ একাদশ ॥

ক সেই 'ভাগবত মেলা'-নাটকের ের মতো'-ই আমাদের অবস্থা। । একই মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে কয়েকটি চরিত্র কথা বলে চলেছি। কথা বলছি, ওরা দাঁড়িয়ে আছে। খন একে একে কথা বলছে আমি াড়িয়ে আছি। বৃত্তা বৃত্তা শিক্ষার রেখা টেনে নিয়ে মানের কাছে ত চলে যাচ্ছে, আর আমি? কী ভাববে? আমিও যদি কাশী ই ওর সঙ্গে? না-না, আমি একা না, ওকে নিয়ে যাবো সঙ্গে।

॥ দ্বাদশ ॥

ি বৃত্তা শিক্ষক, আমার অন্ত- আমার শিক্ষার প্রথম পাঠ। আমি সেই খানিক হলাম। আমি জানি, ামার গ্রামের সবাই আমার দিকে ে চোখে তাকাচ্ছে। 'বাস্তুদোষ'ও পেয়েছে, আমাকে ঘিরে কী হয়েছে শুরু। জানি আমি ই, তবু আমি লুব্ধ প্রবণের মতো ফুলের চারপাশে গুঞ্জন করে । ও আমার সমস্ত সত্তাটাকে, । ঘেরা টানছে। 'বাস্তুদোষ' বলেছো—আমি কী করবো?

॥ ত্রয়োদশ ॥

ি ঘর-বাসী',—আমি হেরম্বের

সবাই, আমিও প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিয়েই সংসারের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি। বয়স হয়েছে, দুঃখের আগুনে পুড়েছি, আর বুঝেছি, আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষা মানুষে পাবে না, নিশ্চিতই করছে। প্রেমিক ও মানুষই বা কজন? যাকে আঁকড়ে ধরতে গেছি, সে-ই আমার জীবন-দেবতা বিরহে নিয়ে আমাকে পথের পাশে ফেলে দিয়ে গেছে। যদি পারতাম আর পাঁচটা মেয়ের মতো সংসারে সৈরাচারিণী দুঃখভারে ছিন্নভিন্ন নিজেকে অহর্নিশ ডুবিয়ে রাখতে, তাহলে বোধহয় কোনো সমস্যাই থাকতো না। কিন্তু তা' পারিনি। আমার এক এক সময় মনে হয়, 'সাধারণ মেয়ে' বলে যাদের আমরা মনে করি, যারা সুখেদুঃখে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর ঈশ্বরে,—তারা আদৌ 'সাধারণ' নয়, তারা অসাধারণ শক্তিময়ী। আর যদি তারাই, 'সাধারণ' বলে পরিগণিত হয়, তা, আমি সেই 'সাধারণ-এর থেকে ঢের নীচে। আমার তাহলে অবলম্বন কোথায়? ঐ পাষাণ দেবতাকেই আশ্রয় করেছি। আমার মনের মত— আমার কল্পনার তুলিকায় আমি তাকে যখন যেমন খুশী আঁকতে পারি। আমার ঘর-সংসার, স্বামী-পুত্র সবই এই কল্পনার মধ্যে। এ-ও একরকমের সুখ, যা আমি হয়ত সঠিক বোঝাতে পারবো না। কল্পনার এই স্বর্গে বাস করি বলেই হয়ত কতকগুলো লৌকিক সমস্যা আর আমার কাছে সমস্যাই নয়। আমি কিন্তু এ-গ্রামের সবার সঙ্গে মনা মিলিয়ে মেয়েদুটিকে দোষ দিতে পারি না। দোষ দিতে পারি না নারায়ণকেও; আমার কেন যেন মনে হয়, এরও প্রয়োজন আছে। মেয়েদুটিকে আমি ভালবাসি। তবে ওরা আজকের যুগের মেয়ে, ওরা ঈশ্বর মানে না, ধর্ম মানে না, ওরা বলে শিল্প শিল্পই। কথাটা আমিও কদিন ধরে ভেবেছি। ওরা আমাদের সঙ্গে মিশবেও পেরে, দেবতাকেও প্রণাম করেছে, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে এ সবে ওদের বিশ্বাস নেই। পরশিনী বাইয়ের কথা কী অর্থ হবে?

॥ চতুর্দশ ॥

ভয়া কিন্তু সত্যিই চলে গেল। আমি কাঁদি নি, আমি একটুও কাতর হইনি। বরং ও যখন বিকেলের দিকে ঘরাকে ফিরে এলো, তখন বললাম—টাপ থেকে বাঁচলে ত?

আমার 'নটুয়া'র মশাই বললেন, কেন?

বললাম,—ও বুঝতে পেরেছে, তোমার-আমার মধ্যে ও একটা অন্তরায়, তাই নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল, ওটা বুঝলে না?

নটুয়ান-মশাইয়ের ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হলো, বললে,—কী বলছো, মা-জী? ওর মুখে কখনো ও-সব আর শোনিনি।

আর একটু হাসলাম মাত্র, কিন্তু বললাম না।

ও বললে,—ট্রেণ ছাড়বার সময় ও বরং অন্য একটা কথা বললো।

—কী?

বললে,—বয়া বললে, ডাক্তারের আবার আমি ফিরে আসবো আমার মাকে নিয়ে করে। মাস্টার-মাস্টার এই ডাক্তারকে ভালোবেসেছিল গভীরভাবে, সেই ভালোবাসার পরিচয় আজে সর্বত্র ছড়িয়ে। মাও ত মুসলমান মেয়ে, খুশি হয়ে এইসব দেখলে।

বললাম,—ছাড়ো ওসব কথা। এখন আমাদের কী হবে? আড়াল ত সরে গেল, এখন লোকচক্ষুতে সবই ধরা পড়বে।

ও বললে,— আড়াল সরে গেল, মানে?

বললাম,—বয়া একটা আড়াল। ওটা বুঝলে না?

ও গম্ভীর হয়ে গেল।

বললাম,—যাই বলো, নাচ আমি ছাড়ছি না।

ও কিছু বললে না। পরের দিন থেকে আমার শুরু হলো বৃত্তাশিক্ষার পালা। 'সত্যভামা'র অভিনয়-অংশই শিখছি। এ শিখতে গেলে ভূমিকা-অনুযায়ী 'পদম্' 'পদম' সবই শিখতে হয়। এমন কি, 'তিলানা'-ও আমি শিখে নিলাম। ও আমাকে প্রথমাবধি ক্রমে সমস্তই শেখাতে লাগলো। বাস্তুদোষ কাটেই বসে থাকতো, কখনো-বা খঞ্জনীতে তাল বাজাতো, কখনো-বা সুর ক'রে 'পদম্' গাইতো।

বোধকরি এমনি করে দিন সাত-আট কেটে গেল। হঠাৎ একটা চিঠি এলো বাবার। ছোট চিঠি। 'বয়া এসে

পাই চলে আসবে। ওখানে থাকার দরকার নেই।'

বাংলায় লেখা চিঠি। ভাইকে কিছু বললাম না। শুধু সে-সন্ধ্যায় মাদ্রাজীদিকে কৌশল করে একটু ঘোরার পার্মিয়ে দিলাম। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে সত্যভামার সেই, মারাত্মক অংশটা আবার করবার প্রয়াস করলাম। এমন সময় মট্‌বাস মশাই এসে উপস্থিত। দরজা খুলে তাকে ভিতরে নিয়ে আবার দিলাম দরজা বন্ধ করে। সবিস্ময়ে বললে, সব বন্ধ কেন? 'মাদ্রাজী বা কোথায়?'

মুচকি একটু হেসে বললাম,—তাকে বেলাটুবে পার্মিয়েছি, সন্ধ্যাদেবী দেবীর কাছে। কতগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করে সে ফিরে আসবে।

—কী প্রশ্ন?

বললাম,—সে তুমি বুঝবে না। একেবারে নিছক আমাদের সমস্যা—মেয়েদের সমস্যা।

ও আর কৌতূহল প্রকাশ করলো না। বললে,—সাড়ী মালকোচা দিয়ে পরেছো দেখছি, কী করছিলে?

জবাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম,—সত্যভামার সেই নাচ। সেই আনন্দের নিগূঢ় অভিব্যক্তি। দেখ, ত, ঠিক হচ্ছে কি না।

শুরু করলাম। ও অবাক হয়ে বললে,—একটু একটু হচ্ছে। আরও অনেক চেষ্টা করলে, পারবে মনে হয়।

ঠিক ছিন্ন লতিকার মতো ওর বিশাল বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, বল্লাম চলো পালাই।

বুক পুরুষ নিজেকেও আর ধরে রাখতে পারলো না। আঁধার ঠোঁটে-গালে-চিবুকে-কপোলে—যেন বিদ্যুৎবহ্নি জ্বালিয়ে দিলো।

কিন্তু আর এগোতে পারলুম না, হঠাৎ আমাকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে দরজা খুলে একেবারে ছুটে গিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করলো।

এরপরে, প্রায় ঘণ্টা দু-তিন পরে, ফিরে এলো 'মাদ্রাজীরা'।

ব্যাকুল হয়ে বললাম,—ভিজিয়ে এলে?

মাদ্রাজীরা সম্নেহে আমাকে কাছে টেনে নিলো, বললে,—কোন ভয় নেই। সন্ধ্যাদেবী বললেন, শিল্পীরা একটু খেয়ালী হবেই। এই প্রথম কাজে ভাবতে হয় কিন্তু ও বাঙালীর আর মেয়েমূর্তির প্রয়োজন! পার্থিবপার্থিবের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হয় বৈকি বৈ কি।

বলে উঠলাম,—তাই বা পার্থিব-পার্থিবের তফাৎ। না হয় আমি ঘৃণিত গণিকাতেই পরিণত হবো, তবু, এই 'অপরূপ মেলা' আজিকার সাধারণ মানুষের জীবনের তলে টেনে আনবোই।

এর পরের কথা আর। 'মাদ্রাজীরা'দের বিদায় ক'রে আমি আজিরেই মট্‌বাস মশাইকে নিয়ে পালালাম। তাজোর গেলাম, সেখান থেকে মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীর দর্শন। আবার ফিরে এলে এই পথ দিয়েই চিদাম্বরম্। সেখান থেকে মাদ্রাজে যেমে মহাবলীপুরম্। ফিরে, মাদ্রাজে ঘাইলাম ক'দিন। দেখালাম ওকে সেই বাড়ী, যেখানে আমি জন্মে ছিলাম। দেখালাম ওকে সেই রাস্তাটা, যেখানে আমার বাবাকে ঘোটর চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল।

মাদ্রাজের পর অবশ্য আর কোথাও নয়, লোজা,—কাশী।

মা বললে,—বরাবর কার থেকে সব শুনেছি।

—কী শুনেছো, কতটুকু শুনেছো?

মা বললে,—ওকে তুই বিয়ে করবি?

মাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম,—জানিনা মা—তবে, লোকটা ফুলের মতো নিষ্পাপ। ওকে বুঝি-বা ভালোই বেসে ফেলেছি। এবার তুমি আমাকে ভাসিয়ে দাও, ফাঁসী দাও, যা খুশী করো।

বলা বাহুল্য, মা আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলতে লাগলো। আনন্দে, না, বেদনায় বুঝলাম না। মা আমাকে বুঝলেও বড়ো-মা বুঝলেন না। ওর যে কঠিন অন্তঃকরণ। মাদ্রাজে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েও আমাদের চিঠি লিখে খোঁজখবর নেয় নি, সেই অন্তঃকরণই আবার কেমনি কঠিন হয়ে উঠলো আমাদের ব্যাপারে।

মা বললে,—তোর অনেক টাকা আমার কাছে গচ্ছিত আছে। তোরা একটা আলাদা বাসা ভাড়া করে থাক, টাকার জন্য ভাবিস না।

তা-ই হলো। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে 'মুকুন্দ-ভবন'এ একটা মোটা মাসিক ভাড়ায় নিলাম। বড়ো-মাকার ফুল ফুটলো। মা, ঠিক-সত্যভামা-রুক্মিণী-মায়া—এদের মধ্যে আজকের মানুষ, আজকের মানুষের মায়া-বেদনা-সুখ-দুঃখ আর প্রেম। কয়েকটি রাত্র-রাণী ফুটিয়ে ও সাজাই আমার কথামতো কাজ আরম্ভ করে দিলো।

কিন্তু, মতো সহজে কথাগুলো লিখলাম, ঠিক সহজেই এসব গড়ে ওঠে নি। অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি, অনেক লোকনিন্দা। শুধু টাকা; বললেই যে সব হয় না, এটা বুঝলাম মর্মে-মর্মে।

বড়ো-মা এলেন না। আর তাঁকে যেচে মা-ও আসতে চাইলো না। সুতরাং এই ছোট্ট শিকারটিকে বেছে করে রাত আমরা দুজন।

শুধু, সন্ধ্যের পর, বিশ্বনাথের আরতি দেখে ফেরবার পথে চুপিচুপি মা এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। কাগজপত্রে নানারকম সই-সাবুদ করিয়ে এখানকার ব্যাঙ্কে মোটা টাকাই আমার নামে জমা দিয়ে দিয়েছিল মা। আমি বলতাম, দেখোনা মা, আমারও টাকা রোজগার করবো। একটা ছোট দল তৈরী করে নিয়ে শীত-গ্রিষ্ম বেরিয়ে পড়বো। কলকাতা-দিল্লী-এলাহাবাদ-পাটনা, কোথাও যেতে বাকী রাখবো না।

মা বলে,—ওকে বিয়েই করে ফেল না মা?

হেসে বলতাম,—কেন মা, লোক নিন্দার ভয় করছো?

—হ্যাঁ মা, সত্যিই ভয়-ভয় করে।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলতাম,—নিজের কথা ভাবো দেখি? তুমি যখন আমার বয়সী ছিলে? তুমি যখন আবার বাবার কাছে ছিলে, মাদ্রাজে? লোকনিন্দা কি হয়নি? কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কী ক্ষতি হয়েছে তোমার তাতে।

বাঁকা চোখে জল এসে পড়তো। আমি প্রসঙ্গটা লঘু করবার জন্য বলে উঠতাম,—হ্যাঁ মা, একটা কথা ত বলছো না? ওকে তোমার পছন্দ হয়েছে? কেমন লাগলো ওকে?

মায়ের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, বলতো, ছেলেটা শিব দিয়েই যেতে আছে। সংসারের ভোজা বোঝেও না।

'অভিমান—আচ্ছা মা, শিবকে তবে ধর্ম-টর্মের সবটে মেলায় কেন বলো ত? আমি বলেছি, সারাজন মহিমময় জীবন তোমার নাটকে আমাকে হবে। তবে যাবা-কাশী-দুঁজনী যাঁড় দাও।

মা বলতো,—নারায়ণ কী বলে?

ছেলে বলতাম,—ছোঁয়ার নারায়ণ আর কী বলবে? আমার কথায় ওলবে কথা বলবে নাকি? টস্!

মা তখন নারায়ণের কাছে যেতো। ওর কাছে এলে মার মুখ চোখ দিয়ে যেন স্নেহ-ক্ষরে পড়তো। বলতো,—কেমন আছো, নারায়ণ?

নারায়ণ কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা ভাবে একেবারে নুয়ে পড়তো। বলতো,

—ভালো আছি, মা।

ওর মুখে 'মা' শুনে কিন্তু হেসে ফেলতাম।

মা বলতো,—মানুষ একটা জিনিষ গড়বার ব্রত নিয়েছো সফল হও, বাবা বিশ্বনাথের কাছে এই প্রার্থনা করি।

ও কিছু বলতো না। আমি বলতাম,—তুমিই আমাদের তর্কের মীমাংসা ক'রে দাও, মা।

—কী তর্ক?

বলতাম—আমি বলি, শিল্প শিল্পই,—এর মধ্যে ঈশ্বর, ধর্ম, এসব টেনে আনা কেন বাপু? কিন্তু, ও তা মানতে চায় না।

নারায়ণ বলতো,—আমি ত প্রতিবাদ করি না।

বলতাম,—মুখে না বললেও অন্তরে তুমি খুশী হওনা। আমি ঠিক না কিনু?

নারায়ণ চুপ। মা বলতো,—শিল্পীর কাছে শিল্পই ঈশ্বর। অন্য ঈশ্বরে দরকার কী?

উৎসাহিত হয়ে ওকে বলতাম,—শুনলে ত? ভালো করে কথাটা শুনে নাও।

মা তারপর বিদায় নিতো। শুরু হতো যথারীতি আমাদের 'কাজ'।

মা একদিন আমাকে ডেকে বললে,—হ্যা-রে, বড়ো জোর এখানে আসে না?

মনটা অভিমানে উথলে উঠে উঠলো। বললাম,—না।

—সে জানে তোমা এসেছিস?

বললাম,—খুব জানে। খবর পাঠিয়েছিলাম আমাদের এক ছাত্রীকে দিয়ে। তা' কিছুতেই এলো না। ভেবেছিলাম, আমিই নিয়ে একদিন ওকে নিয়ে আসবো। কিন্তু, ও যখন খবর পাঠালেও এলো না, তখন যাবোই না ঠিক করেছি।

মা একটু ভেবে বললে,—আচ্ছা, আমিই একদিন দেখা করছি।

দেখা করবার পর মা এলো। তখন বিকেলের দিকে, সন্ধ্যা হয়নি। আমি বসে-বুসে চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। সে লোকটি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। মা এসে বললে, বসবার নেই এখানে। চলে গেছে।

—মানে।

মা বললে—আজ সকালে। সকালে ওর মাকে নিয়ে চলে গেছে তাদের বাড়ী।

'তাদের'-এর কথায় নারায়ণ একটু চমকে উঠলো। মা বললে,—আর একটা আশ্চর্য কথা শুনবি? এখানকার সমস্ত পাট নাকি উঠিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

কথাটি আমাকেও উতলা করে তুললো। মনে হচ্ছে, মাকে আমি একটুও বোধ হয় বুঝতে পারিনি। কী ও চায়? কিসের উপর অভিমান?

পরদিন রাত্রিবেলা ওদের আমিই ছুটি দিলাম। ও বললে, কী হলো। যেন যেতে থাকতে দিলে ও রাজি নয়।

বললাম,—কিনু একটা নিয়ে যে যেতে থাকতে চাও, তা আমি জানি। কিন্তু সবার আগের কাজটাই তুমি করবে না। আমাকে দেখাও? আমি কি সব ভুলে যাবো?

আমি সাধারণ গাঁয়ের মেয়ের মতো 'সত্যভামা'র ভাবটা আরোপ করতে চেষ্টা করলাম; অভিনয়-অংশে, বিশেষ করে সেই কঠিন মানগুলোই আয়ত্ত করতে লাগলাম।

এবং যেন মনে আছে, পর-পর আমি ঐ বিশেষ অভিনয়টার চর্চায় মনোনিবেশ করলাম। চুপি চুপি বলি, দেহটায় সাড়াই যেন আগুন ধরে যেতো একসময়। আর, সেই আগুনে ওকে আমি পুড়িয়ে ফেলতাম বলা যায়।

কিন্তু, এর বোধহয় একটা সমাপ্তি আছে। হঠাৎ একদিন দেখলাম, নাচটা আমি নিখুঁতভাবে ভুলে ফেলেছি, এবং আরও আশ্চর্য, সেদিন আর দেহ নয়, সারা মন জুড়ে একটা অদ্ভুত—অপার্থিব দরদ টের পেতে লাগলো। এ-আনন্দের বুঝি তুলনা নেই, এ-আনন্দের ভার আমাকে যেন আত্মহারা করে তুলতে লাগলো। ওকে বললাম,—চলো ছাদে যাই, তারার ভরা আকাশটায় নিজে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকি।

কেন সেইদিনই কেন, পরে বহুবার ও নাচটার অনুশীলন করেছি, মনটা আমার এক অপার্থিব বিভায় তবে উঠতে থাকতো। ও বলতো,—সত্যিকারের 'ভাবা-ভাব' একেই বলে।

রাগ করে বলতাম,—তোমার এসব পুরাণের বই-টেরাণের মাঝনা দুর করে দাবিয়ে রেখে দাও—আমি সাধারণ গৃহবধূর মনের আনন্দকেই আবাহন করতে চাই।

ও আমাকে ভালোবেসে বুকে টেনে নিয়ে, ক্ষমা চাইতো। আর সঙ্গে সঙ্গে, এ অদ্ভুত অনুভূতির কথা কেমন করে বুঝাবো, আমার সারা দেহ-মন যেন ঘনায়মান সংকুচিত হয়ে এলো।

পারুলই বলতে পারলাম না। আমার মনোজগতে যে কী পরিবর্তনের আলোড়নটা এসে লাগলো,—তা ঠিক বোঝাবো কাকে?

দিনের পর দিন যায়, আমরা কাশীতে প্রথম অভিনয় দেখালাম। লোকের ভালো লাগলো না, লোকে নিলোনা একটুও। ও বললো—কৃষ্ণ-সত্যভামা করো, লোকে হৈ-হৈ করবে।

আমি চীৎকার করে বললাম,—না। লৌকিক মাতামাতি আমাদের উপাস্য।

কিন্তু আমার জীবনে একী হলো? ও আমার গায়ে হাত দিলেই আমি যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো চমকে উঠি।

কিন্তু, সে কথা বলবো কাকে? বললে যে নিজেরই লাজ স্বীকার করা হয়। জোর করে নিজেকে প্রেমের হাতে সঁপে দেই, কিন্তু পরে সঙ্গেই একটা গভীর আশ্লেষ এসে আমার সারা সত্তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

আমি 'দল' নিয়ে জোর করে বেরিয়ে পড়লাম। এলাহাবাদে গেলাম, লোকে নিলো না। পাটনায় গেলাম,—সেখানেও লোকে নিলো না। বাকী ছিল কলকাতা। সেখানেও অভিনন্দন পেলাম না। ফিরে এলাম আবার কাশীতে। ও হতোদ্যম, ও বিমর্ষ। আমি বললাম,—ভেবো না, আবার 'কাজ'-এ লাগো। হয়ত আমাদেরই অভিনয় নিখুঁত হচ্ছে না।

ও বললো,—সত্যভামা-শ্রীকৃষ্ণ করো, লোকে নেবে। এখনো বলছি।

আমি জোর করে বললাম,—না—কিছুতেই না।

এই নিয়ে একদিন প্রচণ্ড কলহ হলো দুজনে। ও বললে,—আমার মন এতে সায় দেয় না। আমার দেবতাকে আমি ত্যাগ করে আছি বহুদিন। আমার মন মানছে না। বরং তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মুক্তি দাও।

উপসংহারে একথাই বলবো, ওকে

ছুটিই নিয়েছি। মুক্তি নিয়েছি, কী, মুক্তি পেয়েছি, সে তর্ক আজ আর করবো না। আমি জানি, ও তাড়োরে ফিরে গেছে। ও-ও জানি, সেখানে ও রত্নাকে খুঁজে বার করবে। কিম্বা, রত্নাই ওকে খুঁজে বার করবে। 'জাগরণ মেলা' নাটক'-এ ও সাজবে একজন শ্রীকৃষ্ণ, রত্না—সত্যভামা। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। আমি একাই চালিয়ে যাচ্ছি আমার স্কুল। আমি আবার একদিন 'দল' নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। সাধারণ মানুষের দুঃখ, তাদের দুঃখ কষ্ট, তাদের আবহ-বেদনাই আমার শিল্পের হবে বিষয়বস্তু, হবে বর্ণকথা।

তা-ই হয়েছিল—নৃত্যশিল্পী-হিসাবে আমি পরবর্তী-জীবনে খ্যাতি অর্জন করে-ছিলাম।

আর সেটা নিয়েই সারাজীবন আমি মেতে আছি। কিন্তু রাতে যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়, সব কোলাহল থেমে যায় জগৎ-সংসারের, তখন বুকের ভিতরে একটা হাহাকার গুমরে-গুমরে উঠতে থাকে। এ-নিরাকরণ বিরহ-বেদনা এক-এক সময়ে অসহ্য মনে হয়। নারায়ণ থাকলে হয়ত বলতো—বাধাতাপ।

আমি চীৎকার করে বলতাম, না।

আমি সাধারণ রমণী। সাধারণ রমণীর সুখদুঃখই আমি অনুভব করি।

কিন্তু, তাহলে? তাহলে 'প্রেম' কেন হঠাৎ-ই একদিন অপ্রেম' হয়ে দেখা দিলো? এর জন্য দায়ী কে? দায়ী আর কেউ নয়, আমি নিজে। নিজের বিষে নিজে জ্বলছি।

মা হয়ত আমার মনের কথা খানিকটা বোঝে। বলে,—চল আমার সঙ্গে বিদেশের মাটিতে। মনটা শান্ত হবে। তীব্র প্রতিবাদে করে বলতাম, কখনই না। দেখতা আমি মানি না। মানুষই আমার কাছে বড়ো।

মা বলতো,—দেবতা কি মানুষ ছাড়া? মনে কর, তুই-ই সত্যভামা, আর সে শ্রীকৃষ্ণ।

মায়ের কোলে মুখ রেখে দু-চ কথা কাঁদতে চেষ্টা করতাম। মন চাইতো চীৎকার করে বলে উঠতো,—না না, সত্যভামা' রত্না, আমি 'রাধা'।

কিন্তু পারতাম না বলতে। আমার মুখ আমার কণ্ঠ চেপে ধরতো।

আমি আবার বাঁধতাম নিজেকে শক্ত করে। আবার নাচের দল ভারী করবার নেশায় মেতে উঠতাম। নানান্ নাচের পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছি।

লোকে আজকাল একটু-একটু নিচ্ছে। আর সেটুকু পাবার করেই সময়ের পথ পার হচ্ছি। আমার বয়স বাড়তে লাগলো। আমার মা মারা গেল, একদিন আমার বড়-মাও গেল,—আমিও প্রবীণা হলনেত্রী হয়ে নাচের দল নিয়ে সারা উত্তর ভারত ঘুরে বেড়াই।

কিন্তু কারণে! একাকী রাত্রিগুলি আমায় কেটে যায় দুঃসহ নীরব কান্নায়। কার বিরহে যে আমি প্রতিনিয়ত কেঁদে মরছি, আমি নিজেই জানি না।

শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে? কী হবে?

৮ পনেরো ৮

আমি একদিন 'বহুজনার' ছিলাম, কিন্তু বহুদিন সে কাজ থেকে আমি বিচ্যুত। তাড়োরের মন্দিরের কাছাকাছিই একটা কুঁড়ে ঘরে আমি থাকি, রত্না, পীত-বস্ত্রা নিয়ে। সঙ্গে শাশুড়ী ছিলেন, তিনি যাবা গেছেন বেশ কিছুদিন চলো। সংসার চালাতে হলে কিছু একটা করতে হয়, তাই একটা ছোট ছেলেদের পাঠশালা করে তার পড়াই। আমার হাতে কুর্থ আছে, এখানে নামের ছোট খাটো ব্যবসাতে সে তা সার্থক করেছে। সংসারের খরচ মোটামুটি চলে যায়। সবাই জানে, মোটামুটি আমি সুখী।

বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছি, চোখে পুরু চশমা, হঠাৎ খবরের কাগজে একদিন চোখে পড়লো,—কে এক মৈত্রেয়ীদেবী নাকি কাশীর গঙ্গায় ডুবে গেছে। ইনি নাকি নাচের স্কুল চালাতেন।

পড়ে, কাগজটা নিয়ে স্ত্রীর কাছে গেলাম, বললাম,—দেখত রত্না, কার খবর লিখেছে? সেই মৈত্রেয়ী কী?

রত্না খবরটা পড়ে কাগজটা একদিকে সরিয়ে রাখলো। হাতের কাজ করতে করতে বললে,—হাঁ হবে।

ধীরে ধীরে বাইরে এলাম। ছেলেমেয়েরা সব গেল কোথায়?

কাছে থাকলে বলতাম,—ভালো করে পড়তো? আমি চোখে ভালো দেখি না। চশমা দিয়েও না। ভালো করে দেখতো, নামটা মৈত্রেয়ী কি না?

কিন্তু কাকে ডাকবো? কেউ কাছে নেই। সমস্ত আকাশটা যেন হঠাৎ কালো হয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। আমি পড়ে গেলাম।

না, বেঁচে আছি। কিন্তু সেদিনের সেই খবরের কাগজটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। পুরানো কাগজ কেউ কি আজকাল যত্ন করে রাখে? নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে কোথাও।

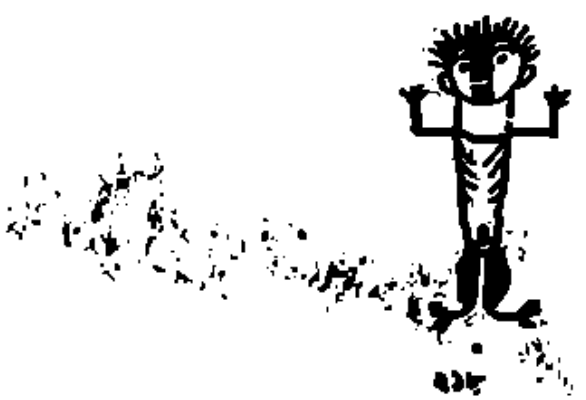

কঙ্কন মালাদেবী

• নমিতা সেন •

স্বল্পসংখ্যক গল্প উপন্যাসের লেখিকা কাঞ্চনমালা দেবী এযুগে পূর্ববঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে একটি অপরিচিত নাম। কাঞ্চনমালার জন্ম হয় ১৮৯১ সালে। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী। 'ভারতী' ত্রৈমাসিকের নিয়মিত লেখক রমেশচন্দ্র ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পুরুষ। মহেন্দ্র-পুরোর ও চন্দ্রকেতুর আবিষ্কার, পাল ও সেনরাজবংশের কীর্তি প্রভৃতি উদ্ঘাটন —তাঁর এই ঐতিহাসিক অবদান স্মরণীয় থাকবে। অনুসন্ধানে ও কল্পনায় স্বামীদেবতা যেমন প্রাচীন ইতিহাসে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধির উজ্জ্বল সম্পদের কয়েক টুকরো তাঁর 'সাধনের কথা' 'সমাজ', 'কথা', 'কথা', 'রমলাল', 'মুখ' ইত্যাদি রচনায়। 'অসীম ও 'সুবর্ণরেখা' তাঁর দুটি পূর্ণাঙ্গ রচনা। এদের মধ্যে 'সুবর্ণরেখা' দুখানি উপন্যাস। এই যে কাঞ্চনমালার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন তাঁর স্বামীদেবতা। অবশ্য স্বামীদেবতার অনুপ্রেরণার প্রভাব থেকেও তাঁকে একেবারে মুক্ত বলে মনে হয় না।

পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক কাঞ্চনমালার এই বিষয়ে প্রবেশাধিকার তাঁর স্বামী রমেশচন্দ্রের লেখার মধ্যে ছিল। কিন্তু কাঞ্চনমালা ইতিহাসের দুর্গম পথের পথিক নন। তিনি ঔপন্যাসিক লেখক নন। ইতিহাসের জটিলতায় স্বামী রমেশচন্দ্রের মত কাঞ্চনমালার তেমন আগ্রহ বা অনুসন্ধিৎসা নেই। তবে

ইতিহাস বদ বা ঐতিহাসিক অনুসেপনের প্রতি তাঁর প্রলোভন লীমাহীন। তাই তাঁর একাধিক বয়ে ঐতিহাসিক পট-ভূমিকায় রহস্যরোমাঞ্চের আবহ সৃষ্টি করেছে। এবং তাঁর গল্পের্ওপাত্র পাত্রীও কোনো বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক নায়ক বা নায়িকা নয়। বরং তারা যেন সেই সুদূর বিস্মৃতপ্রায় লোকের অতি অবাস্তবন—যাদের কথাবার্তায় কাঞ্চন-মালা পুরোপুরি জীবনের মুক্তিনিত্য ইতিহাস অর্জোহলেন। সেদিক থেকে প্রাবোল-দালের তুলনায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রোমান্সের প্রভাবই বেশিরভাগ কাঞ্চনমালার লেখায় সর্বাধিক। আবার রবীন্দ্র সাহিত্যের চিহ্নও কাঞ্চনমালার লেখায় কম নয়। তবে তিনি চিরাচরিত প্রথাকুসারিণী নন। গল্প রচনায় কাঞ্চন-মালা অভাবনীয় চমক সৃষ্টি ক'রতে পারেন নি বটে কিন্তু বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি যে বিশেষ স্বতন্ত্র লেখিকা তা মানতে হয় বৈকি। তিনি কিছু সামাজিক গল্প উপন্যাসও লিখেছেন। 'শনির দশা' ও 'বাঁশির ডাকাতি' তার মধ্যে অন্যতম। বিশেষতঃ রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যের দিক থেকে 'বাঁশির ডাকাতি' খুবই লক্ষণীয়।

কাঞ্চনমালা বেশির ভাগ ছোটগল্পই লিখেছেন। 'মানসী' 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় সেগুলি ছাপা হয়। তাঁর গল্পসংগ্রহ 'শুল্ক' প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালে। যে বইএর ভূমিকায় লেখিকা জানিয়েছিলেন—এই গল্পগুলি যখন লিখিয়াছিলাম তখন প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কোন আত্মীয়ার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার অধিকাংশ গল্পই প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পাগলের কথা ও নিতাই 'প্রবাসীতে', টাঁদ 'যমুনায়', পরিবর্তন ও পরিবর্তন 'সাহিত্যে', ভূতোপিসী, প্রতীক্ষায়, আহ্বান ও বিজয়া 'মানসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সোনার ঘোড়া, ভবিতব্য ও বর্ণীকরণ অপ্রকাশিত।"

কাঞ্চনমালার গল্প-উপন্যাস দায়ু ভাবাবেগেই লেখা হয়। তাঁর 'শুল্ক' গল্পসংগ্রহের প্রথম গল্প 'পুরুলের কথা'র আঙ্গিকটি শুরু হয়েছে এইভাবে—

—লোকে বলে আমি পাগল হইয়াছি, আমার বন্ধুরা বলিয়া থাকেন যে আমার সাধনা আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বাড়ীতে মেয়েরা বলিয়া থাকেন যে অধিক বিদ্যালাভ করিয়া আমার জ্ঞানবুদ্ধি একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে।...

...আমি শ্রীযুক্ত মণিলাল চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, সাধারণের নিকটে উহাই বোধহয় বলিবার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলাম। ঐ, আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যা এবং বহুকৌশলে আমি যাহা-তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে আমার মনের কোনও বিকার হয় নাই যাহা কিছু হইয়াছিল সে অনেকদিন পূর্বে সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি কোনোমতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমার সত্যই সুস্থ এবং নীরোগ।"

—মণিলালের এই আত্মস্থিক রোগের কারণ কাঁটালদহে চরে আত্মীয়ক দুর্ঘটনায় নবপরিণীতা বধূর মৃত্যু। রোগ-মুক্ত এই বিশ্বেতে মণিলালের প্রথমা স্ত্রী লীলার অতিলাশ ছিল। অবশ্য বহুকাল আগে লীলা মারা যায়। মারা যাবার সময় লীলা স্বামীকে বলে যায় একান্ত সত্বর বিবাহ করিলেও তুমি আমার থাকিবে, অপরের হইতে পারিবে না।" তাই যখন দশ সহস্র রক্ততত্ত্ব ও অর্ধ লক্ষাধিক মূল্যের অলঙ্কারমণ্ডিতা রূপসী লীলার পরিবর্তে মণিলালে আত্মবিক্রয় করিতে যায় তখন যেন লীলার হাসি অন্তরাল থেকে শোনা গিয়েছিল। আর তারপরই এই দুর্ঘটনা—"আমি ত তাহাকে ভালবাসিয়াছি কিন্তু মরিয়া ও সে আমাকে বিশ্বস্ত হয় নাই।" এবং সেদিন থেকে " তাহার কথা বলিতে গেলে ঐ রকম করিয়া চারিদিক লাল হইয়া আসে, চারিদিক কেন লাল হইয়া যায় বলিতে পারিনা, আমার শিরায় শিরায় কেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় জানি না।...তবুও বলিতেছি লোকে যাহা মনে করিয়া থাক তাহা সত্য নহে, আমি কখনও পাগল হই নাই।"

কাঞ্চনমালার গল্প বলার ভঙ্গিতে নতুনত্ব আছে। তাঁর বিষয় নির্বাচনেও অভিনবত্ব। মাণিলালের 'পাগলের কথা'র সঙ্গে শুধু নামদাদৃশ্যেই নয় আঙ্গিকগত রীতির দিক থেকেও বিশেষ সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠ আঙ্গিক গল্পটির পটভূমিকা রচনায় সাহায্য করেছে। এই আত্মপ্রকাশের ব্যবহার তাঁর একাধিক গল্প রচনায় দেখা গেছে। কেমন যেন একটা ঘুরোপকথার মৌজিক পরিবেশে কাঞ্চনমালা তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সগুলি পরিবেশন করতে ভালো-বাসেন। এই 'শুল্ক' গল্পসংগ্রহের 'প্রতীক্ষায়' গল্পটি তাঁরই নিদর্শন। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণের' স্বাদ পাই। 'ক্ষুধিত পাষাণের' মত এখানেও মানুষের অতৃপ্ত আত্মা-প্রাপ্তি নিশীথে বিরাট প্রস্তরীর প্রাসাদের প্রতি-প্রকোষ্ঠে, আলোকে জীবনের একটি দৃশ্য অভিনয় করে চলেছে। এ কাহিনীর নায়িকা এক বিংশ বর্তমী—মোগল আমলের বাদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা আলি এদের মর্মান্তিক প্রেমের কাহিনী মোগল হারেমের ঈর্ষার ষড়যন্ত্রে জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পের শেষে লেখিকা জানিয়েছেন—"ইহা যাহা দেখিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য, স্বপ্ন বা মিথ্যা নহে। অতৃপ্ত প্রেমাত্মা-গুলি জীবনের শেষ বক্তব্য ঘটনা—এখনও প্রতিদিন অভিনয় করিয়া থাকে।"

এই ধরনের আরো গল্প কাঞ্চনমালার 'শুল্ক' গল্পসংগ্রহে লক্ষ্য করা যায়। 'আত্মহারে' মোগল হারেমের এক ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর বাস্তবায়ন সৃষ্টি করেছেন লেখিকা। সেই বাস্তবায়নের এক প্রান্ত ছুঁয়ে ধরলে দেখা যায় কাহিনীর নায়ক নবাবী গোরস্থানের পরিদর্শক বৃদ্ধ নাজির হোসেনকে। নাজির ভাবিতে মোগল। মোগলটুলিতে তার বাস। শিল্পীর বাসনা তার পূর্বপুরুষকে একসময় ভারতীয় দিয়েছিলেন। আরবী ফারসী পড়ে নাজির যৌবনে বদরদার পাঠোধার হয়। আর সেই কাজেই তার জীবনে ঘটে চরম সর্বনাশ। অকস্মাৎ একদিন নবাবপুত্রী জাহান বানু বেগমের সঙ্গে ওরফে নাজিরের সাক্ষাৎ হয়। নবাবপুত্রীর রূপে মুগ্ধ নাজির নিজের মনোভাবের কথা বলে ফেলে। নবাবপুত্রীর কৌশলে বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকারও লাভ করে সে। আর তারপর একদিন দেখে ফেলে শাহজাদা জাহানবানুর গোলাপ স্তবকের মত কোমলখানি। সেই থেকে নাজির প্রতি পূর্ণিমায় শাহজাদীর গোরস্থানে ঘুম দেয়। আর মাসে একদিন সে 'মেজোদি পাত্তার তার দীর্ঘ ওভারকোট খুলতে করে অর্ধদিনের জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নবরূপে বেশভূষা করে। সন্ধ্যার পূর্বে মিহি বুটিদার চাপকান, সতরঞ্জির জীনিস্ বুটো ও মখমলের বৈদেশিক টুপি পরিধান করে নাজির প্রিয়তমা শাহজাদার

...ছে সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতের পথে ...া করে।

'...াড়ি গল্পটিতেও এক অতীতের ...ভাষী রোমাঞ্চ মধুর কাহিনী। এ ...র মানুষ দুই চরিত্র আঁকতে পেরেছে। ...ন্তুরের মধ্যে এই উপলব্ধি প্রায়শই ...ন্দিলে ঘুরে বেড়ানো আর মন দেখার ...রের একমাত্র কাজ। সে যেন ...াদের তার সাতাশবর্ষে লেখকের এক পলাশলোচনার উদয় আঁকত। মাঝে ...র তার নিবিড় সাহচর্য যেন ফাল্গুনকে ...বিশ্রান্ত করে—"অনেকক্ষণ পরে উঠে ...লাম বর্ষাদিকা সাবলা বিরাজে। ...রেমনথে একখানি কাজীবর্ণনিভ সুন্দর ...আমার দিকে চাহিয়া আছে।

আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। ...পর্যঙ্কের পার্শ্বে বসিলাম। 'আজে' ...ার বেশভূষা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া ...ম। বহুমূল্য অলঙ্কারে তাহার ...সমস্ত আবৃত। দেহের কুঞ্চিত ...র্যাদর মধ্যে উজ্জ্বল হীরাগুলি ...হের মত জ্বলিতেছে। পূর্ণ কুন্তল ...ানে শুভ্র ললাটে ফোঁটা করিতেছে ...ানে থাকি থাকি মুক্তা হইয়া ...ড়িয়াছে। পৃষ্ঠলম্বিতবেণী মুক্তার জালে ...দ্ধ। এই সুদ্ধ বীর বয়সে সেনোয়াত

কুঞ্চিত পাদত্রাণের আবদ্ধ হইয়া ...খানি প্রস্তর মুরোপ চরণদেহে দেখা ...তেছে। সে এখন তাহার নবযৌবন ...শুভ্র পূর্ণ দেহ লতাখানি আবাহত ...রেছে। তখন অসংখ্য মাণিমুক্তা ...বা উঠিতেছে।" এই সব দেখতে ...তে হাসি সেই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য-...াকের পথেই না বাড়িয়েছে। ...াবতেই এখানে প্রশ্ন জাগে সত্যসত্যই ...চেনা সুন্দরী কি 'কুঞ্চিত পুষ্পাদেব' ...ই সাদীর প্রাতঃস্নায়ী? আর তাঁর কি ...ই উত্তাপ পাত্রকমলের স্বাবক?

'সুরেক' গল্প সংকলনের 'অর্ঘদান' ...টির পরিবেশ সেই একই বিস্মৃতপ্রায় ...ারী আমল। তবে এ কাহিনীর মন ...গ্রাম্যিক নয় এবং এ-যেন প্রত্নতাত্ত্বিক ...র চরম পরাকাষ্ঠা। তবে 'কাঁসুর ...ার্ব' দ্বিতীয় গল্প 'তরাইদেবী' এদিক ...কে 'আঁধার' ও 'আঁচলাবের' সমধর্মী। ...কটি বাঙ্গালী মেয়ে-ব্রাহ্মণ প্রেম-...হেতুগুলে—এটা জাবকীবিবির অপূর্ণ-...বর্ণী মুক্তাপাত্র পড়িবলী তরা আবাবিদের ...া তরোয়াল ... বড় এক " ...সমে'।

—তোইরা ...সম বুঝিলে না? ...সম বড় বাঁকলা চিহ্ন, "অন্ধকারে ...মানার পরে উসম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায়না। সমস্ত রাত—তখনকার প্রদীপ একলক্ষে নাচিতে থাকে। সেদিনস্কার ...সমে একলক্ষ আর প্রেমের ...একলক্ষে সেতার বাজাইল বিকাল, সে সমস্ত করিল, আর সেইদিন নারায়ণ নাচিল রাত্রি। মজলিসের সমস্ত লোক, ইতর-ভদ্র, আমীর ওমরাহ হইতে নফরটি ...করা তোবদার পর্যন্ত সকলেই কিন্তু ...ুলিয়া তাহিক করিল। অনেকে মোহিত হইল, বাঙ্গালী প্রেমবাজ সেইদিন মরিল।"

—ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা কাঞ্চনমালার ছিল না। তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতীতচারণার চিহ্ন কাঞ্চনমালার অনেকগুলি গল্পেই প্রত্যক্ষ করা যায়। তথাপ্রিয় রাখালদাসের প্রভাববলেই বোধ করি কাঞ্চনমালার লেখনীতে ঐতিহাসিক কোমলের মিশ্রটিই সার্বভৌম হয়েছে বেশি। অবশ্য সমসাময়িক সামাজিক জীবন নিয়েও তিনি একাধিক গল্প লিখেছেন। রচনারীতির দিক থেকে সেগুলির বাদুর্য অস্বীকার করার উপায় নেই। 'শুভ্র'গল্প সংগ্রহের 'নির্মাচ' গল্পে অন্তঃপুরের এক নির্মম করুণ পরিহাসের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। 'অভাগিনী' গল্পটি বাঙ্গালীর 'কমলাকান্তের দপ্তরের' প্রতিচ্ছায়ার চরিত্র। বক্তা কমলাকান্তের মত আফিমের মৌতাতে বিভোর নন বটে। তবে তাঁর এই দার্শনিক চিন্তার বাংলাদেশের বিধবা করার সীমাহীন উৎসই বড় হয়ে উঠেছে। 'পরিবর্তনে' বাংলাদেশের চিরাচরিত পাতিব্রত্য খুব সংযত স্থান পেয়েছে। 'পথহারা' গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' বড়াদিদি'র সূক্ষ্ম সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। 'বলীকরণ' গল্পটিও রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র ছায়াবলম্বনে রচিত বলেই মনে হয়। একমাত্র 'টাঁস' ব্যতিক্রম। এ গল্পটি কাঞ্চনমালার 'বসির তাগাদা'র বাসির কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'আদাবিদায়' কথা মনে পড়াও অসম্ভব নয়। তবে এসব গল্প মোটামুটি সুখপাঠ্য এবং লেখকের সুন্দর হাতের রচনা।

কাঞ্চনমালার 'সুরেক' গল্পসংগ্রহ ছাপা হয়েছে ১৩৫২ সালে। কুঞ্চিকায় লেখিকা কাঞ্চনমালার যে এই গল্প সংগ্রহের "গল্পগুলি প্রথমে ভারতবর্ষ, মানসী, বিজলীপত্র, নক্ষত্র ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। প্রথম গল্প 'পরাচিক', স্বাভাবোদ্ভাসনধর্মী রোমান্টিক প্রেমকাহিনী। কাহিনীর আবহ অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথা' গল্পের 'লাকুলখের কথা' বা 'ঘাটের কথা'র অনুরূপ। বাখাল রাজের 'পাষাণের কথা'র গল্পটিও এইসূত্রে মনে পড়ে।

'হোলি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'খোকা-বাবুর প্রত্যাবর্তনে'র সদৃশ। এখানে দুজনের মাঝ কেউ। মোলি তার প্রভু কথা। অন্য অবস্থায় মোলি মারা যায়। কেউ মোলিকে খুবটা ভালোবাসেনা। মোলির মারা যাওয়ার পরে কেউ কেউ দুঃখ করতে পারেন নি। মোলি মারা যাবার পর কেউ দেখে চলে যায়। সেখানে আট বছর বয়সে বন্ধুর মেয়ের মুখে মোলির প্রত্যক্ষতা দেখে তাকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর সেই মেয়েটি কৈশোরে হারিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে। আর তার মধ্যে তখন কেউ মোলির সাদৃশ্য খুঁজে পায় না। কেউ তাকে নিয়ে আর সুখী হয় না। তাই মেয়েটিও একদিন পালিয়ে যায়। এরপর বৃন্দাবনে কেউ আবার তার দেখা পায়। তার কোলে তখন একটি ছোট মেয়ে। তাকে যেন কেউর সেই মোলির মত মনে হয়। কিন্তু মেয়েটি ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। কেউ সরে যায়। আর তখন—অন্ধকার ঘুর হইয়া গেল—ঈষৎ রক্তাম্বরসন্নিভ আলোকে আর্দ্র মন্দির পূর্ণ হইয়া গেল—মেঘের ভিতরে বসিয়া সে উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল.....।"

'হাকপুরীর বিষদ' গল্পটি সেকালের কৌলীন্য প্রথা আশ্রয় করে লেখা। কমলাকান্তের দ্বারাপ্রভাবিত এই চারিত্রটি লেখিকার 'শুভ্র' গল্পসংগ্রহের—'অভাগিনী' গল্পটিতে আর একবার দেখা গেছে। কুলীনপ্রধান হাকপুরো আফিমের গুণগান করে বলেছেন—"বুড়োর কথা শুনিয়া হাসিতেছ যাবা? কিন্তু মনে রাখিও যে তোমার ঐ প্রবন্ধকে কেশের ২রুমালা চিরদিন থাকিবে না। তরা যৌবনের চলচলে মুখখানি চিরদিন পদ্মফুল পদ্মের

মত ভাগ্যবিড়ম্বিত থাকিবে না। যৌবনে উহার চেহারাখানি দুটাইয়া পড়িবে, মাথার চুল হয় বিরল হইবে না হয় সাদা হইয়া যাইবে। তখন এই কালাচাঁদের প্রেমে পাগল হইতে হইবে। কাকচুড়া বুড়া, তাহার কথায় বাস করিত না—কিন্তু চরিত্র নষ্ট হইলেই অর্থিক ধরিত, তাহা হইলে কাকচুড়ার মত সতীসাধ্বী—খুঁচ—সকাল বাঁচ বহু" খুঁজিতে পারিবে।"

কাঞ্চনমালা দেবীর 'রসিক মুরারি' প্রকাশিত হয় ১৩২৪ এর ফাল্গুনে। এটি ভাঁহার বয়সে লেখা গল্পসংগ্রহ। নামগল্প 'রসিক মুরারি' এক কুকুরের আত্ম-জীবনী। প্রকৃতপক্ষে নানা অভিনব এবং আন্তরিকতাপূর্ণ বর্ণনের মাধ্যমে লেখিকা সাধারণতম লেখাটিকে এক একটি চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমেই বাস আত্মপরিচয় দিতে বলেছে —"আমি বাস। আমার ভাল নাম রসিক, অন্য নাম মুখপোড়া, চরামজাদা পাজী, শুয়ার, উল্লুক ইত্যাদি। আমি জাতিতে কলটোঁবিয়ার। আমার একটি কান কালো, সেইজন্য আমি বলাধানাকে সবার চেয়ে বেশি।"

অতঃপর তার সারাদিনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে আমাদের আকারে—

"সকাল বেলা—সকালবেলা কাকের ডাকের চোটে একটু ঘুমাইবার যো নাই, শেষ রাত্রিতে উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে; আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রাত্রি চৌকি দিয়া থাকিয়াছি, সে কথাটা একবারও ভাবেও না। বেটাদের যদি একবার মুখের ভাষা পাই, তা হলে দেখাইয়া দি। এখনও কেউ উঠে নাই, ভাবিয়াছিলাম এই ফাঁকে একটু ঘুমাইয়া লইব; কিন্তু তাহা আর হইল না দেখিতেছি।"

কিছুক্ষণ পরের কথা—"সবে বেলা উঠিয়াছে দেখিয়া বৈঠকখানার তক্তাপোষের নীচে একটু গড়াইতেছিলাম, কিন্তু ছোটদাদার ছেলেটা শেষ রাত্রিয়া একটি টান দিয়াছে যে, সে রাম লাথালাইতে না পারিয়া তাহার হাতে এক ছোবল মারিয়া দিয়াছি; অমনি নিকাশ প্রহার আজ দেখিতেছি।"

এই সব বেটার এত স্পর্ধা আমার সহ্য হয় না। আমি কর্তাবাবুর কুকুর, আর সে কর্তাবাবুর চাকর। বড় দাদাবাবু কন্যাদান করিয়াছেন, চাকরে আর কুকুরে তফাৎ কি?' তাই উপর আমি খাস বিলাতী এলসেসিয়ান পুষ, আর সে বেটা ভ্যাম নিগার। আমার দামও যাহা নিগার, তবুও তাঁহার একটা কদর আছে। আর সব বেটার গায়ে যেন আলকাতরা মাখানো। বাবু আমাকে হাস বলিয়া আদর করিয়া ডাকেন, গিন্নী মোড়াবমুখো বলেন, দাদাবাবুরা ভারাক-ভারা, পাজী, শুয়ার, উল্লুক বলে বলিয়া লয়। বেটারা কি তাই বলিবে? যদি বেটাদের চামড়ার চামড়ার হয় না থাকিত, তাহা হইলে বেটাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিতাম। মোট কথা কালা আদমী এখনও খাস বিলাতী কুকুর পুষিবার যোগ্য হয় নাই।"

গ্রন্থকুকুরের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে রসিক দার্শনিক মতামতও এ বইয়ে ব্যক্ত হয়েছে—"মানুষের মধ্যে দুইশ্রেণীর লোক আছে। প্রথম শ্রেণীর লোক কুকুর দেখিলে ভয়ায়, তাহাদিগকে আমরা বড় ঘৃণা করি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আমাদের ভালবাসে আদর করে, আমরাও তাহাদের ভালবাসি। আমার বাড়ী অনেক রকমের অনেক লোক আসে; কেহ বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আসে, আবার কেহ বা হাঁটিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে আমরা কেবল ঐ উপরের দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এই সকল বাহিরের লোকের মধ্যে আমি একজনকে বড়ই ভালবাসি, সে আমার মনিবের দূর সম্পর্কের ভাইপো। সে বেচারী বড় ভালোমানুষ। লোকটা যদিও মোটা, বেঁটে-কালো; কিন্তু লম্বু বেটার চাইতে কালো নয়। সে নিত্যন্তই গরীব; কারণ আমীর মনিব কখনই গরীব মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না।"—গল্পের বিষয়বস্তু এবং সহজ পরিবেশন রীতির অভিনবত্ব সত্যি বিস্ময়কর।

'আদরের বন্দিতা' গল্পটিতে স্বামী উপেক্ষিতা পত্নীর আক্ষেপ এবং 'শুভ্র মর্মরিকার আকারে লেখা কাঞ্চনমালার পারিবারিক বাস্তবতার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। 'বনের সাথী' গল্পটির আরম্ভ স্পষ্টতঃই রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পের স্মারক। কাঞ্চনমালার আসল পরিচয় তাঁর ছোটগল্পগুলিতেই প্রত্যক্ষ। অবশ্য একখানা উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন।

'পারিজাত' উপন্যাসটি ছাপা হয় ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এ বইখানি লেখিকা তাঁর স্বর্গত পুত্র চপলকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ বচনে তিনি বলেছিলেন—"আমি কবি লিখিতে না—পুত্রবধূ তোমার নিকটে অনুরোধে আমার দুঃখিনী বালবিধবাকে লইয়া তোমারই খুঁজিতে বেড়াইতেছি। কিন্তু তোমারি কাছে যাইবার পাকা কোথাও খুঁজিয়া পেলে দিয়াছ—সেখানে তাহার তোমারই দুঃখিনী মার অঞ্চলের আশ্রয়ের বালবিধবাকে লও।" জেনপুর অঞ্চলকে অবলম্বন করে রাখালদাস তাঁর সেব ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অসীম' লিখেছিলেন। বই-এর সূচনা করেছিল পুত্র অসীমের মুহূর্তাশয়ায়। বইটি তাকেই উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। সে যাই হোক্ দুঃখিনী কাঞ্চনমালা মামীর অনুরোধের কথা স্মরণ করেছেন।

এ গল্পের নায়িকা বালবিধবা ছেলে-বেলায় বাপমাকে হারিয়ে মামামামীর কাছে মানুষ। সিরাজগঞ্জের জমিদার রাধাবল্লভবাবুর ছেলে সন্তোষের সঙ্গে বালবিধবার বিয়ে হয়। কিন্তু সন্তোষ বড় অভিনেত্রী যোন সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে বালবিধবা অনাদৃতা অবস্থায় থাকে। এরপর বালবিধবাকে দীর্ঘকাল নানা দুঃখকষ্টের জীবন কাটাতে হয়। আর সুন্দরী সন্তোষকে প্রত্যাখান ক'রে কলির সংসর্গের ত্রস্ত নেয়। আর তারই আনুকূল্যে সন্তোষ আর বালবিধবার মিলন হয়।

এ উপন্যাসের কাহিনী মহিলা ঔপন্যাসিকদের অন্যান্য পথ ধরেই এগিয়েছে। অবশ্য বাস্তবের সামাজিক উপন্যাসগুলির প্রভাব যে একেবারেই নেই তা নয়। বাস্তবের মত কাঞ্চনমালাও ছিলেন বৈষ্ণবপল্লীর বিবাদী। এছাড়া কাঞ্চনমালার এই রচনার কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বিবেচ্য। রূপ বর্ণনা কাঞ্চনমালা যেন একটু রোমান্টিকধর্মী—"সে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া আছে। আরও দেখিল, তাহার হাতেআঁকা নীলোৎপলদলতুল্য দুইটি নয়নপল্লবের নিম্নে অশ্রুমেঘ দুটিতে চাহিয়া আছে। ও দশনপঙ্‌ক্তির অন্তরাল হইতে শুভ্র হাসি রেখা তাহার ঈষৎবিম্বাধরে দুওরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।"

তাঁর চুল বর্ণনার ভাষাও অনেকটা

(২২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

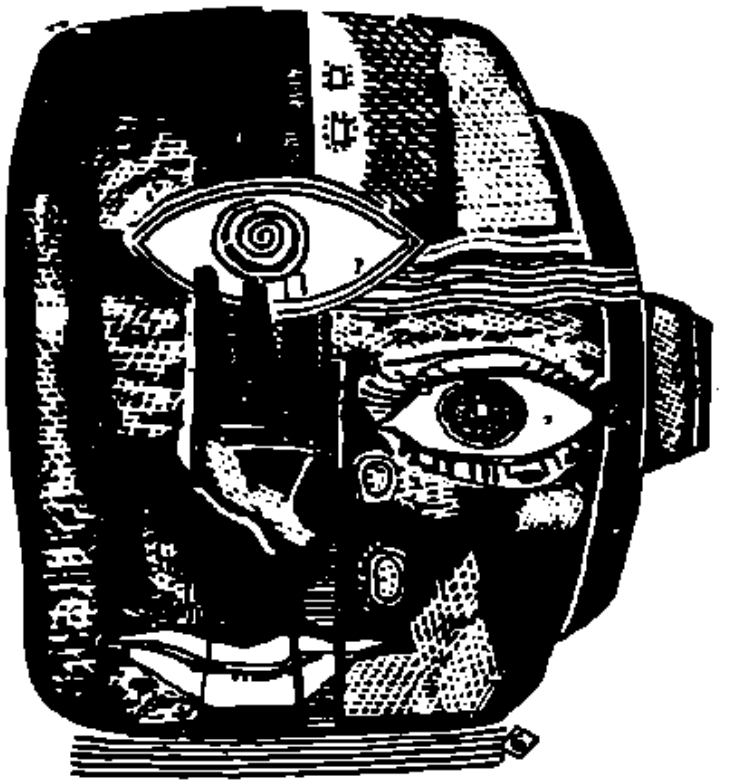

আর একজন

শ্রীঈশ্বর সেনাপতি

সামান্য একটা ভুল। কিন্তু শুধু সেই ভুলের মাশুল দিতে হল সুকান্তকে।

উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদক ভয়ঙ্কর যন্ত্রটির সুইচের পাশে কৌতূহলবশত গিয়ে পড়লে সুকান্তকে এ সাজাটা ভোগ করতে হত না। একটা বিপুলশক্তির বিদ্যুৎতরঙ্গ সুকান্তকে যেন কয়েক লহমার জন্যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কাতরধ্বনি বেরিয়ে ছিল ওর মুখ দিয়ে। দু'হাতের দশটা আঙুল যন্ত্রটারই একটা অংশকে শক্ত করে টেনে ধরেছিল। ওই চেষ্টাতেই নিজেকে বন্ধ করেছিল সুকান্ত। পরে ও বুঝতে পেরেছিল ওকে উদ্ধার করা হয়েছে। ও যে বেঁচে গেল, তার জন্যে, মানে ওর উদ্ধারকারী—তারা কয়েকবার বন্ধ ঘরেই দিয়েছিল ওকে লক্ষ্য করে। দেখেশুনে সুকান্ত বিমূঢ় হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল : আমার মৃত্যু হয়নি দেখে এখন কি ওদের আপসোস হচ্ছে?

চীফ ইঞ্জিনীয়ার মদন দত্তর মুখের সেই মুহূর্তের চেহারাটা সুকান্ত মনে করে দেখতে গেলেই শিউরে উঠছে। ওকে চিনিয়ে যাবেন, নাকি আস্ত গিলে খেয়ে—মদন দত্ত যেন এইরকম একটা উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : যেসব জায়গায় হাই-ভোল্টেজ সার্কিট বর্তমান, সে জায়গাগুলোর আশেপাশে কত কত সাবধানে থাকতে হয়, সেটাই সেখানে তো এ কাজ করবে কী করে? খুব বেঁচে গেছ। আপাতত: বাড়ি যাও।

সুকান্তর চকিতদৃষ্টি পড়েছিল মদন দত্তর মুখের ওপরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের রক্ত যেন সরে গিয়েছিল। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল।

মদন দত্ত যেন বলতে চাইছিলেন সুকান্তর দৃষ্টির সামনে। গলে যাওয়া লোহের মত ওঁর সাদা মুখ চোখ থেকে কী সব ভিজিয়ে যেন বয়ে যেতে সুরু করেছিল। মুখের আকৃতি বদলে যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। ওটা কোন-মানুষের মুখ হতে পারে কিনা, সুকান্ত ভেবে পাচ্ছিল না।

ধীরে ধীরে সুকান্তর অন্তরের চেতনাবোধ ফিরে এল। ওর মনে হতে লাগল—মদন দত্তর শান্তিভঙ্গের গভীরতম প্রদেশে উঁকি মারার মত একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষমতা যেন ও লাভ করেছে। মদন দত্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। সুকান্ত উপলব্ধি করছিল। ওঁর মস্তিষ্কের ভেতর থেকে কোথাকার আদিম হিংস্রতা নিয়ে যেন ছুটে আসছিল। মদন দত্ত সুকান্তকে যেন খুন করে ফেলতে পারেন।

উলতে উলতে সুকান্ত উঠে দাঁড়িয়েছিল। কোনরকমে বলেছিল : আমি এখন তাহলে বাড়ি যাচ্ছি, নিরাপদ দত্ত।

সুকান্ত নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না। এখান থেকে চলে যেতে পারলে ও যেন আগের মত সহজ হয়ে উঠতে পারবে। মদন দত্তর মধ্যে একটা খারাপ কিছুর আঁচ এখনও উপলব্ধি করতে পারছিল। যেন একটা হিংস্রতা—কিছুটা আদিম, এবং ভয়ঙ্কর। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাইরে পথের ওপরে এসে দাঁড়ানোর পরেও সে উপলব্ধি যেন আরও গভীরতর হয়ে উঠছিল। মদন দত্তর পূর্বপুরুষদের একটা কলঙ্ক, সুকান্তর মনে হচ্ছিল যেন সেখান থেকে তাড়া করছে ওকে। ওর নিজেদের বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

বাস একটা যাত্রীবাহী বাসে উঠে পড়ল। যাত্রীসংখ্যা নেহাৎ অল্প নয়। এদিকে ওঁদিকে তাকিয়ে দেখল। ও নিজের মত মানুষদেরই ভীড় বাসে দেখতে পেল। কিন্তু—কিন্তু—তাতেই কি ওরা সকলে স্বাভাবিক? সুকান্তর মনে হচ্ছিল এখানের যাত্রীদের সকলের মনে একই ধরণের চিন্তা রয়েছে—যাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। তবে মানসিক চিন্তাগুলো সুকান্তর চেতনায় আঘাত হানতে সুরু করে দিয়েছিল। চিন্ত

ওদের চোখের। লালসা আর ঘৃণার। আদিম এবং আদিম অনুভূতি।

পেছনের যাত্রী সুকান্তকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। ওর চেতনার ওপরে চারপাশ থেকে যে আঘাত আসছিল, বন্ধ হয়ে গেল সেটা। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যে আতঙ্কটা ওর মনে প্রভাব ছড়িয়েছিল, এখন আবার তা চোখের সামনে মেটার অবগুণ্ঠন, যেন উন্মোচিত হয়ে গেল। চোখ বুজে সুকান্ত নিজের অস্তিত্বকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। একটা বিচিত্র শিহরণ জাগানো তার ওই চেতনার উপলব্ধিতে আতঙ্কের ভয়টা ভুলে দিল। সুকান্ত'ও সমস্ত সত্তাকে নিঃশব্দে অধিকার করে বসল যেন একটা উৎকট উন্মত্ততা।

সামনের আসনের মহিলাযাত্রী ছিল একটি। সুকান্ত'র দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার ওপরে। সালোয়ার-কামিজে সজ্জিতা, রূপ সাধারণ গড়ন। এক মাথা আলোচুলে এলো খোঁপা বাঁধা। তরুণীটি হঠাৎ যেন যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সেদিন দিকে। নিজের সংযত চরিত্র নিয়ে একটা সুকান্ত'র গর্ব ছিল। কিন্তু, এখনই ওর মনের ভেতর থেকে যেন একটা পাশবিক ইচ্ছা ওকে সহসা জানিয়ে দিল যে তরুণীটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। তোমাকেই দেখছে। তোমার চোখে ও চোখ রাখতে চাইছে। এটা কর্ষণ, আদিম—উন্মত্ততা।

দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল সুকান্ত। কিন্তু সে দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি যুবকের ওপরে। সুকান্ত যুবকটির চোখের উপর চোখ রেখেছিল। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। কিন্তু—। সুকান্ত শিউরে উঠেছিল আপাদমস্তক।

: আমি অবাক হচ্ছি। কিন্তু একটা লাভ বিচিত্রভাবে ফিসফিসিয়ে বলায় বলল: বাবা উইলটা রেখেছে কোথায়? প্রায় চারশ হাজার টাকার কারবার হবে। উইলটাকে আমি দেখতে চাই। বিটায়ার করার পর থেকে বাবা তার গুলিভর্তি পিস্তলটা সর্বদাই কাছে কাছে রাখে। সেই পিস্তলটা দিয়েই যাঁর মাথা উড়িয়ে দেওয়া যেত না—

একটা সংযোগ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ে গেল। বাস থেমেছে। মহিলা যাত্রীটি আসন ছেড়ে উঠে পড়েছে। যুবকটির দৃষ্টি সুকান্ত'র দিক থেকে সরে গেল।

আর, একটু পরেই সুকান্ত দেখল, ও নিজেও কখন বাস থেকে নেমে পড়েছে। হাঁটছে রাস্তা দিয়ে। মনটার মধ্যে একটা আতঙ্কের ভয়ের প্রলাপ সর্বদাই জেগে থাকতে চাইছে যেন।

সুকান্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে সব চিন্তাকে এতক্ষণ ওর নিজস্ব বলে মনে হচ্ছিল—সুকান্ত আচমকা সে-চিন্তার প্রকৃত অর্থ পেয়ে পেয়ে গেল খুঁজে। ওর মন বলল, উন্মত্ততার লক্ষণ এ সব নয়। ইন্দ্রিয়-সাহায্য বিনা দূরের দু'টি মানুষের মনোভাবের যোগাযোগ ঘটে আতঙ্ককে কী বলে? টেলিপ্যাথী! সুকান্তর মনে হচ্ছিল, কার্যকর অবস্থার ওই ঘটনার প্রাপ্তিযোগ ঘটে গেছে ওর। আধুনিক বিজ্ঞান যেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আদুনিক বিজ্ঞানীর এখনো সুতীক্ষ্ণ উপলব্ধিক্ষমতা বিজ্ঞানীদেরও অবাক করে দিচ্ছে।

এতক্ষণের সমস্ত উপলব্ধি তাহলে নিছক কাল্পনিক নয়। সুকান্ত নিজেকে শোনাল। অতঃপর একটু একটু করে সুকান্তর মনের পুরোনো অভ্যাসগুলো ফিরে আসতে চাইল। বর্তমানের নিঃসঙ্গতা পাড়া দিতে লাগল ওকে। সুকান্ত'র মনটা সঙ্গী খুঁজতে লাগল। এখন এখন একটা সঙ্গী, যার কাছে সব কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। অনিমার ঘরের দরজার সামনে যখন গিয়ে দাঁড়াল সুকান্ত, তখন সারাদেহ ওর কাঁপছিল। ওকে দেখে অনিমা যে খুশী হয়েছে, অনিমার চোখদুটো সে কথা স্বীকার করছিল না। তবু সুকান্তকে ঘরের ভেতরে আসতে ও আহ্বান জানাল।

সুকান্ত'র পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

: আমাকে আগে টেলিফোন করে জানাওনি কেন, সুকান্ত? অনিমা অভিযোগ করল: আমি এখনি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার এক বন্ধুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ আছে।

সহসা মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল অনিমার। একটা আর্ত অদ্ভুত দৃষ্টিতে সুকান্ত যেন ঠুকরে ঠুকরে দেখছে ওর দিকে। যেভাবে তাকিয়ে রয়েছে, যেন ওর দেখতে চাইছে অনিমাকে। সুকান্তকে কোনদিন ভয় করেনি। কিন্তু এখন, অনিমাকে শঙ্কিত করে তুলছে কেন ও?

: সাংঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, অনিমা। সুকান্ত বলল: শোনো, বলছি।

অনিমার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহের দোলায় দোদুল হল সুকান্তর মনটা। অনিমাকে ও আর চিনতে পারছিল না শাইভাবে। অনিমার গোটা শরীর জুড়ে যেন একটা পরিবর্তন নামছিল। ওর মনের গোপন চিন্তা এসে মিশে গেল সুকান্তর চিন্তার সঙ্গে। সুকান্তর মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটা করে যেন আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় আলোকিত করে নিল অনিমার মনের গোপন চিন্তাগুলোকে। অনিমা সুকান্তকে বিশ্বাস করে না। পাগল মনে করে। ওর ভয়ে অনিমার মনে ঘৃণা জমে উঠছে। বুঝতে পারছে—

অনিমার নীরব জিজ্ঞাসাতে এই: তোমার নিজের বিপদ আমার কাছে বয়ে এনেছ কেন? তোমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি কি ভুল করিনি? তোমার চেয়ে অনেক বিত্তশালী কোন ধনীর দুলালের কাছে আমি কি অনেক বেশী সুখ আরাম আমোদ করতে পারি না?

সহসা দূরে সরে গেল অনিমা। সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুকান্তর মস্তিষ্কের কোষগুলো অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। একটা ছুরি পড়েছিল টেবিলের ওপরে। ছুরিটাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল অনিমা।

সুকান্ত যেন ধপ করে আবার জ্বলে উঠেছিল। আতঙ্কের একটা শিহরণ ছড়িয়ে পড়েছিল শরীরে। অনিমার গোপন চিন্তা ওর চেতনায় এসে আঘাত হেনেছিল। অন্তত আর বিভ্রান্ত চিন্তা: আমি সুকান্তকে ঘৃণা করি। ওকে আর সহ্য করা যায় না।

সুকান্তও আর সহ্য করতে পারছিল না। গলার কাছে কী যেন একটা বস্তু উঠে এসেছিল ওর। সেটাকে দমন করে নিয়ে ও দুঃশ্বাসে অনিমার ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিল।

পথের ওপরে দাঁড়িয়েছিল এসে। আতঙ্কটা সুকান্তকে যেন গিলে খেতে চাইছিল। নিজের মস্তিষ্ক সুস্থ করে

তবে উঠছিল সুকান্ত। ওর মোটা জীবনটাএকটা মার্কাদক ধরণা নিয়ে মাথার মধ্যে বেরুই থাকতে চাইছিল। চিন্তাগুলো এমনই দুরন্ত, বন্য আর দুরাবহ হয়ে স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করতেচাইছিল যে, সুকান্তর মনে হচ্ছিল, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে গেলে ও হয়ত আরাম পাবে।

চীৎকার ও করে নি: তবে দৌড়েছিল পথ দিয়ে। আর, দৌড়বার সময়েই ওর মনের পরিবর্তন এসেছিল। ও লক্ষ্য পেয়েছিল একটু। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পথের এক জায়গায়। সামনে একটা মোটা বেমরেটের ওপরে তখন নজর পড়েছিল সুকান্তর।

মোটা লেখা : মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার অরুণাভ চ্যাটার্জি।

সুকান্ত একটু ভেবেছিল পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর ডাঃ চ্যাটার্জির চেম্বারে গিয়ে ঢুকেছিল ও।

ডাঃ চ্যাটার্জি সেই ধরণের চিকিৎসক যাঁরা এয়ারকণ্ডিশনারের ওপরে সর্বাধিক নির্ভর করেন। ইন্দুর এবং কুকুরের ওপরে তাঁরা পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। কারণ, তাদের মনগুলো একই সরল যে উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্ব তাদের কার্যকলাপ সহজেই বুঝতে পেরে যায়। মানুষের মনস্তত্ত্ব ডাঃ চ্যাটার্জির প্রায় নখদর্পণে। অন্তত তাঁর তাই বিশ্বাস। তাই তিনি তাই বলেন।

সুকান্তর সমস্ত কথা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই তিনি শুনে গেলেন। কথার মাঝে তিনি কোন প্রশ্ন করলেন না, বাধাও সৃষ্টি করলেন না। শুধু শুনে গেলেন। সৃষ্টির মধ্যে একটা সূক্ষ্মদর্শিতা ফুটে উঠল।

অবশেষে তিনি কথা বললেন। তাঁর কণ্ঠে কিছুটা সহমর্মিতা, কিছুটা বা ব্যথা পড়লেও তাদের বিশ্লেষণের অন্তরালের প্রতিক্রিয়া ছিল।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কী আমি বুঝতে পারছি, টেলিফোন যন্ত্রের এক্সচেঞ্জ থেকে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহ তারগুলোর ভেতর দিয়ে ছুটে ইলেকট্রিশিয়ান যেমন করে, তেমনি করেও বিদ্যুৎ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিদ্যুৎপ্রবাহ তারগুলোকে ঝনঝনিয়ে

সচেতন করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তাপ্রবাহের যে নির্দিষ্ট ধারণা রয়েছে, আপনার সেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে। সেই শক্তি আপনাকে হত্যা করতে পারত, কিন্তু তা' হয়নি—আপনি বেঁচে গেছেন।

আপনি এখন সুপারকন্ট্রোলস্যাটিকের আবহাওয়া করতে সক্ষম। কিন্তু এমনি সর্বশক্তির হয়ে উঠেছেন যে মানুষের সচেতন চিন্তাগুলোই শুধু আপনি গ্রহণ করেছেন না, অনেক গভীরের—অচেতন মনের ভাবও ভাবনাগুলোকেও ধরে ফেলতে সক্ষম হচ্ছেন আপনি।

এই হঠাৎ ভাব পরিবর্তন এবং আকস্মিক আপনার অতিজ্ঞতায় একেবারে বদ্ধুর। মানুষের সজ্ঞান মনের একটি সমালোচক আছে। এই সমালোচকটি হচ্ছে, আপনার সত্তা মনের একটা অংশ—হয়ত হাজার বছরের সভ্যতা থেকে যেটাকে আপনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন। শিশুর মত আপনাকে দেখানো হয়েছে যে, অচেতন মনের আবেগকে দমন করে রাখতে না পারলে ভয় এবং লজ্জা আপনার চেতন মনকে অধিকার করে বসবে।

প্রত্যেক মানুষের অবচেতনে লুকিয়ে রয়েছে তার আকাঙ্খা ও আবেগ। কোন কোন মনে ওগুলো প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান। সমালোচকদের সর্বদা আকৃষ্ট করে না। কারো কারো আদিমতা অপরের চেয়ে কম।

অবচেতন মন কিন্তু সত্যিই ভিন্নজাতীয়। আপনার উপলব্ধির জন্যে অপরের চেতনা চিন্তা প্রবাহ এত অল্পের আর লাভজনকভাবে গ্রহণ করে যে একাধিকের মধ্যেই আপনি পাগল হয়ে যেতে পারেন।

অত্যন্ত শক্তিশালী আর বিশুদ্ধ হচ্ছে যৌন আবেগ। কিন্তু ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ, লজ্জা ও তুলনায় দুর্বল। ফ্রয়েড, ইয়াস করতেন, এমন একটা সার্বজনীন বুদ্ধা আবেগ আছে যার ফলে মানুষ জীবনকে এমনই ঘৃণার চক্ষে দেখে যে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে বা অপরকে করে দেয়।

একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মনে অন্য পিতার যৌন উইলে কী আছে দেখার কৌতূহল কিছুটা থাকতে পারেই। কিন্তু সেই সামান্য কৌতূহল অবচেতন মনে যে ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা' আশ্চর্যকর। তার পিতার মৃত্যু হোক বা তাকে খুন করার ইচ্ছা সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ফুটে উঠবে। তাদের, তাদেরই সেই গোপন উইলের সাক্ষ্যটা তাদেরকে আতঙ্কিত করে তুলবে।

কেউ কেউ হাসি, কান্না, ঘুম ইত্যাদি কৃত্রিম বর্জনের নিয়ে মেলামেশে সাধারণ করে। তাদেরে তাই নিয়ে আসতে হয়তো ইচ্ছা তার সচেতন মন সোপন করে না। কিন্তু তার অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া ঘোষণা করতে পারে—আমি খুন করতে পারি। আমি বিষক্ত হয়ে উঠলে, আঘাত করতে পারি।.....

—একটা কালো কাটা দাঁড়ি নিয়ে আমিনা যে ধাক্কাধাক্কি করছিল, সে দৃশ্য তা এখন যেন বেশী করে সুকান্তর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

: আপনার চারপাশের মানুষকে আপনি চিনতে পারছেন না, কেমন? ডাঃ চ্যাটার্জী বলে চললেন, সবাই আপনাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে, তাই না? কিন্তু সবাই তো খারাপ নয়। তারা সাধারণ মানুষ। এবং কারো ক্ষতি করতে চায় না। তাদের সজ্ঞান মনের সমালোচক, যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি—তার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। আপনার মনে যেসব চিন্তা আছে, অন্য মানুষের মনেও আছে তাই। কিন্তু অন্য মানুষের মনের চিন্তাগুলোকে আপনি নিজের অতি তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করে আতঙ্কিত হবেন না। তাহলে কিন্তু পাগল হয়ে যাবেন।

: আমি তাহলে পাগল হয়ে যাচ্ছি, ডাঃ চ্যাটার্জী? প্রায় আর্তকণ্ঠে সুকান্ত বলল: আমি আপনার বিশ্বেও ভালভাবে তাহাতে সাহস পাচ্ছিনা। কী-করব এখন? আপনি আমার জন্যে —ডাঃ চ্যাটার্জী, কিছু একটা করতে পারেন না!

: হ্যাঁ খুব করতে পারি আপনাকে। ডাঃ চ্যাটার্জী কণ্ঠের সুরে পরিবর্তন করলেন: এর কোন ওষুধ নেই, সুকান্তবাবু। কারণ এধরণের ব্যাপার আগে প্রায় ঘটেই নি।

: কিন্তু তা: ° চ্যাটার্জী! সুকান্ত পাগলের মতই বলল: নির্যাতনের এই বিষয় থেকে যারা পাগল হয়ে যায়, তাদের জন্যে তো ওষুধ আছে। বলে দিন, আমাকে—

ডাঃ চ্যাটার্জী বললেন : হাঁ, আপনার বড় আর একটি কেস আমি সেরেছিলাম অনেকদিন আগে। মনে পড়েছে। তবে সে কেসটা আপনার বড় একটা জটিল হয়ে উঠেছিল না। যাই হোক, আমি আপনাকে একটা ইন্‌জেকশন দেব। সেটা অপরাহ্ণ মাংসপেশীর প্রাণচাঞ্চল্য জন্মাবে। বাকিটা ঘুমের। আমি একটা যৌগিক পদার্থ দিয়ে এখনোধিকেই ঘুমোই। সেটা মানুষ ভেদে মাত্রাভেদে প্রযুক্তব্য হয়ে থাকে। সেই হিসাবটাই প্রয়োজন ছিল আপনার কাছে—মানুষ পর্শ-কাতরতা হ্রাস হয়ে নিজেই হবে।

অতঃপর ডাঃ চ্যাটার্জী একটা হাল্কা সিরিঞ্জে কয়েক ফোঁটা কার্বলিক তরলপদার্থ ভরে নিলেন। তারপর হাতের শিরায় ফুঁটা ফুটে দেন।

মুকাভর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল—শুধু মানুষ ভেদে দিয়ে একটা আর প্রবাহ যেন দ্রুত গতিতে ছুটছে ঘিরে মাস্তিষ্কের ভেতরে সৌহে এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল।.....

এরপর মুকাভর যখন ঘুম তখন পুরোদমে রাত বিপ্রহর গড়িয়ে চলতে থেকে। ডাঃ চ্যাটার্জীকে সামনে দেখে হাসলেন ও বললেন : আমি আই ভাল ঘোমাইছি ভটাই। আমার কী প্রয়োজন বলুন।

[বিদেশী কাহিনী প্রভাবিত]

কাজলমালা দেবী

(২২২ পৃষ্ঠার পর)

একইরকম রোমাঞ্চিত কল্পনাবেশে পরিপূর্ণ—গড়া আরম্ভ হয়। লেখতে লেখতে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হইয়া আসিল। অস্তাচলগামী সন্ধ্যাচিত্রাদীপ বাঁধনে পাণ্ডুলিপিগুলি নিমুর্বাজিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার আসিয়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল, নিস্তব্ধতার মাঝের পাখে পাখে অসংখ্য ঝিঁপোকারা ডাকিয়া উঠিল। অদূরে নদীতীরস্থ লৌকাপুঞ্জের আলোর মালোৎমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে ছিল। মধার জলে স্ফীত যমুনার জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিতেছিল। নদীতীরবর্তী বহুমহাশয়ের অট্টালিকার বারান্দা হইতে বালকী একাগ্রচিত্তে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল।"—তবে উপন্যাসের শেষে গীতাপাঠ, গীতার মর্মানে আছা এবং গীতোক্ত আচরণের আত্মস্থতাই প্রাধান্যলাভ করেছে—"তাহার মনে হইল, ধরণীর বেশভূষাতেও সে ত কখনো এমন সৌন্দর্য দেখে নাই। যাহাকে দেখিয়া সে আত্মহারা হইয়া যাইতেছিল, সে তখন প্রেমহাস্যে একাগ্রচিত্তে হাতীমনে দিকে চাহিয়া গীতার গানাংশ বুঝাইয়া দিতেছিল—

রাধারমণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর একবছর পরে ১৯০১ সালে কাজলমালা ধারা যায়। বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে তাঁর নাম খুবই অপরা। যাদী রাধারমণদাসের মতন বিশেষ কীর্তির মানুষ স্মরণ রেখে যেতে পারেন নি সাত্য। যত অভিজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্যই থাকুক তাঁর রচনা আবাক নয় তবু সকল সময় আমার ও মনে থাকে মূ'একটি কথা বা মূহুর্ত ইতিহাসে মূ'একটি করুণ মধুর কাহিনী পরিবেশন এবং সহায় রসিকতার কাজলমালা কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এবং সেই পরিবেশন গীতির নৈপুণ্যে-ই চিরদিন বাংলা-সাহিত্যামোদীদের মধ্যে একটি স্থায়ী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। তাঁর সেই অমরত্বলাভ সম্ভব এবং যথার্থ মধুর ভাঁজটুকুই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে বর্তমান পর্যন্ত সমাজের দরবারে পেশ করা হয়েছে। এ যুগের পাঠকবর্গ এই অবহেলাবাধা লেখিকার প্রতি সুবিচার করবেন।